রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি

পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ

অরূপ কুমার বড়ুয়া

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি

পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ

গবেষক : অরূপ কুমার বড়ুয়া

নিবন্ধন সংখ্যা : ৩/২০০৬-০৭

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক : ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক : মোহাম্মদ আবু জাফর
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতি সম্পর্কে আমার গবেষণা করার উৎসাহ বর্তমান পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে বাস্তবরূপ পেল। এ জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় এ গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য আমাকে তিন বছরের সবেতন শিক্ষা ছুটি প্রদান করেছেন। এ জন্যে মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। একইসঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত বৃত্তি এ গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বেশ সহায়তা করেছে। এ জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফরের সার্বক্ষণিক মূল্যবান উপদেশ, নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হতো না। কাজের শেষ পর্যায়ে অবসর গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যুগ্ম তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও পালন করেন। এ জন্যে তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। এ পর্যায়ে বিভাগীয় ড. আবদুস সোবহান তালুকদার আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমার গবেষণার সূচনাপর্বে বিভাগীয় সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা এবং বর্তমান সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল যথারীতি সহায়তা দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। এ জন্যে তাঁদের নিবেদন করি আমার গভীর শ্রদ্ধা। এ ছাড়া বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমার উপস্থাপিত সেমিনারে উপস্থিত থেকে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা, নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক ড. কুন্তল বড়ুয়া, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জেসমিন আক্তার, লেখক সৈয়দ আবুল কালাম ও অধ্যক্ষ শিমুল বড়ুয়া প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছেন। এ জন্যে তাঁদের প্রতি জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কমলাপুরের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সময় উক্ত গ্রন্থাগারসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করেছেন। এ জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকার সময় আমার বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী-কন্যা সংসার বিষয়ে আমার অনিবার্য উদাসীনতা সহনশীলতার সঙ্গে অনুমোদন করে আমাকে বাধিত করেছেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। এ ছাড়া আমার সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদের সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে অনুজপ্রতিম সতীর্থ ড. মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ-এর সহৃদয় সহযোগিতা ভুলবার নয়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে কম্পিউটার চালক তুষার কান্তি বসাক, দেবাশীষ বড়ুয়া এবং অনুজপ্রতিম মো. আমিনুর রহমান বিভিন্ন পর্যায়ে সহয়োগিতা করে আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এ ছাড়া বাংলা বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার রীনা বেগম, অফিস সহকারী জনাব আব্দুল ওয়ারিশ মিঞা, বার্তাবহ মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান এবং রীনা পারভীনের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রবীন্দ্র নাটকের মূল্যায়নে সমান্যতম অবদান রাখতে সক্ষম হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচনা করব।

অরূপ কুমার বড়ুয়া

তারিখ :   / ১২/২০১৫

প্রত্যয়ন-পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলা বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক অরূপ কুমার বড়ুয়া (নিবন্ধন সংখ্যা-৩/২০০৬-০৭) আমাদের তত্ত্বাবধানে 'রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি' বিষয়ে গবেষণা সমাপ্ত করে পিএইচ. ডি. উপাধির জন্যে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত করছে। সে তার নিজস্ব মেধা, অধ্যয়ন ও শ্রমে এই গবেষণা-কর্ম সুসম্পন্ন করেছে। অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব রচনা এবং এর কোন অংশ মুদ্রিত হয় নি অথবা কোন উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কোন উপাধির জন্যে উপস্থাপিত করা হয় নি। আমরা তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক	যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার	মোহাম্মদ আবু জাফর
সহযোগী অধ্যাপক	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ	বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	ভূমিকা	৮
প্রথম অধ্যায়	নাটক ও রাজনীতি	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্র-পূর্ব নাটকে রাজনীতি	৪৭
তৃতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি, প্রথম পর্ব	১০৮
চতুর্থ অধ্যায়	রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি, দ্বিতীয় পর্ব	১৬৪
পঞ্চম অধ্যায়	রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি, তৃতীয় পর্ব	২৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়	উপসংহার	৩৩৭
	গ্রন্থপঞ্জী	৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর অবদান অসামান্য। নাটকেরও ঘটেছে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবকালে নাট্যমঞ্চের মাধ্যমে বাংলা নাটক হয়ে উঠেছিল বেশ জনপ্রিয়। শিল্প-মাধ্যমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজমানসের যথযথ প্রতিফলনের দক্ষতাও ছিল। এ জনপ্রিয়তার কারণ। তবে সর্বদা জনরুচির অনুসরণ করতে গিয়ে এ সময়ের নাটক শিল্পমানের দিকে থেকে উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছুতেও হয়েছে অনেকখানি ব্যর্থ। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটককে বৈচিত্র্যে ও আপন শিল্প বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হন। বিষয় গৌরবে, সংলাপের প্রাঞ্জলতায় ও ক্ষেত্রবিশেষে ভাষার কাব্যময়তায় এবং কখনও কখনও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তিনি অর্জন করেন বিশিষ্টতা। তিনি প্রথাগত পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখেছেন, লিখেছেন একাঙ্ক নাটক, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য। একই সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব নাট্যবুদ্ধির প্রয়োগে ব্যাপৃত থেকেছেন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এ প্রক্রিয়ায় তিনি উদ্ভাবন করেন বাংলা নাট্যধারায় ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি তত্ত্বনাটক বা রূপক-সাংকেতিক নাটক। এ শ্রেণির নাটকের মধ্যেই তাঁর মানব জীবন ও সমাজ চিন্তার বিশেষ ভাবসমৃদ্ধ মানসের প্রতিফলন ঘটেছে যথযথভাবে।তবে মনুষ যেহেতু রাজনৈতিক সত্তাও বটে, তাই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকেও পরোক্ষভাবে তাঁর সমাজমানসের প্রতিফলন দুর্লক্ষ নয়। এ ভাবে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র-নাট্যরচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিধৃত হয়েছে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

রবীন্দ্রযুগে ভারতবর্ষে তথা সার বিশ্বে সক্রিয় ছিল বিচিত্রমুখী রাজনৈতিক তৎপরতা। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এসময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূচিত হয় রাজনৈতিক আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম স্বভাবতই রবীন্দ্র নাটক এসব আন্দোলন ও সংগ্রাম কতখানি ও কী ভাবে ধারণ করেছে তা লক্ষযোগ্য। আবার রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে একটি প্রলয়ংকারী বিশ্বযুদ্ধ এবং ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের গণ্ডি পেরিয়ে এসেও এ দেশের মানুষের জীবনে স্থিরতা আসে নি। নব্য সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের এদেশীয় দোসর শ্রেণির শোষণের জাঁতাকলে আরও নিষ্পেষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তীব্র শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব প্রকার শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে আরেকটি সংগ্রাম তথা বিপ্লব। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের অনিবার্যতার কোন পরোক্ষ ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যকর্মসমূহে পাওয়া যায় কি না তা জানার কৌতূহলও স্বাভাবিক। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নাটকে সমকালীন জীবন প্রতিফলিত হবে, এটা কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি কালোত্তীর্ণ শিল্পীও। এ কারণে তাঁর রচনায় ভবিষ্যতের জীবন তথা রাজনীতির ইঙ্গিত আশা করাটা অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের শিল্পমান নিয়ে সব বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থ রবীন্দ্র-নাট্যের বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল দিক উন্মোচনের সহায়ক। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষায় এখনও ব্যাপক আলোচনা হয় নি। সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর iex›‘-gvbm গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তা রবীন্দ্র-মানসের গভীরে আলো ফেললেও সমগ্রতাসন্ধানী নয়। অপর দিকে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুধী প্রধান, প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা করেছেন। এঁদের প্রথম দু'জন বস্তুবাদী সমালোচনার নামে যা উপস্থাপন করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রেণিসংগ্রামের বক্তব্য প্রচারক বলে ধারণা জন্মে। অপর পক্ষে প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস i³Kiex নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য তত্ত্বনাটক সম্পর্কে কিছু চকিত-মন্তব্য করেছেন। ফলে তাঁর প্রবন্ধটিও সমগ্রতাস্পর্শী হতে পারে নি। সমালোচনার দ্বান্দ্বিকতাও তাতে অনুপস্থিত বলে আলোচনা হয়ে পড়েছে খণ্ডিত। সম্প্রতি হায়দার আকবর খান রনো iex›‘bv_/ †kYx‘wó‡KvY †_‡K নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকসহ আরও কিছু বিষয়ে শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির আলেচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন। কিন্তু বিষয় সমূহের ব্যাপকতা একটি গ্রন্থে ধারণ করার ফলে প্রবন্ধগুলো হয়েছে সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত চিন্তাসঞ্জাত ও পূর্ব-অনুমান প্রসূত বলে মনে হয়। এ ধরনের সীমাবদ্ধ এবং বস্তুবাদী সমালোচনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আমাদের এ কাজে ব্রতী হতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে নাটকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের স্বরূপ। স্বাভাবিকভাবে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এর সূত্র সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রবীন্দ্র-পূর্ববতী বাংলা নাটকে রাজনীতির প্রতিফলন সম্পর্কিত আলোচনা। এতে তৎকালীন নাটকে রাজনীতির প্রভাব কী ভাবে এসেছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্যায়ের নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতির পরিচয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লোষিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের তথা তত্ত্বনাটক বা রূপক-সাংকেতিক নাটকসমূহে উপস্থাপিত রাজনীতির স্বরূপ। তেমনি পঞ্চম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের নাটকগুলোতে প্রতিফলিত রাজনীতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলো বিশ্লেষণের সময় প্রথমে তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে, প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলেও সে রাজনীতি নাটকের মূল ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে স্থান পায় নি। ফলে এমন ধারণা করা চলে যে, এ সময় রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে রাজনৈতিক নাটক রচনা করতে উৎসাহ বোধ করেন নি। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কোন কোন নাটকে সচেতনভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। আবার বেশ কয়েকটি নাটকে তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে পরোক্ষভাবে। এই সব উদ্‌ঘাটন সম্ভব তাঁর নাটকের ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপের গভীরে অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপের মাধ্যেমে।

রবীন্দ্রনাটকের শিল্পমান বিচার এ অভিসন্দর্ভের প্রধান লক্ষ্য না হলেও কখনও কখনও সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রতিফলিত রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত সর্বদা প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের মতের অনুগামী হয় নি। তবে সে সব ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব নাটকের উপাদান ছাড়াও বিভিন্ন সময় দেওয়া কবির বক্তব্য, সাক্ষাৎকার এবং তাঁর অন্যান্য রচনার সাহায্যে গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার একটি সার-সংক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq
bvUK I ivRbxwZ

শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটক যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যময় এবং চমকপ্রদ। সাধারণভাবে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শিল্পীর মাধ্যমে কোন কিছুর উপস্থাপনাকে বলা হয় নাটক।[১] কারো কারো মতে, নাটকে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের ছবি উপস্থাপন করা হয়।[২] একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য বৈশিষ্ট্যের কারণে নাটকের আবেদন দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। মানব-জীবন উপলব্ধির ফল হিসেবে নাটক সর্বদা সমাজসম্পৃক্তও বটে। সমাজের গভীর তলদেশ থেকে শু করে উচ্চতর ও মহিমান্বিত বিষয় কাব্যিক অনুপ্রেরণায় গ্রহণ করে বর্তমানে নাটক মানব মনীষার সবচে আকষর্ণীয় রূপ গ্রহণ করেছে।[৩]

উৎপত্তির দিক থেকে নাটক প্রায় সভ্যতার সমান বয়সী শিল্প।[৪] সভ্যতার আদিম পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহের জন্য পশু শিকারের প্রস্তুতি হিসেবে যে নৃত্য ও গীতের প্রচলন ছিল পরবর্তী সময় তার সঙ্গে কাহিনী বর্ণনা ও সংলাপ যুক্ত হয়ে নাটকের উৎপত্তি বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। জিয়া হায়দারের মতে 'আদিম যুগের নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের সম্মিলনেই একটি একক শিল্পরূপ লাভ করে থিয়েটার।[৫] স্বতন্ত্র আঙ্গিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পরও নাটক বহু দিন ধর্মীয় অনুষঙ্গ বা কৃত্য (Ritual) হিসেবে চর্চিত হয়েছিল। কিন্তু এর উপস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য এবং সামষ্টিক উপভোগযোগ্যতার কারণে দ্রচত এ শিল্প হয়ে ওঠে রচয়িতার বিশেষ বক্তব্য প্রচারের বাহন। নাট্যাভিনয় দর্শককে দ্রচত উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হওয়ার ফলে শাসকশ্রেণি থেকে শুরু করে ধর্মযাজক কিংবা অধিকার সচেতন শ্রমিক শ্রেণিও নাটককে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা চালায়। বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিস ও ভারতের কোন কোন নাটকে আলোচিত হয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও বক্তব্য।

---

[১] "Drama, In general any work meant to be performed on a stage". J.A. CUDDON, A DICTIONARY OF LITAERARY TERMS, PENGUIN BOOKS, 1982.

[২] "Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre." Elizabeth Drew, Discovering Drama, উদ্ধৃত; শ্রীশ চন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন (সম্পা. অধ্যাপক মুহাম্মদ মফিজুল ইসলাম), ঢাকা? পৃ. ৯২

[৩] The drama is at once the most peculiar, the most elusive, and the most enthralling of all types of literature. It is so deeply associated with and dependent upon the whole material world of the theatre, with its thronging crowds and its universal appeal, it lies so near to the deeper concioussness of the nation in which it takes its rise; its capable of addressing itself so widely and so diversely to peoples of far distant ages of varying climes; it is so social in its aims and its appreciation; it is so prone to discend to the uttermost depths of buffonery and of farce, and yet ascends so easily and so gloriously to the most magnificent heights of poetic inspiration, that it stands undoubtedly as the most interesting of all the literary products of the human intelligence. ALLADYCE NICOLL, The theory of drama, Delhi, 1999. p.9

[৪] ইসমাইল মোহাম্মদ, নাট্যকলার ক্রমবিকাশ, ঢাকা, ১৯৮৭. পৃ. ১

[৫] জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা, ১ম খ-, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব ও কার্যাবলী কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক কর্মসূচীকে বোঝায়।[৬] ব্যাপকতর অর্থে রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র এবং সমাজের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য একক বা সামষ্টিক আন্দোলন বোঝাতে পারে। সে অর্থে শ্রমিক-কৃষকের বা অপরাপর শ্রেণির আর্থিক অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের আন্দোলনও রাজনীতির অংশ।[৭] আবার এঙ্গেলসের মতে, 'যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেই'[৮]। সে কারণে রাজনীতি বলতে কোন নির্দিষ্ট নীতির বদলে শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থরক্ষামূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাও বোঝায়।[৯] প্রাচীন যুগ থেকে শুরু হয়ে আধুনিক যুগের বিভিন্ন ভাষার নাটকে উপরি-উক্ত রাজনীতির প্রভাব কিংবা রাজনীতিসংক্রান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়। এর মধ্যে কোন কোন বক্তব্য নৃপতি, শাসক গোষ্ঠী বা সামাজিক মানুষকে সমর্থন করেছে, উদ্দীপিত করেছে; আবার কখনো কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরোধিতাও করেছে। ফলে, নাট্যকাররা যেমন সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন, তেমনি কখনো কখনো হয়েছেন নিগ্রহের শিকার।

পৃথিবীর প্রাচীন নাট্যচর্চা সম্পর্কে মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় গ্রিক নাটকের। এতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নাটকের মধ্যে এস্কাইলাস (AESCYLUS, ৫২৫–৪৫৬ খ্রীষ্টপূর্ব) -এর রচনা সবচেয়ে প্রাচীন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে সংগঠিত ম্যারাথনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কথা তিনি নিজেই লিখে রেখেছিলেন তাঁর সমাধিলিপিতে।[১০] পরবর্তী সময় এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেছিলেন *Suppliants* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬১) নাটক। তাঁর পরবর্তী *Persians* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭২) নাটকের বিষয়ও স্যালামিসের নৌযুদ্ধে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৬) পারসিকদের বিরুদ্ধে গ্রিকদের বিজয়ের ইতিহাসকেন্দ্রিক।[১১] এ নাটকে স্বেচ্ছাচারী শক্তিকে প্রতিহত করে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সে সময় এথেন্স ছিল বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সে

---

[৬] Politics :1. "Activities associated with Government. The theory and practice of government, especially the activities associated with governing, with obtaining legislatives or executive power or with forming and running organisations connected with government...".
2. "Calculated advancement the use of tactics and strategy to gain power in a organization".
–Bloomstury English Dictonary (new edition),

[৭] Politics, activity linked with relations between classes, nations and other social groups centred on the seizure, retention and use of state power. The relations between classes, and hence their policy, which expresses their fundamental interests, arise from their economic position. Dictonery of Philosophy, Moscow 1984. "Celculated advancement the use of tactics and strategy to gain power in a or organisation. – Bloomstury English Dictonary (new edition),

[৮] ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা-সংকলন, ২য় খন্ড, ১ম অংশ, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৩১৯

[৯] সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২৭

[১০] মোবাশ্বের আলী, বিশ্বসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮২

[১১] কুন্ডল মুখোপাধ্যায়, থিয়েটার ও রাজনীতি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শেই এস্কাইলাসের মানস গঠিত হয়েছিল বলে তিনি স্বৈরাচারকে কোথাও সমর্থন দেন নি। একজন সমালোচকের মতে, উক্ত নাটকে "প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য শক্তির কাছে নগণ্য গ্রীসের বিজয়ের মাধ্যমে তিনি এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, স্বাধীন মানুষকে স্বৈরাচারী শক্তি কখনও পর্যুদস্ত করতে পারে না"।[১২] সে সঙ্গে এও স্মর্তব্য যে, এ সময় রাজা পেরিক্লিস এথেন্সের নাগরিকদের জন্য নাটক দেখা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। এটি তিনি করেছিলেন, মূলত নাগরিকদের আনন্দ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।[১৩]

এস্কাইলাসের পরবর্তী নাট্যকার সফোক্লিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৬-৪০৬) যুগান্তকারী ট্র্যাজেডি রচয়িতা। তাঁর রচিত নাটককে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেই বিখ্যাত নাট্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তাঁর *Poetics* (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০) গ্রন্থে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করেছিলেন। সমালোচকদের ধারণা এ গ্রন্থে ট্র্যাজেডির সূত্র নির্দেশের মধ্যে তৎকালীন দাস-প্রভু ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রতি অ্যারিস্টটলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ব্যক্ত হওয়ার পাশাপাশি কাজ করেছে সে সমাজ টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা। যেমন, ট্র্যাজেডিতে বিমোক্ষণ বা purgation বিষয়ক আলোচনার এক জায়গায় বলা হয়েছে, চিকিৎসক যেমন রোগীর দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করে দিয়ে রোগের উপশম ঘটান, ট্র্যাজেডিও তেমনি দর্শক বা পাঠকের মন থেকে অবরুদ্ধ করুণা ও ভীতির অনুভূতিকে নির্গত করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখে।[১৪] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে,

> করুণা ও ভীতির অবদমনজনিত কুফল ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজকেও বিপন্ন করতে পারে। অবরুদ্ধ অনুভূতিগুলো একদিন প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হতে পারে সামাজিক উপপ্লব কি বিশৃঙ্খলার আকারে।[১৫]

অ্যারিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডি সমাজকে সে ধরনের উপপ্লব থেকে রক্ষার মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করে। এ ছাড়া ট্র্যাজেডিতে নিয়তি (nemesis) বা দৈববাণীর যে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাতে মানবজীবন হয়ে পড়ে পুরোপুরি দেবতা বা প্রকারান্তরে মন্দিরের পুরোহিতের অধীন। কারণ সে সময় পুরোহিতদের মুখ দিয়েই উচ্চারিত হতো আলৌকিক দেবতাদের বাণী। আর এ সব পুরোহিতকে এথেন্সের দাস-মালিক শাসকগোষ্ঠী উৎকোচ প্রদান বা অন্যান্য কৌশলে ব্যবহার করত জনগণকে নিয়ন্ত্রণের কাজে। এ প্রসঙ্গে রেবতী বর্মণ বলেন :

[১২] মোবাশ্বের আলী, গ্রীক ট্র্যাজেডি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪
[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
[১৪] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ, ১৪
[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

> গ্রীক থিয়েটার গ্রীক ধর্মেরই মতো দাস-মালিকদের হাতে ছিল একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র। ইহার সহায়তায় দাস-মালিকেরা সাধারণ লোকের মধ্যে নিজেদের ভাব, নিজেদের আদর্শ প্রচার করিত; সকল সময়ই উদ্দেশ্য থাকিত নিজেদের শ্রেণীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা।[১৬]

সফোক্লিসের পরবর্তী নাট্যকার ইউরিপিদিসও (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০–৪০৬) ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচয়িতা। তাঁর সময় এথেন্স ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী চরিত্রের হয়ে উঠতে থাকে। বিষয়টি ইউরিপিদিসের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তাঁর নাটকে প্রকাশ করেন যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য। যেমন এথেন্সের নৌ বাহিনী সিসিলি আক্রমণ করতে গেলে তিনি সে সময় মঞ্চস্থ করেন *Trojan Women* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪১৫) নাটক, যেখানে যুদ্ধে বীরত্বের পরিবর্তে প্রকটিত হয় ভয়াবহতা, নৃশংসতা এবং অসীম বেদনার হাহাকার। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যুদ্ধের পরিণাম বিজয়ী বা পরাজিত কারও জন্যেই শুভ বা কল্যাণকর নয়।[১৭] শুধু তাই নয়, তাঁর নাটকে অভিজাত চরিত্রের পাশাপাশি প্রথম দেখা গেল কুটিরবাসী নিম্নশ্রেণির চরিত্রের সমাবেশ; শোনা গেল নারীদের বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ ও দ্রোহের কথা। যেমন, তাঁর *Media* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১) নাটকে মিডিআ চরিত্রের সংলাপে ধ্বনিত হলো রীতিমত নারীবাদী বক্তব্য। যেমনঃ

> But we, they say, live a safe life at home.
> While they, the men, go forth in arms to war.
> Fools! Three times would I rather take my stand
> With sword and shield than bring to birth one child.[১৮]

কিন্তু নাট্যকার ইউরিপিদিসের এ সব বক্তব্য সে সময়ের এথেন্স-শাসকের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি রাজরোষে পড়েন এবং শেষ জীবনে দেশ ত্যাগ করে মেসিডোনিয়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এথেন্সের আরেক নাট্যকার এ্যারিস্টোফেনিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৮-৩৮০) ছিলেন শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতা। তিনিও যুদ্ধবিরোধী কমেডি রচনা করে তৎকালীন ডেমাগগ নেতা ক্লিওনের বিদ্বেষের শিকার হয়ে জরিমানা প্রদান করেন।[১৯]

যুদ্ধবাজ ক্লিওনকে বিদ্রূপ করে রচিত তাঁর নাটকগুলো ছিল *Babelonians* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৬) এবং *The knights* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৪)। তাঁর বিখ্যাত নাটক *The Frogs* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৫)-এ জ্যেষ্ঠ নাট্যকার, সমসাময়িক দার্শনিক, রাজনীতিবিদ (ক্লিওনসহ) নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন তিনি। এদিক

---

[১৬] রেবতী বর্মণ, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬২।
[১৭] মোবাশ্বের আলী, গ্রীক ট্র্যাজেডি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০
[১৮] EURIPIDES, Media.
[১৯] এ্যারিস্টোফেনিস, ভেক (অনুবাদ ও ভূমিকা : কবীর চৌধুরী), ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তাঁর তীব্র যুদ্ধ বিরোধী নাটক *Lissystrata* (খ্রীষ্টপূর্ব ৪১১)-এ নাটকের যুদ্ধ-বিরোধী উপাদান সাম্প্রতিক সময়ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা জানাতে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ২০০৩ সালের ৩ মার্চ পৃথিবীর ৫৬টি দেশের ৯১৯টি প্রকাশ্য সমাবেশে এ নাটক অথবা এর অংশ বিশেষ পঠিত কিংবা অভিনীত হয় উক্ত যুদ্ধ-অভিযানের বিরোধিতায়। এই সংঘবদ্ধ উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে Lyssistrata Project ।[২০]

গ্রিসের মতো ভারতেও রয়েছে নাট্যচর্চার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও উপস্থাপনার যে অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্টতই অনুমান করা চলে যে, উক্ত নাট্যশাস্ত্র রচনার বহু পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে নাটকের ব্যাপক চর্চা ছিল।[২১] এ শাস্ত্রে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে:

> নাটক সর্বশ্রেণীর সর্বসাধারণের অনুকৃতি। এতে সকলেরই ভাল মন্দ সব আচরণই স্থান পাবে, নাটক থেকে সকলেই লাভ করবে শিক্ষা ও সুপরামর্শ। নাটক হচ্ছে সকল শাস্ত্রের সমন্বিত আধার। নাটকে থাকবে ত্রিভুবনের সকল কিছুর অনুকৃতি যা অভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত হবে। নাটক যেমন শিক্ষা দান করবে, তেমনি মনে আনন্দের সঞ্চার করবে; শক্তি যোগাবে, দুঃখে হবে সান্ত্বনা।[২২]

অবশ্য উক্ত শাস্ত্রে ‘সর্বশ্রেণীর’ মানুষের অনুকৃতির কথা থাকলেও সংস্কৃত নাটক উপভোগের সুযোগ সে কালে সর্বশ্রেণির মানুষের বিশেষ করে বৈশ্য ও শূদ্রদের ছিল না। রাজন্যবর্গ, উচ্চবিত্ত নাগরিক ও ধর্মীয় পুরোহিতরাই পেত সে সব নাটক উপভোগের সুযোগ। তবে নাটকের কাহিনীতে উচ্চবিত্তের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে নিম্নশ্রেণির চরিত্র। সাধারণভাবে iv‡gvqY, gnvfviZ ও পুরাণ কাহিনীর উপাদান নিয়ে সংস্কৃত নাটক রচিত হলেও তাতে সমসাময়িক রাজনীতি এবং প্রচলিত লোককাহিনীও ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বিশাখদত্তের (আনুমানিক খ্রীস্টীয় ৯ম শতক) g‘viv ÿm নাটকটি পুরোপুরি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অবলম্বনে রচিত। A B Keith -এর মতে:

> It is a drama of political intrigue, centred in the person of Raksasa, formarly minister of the Nandas, who is now sworn to revenge their destruction on Canakya, the Brahmin who vowed to ruin them,...[23]

---

[২০] রথীন চক্রবর্তী (সম্পা.), যুদ্ধ ও থিয়েটার, নাট্যচিন্দ্র, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১-৬, পৃ. ১১
[২১] দুলাল ভৌমিক, সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ. ১৬
[২২] জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬১
[২৩] Keith, A.B. The Sanskrit Drama, oxford, P.205.

Dhaka University Institutional Repository

এ নাটকে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে শু করে, রাজনৈতিক হত্যা ও নিপীড়নসহ বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রের চিত্র উপস্থাপিত হতে দেখা যায়।[২৪] বিশাখদত্তের নামে প্রচলিত †'exP›' ¸ß ও AwfmwiKvew ÂZK নাটকও রাজনীতিসম্পৃক্ত বলে কেউ কেউ মনে করেন।[২৫]

সংস্কৃত নাটকে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার ফলে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পরোক্ষ চিত্র পাওয়া যায় শূদ্রকের (আনুমানিক ৭ম শতক) g"QKwUK রচনায়। এখানে এক সজ্জন ব্রাহ্মণ পুরুষ চারুদত্তের সঙ্গে গণিকা বসন্তসেনার প্রেমকাহিনী উপস্থাপনার পাশাপাশি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের কথাও বর্ণিত হয়েছে। পরিণতিতে পাওয়া যায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন এবং প্রজাহিতৈষী রাজা গোপালের ক্ষমতালাভের সংবাদ।[২৬]

মধ্যযুগে (খ্রিষ্টীয় ১০ম শতক থেকে) ইউরোপের ধর্মযাজকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবেও নাট্যক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। এতে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বাইবেলের প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনী যেমন, মূল পাপ থেকে মানুষের জন্ম, যীশুর জন্ম-মৃত্যু-পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন ইত্যাদি বিষয় এবং বিভিন্ন পয়গম্বরদের জীবন ও কর্মের অংশও অভিনীত হতো। একজন ঐতিহাসিকের মতে,

> ...মধ্যযুগে সাধারণ জনগণের ভাষায় বর্ণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রীস্টীয় ধর্মকথা ল্যাটিন ভাষাতেই অনুষ্ঠিত হতো, ফলে জনসাধারণের আদপেই বোধগম্য হতো না। তাই দৃশ্যরূপের মাধ্যমে খ্রীস্টধর্মের কথা কাহিনী উপস্থাপিত করা হলে তা' যেমন সহজবোধ্য হতো, তেমনি ধর্মশিক্ষা দানও সহজতর হতো – খ্রীস্টান ধর্ম পরিচালকেরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তারা নাট্যকে পুনরুজ্জীবিত করলেন।[২৭]

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এ সব ধর্মীয় নাটক ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন, ফ্রান্সে বলা হতো 'mysteres' বা 'mystery plays', ইংল্যান্ডে 'miracles', ইটালিতে 'sacre rapprentazioni', স্পেনে 'autos sacramentales' এবং জার্মান ভাষায় 'Geistliche spiele'।[২৮] এ নাটকগুলো প্রথম দিকে গীর্জার ভেতরে শুরু হলেও ধীরে ধীরে গীর্জাঙ্গন থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতকের দিকে শু হয়ে ষোড়শ শতকেও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ করা গেছে ধর্মীয় নাটকের অস্তিত্ব। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এসব নাটকে আলৌকিক ঘটনার পাশাপাশি

---

[২৪] ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩৩-৩৪

[২৫] দুলাল ভৌমিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

[২৬] মৃচ্ছকটিক, শ্রী সুকুমারী ভট্টাচার্য অনূদিত, নতুন দিলণ্টী, ১৯৮৫

[২৭] জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা (২য় খ), ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.৬

[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

অনেক পরিমাণে ছিল পার্থিব কমিক পরিস্থিতি এবং মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র। গীতা সেনগুপ্ত এ ধরনের নাটকের কাহিনী সংগঠন সম্পর্কে বলেন:

> কাহিনী প্রথমাবস্থায় বলা যায় সম্পূর্ণ বাস্তব ধারায় চলত এবং তা যখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছত নাট্যকার তখন সর্বশেষ বিস্ময়ের দিকে তার মোড় ফিরিয়ে নিতেন। এর পরে কাহিনী শেষ করতে যেখানে মিরাক্লের দরকার সেখানে মিরাক্ল এলেও বাস্তব উপাদান তাকে আচ্ছাদিত করে তুলত।[২৯]

মূলত এভাবে শিল্প মাধ্যমের অন্তঃবৈশিষ্ট্যের কারণেই নাটক পুনরায় ধর্মীয় আবহ থেকে এগিয়ে যায় মানবজীবন প্রতিফলনের পর্যায়ে। এই গতি ও প্রবণতা পরিপূর্ণতা অর্জন করে ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের ফলে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি (১৪৫৩-এর পর) থেকে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন জ্ঞান বিজ্ঞানের যে চর্চা শুরু হয় তার ভিত্তি ছিল মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়। একজন ঐতিহাসিকের মতে,

> নবজাগরণের স্পন্দনে ঈশ্বরকেন্দ্রিক মূল্যবোধ অন্তর্হিত হল। সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও দর্শন মানবতন্ত্রের বন্দনায় মুখরিত হয়ে উঠে। ঈশ্বরকে পশ্চাতে রেখে সজাগ সদীপ্ত মর্যাদাবান মানুষকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করতে মনীষীরা সচেষ্ট হলেন।[৩০]

ইতালি থেকে সূচিত হয়ে এ নবজাগরণের ঢেউ সারা ইউরোপে দ্রূচত ছড়িয়ে পড়ে। নাটকে এর প্রভাব প্রবলভাবে দেখা যায় প্রধানত ষোড়শ শতকের ইংল্যান্ডে। এ সময় ইংল্যান্ডে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। টমাস কিড (১৫৫৮–১৬৯৪), ক্রিস্টোফার মার্লো(১৫৬৪–১৫৯৩), উইলিয়ম শেক্সপিয়র (১৫৬৪–১৬১৬), টমাস ন্যাশ (১৫৬৭–১৬০১), বেন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭) এদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের বেশ কিছু নাটকে তৎকালীন মানবজীবন, সমাজ ও রাজনীতির বহু বিষয় এমনভাবে উঠে আসে যে, তাতে নব্য বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীও হয়ে পড়ে বিচলিত। ফলস্বরূপ তারা এ ধরনের নাটক মঞ্চায়নে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে। এমনকি নানা অভিযোগে নাট্যকার ও অভিনেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতেও তারা দ্বিধা করে নি। যেমন টমাস ন্যাশ- এর নাটক AvBj Ad WMm নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি নাট্যদলের সবাইকে জেলে ঢোকানো হয়। একই ভাবে নাটক B÷ l qvW †nv নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কারারুদ্ধ করা হয় নাট্যকার চ্যাপম্যানকে। নাট্যকার বেন জনসন ও টমাস কিডকে গ্রেপ্তার করা হয় ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অজুহাতে।[৩১] বলাবাহুল্য, শেক্সপিয়রের নাটকেও আরোপ করা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের সেন্সরশিপ। যেমন তাঁর wØZxq wiPvW© এর একটি

---

[২৯] গীতা সেনগুপ্ত, বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৩১০

[৩০] নির্মল কুমার সেন, রাষ্ট্রচিন্ড়ার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ.৭

[৩১] SHAKESPEAR, The Essential Guide to the life and works of the bard, Encyclopaedia Britannica, pp 144-156.

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়, চরিত্রের নাম পরিবর্তন করা হয় বারবার, কেটে দেওয়া হয় বহু সংলাপ ও দৃশ্য।[৩২] এসব নাটকের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর অভিযোগ ছিল উদ্ভট ও হাস্যকর। কেউ বলেছেন, “নাট্যশালা হচ্ছে শয়তানের আখড়া”; কেউ বলেছেন– “বেশ্যাবৃত্তির মূল; বিকৃত যৌন কামনারও”।[৩৩] এমনকি লন্ডন শহরে সে সময় ছড়িয়ে পড়া প্লেগের কারণ হিসেবে নাটককে দায়ী করতেও তাদের বাধে নি। এ বিষয়ে তাদের যুক্তি ছিল, “প্লেগের কারণ পাপ, পাপের কারণ নাটক, সুতরাং প্লেগের কারণ নাটক।”[৩৪] কিন্তু নাট্যতাত্ত্বিকদের মতে, “সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ নৈতিকতার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মূলত সেন্সর প্রথা কঠিন করেছিলেন।”[৩৫] আর এলিজাবেথের পর স্টুয়ার্ট বা জ্যাকোবিয়ান আমলে প্রায় আঠার বছর (১৬৪২-১৬৬০) লন্ডনে নাটক ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এ সময় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সেন্সর প্রথা কঠিনভাবে আরোপিত হয়। যেমন, ফ্রান্সের বিখ্যাত কমেডি রচয়িতা মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩)-এর Z׀Zd নাটকটি নিষিদ্ধ হয় একাধিকবার।[৩৬]

ইউরোপে নাটক পুনরায় জনগণের বক্তব্য নিয়ে আসতে শুরু করে ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ সাল) সূত্র ধরে। এ বিপ্লবের অন্যতম রূপকার ভলতেয়ার (১৬৯৪–১৭৭৮), জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২–১৭৭৮), দেনিস দিদেরো (১৭১৩–১৭৮৪) প্রমুখ নাটককে জনমুখী করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেন। এরা একই সঙ্গে ছিলেন নাট্যকার এবং নাট্যতাত্ত্বিক। ভলতেয়ার নটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে গণশিক্ষার ক্ষেত্রে থিয়েটারের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি নিজব্যয়ে কয়েকটি প্রাইভেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৭] ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা প্রভাবিত করেছিল সমগ্র ইউরোপকে। তত্ত্বের পাশাপাশি নাট্য প্রয়োগেও ভলতেয়ারের ছিল অনন্য অবদান। তিনি সে কালে প্রচলিত মঞ্চের ওপর থেকে সুবেশী অভিজাত দর্শকদের সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এরা মঞ্চের ওপরে বসে অভিনেতাদের দিকে মন্তব্যসহ নানা কর্মকাণ্ডে নাটকে বিঘ্ন ঘটাতো।[৩৮] দিদেরো কয়েকটি নাটক রচনার পাশাপাশি *The Paradox of acting* নামে অভিনয় তথা থিয়েটার সম্পর্কিত তত্ত্বমূলক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।[৩৯] এরা সবাই চেয়েছিলেন বিভিন্নভাবে নাটকের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিপ্লবের শিক্ষা পৌঁছে দিতে। পরবর্তী সময় দিদেরোর ভাবশিষ্য

---

[৩২] উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

[৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

[৩৫] জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

[৩৬] কবীর চৌধুরী, ফরাসী নাটকের কথা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৯

[৩৭] জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা (৩য় খ), ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৩

[৩৮] “... এই ফুলবাবুরা মঞ্চ অলংকৃত করে মঞ্চের দু’পাশে সারিবদ্ধ আসনে বসত এবং মাঝের অপ্রশস্ড় স্থানে অভিনেতাদের কোনক্রমে অভিনয় চালাতে হত। এই সৌখিন বাবুরা যখন খুশী বাইরে যেত, মঞ্চে বসে খানা পিনা করত, যখন যা মনে আসত সরবে সেই উক্তি করত, এবং সাধারণ দর্শকদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করায় সর্বদাই ব্যস্ড় থাকত।” গীতা সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১-৪৪২

[৩৯] জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যতাত্ত্বিক ও নাট্যকার লুই সেবাস্তিয়া মার্সিয়া সাধারণ মানুষের জন্য ‘পিপল্‌স থিয়েটার’ বা গণনাট্য প্রতিষ্ঠার দিকে অনেকখানি এগিয়ে যান। পূর্বসূরীদের মতো তিনিও মনে করতেন: “থিয়েটার হলো মানবিক যুক্তিবোধকে শক্তিশালী করার এবং গোটা জাতিকে আলোকিত করার সব থেকে ক্ষমতা সম্পন্ন এবং প্রত্যক্ষ মাধ্যম বা পদ্ধতি।”[৪০] এসব উদ্যোগ ও কাজের ফলে বিপ্লবের পরপরই (১৭৯৩ সালে) ফ্রান্সে গঠিত হয় নাট্য বিষয়ক একটি কমিশন। এ কমিশন ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের থিয়েটারকে সাহায্য সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে নাটককে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় শিল্প আঙ্গিকে পরিণত করতে সমর্থ হয়।

নাটক সম্পর্কে ফরাসীদের এ উদ্যোগ ধীরে ধীরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। যেমন, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৯ সালে গঠিত হয় ফোক্‌সথেয়াটেয়ার। একই ভাবে ১৮৯৪ সালে জার্মানিতে স্থাপিত হয় শিলার থিয়েটার। রম্যাঁ রলাঁর মতে, নাট্যকার শিলার ছিলেন একান্তভাবে রুশো ও মার্সিয়ার চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত।[৪১] সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামেও এ সময় উল্লিখিত ধারার গণনাট্য গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।[৪২]

ফরাসী বিপ্লব ও আঠারো উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে উনিশ শতকের ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সংযোগ শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকের বিষয়, আঙ্গিক ও উপস্থাপনা ভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। শিল্প সাহিত্যে এ আলোড়ন বাস্তবতাবাদ (Realism) হিসেবে পরিচিত।[৪৩] ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮ – ১৮৫৭) সৃজিত ‘পজিটিভিজম’ চিন্তাধারা, কার্ল মার্কস (১৮১৮ – ১৮৮৩) ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (১৮২০ – ১৮৯৫) KwgDwb÷ cwUi Bk‡Znvi (১৮৪৮), চার্লস ডারউইনের (১৮০৯ – ১৮৮২) w‘ AwiwRb Ae w¯úwkR (১৮৫৯), কার্ল মার্কস-এর wµwUK Ae cwjwUK¨vj BKbwg (১৮৫৯) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশ্লেষণের প্রভাবে আঠারো শতকের রোমান্টিক ভাবালুতার প্রতি মানুষের আস্থা উঠে গিয়েছিল। এ অবস্থায় শিল্প-সাহিত্যে কল্পনার ঐশ্বর্য সন্ধানের পরিবর্তে আসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয় ও প্রকরণে বাস্তবজীবন অনুকরণের প্রবণতা। এ ধারার পথিকৃৎ ছিলেন ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার এমিল জোলা (১৮৪০ – ১৯০২) এখানে উল্লেখ্য যে, জোলা তাঁর ধারাটিকে স্বভাববাদ বা স্বাভাবিকতাবাদ (Naturalism) হিসেবে পরিচয় দিলেও বাস্তবতাবাদের সঙ্গে এর খুব একটা পার্থক্য নেই; বরং দুটো

---

[৪০] রথীন চক্রবর্তী (অনুবাদ ও সম্পাদনা), রম্যাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটার, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৯০
[৪১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
[৪২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০
[৪৩] জিয়া হায়দার, নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

একে অপরের পরিপূরক।[৪৪] এ ধারার নাটক সম্পর্কে এমিল জোলা ‘দি ন্যাচারালিজম ইন থিয়েটার’ প্রবন্ধে লিখলেন :

> নাটককে উপকথা ও কাল্পনিক জগতের সাজানো কাহিনী ছেড়ে সতেজ জীবনে ডুব দিতে হবে। সেখানে থাকবে জীবন্ত চরিত্র ও তার পারিপার্শ্বিক। ... নাটকে আনতে হবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মানসিকতা। একমাত্র বিজ্ঞানই থিয়েটারকে বাঁচাতে পারে।[৪৫]

তিনি যে বিষয়ের ওপর জোর দিলেন তা হলো, শিল্পকলা অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত হবে তার নিয়ম শৃঙ্খলায় ও পদ্ধতিতে; এবং মানুষের জীবনাচরণ, ব্যবহার প্রভৃতিতে তার অতীত উত্তরাধিকার (heridity), পারিপার্শ্বিকতা ও তাদের প্রভাব কার্যকর থাকে আবশ্যিকভাবে। এ তত্ত্বের প্রয়োগ তাঁদের নাট্যসৃষ্টিতেও লক্ষ করা গেল। জোলার †U‡imv i¨vKqv (Therese Raquin) উপন্যাসের নাট্যরূপের ভূমিকায় তিনি বললেন, পুরনো– বিশুদ্ধ নীতিবান নায়কের জয়সূচক কিংবা নীতিহীন খল নায়কের প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও পরাজয়ের– ছক বাঁধা নাটকের দিন শেষ।[৪৬] বস্তুতপক্ষে বাস্তবতাবাদের পূর্বে রোমান্টিক ধারায় মানবজীবন চিত্রিত হতো আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিতরূপে, যেখানে স্বপ্নমায়া ও কল্পনার প্রভাবে জীবন হয়ে উঠত বীরত্বপূর্ণ, দুঃসাহসিক অভিযানে সমৃদ্ধ ও মোহময়।[৪৭] কিন্তু বাস্তবতাবাদে মহান আদর্শবাদ ও কল্পনাবিলাসের স্থান রইল না, বরং এর ঝোঁক হল বাস্তবজীবনের সেই অংশের প্রতি যা রক্তাক্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, ক্লেদময়, নিষ্ঠুর ও নীচ। জোলা সূচিত ন্যাচারালিস্টিক নাটকের অন্যতম বক্তব্য ছিল, থিয়েটারকে বুর্জোয়াদের দীর্ঘকালীন অধিকার থেকে, ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। তাই ন্যাচারালিস্টিক নাটকে বুর্জোয়া সমাজের প্রতি তীব্র বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল।[৪৮]

এ সময় ইউরোপের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বিরাজ করছিল তীব্র শ্রেণি-সংঘাতের পরিবেশ। পুঁজিবাদী শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃটেনসহ অন্যান্য দেশে উদ্ভূত বিশাল শ্রমিক শ্রেণি তখন প্রবল শোষণের সম্মুখীন। তাদের প্রতিবাদ, সংঘবদ্ধ দাবি দাওয়া আদায়ের তীব্র সংগ্রামে বুর্জোয়া শাসকেরা শঙ্কিত। সে কারণে প্রচণ্ড দমননীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের এসব আন্দোলন বন্ধ করার জন্য তারা ছিল সদা তৎপর। যেমন, ১৮৪৮ সালে জার্মানির শ্রমিকদের ঐতিহাসিক আন্দোলন অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়। একই ভাবে ১৮৭০ সালে ফ্রান্সে গঠিত পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক

---

[৪৪] J.A. CUDDON, ibid, p. 416; জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬; কবীর চৌধুরী, সাহিত্য কোষ, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ.৭৮

[৪৫] সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১০-১১

[৪৬] আলী আনোয়ার, আধুনিক ইউরোপীয় নাটক, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ১৩

[৪৭] কবীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

[৪৮] জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ.৮

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র 'প্যারি কমিউন' ধ্বংস করা হয় নির্বিচার হত্যার মাধ্যমে।[৪৯] বাস্তবজীবনের এ সমস্ত ঘটনা, এর ভুক্তভোগী এবং চাক্ষুষ দ্রষ্টা শিল্পী সাহিত্যিকরা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এ অবস্থায় নাটকে উঠে আসতে থাকে – 'রাজনৈতিক সচেতনতা, শ্রেণি-বৈষম্য, শোষক-শোষণের এবং দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণির সংগ্রামের নাট্যচিত্র।'[৫০]

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নাটকের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক ও উপস্থাপনা বৈশিষ্ট্যেও নিয়ে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। যেমন প্রথমত, নাট্য সংলাপের ভাষা কাব্যের পরিবর্তে গদ্যে রচিত হতে লাগল। এর পূর্বে দুই একটি নাটক গদ্যে রচিত হলেও বেশীরভাগই ছিল কাব্যনাটক। শুধু তাই নয়, এ সব গদ্যে ব্যবহৃত হতে লাগল স্থানিক উপভাষা; এমন কি 'শ্ল্যাং' বা নিষিদ্ধ শব্দও চলে এল বাস্তবতার প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় এক বা দুটি প্রধান চরিত্রের পরিবর্তে সব চরিত্র হয়ে উঠল তাৎপর্যময়। স্বভাবতই এর প্রভাব অভিনয়ের মধ্যেও পড়ল এবং সেখানে স্টার বা তারকাপ্রথার পরিবর্তে প্রাধান্য পেল দলগত অভিনয়। তৃতীয়ত, নাটকের প্রধান চরিত্র সমূহ বেশিরভাগই আসতে লাগল সমাজ পরিবেশ দ্বারা নিগৃহীত নিচুতলার বড়জোর মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। পূর্বে এ শ্রেণির মানুষ নাটকে এলেও তারা সর্বদা থাকত প্রান্তীয় চরিত্র হিসেবে। চতুর্থত, চরিত্রের স্বগতোক্তি (aside) কিংবা নাটকীয় একোক্তি (dramatic monologue)- মূলক দীর্ঘ ভাষণের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকৃত হলো। কারণ এসব ছিল বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কৃত্রিম।

উল্লিখিত পরিবর্তনের সূত্রে নাট্য-প্রযোজনা ও মঞ্চ পরিকল্পনায়ও আসে নতুনত্ব। মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে বাস্তবতার হুবহু অনুকরণ নাট্যকার ও পরিচালকের আরাধ্য হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে নাট্য ঘটনার নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য নাট্যকারদের অনুপুঙ্খ মঞ্চ নির্দেশনা হলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। ইংল্যান্ডের নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬ – ১৯৫২) তাঁর নাটকের মঞ্চনির্দেশনায়, ঘরে বইয়ের আলমারিতে কী কী বই এবং পাশের দেওয়ালে কার কার ছবি থাকবে সে সবও খুঁটিনাটি বর্ণনা করেন কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী। কুশীলবদের অভিনয়-দক্ষতা, সংলাপ প্রক্ষেপনের রীতি, আবহধ্বনির ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ মনোযোগ ধাবিত হয়। যেমন, নরওয়ের জনপ্রিয় নাট্যকার হেনরিখ ইবসেন (১৮২৮ – ১৯০৬) -এর *A Doll's House* (১৮৭৯) নাটকের শেষ দৃশ্যে নোরা স্বেচ্ছায় তার স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় 'সশব্দে' দরজা বন্ধ করে যায়। বলা বাহুল্য, নোরার মধ্যে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার যে উদ্বোধন ঘটেছে তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় সজোরে দরজা বন্ধ করার ওই আবহ ধ্বনি বা শব্দ। সমালোচকদের মতে :

---

[৪৯] সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

[৫০] জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

> নোরা তার পুতুল খেলার সংসার ফেলে পেছনে দরজাটা সশব্দে টেনে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। ইউরোপের প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ঐ দরজা বন্ধ করার শব্দের প্রতিধ্বনি অনুরণিত হতে থাকে।[৫১]

এ ধারার কয়েকজন নাট্যকার হলেন ফ্রান্সের অঁরি বেক (Henri Becque, ১৮৩৭–১৮৯৯) সুইডেনের অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ (১৮৪৯ – ১৯১২), জার্মানির গেরহার্ট হাউপ্টম্যান (১৮৬২ – ১৯৪৬), রাশিয়ার নিকোলাই গোগোল, ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮ – ১৯৬৩) আমেরিকার ইউজিন ও নিল (১৮৮৮ – ১৯৫৩) প্রমুখ।

বাস্তববাদী ধারার প্রভাবে নাটকে মানবজীবন ও সমাজ-সম্পৃক্ত বহু বিষয় রূপায়িত হলেও সে সব নাটকে সর্বদা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধানভাবে আসত না। নাটকে প্রত্যক্ষ এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয় রাজনীতিতে মার্কসবাদ উদ্ভবের সূত্রে। প্রসঙ্গত ইউরোপে বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির ওপর যে তীব্র শোষণ নেমে আসে তা থেকে মুক্তির জন্য সেখানে একের পর এক বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়। এ সব সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে জার্মানির কার্ল মার্কস (১৮১৮ – ১৮৮৩) এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০ – ১৮৯৫) সৃষ্টি করেন শ্রমিক শ্রেণির একটি রাজনৈতিক দর্শনের, ইতিহাসে যা মার্কসবাদ হিসেবে পরিচিত। সমাজচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদ এমন একটি পদ্ধতির জন্ম দেয়, যার ফলে বস্তুজগৎ ও মানুষের ভাবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সৃষ্টি হয়। একইসঙ্গে পাওয়া যায় এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ও বিকাশের মাধ্যমে সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যার তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে সূত্রে আসে সমাজতন্ত্রের ধারণা। একজন মার্কসবাদীর মতে,

> যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করে মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রের ধারণাকে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে, চিন্তার ইতিহাসে সেটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) নামে পরিচিত।[৫২]

এ মতবাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়, পাশাপাশি সে দর্শনের প্রয়োগও ঘটানো হয় সমাজের[৫৩] আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। KwgDwbó cwUi Bk‡Znvi (১৮৪৮), cwR (১৮৬৭), Rvgvb fvev‘K (১৮৪৬) ইত্যাদি গ্রন্থে এ মতবাদ প্রচারিত হয় এবং দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সমস্ত ইউরোপে।

---

[৫১] আলী আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

[৫২] মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্ড়, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৯০ পৃ. ৪৫

[৫৩] এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস তাঁর ফয়েরবাখ থিসিস গ্রন্থে বলেন, 'দার্শনিকেরা কেবল নানা ভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো তাকে পরিবর্তন করা'। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, দ্বিতীয় খ—, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভূত হলেও এটি অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিসহ শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। এর অনুসরণে শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় গড়ে ওঠে মার্কসবাদী সমালোচনা নামের বিশেষ একটি ধারা। মার্কস কিংবা এঙ্গেলস শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে পরিপূর্ণ কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁরা উভয়ে এ সব বিষয়ে ছিলেন গভীর বোধসম্পন্ন। তাঁদের রচনার বিভিন্ন স্থানে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এ ছাড়া সমসাময়িক বিভিন্ন লেখক ও ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁরা লিখে পাঠিয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও মন্তব্যসহ চিঠি। প্রথমত তাঁদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব, চিঠিপত্রে উল্লিখিত মন্তব্য ও সূত্র ; এবং পরবর্তী সময় বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ যেমন জি ভি প্লেখানভ (১৮৫৬ – ১৯১৮), ভ ই লেনিন (১৮৭০ – ১৯২৪), আ লুনাচারস্কি (১৮৭৫ – ১৯৩৩), গিওর্গি লুকাচ (১৮৮৫ – ১৯৭১), মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬), ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭ – ১৯৩৭), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮ – ১৯৩৬) প্রমুখের রচনায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে উক্ত ধারা বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পরবর্তী আলোচনায় এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক এবং বিশেষত নাটকে তা প্রতিফলনের কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণিত হলো।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সমাজে মানব জীবন উৎপাদন-সম্পর্ক (relations of production) নির্ভর। এই উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস মানবজীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য সমাজ গঠিত হয়, ব্যক্তির সমন্বয়ে। তাই সমাজ গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির ভূমিকাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। এবং সেই নিরিখে, উৎপাদন-সম্পর্ক সৃষ্টিতে ও নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির এবং একই সঙ্গে সমষ্টির তথা সমাজের কার্যকর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় অনস্বীকার্য।

শ্রেণিবিভক্ত কোন সমাজই স্থির বা অনড় নয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নিয়মে প্রতিটি সমাজ অভ্যন্তরে থাকে স্থিতি ও পরিবর্তনকামী শক্তির দ্বন্দ্ব, সুবিধাভোগী ও নির্যাতিত শ্রেণির দ্বন্দ্ব। নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণি চায় সনাতন সমাজ টিকিয়ে রাখতে আর নিপীড়িত শ্রেণি চায় তা পরিবর্তন করতে। এই শ্রেণি দ্বন্দ্ব বা শ্রেণি-সংগ্রামে বিজয়ী শ্রেণি প্রতিষ্ঠা করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা। এ ভাবে এক সমাজ-কাঠামো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অপর সমাজ কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের এ ধারায় আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে এসেছে দাস-প্রভুভিত্তিক সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজ। মার্কস-এঙ্গেলস এ জন্যেই বলেছেনঃ æThe history of all hitherto existing society is the history of class struggles”.[৫৪] সেই সংগ্রামে সামাজিক মানুষ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাঁর শ্রেণি অবস্থান অনুযায়ী অংশ

---

[৫৪] Marx - Engles, Manifesto of the Communist Party, Selected Works, Progress Publishers, Moscow, 1970, P.35

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে। প্রত্যেক মানুষই অবস্থান করে হয় সুবিধাভোগী শ্রেণিতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণিতে। সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাই কেউ নিরপেক্ষ বা মাঝামাঝি অবস্থান নিতে পারে না। নিরপেক্ষ আর সোনার পাথরবাটি একই কথা।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজও টিকে আছে তার অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে।[৫৫] ভারতবর্ষের প্রথম দিকের মার্কসবাদী পণ্ডিত সরোজ আচার্যের মতে :

> যাযাবর সমাজ, কৃষি সমাজ, শিল্পী সমাজ সকল সমাজ ব্যবস্থায় গড়িয়া উঠে জীবিকা উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া। এই উৎপাদন পদ্ধতি দিয়া আবার স্থির হয় মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relation); আর এই উৎপাদন সম্পর্কই সমাজের বনিয়াদ – আমাদের পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি।[৫৬]

সমাজের এই মৌল কাঠামো (Basic Structure) নির্ভরশীল উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের সম্পর্কের উপর। নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি। এই সব মিলে গঠিত হয় যে উপরি-কাঠামো (Superstructure) তার কাজ হলো সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের যারা মালিক, তাদের ক্ষমতাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (Institution), যেমন আইন ও শাসন ব্যবস্থা, দ্বারা সুরক্ষিত রাখা। স্বাভাবিকভাবে এ উদ্দেশ্যে সমাজে নৈতিক, ধর্মীয়, নন্দনতাত্ত্বিক প্রভৃতি মতাদর্শও গঠিত হয়। কার্ল মার্কস তাঁর *A Contributin to the critique of political economy* গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে বলেন :

> In the Social production of their life men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.[৫৭]

---

[৫৫] The building like metaphor of base and superstructure is used by Marx and Engles to propound the idea that the economic structure of society (the base) conditions the existence and forms of the STATE and social consciousness (the superstructure). Tom Bottomore, ed. A Dictionary of Marxist Thought, New York 1983, p. 43.

[৫৬] সরোজ আচার্য রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬

[৫৭] Marx Karl, *Preface to A contributions to the critique of Political Economy,* Marx-Engels, selected works Vol. 1, Foreign Language Publishing House, Moscow, 1962 pp. 362-363.

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প-সাহিত্য উপরি-উক্ত সামাজিক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। বিশেষ করে সাহিত্যে সমাজ উদ্ভাবিত ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বলে কোন কোন সাহিত্যতাত্ত্বিক সাহিত্যকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[৫৮] সেই শিল্প-সাহিত্য কিংবা নন্দনতত্ত্বও সমাজের উপরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত যা সামাজিক মতাদর্শ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জি ভি প্লেখানভের ভাষায় : “একটি যুগের সামাজিক মানসিকতা সেই যুগের সামাজিক সম্পর্কসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একথা যেমন স্পষ্ট, তেমন আর কোথাও নয়।”[৫৯] সামাজিক অবকাঠামোতে পরিবর্তন সুচিত হলে উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানেও পরিবর্তন আসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের সম্পর্কের বিষয়টি। দাস যুগে রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করত। সামন্ত যুগেও রাষ্ট্রে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিল ধর্মীয় পীঠসমূহ। অথচ পুঁজিবাদী যুগে রাষ্ট্র ব্যাপারে ধর্মের সেই ক্ষমতা আর থাকলো না। ধর্ম অনেকখানি পরিণত হলো জনগণের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে। অবশ্য মূল্যবোধের বা উপরিকাঠামোর এই পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে পারে না ; এর জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য উপাদানের মতো সামাজিক অবকাঠামো বদলের সঙ্গে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকেও আসে পরিবর্তন। যেমন প্রাচীন দাস ও সামন্ত সমাজ-চৈতন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে ivgvqY, gnvfviZ, BwjqW, I‡Wwmi মতো মহাকাব্য। সামন্ত সমাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে আছে রোমান্সমূলক কাব্য। আর সামন্ত সমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তিত হওয়ার সময় নিয়ে এলো গদ্য ও উপন্যাস।[৬০] তবে সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন এবং সাহিত্য আঙ্গিকের বিকাশ সর্বদা সরলরৈখিক বা যান্ত্রিক নয়। সাধারণত সমাজ চৈতন্যের মননশীল সৃষ্টি হিসেবে সাহিত্য এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাহিত্য শুধু অবকাঠামো থেকে উপাদান সংগ্রহ করে না : ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তী প্রভৃতি থেকেও আসে সাহিত্যের বিষয়। যথার্থ মহৎ সাহিত্য নির্দিষ্ট যুগের সৃষ্টি হয়েও যুগান্তরের পাঠককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। যেমন, ফেরদৌসী সামন্ত সমাজের পটভূমিতে এবং শেক্সপিয়র ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া উত্থানের প্রারম্ভিক যুগের পটভূমিতে সাহিত্য রচনা করলেও তাঁদের মহাকাব্য এবং নাটক পরবর্তীকালেও আদৃত হয়েছে। একজন লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি কী ভাবে প্রকাশ করতে চান সেটি তার নিজস্ব অভিরুচি। একইসঙ্গে স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক সমাজ-কাঠামোতে অবস্থান করে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকসমূহে বরাবর

---

[৫৮] ‘Literature is a social institution, using as its medium language, a social creation, Such traditional literary devices as symbolism and meter are social in their very nature’. Wellek, Rene and Warren, Austin, *Theory of Literature*, London, 1963. P.94

[৫৯] উদ্ধৃত; টেরী ঈগলটন, মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা (ভাষান্তর : নিরঞ্জন গোস্বামী), কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ. ১৫

[৬০] সাঈদ-উর-রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

সামন্ত সমাজকে অবলম্বন করেছেন। তবু, তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি আজও কালোত্তীর্ণ শিল্পী হিসেবে গণ্য। মূলত, সাহিত্যের এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সংস্কৃত ও গ্রিক মহাকাব্য, কালিদাস কিংবা এস্কাইলাস-সফোক্লিস-এ্যারিস্টোফেনিসের নাটক আজও আমাদের আগ্রহের বস্তু।

এ দিকে সামন্ত সমাজ থেকে বিবর্তিত হওয়া পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে ব্যাপক ও তীব্র। মুনাফার দুর্দমনীয় লোভে এই পুঁজিবাদ সমস্ত কিছুকে পণ্যে পরিণত করে। মানুষ সেখানে হয়ে যায় পণ্যমাত্র, মানবতা বাঁধা পড়ে শোষণের জালে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার ঐকান্তিক কামনায় কার্ল মার্কস ও তাঁর অনুসারীরা আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন যে,

> The major classes are most clearly differentiated, class consciousness most fully developed, and class conflict most acute, in capitalist society, which constitutes in these respects a culminating point in the historical evolution of class divided fomrs of society. From this perspective modern class struggles have a central importance in Marxist theory, because their outcome is conceived as a transition to socialism; that is to classless society.[৬১]

সেই শ্রেণিহীন সমাজে শোষণ থাকবে না, থাকবে না মানবতা লাঞ্ছনার কোন ব্যবস্থা। মানুষ হবে যথার্থ স্বাধীন, তার বিকাশ হবে বাধাহীন। সমাজের নেতৃত্বে থাকবে প্রলেতারীয় বা সর্বহারা শ্রেণি। কিন্তু বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজের রক্ষকেরা অনায়াসে তা হতে দিতে চায় না।[৬২] শ্রমজীবী শ্রেণিকে তাই সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মার্কসবাদীদের মতে, এটাই বুর্জোয়া সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।[৬৩] এভাবে সমাজ-অভ্যন্তরের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যে শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে দার্শনিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক অবয়ব গঠন করে এবং শ্রেণি-দ্বন্দ্বের যৌক্তিক সমাপ্তি ঘটায়। এ প্রসঙ্গে স্ট্যালিন বলেছেন :

> সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হয় বলিয়াই নতুন সামাজিক ধারণা ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটে ; তাহাদের সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী শক্তি বিনা সমাজের বাস্তবজীবন বিকাশের

---

৬১ A Dictionary of Marxist Thought, Ibid, P. 78.

৬২ "উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে চায়। অপর দিকে শ্রমিক শ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে" এ এফ এম ইমাম আলি, সমাজতত্ত্ব, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৯

৬৩ "প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পত্তি-মালিক এবং দাস, ভূমিদাস অথবা সর্বহারার মধ্যে অব্যাহত থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদের যুগে এই সংগ্রাম পরিগ্রহ করে এমন এক রাজনৈতিক চরিত্র যার লক্ষ্য হলো দাসত্বের বন্ধন থেকে শ্রমজীবী জনগণের সার্বিক মুক্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং যে শ্রেণী সম্পত্তিকে ভালবেসে কিন্তু সম্পত্তির স্রষ্টা শ্রমজীবী জনগণকে ঘৃণা করে সেই শ্রেণীর পরিপূর্ণ উচ্ছেদ।" বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন অসম্ভব বলিয়াই তাহাদের আবির্ভাব ঘটে ; সমাজের বাস্তবজীবন বিকাশ সম্পর্কে কাজের তাগিদে দেখা দিয়া নতুন সামাজিক ধারণা ও মতবাদ সকল বাধা সবলে দূর করিয়া অগ্রসর হয়, জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে, এবং যে সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, সেইসব শক্তিকে পরাভূত করার কাজকে সহজ করে।[৬৪]

সমাজের মননশীল স্রষ্টা হিসেবে শিল্পী-সাহিত্যিকগণ উল্লিখিত পরিবর্তনমুখী সমাজ-চৈতন্যের প্রতিফলন যেমন ঘটাতে পারেন, তেমনি পশ্চাৎপদ মতাদর্শও প্রকাশ করতে সক্ষম। মতাদর্শহীন সৃষ্টি বলে কিছু নেই। সাধারণভাবে একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁর শ্রেণি অবস্থান অনুযায়ী মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তা প্রচার করেন। তবে তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও শৈল্পিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে কিংবা নিজের বিবেকতাড়িত মতামত প্রকাশের ঐকান্তিকতায় শিল্পীরা অনেক সময় তাঁদের শ্রেণি, ঐতিহ্য-লালিত দর্শন এমনকি কালগত চিন্তার অবস্থানও পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন। কারণ, সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল সত্তার অংশ হিসেবে নিপীড়িত মানবতার আকুতি ও সংগ্রাম তাঁরা উপলব্ধি করেন এবং সৃজ্যমান শিল্পকর্মে তা রূপ দেন। শিল্পীমাত্রই স্পর্শকাতর মনের অধিকারী, সমসাময়িক সমাজের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব তাই শিল্পী-সাহিত্যেকরা এড়িয়ে যেতে পারেন না। যে কোন একটি পক্ষ তাঁকে অবলম্বন করতেই হয়– সচেতনভাবে অথবা অসচেতনভাবে। ফলে শিল্পস্রষ্টার শ্রেণি অবস্থান যা-ই হোক না কেন, শিল্পগুণের পাশাপাশি বক্তব্যের গ্রগতিমুখীনতার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বস্তুবাদী রাজনীতির সমর্থকে পরিণত হন। এসব কারণেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অভিজাততন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক হয়েও ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার বালজাক এঙ্গেলস-এর শ্রদ্ধা অর্জন করেন।[৬৫] অথচ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সর্বহারা শ্রেণির জন্য শিল্পগুণহীন উপন্যাস রচয়িতা মিন্না কাউৎস্কি এঙ্গেলস-এর পূর্ণ প্রশংসালাভে ব্যর্থ হন।[৬৬] তেমনি রুশ লেখক তলস্তয়কে লেনিন 'একজন খৃষ্টভক্ত ভু-স্বামী' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, æThe great artist, the genius who has not only drawn incomparable pictures of Russian life but has made first-class contributions to world literature.”[৬৭]

এভাবে মহৎ শিল্পী-সাহিত্যকবৃন্দ অনেক সময় নিজের অজান্তেই নিপীড়িত মানুষের জন্যে নতুন সমাজ গড়ার অনুকূলে অবদান রাখেন।

---

[৬৪] সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১১১

[৬৫] Engels, Frederich, 'Letter to Margaret harkness', Compiled by Mayanard Solomon, Marxism and Art,
Detroit, 1979, p. 269-271

[৬৬] Ibid, p. 267-268

[৬৭] Lenin, On Literature and Art, Moscow, 1987, p. 31

Dhaka University Institutional Repository

আবার সমাজ বিকাশের কোন কোন পর্যায়ে এমন সময় আসে যখন শিল্পী-সাহিত্যিক সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী শিল্প সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ হন। জনগণকে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে কিংবা বিপ্লবীদের মনোবল দৃঢ় করায় উৎসাহ দিতে তাঁরা হন উদগ্রীব। তেমন অবস্থা এসেছিল রাশিয়ায় (বিপ্লবের আগে ও পরে), চীনে, ভিয়েতনামে; সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন দেশের শিল্পী সাহিত্যিকগণ এতে সামিল হন। এ ক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য হয়ে ওঠে সংগ্রামের হাতিয়ার। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির প্রভাব ও এলাকা যে ভাবে বিস্তৃত হয়েছে তাতে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষে আর সরাসরি রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুত সমাজের পরস্পর বিরোধী শ্রেণিগুলো যতই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে রাজনীতি ততই সবাইকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন দেশে সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রাম শক্তি সঞ্চয় করে। ইতোমধ্যে বিশ্বের কয়েকটি দেশে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এসবের প্রভাবে বৈপ্লবিক সামাজিক রূপান্তরের এক প্রগতিশীল স্রোতোধারা প্রবাহিত হয় শ্রমিক শ্রেণির অনুকূলে। এ অবস্থায় বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা, শ্রেণি-সংগ্রামের চেতনা শিল্প সাহিত্যের বিষয়, বক্তব্য ও আঙ্গিকে দেখা দেয় প্রবলভাবে।

প্রসঙ্গত বিবেচ্য বিষয় হলো, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদান হয়ে অবকাঠামো (Basic structure) পরিবর্তনে ভূমিকা নিতে পারে কি না। তাত্ত্বিকদের মতে, শ্রমজীবী মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তাদের মাধ্যমে সমাজের মৌল কাঠামো বা উৎপাদন সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। ক্রিস্টোফার কডওয়েল বলেন, “শিল্প মানুষের আবেগ ও প্রবৃত্তির মাধ্যমেই সমাজের ওপর কাজ করে।”[৬৮] শিল্প মানুষের আবেগকে সংগঠিত রূপ দান করে, মানুষের প্রবৃত্তিকে (instinct) পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের সঙ্গে অন্বিত করে এবং নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। যে মুহূর্তে এই নতুন চিন্তা মানুষকে আকৃষ্ট করে সে মুহূর্তে তা বাস্তবশক্তিতে পরিণত হয়।[৬৯] আর এই বাস্তবশক্তিই সমাজ বিপ্লব ঘটায়।[৭০] ১৮৯৪ সালে হ. স্তার্কেনবুর্গকে লেখা এঙ্গেলসের একটি চিঠিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় :

> Political, juridical, philosophical, religious, literary, artistic, etc., development is based on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic basis. It is not the economic situation, which is solely

[৬৮] ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি, উদ্ধৃত; শ্রী হীরেন ভট্টাচার্য, মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব (সম্পা. সুহাস চট্টোপাধ্যায়), কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪৪

[৬৯] ‘যে মুহূর্তে কোন মতবাদ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সেই মুহূর্তেই ঐ মতবাদ বাস্ড়ব শক্তিতে পরিণত হয়।’ হেগেলের ‘ফিলজফি অফ রাইট’ সম্পর্কে মার্কস, উদ্ধৃত, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

[৭০] হীরেন ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্ড়বতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

> active, while everything else only has passive effect. There is, rather, interaction on the basis of the economic necessity, which ultimadely always asserts itself.[71]

শিল্প সাহিত্যের এ ক্ষমতা আছে বলেই লেনিন এবং মাও সে-তুঙ রাশিয়া ও চীনে বিপ্লব সফল করে তোলার জন্য শিল্প সাহিত্যকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। লেনিন চেয়েছেন :

> Literature must become part of the common cause of the proletariat, 'a cog and a screw' of one single great Social Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class. Literature must become a component of organised planned and integrated Social-Democratic party work.[৭২]

লেনিনের এই 'পার্টিজানশিপ' দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে উপযোগবাদের প্রতি পক্ষপাত। এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন চীনের মাও সে-তুঙ। তাঁর মতে- উপযোগবাদ ঊর্ধ্ব কোন 'বাদ' পৃথিবীতে নেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উপযোগবাদও কোন না কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপযোগবাদই হতে পারে। আমরা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী উপযোগবাদের অনুসারী।[৭৩]

শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর এ শক্তি ও সম্ভাবনাকে ম্যাক্সিম গোর্কি একটি নতুন শিল্প মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করলেন – সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist Realism) নাম দিয়ে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাদের কয়েকটি সাহিত্য সমালোচনামূলক চিঠিতে শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে যে বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি কামনা করেছিলেন, লেনিন যে ভাবে সাহিত্যকে বিপ্লবী কর্ম প্রক্রিয়ার শরিক করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষাই শিল্পতত্ত্বে রূপ দিয়েছিলেন গোর্কি। তাঁর gv (Mother, 1906) উপন্যাসে গোর্কি এ তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটালে তা ধীরে ধীরে রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরাও অনুসরণ আরম্ভ করেন। পূর্বেকার বাস্তবতাবাদ বা স্বাভাবিকতাবাদী নাটকে কোথাও কোথাও শ্রমিক কিংবা নিম্নশ্রেণির জীবনের রূপায়ন ঘটলেও সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু সমাজের নির্মাতা হিসেবে মহিমান্বিত করে তোলার ব্যাপারটি প্রাধান্য পেত না। আবার কোন কোন লেখক – যেমন জোলা, বালজাক কিংবা পুশকিন, তলস্তয় – তাঁদের কিছু লেখায় বুর্জোয়া ব্যবস্থার ত্রূটি বিচ্যুতি দেখালেও, সে সমাজ পরিবর্তন করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি। গোর্কির বিবেচনায় সেগুলো ছিল ঐ শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কিছু পরোক্ষ চেষ্টা মাত্র। এ ধরনের রচনাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'সমালোচনামূলক

---

[৭১] Engels to H. Starkenburg, Marx and Engels, Selected Correspondence (1846-1895) London, 1943, p. 517

[৭২] Lenin, Ibid, pp - 25-26

[৭৩] মাও সে-তুঙ, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, পিকিং, ১৯৭৭, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা'[৭৪] (Critical Realism) হিসেবে। অন্যদিকে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'য় কেবল সমাজদ্বন্দ্বের যথাযথ প্রতিফলন নয়, এখানে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনারও ইঙ্গিত দেওয়ার সুযোগ থাকে।[৭৫] এ ধরনের রচনায় শ্রমজীবী শ্রেণি থেকে এমন নতুন ইতিবাচক নায়কের আবির্ভাব ঘটে যারা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য সর্বদা যেমন শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও তাদের পার্টির প্রতি দায়বদ্ধ থাকে, তেমনি সব ধরনের আদিম সংস্কার ও ভাববাদী ধারা পরিহার করে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ ও আর্ন্তজাতিক কল্যাণ-চেতনায় থাকে নিরন্তর আস্থাশীল।[৭৬]

গোর্কির অনুসরণে রাশিয়ার অন্যান্য লেখক যেমন ফিওদর গ্ল্যাডকভ, নিকোলাই অস্ত্রভস্কি, মিখাইল শলোকভ প্রমুখ এ ধারায় সাহিত্য রচনা করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর এ তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ে শিল্পের অন্যান্য শাখাতেও। যেমন, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে, নাটক ও চলচ্চিত্রে ; এমনকি সঙ্গীত ও স্থাপত্যকলায়ও এর প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু শিল্পী সাহিত্যিক একই উদ্দেশ্যে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। যেমন, সাহিত্যে মার্টিন অ্যান্ডারসন, লুই আরাগঁ, আঁরি বারবুস, নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদা, হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ; নাটকে রম্যাঁ রোলাঁ, মায়কোভস্কি, এরভিন পিসকাটর, বের্টোল্ট ব্রেশট; সঙ্গীতে হান্‌স আইসলার, পল রোবসন; চলচ্চিত্রে সের্গেই আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন, দভজেঙ্কো, চেতন আনন্দ প্রমুখ; চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে পিওতর বুচকিন, রুডল্‌ফ ফ্রেন্‌তজ, আইজ্যাক ব্রদস্কি, ওনোরে দোমিয়ে, ক্যোথে কোলভিৎস, গেয়র্গ গ্রোস, সোমনাথ হোড়, ইয়ে ফু, লি হুয়াওসহ আরো অনেক শিল্পী তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করেন সাম্যবাদী আকাঙ্ক্ষার শিল্পীত ভাষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় শিল্প সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট মাধ্যমের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে উল্লিখিত রাজনৈতিক বক্তব্য, প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠায় সুযোগ থাকে কি না। স্মর্তব্য মার্কস,

---

[৭৪] "সাহিত্য বাস্ড়বাদের বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের একটি বিশেষ স্ড়র সমালোচনামূলক বাস্ড়বতাবাদ। সমালোচনামূলক বাস্ড়বতাবাদের লেখকরা বুর্জোয়া সমাজের শুধু সমালোচনাই করেছেন কিন্তু তাঁরা সমাজকে পরিবর্তন করে নতুন কোনো সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন নি। এই সমাজের সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলির সমাধান ও নিরসন কোথায় তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। ... লেখকদের এই সব গতি প্রকৃতি ও ধ্যান ধারণাও আসলে বুর্জোয়া আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই প্রতিফলন।"... হীরেন ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্ড়বতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৫

[৭৫] বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, ২০০৫৬, পৃ. ৫৯-৬৪

[৭৬] The communist aesthetic ideal is embodied in a new type of positive hero-the working man and fighter, the builder of communist society. The chief ideological and aesthetic principles of S.R. are commitment to communist ideology, service to the people and adherence to partisanship, close bonds with the working people's struggle, socialist humanism and internationalism, historical optimism, rejection of formalism (q.v.) and subjectivism and of naturalistic primitivism. Dictonary of Philosophy, (Second revised edition), Moscow, 1984, p. 352

Dhaka University Institutional Repository

এঙ্গেলস, লেনিন কিংবা মাও সে-তুঙ কেউই শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য উপেক্ষা করার কথা বলেন নি। শিল্পগুণহীন বক্তব্যনির্ভর সাহিত্যকে তাঁরা উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। লাসালের কাছে লেখা পত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং মিন্না কাউৎস্কির পূর্বোক্ত পত্রে এঙ্গেলস শিল্প ও রাজনীতি উভয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া 'Down with non-partisan writers! বলেও লেনিন কর্তৃক তলস্তয়কে রুশ বিপ্লবের দর্পণ হিসেবে আখ্যায়িত করা সে কথাই প্রমাণ করে। আর মাও সে-তুঙ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন :

> আমাদের দাবী হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একত্ব, অন্তর্বস্তু ও রূপের একত্ব, বিপ্লবী রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু ও যথাসম্ভব নিখুঁত শিল্পরূপের একত্ব। শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন তাতে শিল্পগত গুণাবলীর অভাব থাকলে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে।[৭৭]

বক্তব্য প্রগতিমূলক হলেও শিল্পমূল্যহীন রচনা আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিল্প সৃষ্টি করতে না চাইলেও শিল্পীর অজান্তে কখনো কখনো তাঁর রচনায় প্রগতিমূলক রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়ে যেতে পারে। এ সব বিষয় বিবেচনা করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। যেমন—

এক. শিল্পী–সাহিত্যিকরা অন্যান্য সামাজিক মানুষের মতোই রাজনীতি সম্পৃক্ত। ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির সঙ্গে কারও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও কেউই রাজনীতির বাইরে থাকতে পারেন না।

দুই. সাধারণভাবে লেখকের শ্রেণি অবস্থান তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। কখনো কখনো লেখকের নিজস্ব অনুধাবন, অভিজ্ঞতা ও বিবেকের তাড়নার প্রভাবে সচেতন কিংবা অবচেতনে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করতেও সক্ষম হন।

তিন. বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের নিপীড়ন থেকে সমাজ ও সভ্যতাকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন শিল্পী সাহিত্যিক সরাসরি প্রগতিশীল রাজনৈতিক শিল্প সৃষ্টিতে ব্যাপৃত হতে পারেন।

উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের তৃতীয়টি অবলম্বনে (প্রগতিশীল রাজনৈতিক শিল্প) অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নাটক মঞ্চায়ণের সূত্রপাত ঘটে ফ্রান্সে উনিশ শতকের শেষ দশকে। ১৮৯২ সালে নাট্যকার মরিস পত্তিসের গণনাট্যের আদর্শে ফ্রান্সের একটি ছোট্ট গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটকে অভিনয় করতেন তাঁর পরিবারের সদস্য এবং গ্রামের কিছু শ্রমিক ও ক্ষুদে ব্যবসায়ী।[৭৮] পরবর্তী পর্যায়ে ১৯০১ সালে বিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ, মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রবক্তা

[৭৭] মাও সে-তুঙ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
[৭৮] রথীন চক্রবর্তী, রম্যাঁ রলাঁর পিপল্‌স থিয়েটার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) বস্ত্র শ্রমিকদের ধর্মঘটে সাহায্য করার জন্য প্রযোজনা করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘vZ̈ (Danton)| এর পরের বছর প্রযোজিত তাঁর অপর নাটক 14 RjvB এর ভূমিকায় তিনি লেখেন :

> আমাদের আদর্শ হলো, ১৭৯৪ সালে যে কাজ বিঘ্নিত হয়েছিল তা ফের হাতে তুলে নেওয়া হোক এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তা সম্পূর্ণ হোক আরও বেশি সচেতনতার সঙ্গে এবং আরও বেশি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মানুষের হাতে।[৭৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, রম্যাঁ রলাঁ মূলত ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতেই তার সমসাময়িক রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী নাটকসমূহ (মোট ৮টি) রচনা করেছিলেন।[৮০] এ সময় তিনি একটি নাট্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেগুলো পরে সংকলিত হয় wccjm w_‡qUvi (১৯০৩) নামে। এ সব প্রবন্ধে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যবিষয় এবং আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার পাশাপাশি গণনাট্য রচনা সম্বন্ধেও কিছু দিক নির্দেশনার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, শ্রমজীবী শ্রেণির জন্য রচিত নাটকের কয়েকটি প্রধান শর্ত হলো :

> ক. এই থিয়েটারকে অবশ্যই বিনোদন বা রিক্রিয়েশন হতে হবে।
>
> খ. থিয়েটারকে অবশ্যই শক্তির উৎস হতে হবে। এবং
>
> গ. থিয়েটারকে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে হবে।[৮১]

একইসঙ্গে তিনি নাটক উপস্থাপনার জন্য মিলনায়তন, মঞ্চপরিকল্পনা, অভিনয়রীতি, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনার বিন্যাস, সংলাপ, আবহসঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন নাটক নিয়ে– বিশেষ করে গ্রিক এবং শেক্সপিয়রের–রলাঁর বক্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করলেও শ্রমজীবী শ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর wccjm w_‡qUv‡ii অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এর প্রভাব ভারতেও বিস্তৃত হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। বিশেষ করে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘে’র (INDIAN PEOPLES THEATRE ASSOCIATION) নামটি রলাঁর উক্ত প্রবন্ধ সংকলন থেকেই নেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা।[৮২]

রাজনৈতিক নাটক রচনা, উপস্থাপনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুমাত্রিক উল্লম্ফন ঘটে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রে। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার প্রায় প্রতিটি শহরে জার (Czar) শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত সরকারি ও বেসরকারি থিয়েটার চালু ছিল। সাধারণত উচ্চ শ্রেণির মানুষরা উপভোগ

---

[৭৯] উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

[৮০] রম্যাঁ রলাঁ : বিপণ্ডবের নাট্যরূপায়ণ (১ম খ), সম্পাদনাঃ অরচ্ণ মিত্র, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ক-চ (ভূমিকাংশ)

[৮১] রথীন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১২০

[৮২] “রমাঁ রলাঁর বিখ্যাত দি পিপলস থিয়েটার গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রেরণার মূলে কাজ করেছিল। ‘পিপলস থিয়েটার’ কথাটিই তো ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে।” দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

করতেন এ সব থিয়েটারের নাটক। এখানে অভিনীত হতো বাস্তববাদী ধারার আধুনিক, প্রাচীন গ্রিক, ইংল্যান্ডের এলিজাবেথীয়সহ অন্যান্য দেশের নাটক। স্বভাবতই বিপ্লবী বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ করে বহু থিয়েটার তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তাদের মতাদর্শ প্রচার ও শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করে। তবে পুরনো ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি থিয়েটার ছিল এ প্রচারধর্মী কাজের বাইরে। যেমন স্তানিস্লাভস্কির 'মস্কো আর্ট থিয়েটার', বিখ্যাত 'বলশয় থিয়েটার' ইত্যাদি। ফলে একদিকে তাদের ধ্রূপদী শিল্প চর্চা যেমন অব্যাহত থাকে, অপরদিকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে এ সবের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে। স্মর্তব্য, বিপ্লবের আগে 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' সরকারি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৮৩]

তবে (১৮৯৮ সালে স্থাপিত) এ থিয়েটার-এর অভিনয় শিল্পের সুনাম ছিল বিশ্বব্যাপী। বিশ্বনাট্যের একজন প্রধান অভিনয়তাত্ত্বিক কনস্তান্তিন স্তাস্লিাভস্কি (১৮৬৫ – ১৯৮৩) ছিলেন এ থিয়েটারের প্রধান পরিচালক। সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে না ছুটে তাঁর থিয়েটারে নাটকের শিল্পবৈশিষ্ট্যের দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো বেশি। নাটক উপস্থাপনাযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনে কয়েকশ বার মহড়া দেওয়া হতো। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় এ থিয়েটার সরকারি ব্যবস্থাপনায় এনে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা হলেও পরে শিল্পীদের কাছেই ছেড়ে দেওয়া হয় এর দায়িত্ব।[৮৪] অবশ্য বিপ্লবী সরকার এর পাশাপাশি আরো কয়েক হাজার থিয়েটার স্থাপন করে, যেখানে নিয়মিতভাবে উপস্থাপনা করা হতো নতুন ধরনের নিরীক্ষামূলক নাটক।[৮৫] যেমন পেত্রোগ্রাড শহরে স্থাপিত হয় Hermitage Theatre যার পরিচালক ছিলেন ইউরি আনেন্‌কভ। এ থিয়েটারের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ছিল লেভ তলস্তয়ের ॥' d॥÷ ॥W॥÷ j॥i| এ নাটকে তলস্তয়ের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার কুলাক শ্রেণি, যারা গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও শ্রমজীবীদের মদ্যপানে উৎসাহ দিত। আনেন্‌কভ এ নাটকে প্রহসন ও সার্কাস ভঙ্গির মাধ্যমে নতুন ধরনের উপস্থাপন শৈলী সৃষ্টি করেন। সোভিয়েত সরকারের নতুন নাট্যরীতি বা দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত ব্যক্তি ছিলেন স্তানিস্লাভস্কির প্রতিভাধর শিষ্য কার্ল থিওডর কাশিমির মায়ারহোল্ড (১৮৭৫–১৯৪০)। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত নাট্যশালার প্রধান এবং সে সূত্রে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। কবি মায়কোভস্কি রচিত ॥g॥÷ e‡d তাঁর বিখ্যাত প্রযোজনা। তাঁর প্রতিটি প্রযোজনা ছিল নতুন নাট্যচিন্তার খোরাক এবং একইসঙ্গে সৃষ্টি করত তর্ক বিতর্কের ঝড়।

---

[৮৩] সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অক্টোবর বিপণ্ডব ও সোভিয়েত থিয়েটার', এপিক থিয়েটার (সম্পা. উৎপল দত্ত), সংখ্যা ৯-১২,
কলকাতা, ১৯৯২

[৮৪] চিত্তরঞ্জন ঘোষ, রুশ-বিপণ্ডব, সাম্যচিন্ড়া ও আমাদের নাট্যজগৎ, বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা (সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ), কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৯২-১৯৭

[৮৫] একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯১৭ সালে যেখানে রাশিয়ায় থিয়েটারের সংখ্যা ছিল ২১০ টি, ১৯২৬ এর মধ্যে সে সংখ্যা ছয় হাজারে উন্নীত হয়। চিত্তরঞ্জন ঘোষ, পূর্বোক্ত পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

যেমন মায়ারহোল্ড উদ্ভাবিত ‘বায়োমেকানিক্স’ তত্ত্ব নিয়ে স্তানিশ্লাভস্কি, ভাক্তানগভ, তাইরভ প্রমুখ প্রবীন নাট্যতাত্ত্বিক হয়ে উঠেছিলেন উদ্বিগ্ন। এর কারণ ছিল – তাঁর এ তত্ত্বে অভিনয়ের পরিবর্তে শরীরী ভাষার মাধ্যমে চরিত্রের আবেগ অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশ করতে হতো অভিনেতাদের।[৮৬] শুধু তাই নয় তার নাটকে শৈল্পিক উপস্থাপনার চেয়ে প্রাধান্য পেত যান্ত্রিক ও সামরিক সরঞ্জামের বিশাল প্রদর্শনী। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশের ধ্রুপদী নাটকও উক্ত তত্ত্ব অনুযায়ী ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে নিতেন। অথচ তৎকালীন বিপ্লবী সরকারের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব প্রথমদিকে মায়ারহোল্ডকেই সমর্থন দিয়েছিলেন নিরঙ্কুশভাবে। পরে ১৯৩৮ সালের দিকে তাঁর জনবিচ্ছিন্নতা ও অতি বাম ঝোঁকের ব্যাপারটি পার্টি নেতৃত্ব বুঝতে পারেন এবং তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[৮৭]

আধুনিক নাট্যভঙ্গির পাশাপাশি রাশিয়ার জনপ্রিয় লোকনাট্য আঙ্গিকেও নতুন বিপ্লবী বিষয় উপস্থাপন করা হতো। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন স্তানিশ্লাভস্কির অপর দুই শিষ্য রাডলভ ও সোলোভিয়েভ। রুশ লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক থিয়েটারের মিশ্রণে তাদের *The Monkey That was Informer* নাটকে শ্রমিক শ্রেণির শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

উল্লিখিত থিয়েটার ছাড়াও সোভিয়েত সরকার তাঁদের বিপ্লব সংহত করার জন্য এবং সর্বস্তরের মানুষ ও সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী শিক্ষা প্রচার ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য নাটককে বিভিন্ন ভঙ্গিতে, রীতিমত অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে শুরু করে। নাট্যতাত্ত্বিকরা এসব উপস্থাপনাকে গ্রহণ করেছিলেন agitation propaganda বা প্রচারধর্মী নাটক হিসেবে।[৮৮] যেমন লালফৌজের নাট্যদলগুলো ব্যবহৃত হতো সেনাবাহিনীর শিক্ষা ও মনোবল দৃঢ় করার কাজে। ‘মস্কো নিউজ’ পত্রিকায় এদের সাফল্যের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় – বিপ্লব পরবর্তী গৃহযুদ্ধের সময় বিপর্যস্ত একটি ডিভিশনকে এ রকম একটি নাটক দেখানো হয়। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যেমন :

> একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, মাসের পর মাস লড়াই করে একটা ডিভিশন প্রচণ্ডভাবে রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা প্রায় রণে ভঙ্গ দেওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এই নাটকটির বিষয়বস্তু তাদের এত উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, তারা দাবি জানাল যুদ্ধক্ষেত্রের দায়িত্বে

---

[৮৬] “He devised an acting style known as ‘bio-mechanics’, in which actors perform as gymnasts or machines to convey their feelings through physical gestures”- Theodore Hotlen-এর উদ্ধৃতি, জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা (৪র্থ খন্ড), ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৯

[৮৭] এলেনদিয়া প্রোফের, ‘মায়ারহোল্ড’ (ভাষান্তর : কাবেরী বসু), স্যাস (নাট্যপত্র), রজতজয়ন্তী সংখ্যা ২০০৮, কলকাতা,

[৮৮] জিয়া হায়দার, নাট্যবিষয়ক নিবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অবিলম্বে নিয়োগ করা হোক।... তারা সিদ্ধান্ত করল – র‍্যাঙ্গেলকে [শত্রচ সেনাদের কর্মকর্তা] সম্পূর্ণভাবে পরাজিত এবং দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।[৮৯]

আবার জনসাধারণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনার জন্যও এ ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করা হতো। এর মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক ছিল cwZwecøex wkwe‡ii Pµvš Ímgn, menvivi †mbvewwnbx, avgvaiv‡'i weiæ‡× msMvg, cwRev‡'i lohš, ইত্যাদি। প্রচারধর্মী নাটকের দ্বিতীয় ও জনপ্রিয় ভঙ্গি ছিল 'বিচার দৃশ্য' অভিনয়। এ সব নাটকে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের উকিল, সাক্ষী, দলিলপত্র ইত্যাদি সাড়ম্বরে উপস্থাপন করে অপরাধের সত্যতা ও গুরুত্ব নিরূপণ করা হতো। জুরি হিসেবে থাকতেন স্থানীয় কিছু দর্শক আর বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন কোন আইনজীবী। i¨v‡½‡ji wePvi, †ivRv j‡·gevM nZ¨vi wePvi, †gb‡kwfK‡'i wePvi ইত্যাদি নাটক পরিবেশিত হতো এ ভঙ্গিতে। উল্লেখ্য, এ ধরনের নাটকের সূত্রেই রাজনৈতিক নাটকের অন্যতম আঙ্গিক হিসেবে পথ নাটকের উদ্ভব ঘটে।[৯০] এ সবের পাশাপাশি 'সজীব সংবাদপত্র' (living newspaper), জীবন্ত পোস্টার, বিতর্ক সভা ও লিটারারি মন্তাজ ভঙ্গিতেও উপস্থাপিত হতো নতুন নতুন বিষয়ের নাটক।[৯১] বিশাল প্রদর্শনী ও গণ শোভাযাত্রাও ছিল সোভিয়েত বিপ্লবী থিয়েটারের অন্যতম বাহন। এ ধরনের প্রদর্শনীতে শ্রমিক, কৃষক, লালফৌজ তাঁদের ব্যবহৃত সরঞ্জামসহ উপস্থিত হয়ে মঞ্চের ওপর জীবন্ত দৃশ্য উপস্থাপন করতো। সঙ্গে থাকত মূকাভিনয়, প্রহসন ও রূপকের অভিনয়। মঞ্চ হিসেবে কখনো ব্যবহৃত হতো কোন প্রাসাদের বিশাল চত্বর, কখনো খোলা বড় গাড়ি। ১৯১৯ সালের মে দিবস এবং ১৯ জুলাই তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে পেত্রোগ্রাদের শীত প্রাসাদের সামনে অনুষ্ঠিত হয় এরকম একটি প্রদর্শনী। এ অনুষ্ঠানে লাল ফৌজ, নাবিক, শ্রমিক ও অভিনেতাসহ মোট আট হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শ্রমিক আন্তর্জাতিক গান করেন চল্লিশ হাজার গায়কের বিশাল কোরাস। তেমনি শোভাযাত্রার খোলা গাড়িতে ফুটিয়ে তোলা হয় জারের পুলিশ বাহিনীর পরাজয়, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশনেতার কুশপুত্তলিকা ও ব্যঙ্গাত্মক ছবি, পুঁজি বনাম শ্রমিকের যুদ্ধের অভিনয় ইত্যাদি। মে দিবসের শোভাযাত্রায় পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকদের উদ্দেশে ২৪ ফুট উঁচু একটি প্রেসক্রিপশন বহন করা হয়। সেখানে লেখা ছিল :

রোগীর নাম – পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক

ব্যাধি – অতিনিদ্রা

দাওয়াই – সাধারণ ধর্মঘট, অভ্যুত্থান ও সোভিয়েত রিপাবলিক

---

[৮৯] উদ্ধৃত, শিব শর্মা, পথনাটকের ঐতিহ্যগত বিষয় : বিকাশ ও বিভ্রান্ড়ি, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, পথনাটক সংখ্যা, ৯,২০০৪ পৃ. ১৯

[৯০] উৎপল দত্ত, অক্টোবর বিপণ্ডব ও সোভিয়েৎ সংস্কৃতি, এপিক থিয়েটার, নভেম্বর বিপণ্ডব সংখ্যা ১৯৯৩, কলকাতা

[৯১] সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ডোজ – যত ইচ্ছে

ডাক্তার – ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।[৯২]

উক্ত অভিনয় ও শোভাযাত্রাকে প্রাচীন মিশরের ওসিরিস প্যাশন প্লে'র আধুনিক রূপায়ণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে।

রাশিয়ার মতো জার্মানিতেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের নাটক মঞ্চায়নের সূত্রপাত ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের পরপর। পরাজিত ও বিপর্যস্ত জার্মানির অর্থনীতি তখন সম্পূর্ণ পঙ্গু। চলছে যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন, সে সঙ্গে রয়েছে প্রবল বেকার সমস্যা। এ অবস্থায় রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সামগ্রিক বিপুল অগ্রগতি ঘটলে তা জার্মানির তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের মধ্যেও পড়তে শুরু করে এর প্রভাব। ফলে ১৯১৯ সালে সেখানে গঠিত হয় 'জার্মান ওয়ার্কার্স থিয়েটার লীগ', যার বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন শ্রমজীবী ও সৌখিন অভিনেতা।[৯৩] তাঁদের অনুসরণে সমাজতান্ত্রিক নাট্যচিন্তার ধারায় গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি 'অ্যাজিট প্রপ স্কোয়াড' (Agit prop Truppen) যেমন বার্লিনের 'গ্রুপে ইউংগার শাউশপীলের', লাইপজিগের 'কোলেকটিভ ইউংগার শাউশপীলের' ড্যুসেলডর্ফের 'ট্রুপে ভেস্‌টেনস' ইত্যাদি।'[৯৪] এ উত্তরাধিকার থেকেই জার্মানিতে আবির্ভূত হন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দুই বিখ্যাত নাট্যতাত্ত্বিক ও স্রষ্টা, এরভিন পিসকাটর (১৮৯৫-১৯৬৬) এবং বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট (১৮৯৮-১৯৫৬)। এদের মধ্যে পিসকাটর ছিলেন মূলত পরিচালক, তিনি কোন নাটক রচনা করেন নি। বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট প্রথম দিকে পিসকাটরের সহযোগী হিসেবে থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে বহু নাটক রচনা ও পরিচালনা করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখ্য, পিসকাটর নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন প্রলেতারীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক জার্মান তরুণের মতো পিসকাটরও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন সৈনিক হিসেবে। সেখানেই তিনি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে প্রচারিত যুদ্ধবিরোধী বক্তব্যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সে সঙ্গে রাশিয়ার বিপ্লব এবং সদ্য গঠিত সোভিয়েত সরকারের একতরফা যুদ্ধ বিরতি, সৈনিকদের উদ্দেশে মৈত্রী, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা ইত্যাদি পিসকাটরকে বিপ্লবী চেতনার শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলে। তিনি থিয়েটারকে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কার্যসূচি প্রচারের বাহন হিসেবে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নেন। তাই বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি স্থাপন করলেন একটি প্রলেতারীয় থিয়েটার (প্রলেটারিশেস টেয়াটর)। এখানে

---

[৯২] উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত

[৯৩] জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

[৯৪] সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রযোজনা করেন তিনটি একাঙ্ক নাটকের একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠান, যেখানে সোভিয়েতের সমর্থনে শ্রমিক ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়। ১৯২৪ সালে তিনি প্রযোজনা করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক cZvKv, যার উপস্থাপনা বৈশিষ্ট্য থেকে পরবর্তী সময় উদ্ভাবিত হয় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম নাট্যরীতি 'এপিক থিয়েটার'।[৯৫] এ প্রযোজনা দেখে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বুঝতে পারে যে, পিসকাটরের নাটক মানুষের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। সে কারণে পার্টি তাঁকে ওই বছরই একটি 'রেভ্যু' নাটক প্রযোজনার দায়িত্ব দেয়। 'রেভ্যু' জার্মানির নাইট ক্লাবগুলোতে নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ও রাজনৈতিক স্কেচধর্মী ছোট নাটক। পিসকাটর সে আঙ্গিকের নাটকও বিপ্লবী প্রচারের কাজে লাগান। তাঁর পরিচালিত †iW †if¨ (১৯২৪) তে উঠে আসে জার্মানির শ্রমিক শোষণের এবং শ্রেণি-সংগ্রামের চিত্র। পিসকাটরের অন্যান্য নাটকের মতো এখানে অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় চলচ্চিত্র, বিভিন্ন পরিসংখ্যানের বিশাল বিশাল চার্ট, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি। এর ফলে দর্শকের পক্ষে নাটকের বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা সহজ হয়, নাটক কেবল তার নির্দিষ্ট text-এর মধ্যে সীমায়িত থাকে না। এ প্রসঙ্গে পিসকাটর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Wvm †cwjwU‡k †UqvUvi (The Political theatre) - এর এক জায়গায় বলেন:

> আমি পরিচালনার একটি বিশেষ পদ্ধতি বিকশিত করতে সমর্থ হলাম যাকে পরে অন্যেরা এপিক থিয়েটার নাম দিয়েছেন। বস্তুটা কী? সংক্ষেপে বলতে গেলে নাট্যক্রিয়ার সম্প্রসারণ এবং পটভূমিকার বিশ্লেষণ; অর্থাৎ নাটকটা নাট্যকাঠামোর বাইরেও বিস্তৃত হবে।[৯৬]

†iW †if¨ অভিনীত হতে লাগল জার্মানির শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে, যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সুযোগ পেলেন নাটকটি দেখার। আর এভাবেই পিসকাটরের উদ্যোগে জামার্নিতে রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়। উল্লেখ্য জার্মানিতে তখন শুরু হয়েছে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর উত্থান। তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলো প্রচার করতে লাগল – পিসকাটর সোভিয়েতের গুপ্তচর এবং শিল্পের নামে তিনি মূলত বলশেভিক প্রচার চালাচ্ছেন। আবার তাঁর পক্ষেও বিবৃতি দিলেন জার্মানির অনেক নাট্যকার ও বুদ্ধিজীবী। পিসকাটরের নাট্য প্রযোজনা অব্যাহত থাকে; তিনি করলেন আর্নস্ট টলার-এর wK gRv Avgiv †e‡P AwQ, আলেক্সেই তলস্তই-এর ivmcywZb, য়ারোশ্লাভ হাসেক-এর উপন্যাস †kv‡qBK অবলম্বনে একই নামের নাটক প্রভৃতি। এ দিকে তাঁর বিরুদ্ধতাও হয়ে উঠল আরো তীব্র ; পিসকাটরের নাট্যশালার সামনে শুরু হলো 'ব্রাউন শার্ট' পরিহিত নাৎসি ঝটিকা বাহিনীর পিকেটিং। এক পর্যায়ে পিসকাটরের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলে ১৯৩১ সালে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

---

[৯৫] উৎপল দত্ত, পিসকাটর : রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক; এপিক থিয়েটার, পূর্বোক্ত

[৯৬] উদ্ধৃত; উৎপল দত্ত, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পিসকাটর দেশ ত্যাগ করার পর তাঁর সহকর্মী ও উত্তরসূরীরা যেমন বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট, ফ্রিডরিশ ভোল্‌ফ, গুস্তাভ ফন ভান্‌গেন্‌হাইম প্রমুখ উক্ত ধারার নাটক চালিয়ে যেতে থাকেন। ফ্যাসিস্ট চক্র যথারীতি এ সব নাটক বন্ধ করার জন্য চালায় সর্বাত্মক চেষ্টা। তারা বিভিন্ন থিয়েটার মালিকদের হুমকি দেয়, এ সব পরিচালকের কাছে থিয়েটার ভাড়া না দেওয়ার জন্য। ফলে নাটক মঞ্চায়নের জন্য থিয়েটার ভাড়া পাওয়া তাদের কাছে দুরূহ হয়ে ওঠে। ভোল্‌ফ এ প্রসঙ্গে বলেন :

> ১৯৩১ সালের পর থিয়েটার ফ্রন্টে ফ্যাসীবাদী আক্রমণ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সমস্ত থিয়েটারের মালিক – যাঁরা আগে আমাদের নাটক নিয়ে দীর্ঘদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চালিয়ে যেতেন তাঁরা এখন 'নীতিগতভাবে' আমাদের প্রত্যেকটি নাটক বাতিল করলেন।... জনৈক নাট্য পরিচালক আমাকে বলেছিলেন আর তিনি আমাদের নাটক (আমার কিম্বা ব্রেশ্‌ট বা ভান্‌গেন্‌হাইমের) নাট্য তালিকায় রাখতে পারবেন না। কারণ আমাদের নাটকের একটি অভিনয় হলে তাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে।[৯৭]

এ প্রতিকূলতার কারণে ব্রেশ্‌টের KmvBLvbvi mš'í †hvnvbv (DIE HEILIGE JOHANA DER SCHLACHTHOFE), ভোল্‌ফ-এর Wx BDs‡Mb db gbm নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় তাঁরা বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের এ্যাজিট-প্রপ দলগুলোর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। এসব দলের জন্য ভোল্‌ফ রচনা করেন তিনটি এবং ব্রেশট লেখেন ম্যাক্সিম গোর্কির *Mother* উপন্যাস অবলম্বনে Wx gU¨vi (The Mother) এবং Wx gvmbvn‡g (The Measures Taken) নাটক। ভান্‌গেন্‌হাইম ও তাঁর 'ট্রুপে ৩১' নিয়ে তখন †fAi BmU W¨gm‡U চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হিটলার ক্ষমতায় আরোহন করার (৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৩) পরপরই জরুরী অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে নাটকে রাজনৈতিক প্রচার বন্ধ ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, হিটলারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন ধর্মঘট বন্ধ করার ষড়যন্ত্র হিসেবে ফ্যাসিস্টরা নিজেরাই আগুন লাগিয়ে দেয় রাইখস্ট্যাগ (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩) ভবনে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এর দায় চাপায় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের ওপর।[৯৮] এর জের ধরে হাজার হাজার কমিউনিস্ট শ্রমিক ও ফ্যাসিবিরোধী সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করে চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। উল্লেখ্য, সে রাতে পুলিশ ব্রেশ্‌টের বাড়িতেও হামলা করেছিল। তবে ব্রেশ্‌ট তার আগেই পরিবার নিয়ে শ্রমিকদের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এর পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শু হয় তাঁর উদ্বাস্তু জীবন। ব্রেশটের নির্বাসিত জীবনের এক পর্যায়ে

---

[৯৭] উদ্ধৃত; সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

[৯৮] "It was Germany itself that the first ray of light emerged. To discredit the communists, Hitler and his henchmen Goering, Goebbels, etc. conspired, had the grand building of the Reichstag set on fire (March 1933) and got several communists leders arrested on the plea that it was their doing..." Sajjad Zaheer, 'REMINISENCES; বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা (সম্পাদনা: ধনঞ্জয় দাশ), কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫৭০

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৩৫ সালে) নাৎসি সরকার তাঁর জার্মান নাগরিকত্বও কেড়ে নেয়।[৯৯] এখানেই শেষ নয়, পরে জানা গেছে হিটলারের তৈরি করা মৃত্যু পরোয়ানা প্রাপ্তদের তালিকায় পাঁচ নম্বরেই ছিল বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টের নাম।[১০০]

বস্তুত বের্টোল্ট ব্রেশট ছিলেন শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত কবি ও নাট্যকার। প্রথম জীবনে তিনিও জার্মানির পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পরে ১৯১৯ সালে একুশ বছর বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। এ কারণে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক e/j (BAAL) প্রকাশ করতে প্রকাশক অস্বীকৃত হন। ১৯২৬ সালে তিনি গভীরভাবে অর্থনীতি ও মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেন এবং নাটকে এর প্রয়োগ বিষয়ে উদ্ভাবন করেন ‘এপিক থিয়েটার’ তত্ত্ব।[১০১] মার্কসবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ফলে তিনি হয়ে ওঠেন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকামী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বুর্জোয়া থিয়েটারেরও শাসকশ্রেণির হাতে উৎপাদনের উপায়সমূহের মতো তাদের শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার যন্ত্র বিশেষ।[১০২] তাই প্রচলিত থিয়েটারের ধ্যান ধারণার পরিবর্তে তিনি নতুন রীতির সন্ধানে ব্যাপৃত হন। এ সময় নাট্যকার ভোল্‌ফ ও ভান্‌গেন্‌হাইমের ব্যবহৃত ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত Lehrstuck (এক প্রকার শিক্ষানাট্য) ভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক নাট্যচিন্তায় উত্তরণের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করে। Roswitha Mueller -এর মতে :

> The anticipatory aspect of Brechts theory is most highly developed in the *Lehrstuck* while the theoritical and practical perpose of Brecht’s epic theatre was to work with democratic ideals under the conditions of capitalist societies bringing bourgeois ideology to bear upon its own presuppositions, the historical basis for the *Lehrstuck* is a society in transition to socialism.[103]

এই শিক্ষানাট্য *Lehrstuck* ভঙ্গিকেই ব্রেশ্‌ট পরবর্তী সময় এপিক থিয়েটারে উন্নীত করেন। এ আঙ্গিক বিশ্বনাট্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করে মার্কসীয় তথা বৈপ্লবিক নাট্যরীতি হিসেবে। কার্ল

---

[৯৯] সৌভিক রায় চৌধুরী, ‘ব্রেশট: জীবন ও শিল্পকর্ম’; বের্টোল্ট ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার নাট্যচিন্তা (সম্পা. রথীন চক্রবর্তী), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫

[১০০] উৎপল দত্ত, ‘বের্টোল্ট ব্রেশট, কমরেড’, বের্টোল্ট ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

[১০১] ব্রেশটের বন্ধু এবং তাঁর অন্যতম জীবনীকার John Willet - এর সূত্রে হিউ বোরিসন, ‘ব্রেশ্‌ট এবং পিসকাটর’ (অনুবাদ: ধীরাজ বসু) প্রবন্ধে বলেন, “অভিনয়ের যে ধরন পিসকাটর মঞ্চে প্রয়োগ করেছেন, তার উদ্ভাবক মোটেই তিনি ছিলেন না। এপিক থিয়েটার, শারীরিক অভিনয়, প্রতিপাদক (demonstrative) অভিনয় রীতি এ সবই ব্রেশটের মৌলিক সৃষ্টি।” বের্টোল্টে ব্রেশ্‌ট ও তার থিয়েটার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

[১০২] “In Brecht’s vew, the cultural aparatus functions, among other things, to stabilise the existing social relations both politically and economically.” Roswitha Mucller, ‘Learning for a new society: Lehrstiick’, The cambridge companion to Brecht (edited: Peter Thomson and Glendyr Sacks), CAMBRIDGE UNIVERSITY, 1994, P. 81

[১০৩] Ibid, p. 82

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসের d‡qiivL w_wm‡mi মতো শ্রমজীবী শ্রেণির অনুকূলে পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার সংগ্রামে এ রীতি নাটকের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়। সাধারণ বা অ্যারিস্টটলের রীতির নাটকে দর্শক কেন্দ্রীয় চরিত্রের আবেগের সঙ্গে, নাট্য ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম ও মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠে যে, তার বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ সক্রিয় থাকতে পারে না।[১০৪] ফলে নাট্য ঘটনার সমান্তরালে বিদ্যমান বাস্তবসামাজিক সমস্যা তার মনে চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে পারে না বলে বলে উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তনে তার থাকে না বিশেষ কোন উৎসাহ। পক্ষান্তরে 'এপিক থিয়েটার' নাটককে মায়া (illusion) নয়, অভিনয় শিল্পীদের সহায়তায় কোন ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করে বলে দর্শক ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারে না। এক বিচ্ছিন্ন দূরত্বে অবস্থান করার ফলে (elienation) সে আবেগাপ্লুত না হয়ে নাট্য ঘটনাকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে দর্শকের মনে সমাজের বাস্তব অবস্থা সর্বদা জাগরুক থাকে এবং সৃষ্টি সমান্তরাল সমস্যা সমাধানে কার্যকর চিন্তার উন্মেষ ঘটবার সম্ভাবনা। এ ভাবে বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট তাঁর নতুন রীতির নাটকের মাধ্যমে দর্শকের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছেন, যাতে উদ্দিষ্ট দর্শক পৃথিবীকে বদলানোর ক্ষেত্রে রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১০৫] ব্রেশ্‌ট তাত্ত্বিক Peter Brooker এ রীতিকে বৈজ্ঞানিক এবং মার্কসীয় আখ্যা দিয়ে বলেন :

> In so far as epic theatre was, or became, a more consistently Marxist theatre (and might by that token be thought of as scientific), it sought to produce a knowledge of the 'causal laws of development'; to divide rather than unify its audience to intervene in and so transform ideas and attitudes. Its domain was crucially therefore the domain of conciousness and ideology.[106]

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের উল্লিখিত প্রয়োগের সূত্রে ব্রেশ্‌ট সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের (socialist realism) অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবেও আবির্ভূত হন। এদিক থেকে তাঁর অনন্য অবদান হলো– বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োগ। ইতঃপূর্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী তাত্ত্বিকরা দৃষ্টি দিয়েছিলেন কেবল বিষয় (Text)-এর দিকে ; বিষয় উপস্থাপনার আঙ্গিক নিয়ে বিশেষ জোর দেন নি। কিন্তু ব্রেশ্‌ট বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য যুৎসই আঙ্গিক (form) খুঁজতে গিয়েই 'এপিক' রীতির উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ দরকার যে, জার্মান ফ্যাসিবাদী সরকারের নির্বাসন দণ্ড

---

[১০৪] "In Brecht's view, drama, and contemporary German drama especially, invited its spectetors to empathise with the emotional destiny of its central individual characters. Audiences were encouraged to surrender to the suspense and consolations of the well made play, faithful to the unities of time and place and their naturalistic depiction" Peter Brooker, 'Key words in Brecht's theory and practice', ibid, p. 188

[১০৫] রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বের্টোল্ট ব্রেশট : প্রয়োগের নন্দনতত্ত্ব, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬৪

[১০৬] Peter Brooker, 'Key words in Brecht's theory and practice', ibid, p. 189.

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাদের জঙ্গী সমর্থকদের হয়রানির মধ্যেই তিনি এ রীতির প্রয়োগে নাটক পরিচালনা চালিয়ে গেছেন ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে। ১৯৫৪ সালে নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে ‘থিয়েটারে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম-এর প্রয়োগ’ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ব্রেশ্‌ট। এর এক স্থানে তিনি লেখেন, “সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্টিক শিল্প সামাজিক ক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক নিয়মকে তুলে ধরবে। এই নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ফলে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারিত করবে।”[১০৭] এ ভাবে বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট শিল্প-সাহিত্যে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের ধারায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

রাশিয়া ও জার্মানির ‘এ্যাজিট-প্রপ’ নাট্যধারা ত্রিশের দশকে আমেরিকার নাট্যকর্মীদেরও প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। ১৯৩০-এর শীত মওসুমে নিউইয়র্কের জার্মান শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে পিসকাটরের অনুসরণে গঠিত হয় একটি জার্মান থিয়েটার গ্রুপ। প্রায় একই সময় ইংরেজি ভাষায়ও ‘ওয়ার্কার্স লেবোরেটরি থিয়েটার’ নামের একটি দল আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৫ সালে নিউইয়র্কে ছড়িয়ে পড়ে এ ধারার একাধিক প্লে প্রোডাকশান ইউনিট। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ‘লিভিং নিউজ পেপার’ দল। দলটির প্রথম উপস্থাপনা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখলের তথ্যমূলক পর্যালোচনা। ১৯৩৬ সালে উপস্থাপিত হয় তাদের বিখ্যাত প্রযোজনা ‖Ucj G cøvl IqvÛvi। এ নাটকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের গৃহীত ‘এগ্রিকালচারাল এডমিনিস্ট্রেশন এ্যাডজাস্টমেন্ট’ (AAA) কর্মসূচির পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য, হিসাব ইত্যাদি উপস্থাপনসহ তীব্র সমালোচনা করা হয়। এমনকি ঐ কর্মসূচির বিরুদ্ধে কৃষক ও বেকার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের তাৎক্ষণিক (নাটক অনুষ্ঠানের দিনের) অগ্রগতিও ঘোষণা করা হতো লাউড স্পিকারের মাধ্যমে।[১০৮] পরবর্তী সময় এ ভাবধারায় অনেক সাধারণ থিয়েটারও গড়ে ওঠে; যেমন নিউইয়র্কের অফ-অফ ব্রডওয়ে, দি ওপেন থিয়েটার, লা মামা এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার সানফ্রান্সিসকো মাইম ট্রুপ, বার্কলির ম্যাজিক থিয়েটার প্রভৃতি।

থিয়েটারকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা হয়েছে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীন বিপ্লবের সময়। দীর্ঘস্থায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের, বিশেষ করে লাল ফৌজের জাপান বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়, ১৯৩১ সালে কিয়াঙসির মুক্তাঞ্চলে প্রথম এ ধরনের নাট্যদল গড়ে তোলা হয়। এ উদ্দেশ্যে জুইচিনের গোর্কি বিদ্যালয়ে এক হাজারের বেশি ছাত্র সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি হয় ‘জাপ বিরোধী গণনাট্য সমিতি’র আটটি নাট্যদল। ইউরোপ ও মস্কোতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা কমিউনিস্ট শিল্পী ওয়েই কুঙ-চি (Wai kung-Chi) ছিলেন এসব দল বা সমিতির পরিচালক। কমিউনিস্ট লাল ফৌজের

---

[১০৭] উদ্ধৃত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

[১০৮] জিয়া হায়দার, নাট্যবিষয়ক নিবন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি দলের সঙ্গে থাকতো একটি করে নাট্যদল (রেড থিয়েটার)। কোন অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পরপর রেড থিয়েটার সেখানে উপস্থিত হতো এবং তাদের অভিনয় ও অন্যান্য পরিবেশনার মাধ্যমে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের মনে। সে সঙ্গে ছড়িয়ে দিত জাপ-বিরোধী তীব্র প্রতিরোধ চেতনা। ন্যূনতম নাট্য উপকরণ এবং অত্যন্ত সহজ সরল ভঙ্গিতে উপস্থাপিত এ সব নাট্যদলের অভিনয়ে কৃষকরা একইসঙ্গে মুগ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে উঠত। ১৯৩৬ সালে আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক এডগার স্নো-র সঙ্গে এ রকম একটি দলের দেখা হয়। চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা *RED STAR OVER CHINA* (1973) বইতে তিনি রেড থিয়েটারের কিছু বর্ণনাও দিয়েছেন। রেড থিয়েটারের বিপুল জনপ্রিয়তার একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি পরিচালক ওয়েই কুঙ চি-র মন্তব্যসূত্রে বলেন যে, তাঁদের নাটক চীনা কৃষকদের কাছেই শুধু নয় শত্রু সৈন্যদের কাছেও আকর্ষণীয় ছিল। রেড থিয়েটারের অনুষ্ঠান দেখার জন্য কুয়োমিনটাঙ-এর শত্রু সৈন্যরা গোপনে অনুরোধ পাঠাতো। ওয়েই কুঙ-চি-র ভাষায় :

> যখন আমরা শ্বেত প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাছাকাছি চলে যাই, তখন কুয়োমিনটাঙি সৈনিকরা শ্বেত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলাগুলোর কোনও শহরের বাজারে আমাদের অভিনেতাদের যাওয়ার জন্য গোপনে খবর পাঠায়। আমরা যাওয়ার পর লাল আর শ্বেত সৈনিকরা উভয়েই অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের অভিনয় দেখার জন্য বাজারে আসে। কিন্তু কুয়োমিনটাঙের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারীরা এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে কখনোই এটা অনুমোদন করে না, কারণ কুয়োমিনটাঙি সৈন্যরা আমাদের অভিনেতাদের অভিনয় দেখার পর লাল সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর রাজি হয় না।[১০৯]

স্মর্তব্য, যৎসামান্য নাট্য উপকরণের মতো এ অভিনেতাদের দেওয়া হতো কেবল পোষাক, খাদ্য ও সামান্য ভাতা। কিন্তু তাতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। একইসঙ্গে অন্যান্য কমিউনিস্টদের মতো তারাও প্রতিদিন পড়াশোনা করত এবং বিশ্বাস করত যে, তারা চীনের জনসাধারণ ও তাদের সৈনিকদের জন্য কাজ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে এডগার স্নো-র মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য ; যেমন, "বাস্তবসম্মত বিলাসের উপকরণের দিক থেকে তারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অতি দীন বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলব, কিন্তু এদের মতো এত সুখী আর কাউকে দেখিনি আমি।"[১১০]

এসব দলের গান ও পালা প্রায় সবই লিখত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার বিভাগের সদস্যরা এ সব পালায় 'সজীব সংবাদপত্রে'র মতো নিত্যনতুন সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক

[১০৯] উদ্ধৃত; এডগার স্নো, চীনের আকাশে জাগে লাল তারা (ভাষান্তর ও সম্পাদনা: অজয় চট্টোপাধ্যায়), কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮২
[১১০] এডগার স্নো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় অভিনয়ের উপজীব্য হয়ে উঠত। ১৯৩৩ সালে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন হুনান প্রদেশের বিখ্যাত লেখক চেঙ ফাঙ উ। ১৯৩৬ সালে চীনের বিশিষ্ট লেখিকা তিঙ লিঙ যুক্ত 'হন ফ্রন্ট সার্ভিস ড্রামাটিক ট্রুপ'- এর সংগঠক হিসেবে। পরবর্তী সময় অপর মার্কিন সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং (Anna Louise strong) এর সঙ্গে ডিঙ লিঙ-এর সাক্ষাৎ ঘটে। চীন যুদ্ধ সম্পর্কে আনা লুই স্ট্রং-এর লেখা *China Fights for Freedom* গ্রন্থে সেই সাক্ষাৎকারের সূত্রে পাওয়া যায় যুদ্ধকালীন চীনা থিয়েটার ও তিঙ লিঙ-এর শিল্প ভাবনা।[১১১] উক্ত সাক্ষাৎকারে তিঙ লিঙ বলেন :

> আজকের দিনে লেখক শিল্পীদের একটি মাত্র কর্তব্য রয়েছে এবং সেটা হলো দেশকে রক্ষা করতে সাহায্য করা। সাহিত্যতত্ত্ব কি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে আমরা নিজেদের হারাতে চাই না। আমরা জনগণকে উজ্জীবিত করার জন্যই লিখি।...
>
> শিল্পতত্ত্ব দিয়ে দেখলে আমাদের নাটককে পশ্চাৎপদ মনে হতে পারে, কিন্তু যুবকেরা আমাদের অভিনয় দেখতে পছন্দ করে কেন না, আমরা তাদের জীবন কথাই নাটকে দেখাই। ... এই বিপদ ও মৃত্যুর ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যেও আমরা কষ্ট করে জনগণের কাছে যাই, জনগণ হাসিমুখে আমাদের গ্রহণ করে। এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে।[১১২]

এ সব কারণে চীনা নাটক ও শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, China Drama has gone to war, বা Art is forced back to the people।

ভারতে উল্লিখিত ধারার সাহিত্য কিংবা নাটক রচনা রাশিয়ার বিপ্লবের পূর্বে লক্ষ করা যায় না। তবে উনিশ ও বিশ শতকের লোকসাহিত্য, লোকনাট্য এবং কলকাতাকেন্দ্রিক কয়েকটি থিয়েটারে উপস্থাপিত নাটকে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক উপাদান ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। যেমন তিতুমিরের অন্যতম সহযোদ্ধা সাজন গাজি লিখিত পুঁথিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে তিতুমিরের বিভিন্ন সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[১১৩] তেমনি উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত কয়েকটি নাটকে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় রাজনীতির তীব্র প্রকাশ ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। একইভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যুক্তপ্রদেশে কৃষক সমাজ ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রচারের জন্য লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করেছিল বলে জানা যায়।[১১৪] রাশিয়ার বিপ্লবের কয়েক বছর পর তৎকালীন বাংলার জনপ্রিয় নাট্যপত্রিকা 'নাচঘর'-এ মস্কো আর্ট থিয়েটারসহ ওই দেশের নাটক সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হত। এ ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় সাম্যবাদ ও সোভিয়েত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বিপ্লবের

---

[১১১] দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৭, ১২৯

[১১২] উদ্ধৃত, দর্শন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮

[১১৩] স্বপন বসু, গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯৪

[১১৪] ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮৬, পৃ. ৫৪৫

Dhaka University Institutional Repository

পরপরই। এ সবের প্রভাবে ১৯২৬ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় সাম্যবাদ অনুপ্রাণিত নাটক agNU মঞ্চস্থ হয় কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে।[১১৫] কে সি রায় চৌধুরী রচিত এ নাটকে এক বিলেত-ফেরত সোশ্যালিস্ট (জমিদার পুত্রও বটে) শহরের গৃহকর্মীদের সংগঠিত করে। বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তারা ধর্মঘট করলে গৃহস্থেরা নতুন কর্মী নিয়ে আসে গ্রাম থেকে। এ অবস্থায় দাঙ্গা শুরু হলে নায়কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও সমাপ্তি ঘটে। খাপছাড়া কাহিনী, দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী 'কলেজ স্কোয়ার বক্তৃতা'-ধর্মী সংলাপ এবং সামগ্রিক উপস্থাপনার দুর্বলতায় এ নাটক দেখে 'নাচঘর' পত্রিকার প্রতিবেদকই দুঃখিত হয়েছিলেন। এ দিক থেকে ওই বছর প্রবাসী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩১) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের i³Kiex (১৯২৬) সাম্যবাদ অনুপ্রাণিত বাংলা ভাষার প্রথম নাটক হিসেবে অভিহিত করা চলে। উল্লেখ্য, নাটকটির প্রথম খসড়া রচিত হয়েছিল এরও তিন বছর আগে 'যক্ষপুরী' নামে।[১১৬] পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তা কয়েকবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন তাঁর পরিচিত জনদের। এর মধ্যে 'নাচঘর' পত্রিকার প্রতিবেদক (সম্পাদক) হেমেন্দ্রকুমার রায়ও ছিলেন।[১১৭] এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে তিনি লিখেছিলেন :

> আমরা এ নাটক শুনেছি – স্বয়ং কবির মুখে। শুনে অবাক হয়েছি। ... এর তুলনায় আমাদের রঙ্গালয়ে প্রচলিত নাটক যে কী তুচ্ছ, সামান্য – অবহেলার সামগ্রী তা কহতব্য নয়।...
> পৃথিবীর চতুর্দিকে – বড় বড় সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থলে অন্যের রক্ত শোষণ কোরে নিজের জাতীয় যৌবন-শক্তিকে চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ন রাখবার যে প্রবল প্রচেষ্টা, প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে বস্তু এবং শক্তিকে সংগ্রহ ও আয়ত্ত করবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা, তার মধ্যে যে মর্মান্তিক ট্রাজেডি প্রচ্ছন্ন আছে এই নাটকে তারই কাহিনী মূর্তি লাভ করেছে। এ নাটক দেশ-বিশেষের নাটক নয় – এ বিশ্বের সামগ্রী।[১১৮]

বস্তুত এ নাটকে নির্মম শ্রমশোষণ, শ্রম বিভাজন, শ্রম শোষণজনিত কারণে উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে শ্রমিকের বিবিধ বিচ্ছিন্নতা, ধর্মের ব্যবহার, শ্রমিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে সাম্যবাদী দর্শনের আলোকে। নাটকটি সে সময়ের বিখ্যাত নাট্য পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নির্দেশনায় বাণিজ্যিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয় নি। এমনকি যোগ্য অভিনেত্রী (নন্দিনী চরিত্রে) খুঁজে না পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার মহড়া দিয়েও এ নাটকের মঞ্চায়ন বাতিল করেন। কবির জীবদ্দশায় এ নাটকের কেবল একটি মঞ্চায়নের কথা জানা

---

[১১৫] চিত্তরঞ্জন ঘোষ, 'রচশ-বিপণ্ডব সাম্যচিন্ড্র ও আমাদের নাট্যজগৎ' বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
[১১৬] রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১১৫
[১১৭] রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩
[১১৮] উদ্ধৃত, ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

যায়। বিহারের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে কলকাতার নাট্যনিকেতনে ১৯৩৪ সালের ৬ এপ্রিল প্রথম মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের i³Kiex নাটক।[১১৯]

i³Kiex-র আগে আরো কয়েকটি সাম্যবাদ প্রভাবিত নাটক মঞ্চস্থ হয়। সে গুলো যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের †'‡ki WvK (১৯৩০) এবং শরৎচন্দ্র ঘোষ রচিত AwfRvZ (১৯৩১)। এর মধ্যে †'‡ki WvK নাটকে গ্রামের চাষী ছাত্র এবং নারীদের সম্মিলিতভাবে কুটির শিল্পের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। গ্রামের মহাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে এবং চালু করবে কৃষক সমিতি। এ সব কারণে নাটকটি সমালাচকের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়।[১২০] পক্ষান্তরে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতদের পরাজয়, পতন এবং নতুন মূল্যবোধ নিয়ে রচিত AwfRvZ নাটকটি তৎকালীন দর্শক প্রত্যাখ্যান করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ˆi‡_i iwkˆ (১৯৩২) নাটকেও সাম্যবাদী আদর্শের স্পষ্ট রূপায়ণ ঘটেছে। এ নাটকে সভ্যতার রথ টানার ক্ষেত্রে কবি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পরিবর্তে শূদ্র তথা শ্রমজীবী মানুষদেরই উপযোগী বলে ঘোষণা করেছেন। বিষয়টি তৎকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রলেতারীয় শ্রেণির উত্থানের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রভাব বলে মনে হয। স্মর্তব্য ১৯৩০ সালে কবি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ঘুরে এসেছিলেন বলে সে প্রভাব মোটেই আকস্মিক ছিল না।[১২১] রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এ নাটক ১৯৩২ সালেই একবার মঞ্চস্থ হয় শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায়।[১২২]

অবশ্য সাম্যবাদী অনুপ্রেরণায় উল্লিখিত নাটকগুলো যথেষ্ট দর্শক আনুকুল্য লাভ করতে পারে নি। কারণ হিসেব বলা চলে, এ সবের রচনা এবং উপস্থাপনায় সৌকর্য ও দক্ষতার ঘাটতি যেমন ছিল, তেমনি দর্শক সমাজও এ ধরনের নাটকের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না। সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের অধীন তৎকালীন ভারতবর্ষের মানুষের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই কাজ করছিল বহুল পরিমাণে। শক্তিশালী ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির অনুপস্থিতিতে এ দেশে শ্রেণি সংগ্রামের চেতনা এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশও আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ছিল না। ঐতিহাসিক সুকোমল সেন-এর মতে :

> পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা উত্তরকালের তুলনায় শ্রমিকশ্রেণি সংখ্যাগত দিক থেকে ক্ষুদ্রকায় ছিল। আবার এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় শ্রমিক শ্রেণির একটা অংশ অসংগঠিত ছিল এবং

---

[১১৯] রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

[১২০] "All these make Desher Dak really an avante garde play of the thirties of this century". cited from Sushil K. Mukharjee. The Story of the Calcutta Theatres, 1753-1980; ধনঞ্জয় দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪.

[১২১] প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, তৃতীয় খ=, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪২২-২৪

[১২২] রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণি-সংগ্রাম তীব্রতর করার প্রক্রিয়া থেকে দূরেই ছিল। ফলে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হলেও আন্দোলনে যে ধরনের ব্যাপকতা সম্ভব ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি।... এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে ত্রিশের দশকে এবং এমনকি চল্লিশের দশকেও শ্রমিকশ্রেণির সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে দুর্বলতা যথেষ্ট ছিল।[১২৩]

এ সব কারণে বাংলা ভাষায় সাম্যবাদী রাজনীতি আশ্রিত নাটকের বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবিতকালে খুব একটা হয় নি। আবার তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পরেই (১৯৪৩ সাল থেকে) 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র উদ্যোগে উল্লিখিত ধারার বেশ কয়েকটি নাটক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মঞ্চস্থ হতে থাকে।

দেখা যাচ্ছে কৃত্য এবং ধর্মীয় আবহ থেকে একটি বিশেষ শিল্প হয়ে ওঠার সময় থেকেই নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। প্রাচীন গ্রিক ও সংস্কৃত নাটকে রয়েছে এর নিদর্শন। মধ্যযুগে পুনরায় গির্জার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে নাটক একই ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ইউরোপের নব-জাগরণ সূত্রে নাটকে রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসে আরো প্রত্যক্ষভাবে। একইসঙ্গে নাট্যকার অভিনেতাদের ওপর রাষ্ট্রশক্তির দমন-পীড়নও শুরু হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটকের সংগ্রামী ভূমিকা রোধ করা সম্ভব হয় নি। ফরাসী বিপ্লবের সূত্রে নাটক, রীতিমতো নিপীড়িত শ্রেণির শৈল্পিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লব এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে মার্কসবাদী রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটক হয় আরো শানিত। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শোষিত শ্রেণি ও পরাধীন জাতিসমূহের রাজনৈতিক লড়াইয়ে নাটক একটি আবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও মানবগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ হাতিয়ার ব্যবহার করছে সৃষ্টিশীলভাবে। বাংলা নাটকও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উক্ত সংগ্রামী ঐতিহ্য নানামাত্রিকতায় সাঙ্গীকৃত করেই বিকশিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

---

[১২৩] সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০০), কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq
ie›`'-ce bvU‡K ivRbxwZ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে থেকে বাংলা নাটকে রাজনীতির বিভিন্নমুখী প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এ সময়ের নাটকে রাজনীতি এসেছে কখনও সমাজ সংস্কারের রূপে, কখনও সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত নিপীড়নের প্রতিরোধ হিসেবে; কিংবা কখনও ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় চেতনার জাগরণ রূপে।

১৭৯৫ সালে একজন রুশ শিল্পী গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ কলকাতায় *The Desguise* নামে একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ–Kvíwb mse'j–মঞ্চস্থ করেন। তিনি *Love is the Best Doctor* নামের অপর একটি নাটকেরও অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১] উক্ত দুটি অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটলেও ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কারণে নাটক দুটোর নিয়মিত মঞ্চায়ন যেমন হয়নি, তেমনি দীর্ঘদিন বাংলা নাট্য রচনার কোন চেষ্টাও লক্ষ করা যায়নি। যদিও সে সময় ইংরেজদের পরিচালিত বেশ কয়েকটি থিয়েটারে ইংরেজি নাটকের অভিনয় হতো। এমনকি বাঙালি জমিদার প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটারে'ও (১৮৩২ সালে) প্রথম দুটি নাটক–Rwjqvm wmRvi এবং DËiivgPwiZ অভিনীত হয় ইংরেজিতেই। উল্লেখ্য, এ ধারায় উনিশ শতকের মধ্যভাগ,[২] কোথাও কোথাও বিশ শতকের চল্লিশ দশকেও বাঙালি অভিনেতারা ইংরেজিতে শেক্সপিয়রের নাটক মঞ্চস্থ করতো।[৩] বাঙালির উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায়। নাটকটি ছিল বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান we'¨vm›'i এর নাট্যরূপ।[৪] এর অভিনয় তৎকালীন ইংরেজি পত্রিকা 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'-এ বেশ প্রশংসিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫৭-এর আগে আর কোন বাংলা নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। অবশ্য এর মধ্যে মৌলিক এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে বেশ কয়েকটি অনুবাদ নাটক প্রকাশিত হয়। যেমন জে সি গুপ্তের KxwËwejvm (১৮৫২), তারাচরণ শীকদারের f'vRb (১৮৫২), শেক্সপিয়ারের দ্য gv‡P›U Ae †fwbm অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষের fvbgZx wPËwejvm (১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের Kjxb Kjme©¯ (১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহের evebvUK (১৮৫৫), বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের সংস্কৃত থেকে অনুবাদ AwfÁvb kKšÍjv (১৮৫৫) ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে

---

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; কলকাতা ১৯৬৮, পৃ. ১০৪
২ অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৭-২৭
৩ উৎপল দত্ত, আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, কলকাতা, ২০০৯ পৃ. ৯-১১
৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৪০৫ পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

AwfÁvb kKšÍjv ও Kjxb Kjmeÿ¯ মঞ্চায়নের মাধ্যমে বাংলা নাটক রচনা এবং মঞ্চায়নের নিরবচ্ছিন্ন ধারা শুরু হয়।[৫] বস্তুত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলায় যে সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তার প্রভাবে এ সময় কুলীন Kjmeÿ¯র মতো বহু নাটক রচিত হতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ছিল। বলা বাহুল্য এ সময় কোম্পানির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিচশ্রেণির ইংরেজ কর্মচারীরাও বাণিজ্যের নামে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থ সঞ্চয় করত। মূলত কলকাতার ইংরেজ কর্মচারীদের বিনোদনের জন্যেই ইংরেজি থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় কোলকাতা শহরে। ইংরেজ ছাড়াও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু পুরনো জমিদার এবং কোম্পানির 'বেনিয়ানি মুচ্ছুদ্দিগিরি দেওয়ানী সরকারী'[৬] ইত্যাদি করে বিত্তশালী হয়ে ওঠা কিছু বিনোদনলিপ্সু বাঙালিও ছিলেন। ইংরেজরা লেবেদেফের উদ্যোগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নেয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে শুরু করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র।[৭] এর ফলস্বরূপ ইংরেজদের থিয়েটার চললেও কেবল বাঙালির জন্য পরিচালিত লেবেদেফের থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সে সময়ের চরম দুর্দিনে যথাক্রমে আট রুপি (বক্স ও পিট) এবং চার রুপি (গ্যালারি)[৮] খরচ করে নিয়মিত নাটক দেখার মত স্বচ্ছল ও শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যাও যে পর্যাপ্ত ছিল না, তা অনুমান করা শক্ত নয়। কারণ এ সময় সমগ্র বাংলা অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র লুণ্ঠনের ফলে রীতিমত দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছিল।[৯] অন্যদিকে তখনো বাংলাদেশে কোম্পানির পক্ষ থেকে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কোন প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়নি। আঠার শতকের শেষ দিকে ইংরেজদের আদালতে কেরানি, মুহুরি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সবেমাত্র কিছু বাঙালি ইংরেজি শেখার চেষ্টা করছিল। সে শিক্ষা ছিল মূলত কতগুলো ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সত্যিকার শিক্ষা লাভ নয়।[১০] তা ছাড়া নাটক রচনার জন্য চলনসই বাংলা গদ্যভাষা তখনও গড়ে ওঠেনি। এ সব কারণে লেবেদেফের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি বাংলা নাটক রচনা কিংবা মঞ্চায়ন লক্ষ করা যায়নি প্রায় অর্ধ শতক পর্যন্ত।

প্রকৃত পক্ষে বাংলা নাটক রচনার সঙ্গে সচেতন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা শুরু হয় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার পর। এ সময়

---

[৫] সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন কোন গবেষক বাংলা নাটকের সূচনালগ্ন হাজার বছর পূর্বে বলেও মত প্রকাশ করতে চাইছেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ড. সেলিম-আল দীন (ga¨ h‡Mi evOjv bvU¨, বাংলা একাডেমী) এবং সৈয়দ জামিল আহমেদ (nvRvi eQi : evsjv‡`‡ki bvUK I bvU¨Kjv, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা) প্রমুখ।

[৬] বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৩

[৭] আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮-৯

[৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

[৯] R. Palme Dutt, India Today, Calcutta, 1986, p. 108; উইলিয়াম ফুলারটন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

[১০] বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ব্রিটিশ কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নি শুরু হয় এবং তাদের বেশির ভাগের বাণিজ্যিক অফিস (এজেন্সি) স্থাপিত হয় কলকাতা শহরে। এসব অফিসে চাকুরি পাওয়ার লক্ষ্যে বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজি শেখার প্রবল আগ্রহ জন্মে। এ সময় কলকাতায় বেশ কয়েকজন বিদেশি ভদ্রলোক ইংরেজি শেখার স্কুল চালাচ্ছিলেন। যেমন, শেরবোর্ন (উল্লেখ্য, এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষালাভ করেছিলেন), মার্টিন বৌল, আরাটুন পিক্রস, ডেভিড ড্রামন্ড (ডিরোজিওর শিক্ষক), ডেভিড হেয়ার, জি এ টার্নবুল প্রমুখ।[১১] কোলকাতার কাছে আন্দুল, চনক, পানিহাটি, সুখচর, বরাহনগর এবং শ্রীরামপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর এবং ঢাকায়ও কিছুদিনের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২] মনে হয় কেবল ইংরেজি শেখাবার লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও এসবের কয়েকটি ছিল যথার্থ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র। কারণ, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার আগে এ ধরনের স্কুল থেকেই শিক্ষা পাওয়া রামমোহন রায়, ডিরোজিও, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ মল্লিক, রসময় দত্ত প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উত্থান ঘটেছিল। এসব শিক্ষিত বাঙালি নিজেরা জ্ঞানচর্চার জন্যে গড়ে তুলেছিলেন বেশ কয়েকটি সভা সমিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সভাগুলো হল 'আত্মীয় সভা', 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি', 'হিন্দু কলেজ', 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', 'গৌড়ীয় সমাজ' ইত্যাদি।[১৩] এসব সভায় জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ধর্ম, দেশ এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতো। যেমন, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভায়' আলোচিত হতো জাতিভেদ সমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহের সমস্যা, নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ সমস্যা, সতীদাহ বা সহমরণ সমস্যা প্রভৃতি।[১৪] মূলত রামমোহনের প্রচেষ্টা এবং সমর্থনের ফলে ইংরেজরা এ সময় (১৮২৯) সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে সমর্থ হয়। শুধু তা-ই নয় এ সভাকে কেন্দ্র করে ১৮১৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় বিখ্যাত 'হিন্দু কলেজ'। এ কলেজের অন্যতম শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর উদ্দীপনাময় আলোচনার মাধ্যমে বাঙালি সন্ধান পায় পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষার। এখানকার ছাত্ররা ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু করে লক, হিউম, বার্কলে, রীড, স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষী ও চিন্তানায়কদের রচনা পাঠ করেন এবং এর ফলে তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সমাজ গবেষক বিনয় ঘোষের মতে :

> ব্রিটিশ আমলে নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর (Bengali intelligentsia) প্রথম ও প্রধান উৎপত্তিস্থল হিন্দু কলেজ। উনিশ শতকের তিরিশ থেকে পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাংলার

---

[১১] বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯।

[১২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৬ পৃ. ১২৪

[১৩] বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৪

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

> সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের বুদ্ধি ও চিন্তার পথ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে দেয়।[১৫]

এঁরা সেকালের সমস্ত বিষয়কে বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। এদিক থেকে তাঁদের একটি অংশ, বিশেষ করে ডিরোজিওর সরাসরি ছাত্ররা – ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত–প্রথম পর্যায়ে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলেও পরিণত বয়সে এবং কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং নৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশ সমাজ ধর্ম দর্শন সাহিত্যের পাশাপাশি সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিষয়েও ইয়ং বেঙ্গলরা তাদের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করতেন। তাঁরা সে সময় প্রচলিত আফ্রিকার দাস ব্যবসার তীব্র নিন্দা করেন এবং মরিশাসে কুলি চালান দেবার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান।[১৬]

উল্লেখ্য যে, এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে কোম্পানির মনোযোগ লক্ষ করা যায় ১৮৩৫ সালে বেন্টিংক-মেকওলে (Macaulay) পরিকল্পিত ইংরেজিসহ পাশ্চাত্য শিক্ষার সরকারি নীতি চূড়ান্ত হওয়ার পর। অবশ্য মেকওলের লক্ষ ছিল এদেশে এমন একটি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তোলা, যারা বিদেশি শাসক এবং এদেশি শাসিতদের মধ্যে কেবল দোভাষীর কাজ করবেন। চামড়ার রঙ এবং দেহের রক্তের দিক থেকে তাঁরা ভারতীয় থাকলেও রুচি মতামত, নীতিবোধ ও মণীষার দিক থেকে হবেন খাঁটি ইংরেজ।[১৭] মেকওলের গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে তিরিশ বছরের মধ্যে এ দেশে আর একজনও মূর্তিপূজক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৯৩৬ সালে তিনি তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ æthere would not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence”[১৮]

বলা বাহুল্য, মেকওলের প্রথম ভাবনা কিছুদিনের জন্য একট ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে লক্ষ করা গেলেও দ্বিতীয়টি প্রায় পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে গঠিত ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠী এবং নতুনভাবে – অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের পর–স্থাপিত স্কুল কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)-এর মাধ্যমে এদেশে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। সে সঙ্গে স্বল্পসংখ্যক হলেও সৃষ্টি হয় একটি আধুনিক বুদ্ধিজীবী (intelligentsia) গোষ্ঠীর। সাধারণভাবে সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকেন

---

[১৫] বিনয় ঘোষ,বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

[১৬] নন্দিনী সেন, 'জাতীয় জাগরণ ও আর্ন্তজাতিক চেতনা' অসমাপ্ত বিপ্লব, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা (সম্পা. নরহরি কবিরাজ, কলকাতা, ২০০৭ পৃ. ৫৮

[১৭] "Who may be interpreters between us and the millions whom we govern – a class of persons Indian in colour and blood, but English in taste, in-openions, in morals and in intellect" উদ্ধৃত; বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭।

[১৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

যাঁরা সমাজের জন্য বাইরের জগতের উন্নত ধ্যান ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আমদানী করে থাকেন। সমাজে এঁরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত।[১৯] উদ্ভূত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠী তৎকালীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু সংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস দূরীকরণে সচেষ্ট হন। যেমন, পূর্বে উল্লিখিত সতীদাহপ্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, কৌলীন্য প্রথার উচ্ছেদ, বহু বিবাহ প্রথা বাতিল করা, সামাজিক ভ্রষ্টাচার, নারীশিক্ষা-নারীমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে অনেকখানি সফল হন তাঁরা। এসব বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ-প্রতিবেদন প্রকাশ, গ্রন্থ প্রণয়ন, আলোচনা ইত্যাদির পাশাপাশি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম নাটকেও উল্লিখিত সমাজ সংস্কারমূলক বক্তব্য প্রচার হতে থাকে। এ বিষয়ে গোলাম মুরশিদ জানাচ্ছেন :

> ... সমাজ সংস্কারবিষয়ক সচেতনতা ও মনোভাব সেকালের সাহিত্যের সকল বিভাগেই কমবেশি ছড়িয়ে থাকলেও, নাটকেই বোধ হয় সবচেয়ে ব্যাপক এবং সরাসরি ব্যক্ত হয়। এ নাটকগুলো রচিত হয়েছিল সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে।[২০]

১৮৭৬ সালের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যে রচিত এ রকম নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ।[২১] এতে দেখা যায়, বিধবা বিবাহ বিষয়ে ২১টি, কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ নিয়ে ২৩টি, বাল্যবিবাহ অবলম্বনে ৪টি, নারীশিক্ষা-নারীমুক্তি নিয়ে ২টি এবং মদ্যপান, লাম্পট্য ও বেশ্যাসক্তির মতো সামাজিক ভ্রষ্টাচার নিয়ে প্রায় ১০টির মতো নাটক রচিত হয়েছে। তবে, এই শ্রেণিকরণ একেবারে জল-অচল নয়; কারণ বিধবাবিবাহ বিষয়ের নাটকে বাল্য বিবাহের প্রসঙ্গ, কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে বহুবিবাহের বিষয় অনেক নাটকে মিশ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু স্পষ্টতই এ সব নাটকের কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টি ও পরিণতিতে সমস্যাগুলোর উপস্থাপনায় নাট্যকারদের আন্তরিক আগ্রহের ঘাটতি দেখা যায় না। ফলে কোন কোন নাটকের উপস্থাপনা এবং পরিবেশন নৈপুণ্য দর্শক এবং পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে পেয়েছে বেশ সাফল্য। কয়েকটি নাটকের কাহিনী এবং মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্য থেকে ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়।

এদিক থেকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২–১৮৮৬) Kj¨bKj me©¯ (১৮৫৪)। রাজা বল্লাল সেন প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার কারণে যে ভাবে নারীসমাজ নিগৃহীত এবং সমাজ দূষিত হচ্ছিল তার পরিচয় আছে এ নাটকে। তা ছাড়া Kj¨b Kjme©¯-ই মঞ্চস্থ হওয়া

---

[১৯] সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইমের মতে, æIn every society there are social groups whose special task is to provide an interpretation of the world for the society. We call these the intelligentsia", উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

[২০] গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৯

[২১] পূর্বোক্ত, পৃ, ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম (১৮৫৭) মৌলিক বাংলা নাটক।[২২] এ প্রথায় কুলীন পাত্ররা তাদের প্রতিটি বিয়ের জন্য কন্যাপক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে পণ নিতেন। অবশ্য বিয়ের ক্রমিক অনুযায়ী পণের অংক ধীরে ধীরে কমে যেত। বিয়ে করাটা এ ধরনের মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে উঠেছিল। পণ সংগ্রহ করার পর স্ত্রীর সঙ্গে তাদের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকতো না; এমনকি সব স্ত্রীকে তাঁরা চিনতেও পারতেন না। কোন কোন কুলীন পাত্র ৫০টি, ৬২টি এমনকি দু'শতাধিক বিয়েও করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে ইয়ং বেঙ্গলদের পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২৩টি গ্রামের ২৭ জন কুলীন ৮টি থেকে ৬২টি পর্যন্ত বিয়ে করেছিলেন।[২৩] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) রচিত eûlŒeevn গ্রন্থে হুগলী জেলার এ রকম যে দীর্ঘ তালিকা আছে তাতে প্রথম তিনজনের বিয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৮০, ৭২ এবং ৬২।[২৪] রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কুলীনের কথা বলেছিলেন যিনি ১৮০টি বিয়ে করেছিলেন।[২৫] এরকম অযৌক্তিক সংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন মানুষ মাত্রই যে সোচ্চার হবেন তা বলাই বাহুল্য। রংপুরের কুড়িগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র চতুর্ধুরীন (চৌধুরী) সাময়িকপত্রে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট নাটক রচনাকারীর জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের Kjxb Kjmeÿ¯ মূলত সে উদ্দেশ্যেই রচিত হয় এবং নাট্যকারও যথারীতি লাভ করেন উক্ত পুরস্কার।[২৬] পুরস্কৃত নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কলকাতা ও অন্যান্য শহরে মঞ্চস্থ হয় বহুবার। শুধু তাই নয়, এ নাটক রচিত হওয়ার ছয় বছরের মধ্যে তিনবার এবং ১৮৮৬ সালের মধ্যে মোট ছয়বার[২৭] মুদ্রিত হয়। এর কাহিনীতে আছে : এক কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৬ ও ৮ বছরের – চার কন্যাকে পাত্রস্থ কতে না পারায় সমাজে বদনামের ভাগী হয়ে পড়েন। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তিনি নিযুক্ত করেন দু'জন ঘটক। এদেরই একজন পাত্রের সন্ধান নিয়ে আসলে তিনি সেদিনই চার কন্যাকে উক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার আয়োজন করেন। এ সংবাদ কন্যাদের জানানো হলে তাদের প্রতিক্রিয়া হয় বিভিন্নরকম। বড় মেয়ে বলে যে, এখন তার যমের সঙ্গে দেখা হলেই ভাল হয়। দ্বিতীয়া কুলীনের মেয়ের বিয়ে হওয়া নিয়েই সংশয় প্রকাশ করে। একমাত্র ষোড়শী বিয়ের খবরে আনন্দিত হয়ে বলে, "বর যেমনই হোক, বিবাহ হইলেই হইল।" আর চতুর্থ কিশোরী তো বিয়ে ব্যাপারই বোঝে না। সে তার মাকে প্রশ্ন করে, "বে আবার কি? ওটা কি খাবার জিনিস?" শেষ পর্যন্ত বর আসলে দেখা যায় বরের বয়স ষাট, দেখতে কুৎসিত, অন্ধ এবং বধিরও বটে। কন্যারা এ বিয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েও পিছিয়ে যায়; কারণ

[২২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

[২৩] উদ্ধৃত; গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

[২৪] বিদ্যাসাগর রচনাবলী (২য় খণ্ড), কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৮৭৩-৭৮

[২৫] K.M. Benerji, 'The Kulin Brahmins of Bengal' থেকে উদ্ধৃত; গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

[২৬] শ্রীসুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), কলকাতা ১৩৬৯ পৃ. ৪০৯

[২৭] হারানো দিনের নাটক (সম্পা: পিনাকেশ সরকার), কলকাতা, ১৯৯৯, ভূমিকাংশ, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

তাতে কোন ফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কুলপালক এ রকম কুলীন বরের কাছেই চার মেয়েকে সম্প্রদান করে তাঁর কুল রক্ষা করেন। ঘটক অনৃতাচার্য তার পাওনা আদায় করে নেন দ্রুত।

সমসাময়িক একটি বাস্তব সমস্যা নিয়ে রচিত হওয়ায় এবং প্রধানত নারী চরিত্রের যথাযথ চিত্রায়নের ফলে এ নাটক দর্শক ও পাঠকের মধ্যে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। যেমন এ প্রথার জন্যে বহুবিবাহ করার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময় আদৌ দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হয় না; এর ফলস্বরূপ সমাজে যে অনাচার হয় তার পরিচয় আছে নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। এখানে বিবাহবণিকের সঙ্গে তার এক ছেলে অধর্মরুচির হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। অধর্মরুচি বেশ সংকোচের সঙ্গে বলে যে, নকুলপুরে সে একটি বিয়ে করে তিন বছর সেখানে যায় নি, অথচ সেখানে মেয়ের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে সে যাচ্ছে। এ কথা শুনে বিবাহবাণিক উচ্চহাস্যে জানায় :

> বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি?[২৮]

এ সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার তথাকথিত কুলীন সন্তানদের জন্ম সংক্রান্ত যে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে উক্ত প্রথার প্রতি তাঁর ঘৃণার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। কৌলীন্যপ্রথা বিষয়ে অন্যান্য নাট্যকারও প্রচুর নাটক রচনা করেন: যেমন, অজ্ঞাতনামা রচিত ejøvjx LvZ (১৮৬৭), অম্বিকাচরণ বসুর Kjxb Kvq¯ bvUK (১৮৬১), রামনারায়ণ তর্করত্নের bebvUK (১৮৬৬), Dfq m¼U; দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩৬-১৮৮০) we‡q cvMjv e‡ov (১৮৬৬), RvgvB ewiK (১৮৭২), তারাপদ চূড়ামণির mcZx bvUK (১৮৫৮), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের PcjwPËPvcj¨ (১৮৫৭) ইত্যাদি।

কৌলীন্যপ্রথার কারণে বহুবিবাহ, অসমবিবাহ সমাজে অপর একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছিল; তা হলো বহু নারীর অকালবৈধব্য। এ সব সংস্কারের কারণে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তার বহু সংখ্যক স্ত্রীর বৈধব্যদশা শুরু হতো। স্ত্রীদের মধ্যে বালিকা থেকে কিশোরী, তরুণীসহ বিভিন্ন বয়সের নারী থাকতো। সংস্কারমতে বিধবাদের কঠোর জীবনাচার মেনে চলতে হয়, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সে সব বিধান মেনে চলা অনেকখানি অসম্ভব বটে। আবার বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন না থাকার ফলেও বিভিন্ন অনাচার ও দুঃখজনক ঘটনার জন্ম হচ্ছিল। এ সব বিষয় নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই শিক্ষিত বাঙালিরা বিভিন্নভাবে আলোচনা করছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি এ বিষয়ে একাধিক রচনায় বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেন। অবশ্য, সে

[২৮] কুলীনকুলeÿ¯, হারানো দিনের নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

সময় এ মতের বিরুদ্ধেও কিছু গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচিত হতে থাকে। বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় তৎকালীন সরকার ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়ে আইন প্রণয়ন করেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ে নাটক রচনারও সূত্রপাত হয় সে বছরেই। উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত weaev-weevn (১৮৫৬) এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ও উল্লেখযোগ্য নাটক। এ নাটকে একটি বিধবা চরিত্রের মাধ্যমে রক্তমাংসের দেহের মানবিক অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং সে সূত্রে তার গভীর দুঃখময় পরিণতি দেখিয়ে নাট্যকার বেদনাদায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। নাটকে রক্ষণশীল ব্যক্তি কীর্তিমান ঘোষের কন্যা বালবিধবা সুলোচনা প্রাণস্ফূর্তিতে ভরপুর এক যুবতী। কম বয়সে বিধবা হওয়ার কারণে সে বিধবার আচার-আচরণ সম্পর্কে মোটেই শ্রদ্ধাশীল নয়। এ বিষয়ে বিদ্রূপ করতেও সে নিঃসংকোচ। যেমন সে বলেঃ "না, আমরা মানুষ নই, যে দিন বিধবা হয়েছি সেই দিন মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাট্টে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয়?"[২৯] এদিকে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহের আইন হলেও কীর্তিরাম এর ঘোর বিরোধী। গ্রামের অপর বিধবা প্রসন্নর বিয়ে হয়, কিন্তু সুলোচনার বিয়ের ব্যাপারে কীর্তিরামের কোন চেষ্টা নেই। এ অবস্থায় গ্রামের এক সুদর্শন যুবক মন্মথের সঙ্গে সুলোচনার প্রেমের সম্পর্ক হয় এবং এক পর্যায়ে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে অবশেষে সুলোচনা আত্মহত্যা করে সবাইকে যেন বিপদ থেকে উদ্ধার করে। বস্তুত, এভাবে সুলোচনার মতো উচ্ছল প্রাণশক্তির এক যুবতীর চরম সামাজিক অবমাননা ও অকালমৃত্যু নাটকের সমাপ্তিতে সঞ্চার করে এক করুণ আবহ। বিধবাদের মানবিক সমস্যা বিষয়ে সচেতন এবং সহৃদয় যে কোন দর্শক কিংবা পাঠক সুলোচনার এই মর্মান্তিক বেদনাজাত মৃত্যুতে ব্যথিত হবেন। জানা যায়, স্বয়ং বিদ্যাসাগরও এ নাটকের অভিনয় দেখে অশ্রু সংবরণ করতে সক্ষম হন নি।[৩০] উল্লেখ্য, নাটকে বিদ্যাসাগর সূচিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত উপস্থাপন করে বিধবা-বিবাহের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত হয়। যেমন, তৃতীয় অঙ্কে বাচস্পতির সঙ্গে রামদেব তর্কালঙ্কার এবং হরিহর ভট্টাচার্যের বিতর্কে বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের বহু উদ্ধৃতি ও যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আবার প্রথম অঙ্কে কীর্তিরামের বন্ধু শ্যামাচরণের সংলাপে দেওয়া হয়েছে বাস্তব সামাজিক যুক্তি। যেমন,

> কীর্তিরাম।... বিধবার বিবাহ লয়ে সর্বত্রেই মহা গোলযোগ হতেছে... সাগরস্বরূপ হিন্দুশাস্ত্র হতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কি বিধি বাহির করেছেন তা বলতে পারি না, একেবারে সকলে নেচে উঠেছে–আর কোন কথা নাই, ঘরে ঘরে কেবল ঐ কথাই শুনতে পাই।

---

[২৯] বিধবা বিবাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
[৩০] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাচরণ।... এ কথা সঙ্গত হল না বিধবাবিবাহ লজ্জাকর বলতেছেন, কিন্তু তাহারা পতি বিহনে যে সকল কর্ম করে তাহা কি লজ্জাকর নয়, বিবাহটাই লজ্জাকর বিষয় হল?

কীর্তিরাম। ওহে ভাই লুকয়ে চুরয়ে কোথায় কে কি করে সে সমুদয় দেখতে গেলে কি কর্ম চলে? প্রকাশ্যেই সমুদয় দোষ, গোপনে কে না কি করে, কার ঘরে কি না আছে? অতএব সে কথা ছেড়ে দেও।

শ্যামাচরণ। তবে আপনার কি এই অভিপ্রায় যে গোপনে ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি হওয়া ভাল, কিন্তু প্রকাশ্যে শাস্ত্রসম্মত দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়া ভাল নয়।

কীর্তিরাম। দূর হউক, ও কথায় আর কাজ নাই।...শুনতে পাই ব্যবস্থাপক সমাজে নাকি বিধবা বিবাহের আইন হতেছে – রাজা বলপূর্বক যে কোন কর্ম হউক অনায়াসে করতে পারেন, অতএব হিন্দুধর্ম যে এককালীন লোপ হবে তার আর সন্দেহ নাই।

শ্যামাচরণ। মহাশয়! আপনার নিতান্ত ভ্রম হয়েছে। ব্যবস্থাপক সমাজে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় যে আইনের কথা উল্লেখ করলেন, সে আইনের মর্মই আপনি অবগত হন নাই। ঐ আইনের স্থূল মর্ম এই যে, যদি কেহ বিধবা স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করে, তবে সেই পরিণয় দ্বারা উৎপাদিত যে সন্তান তিনি প্রথম বিবাহের সন্তানের ন্যায় পিতার ধনাধিকারী হবেন। এক্ষণে এই আইনে কাহার কি আপত্তি হইতে পারে? রাজা বলপূর্বক কাহারও বিবাহ দিতেছেন না, তবে যিনি ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করবেন, তাঁহার জন্যই এই নিয়ম হতেছে।[৩১]

উল্লিখিত সংলাপসমূহে বিধবা বিষয়ক সামাজিক সমস্যা, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, আইন প্রণয়ন এবং সে সময় এ ধরনের বিবাহ প্রচলিত হওয়ার মত যে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। নাটকটির কয়েকবার মঞ্চায়ন এবং এক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় মুদ্রণ সে কালের সমাজে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়। সমালোচকের ভাষায়:

যে কালে শিক্ষার বিকাশ সামান্যই ঘটেছিল, সেইকালে একটি নাটকের চতুর্থ সংস্করণ [১৮৭৮-এর মধ্যে] প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাকে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হয় এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে পাঠকসমাজের সচেতনতাও এ থেকে প্রমাণিত হয়।[৩২]

এ ছাড়া উক্ত ÌeaeÌeevn নাটকের সাফল্যে সে সময় একই বিষয়ে প্রচুর নাটক রচিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি হলো – উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের Ìea‡ev0vn নাটক (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্রের Ìeaev

[৩১] কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, হারানো দিনের নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১-১৯২
[৩২] গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

g‡bviÄb (১৮৫৬), বিহারীলাল নন্দীর weaev cwiY‡qvrme (১৮৫৭), নারায়ণ চট্টরাজের Kwj‡KšZK bvUK (১৮৫৮), হরিশ্চন্দ্র মিত্রের g¨vI ai‡e †K? (১৮৬২), যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের weaev wejvm bvUK (১৮৬৪) ইত্যাদি।

উনিশ শতকের মধ্য পর্যায়ে বাংলায় সমাজ সংস্কারের অপর বিষয় ছিল স্থিতিশীল ও শোভন সমাজের জন্য আন্দোলন। এর প্রধান কারণ ছিল তৎকালীন 'বাবু' সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা। নব্য জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিরা এ সময় ইংরেজের অনুকরণ এবং বিলাসী জীবন যাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার নৈতিক স্খলনের শিকার হন। মদ্যপান, পতিতাগমন, রক্ষিতা ও বাঈজি পোষণসহ আরো বহুবিধ উপসর্গে এই শ্রেণি ছিল নিমজ্জিত । বেশ কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তরুণদের মধ্যেও এ প্রভাব ছড়িয়ে পড়লে এর বিরুদ্ধে সচেতনতার উন্মেষ ঘটে। অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারিচরণ সরকার, বিদ্যাসাগরসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সময় পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা এবং সংগঠন তৈরি করে বিশেষভাবে মদ্যপান বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৬৭ সালের একটি হিসেবে দেখা যায় সে বছর ফ্রান্স থেকে ভারতে কেবল শ্যাম্পেন রপ্তানি হয় ৫০ লক্ষ বোতল; যেখানে ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং রাশিয়ায় রপ্তানি হয়েছিল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ, ২৫ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ বোতল।[৩৩] উদ্বেগের বিষয় ছিল তৎকালীন তরুণ সমাজ মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পিতা-মাতা-স্ত্রীসহ অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, তাঁদের ওপর অত্যাচার, এমনকি হত্যা করার মত ঘটনাও ঘটিয়েছিল। স্বভাবতই সমাজে মদ্যপান বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার হলে নাট্যকাররাও এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। যেমন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) G‡KB wK †j mf¨Zv? (১৮৬০), মহেশচন্দ্র দাস-এর †bkvLwi wK SKgwi (১৮৬৩), দীনবন্ধু মিত্রের maevi GKv'kx (১৮৬৬), নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের evimYx wejvm (১৮৬৭), জ্ঞানধন বিদ্যালংকারের mav bv Mij (১৮৭০) ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে G‡KB wK e‡j mf¨Zv ও maevi GKv'kx বিপুল জনপ্রিয়তা পায় এবং বাংলা সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য প্রহসন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

G‡KB wK e‡j mf¨Zvi কাহিনীতে নববাবু নামের এক যুবকের কথা আছে। তার পিতা কর্তা মশাই পরম বৈষ্ণব, বেশির ভাগ সময় বাস করেন বৃন্দাবনে। তিনি পুত্রের সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। একবার বৃন্দাবন থেকে এসে তিনি বাড়িতে অবস্থান করায় নববাবুর মদ্যপান আর বারবণিতাসঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় নববাবুর বন্ধু কালী সেই বৈষ্ণব পিতার অনুমতি নিয়ে নববাবুকে নিয়ে যায় তাদের জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়। কর্তাবাবুর কিছু সন্দেহ হওয়ায় তিনি এক বৈরাগীকে নববাবুর সন্ধান করতে পাঠান। বৈরাগী দেখে যে সেখানে চলে কেবল নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ

[৩৩] 'হিতসাধক' (চৈত্র ১২৭৪) পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত; গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এবং বারবণিতাদের সঙ্গভোগ। নববাবু বৈরাগীকে দেখতে পেয়ে উৎকোচ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে। কিন্তু সভাশেষে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে উৎকট আচরণে নিজেই সবকিছু বুঝিয়ে দেয় কর্তাকে। শুধু তাই নয়, সে তার পিতাকেও 'মদ্ ল্যাও' বলে হুকুম করে। ক্ষুব্ধ, অপমানিত ও মর্মে পীড়িত হয়ে কর্তাবাবু পরদিনই সবাইকে নিয়ে চলে যান বৃন্দাবনে।

ক্ষুদ্রাকৃতির এ প্রহসনে মাইকেলের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ইংরেজি শিক্ষিত নব্য তরুণ সমাজ ; সমালোচকদের মতে ডিরোজিওর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী।[৩৪] প্রহসনটিতে নববাবু, কালীনাথসহ 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভার সদস্যদের যেসব বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো উক্ত গোষ্ঠী এবং তৎকালীন নব্যশিক্ষিত ও ধনী হওয়া বাঙালির ক্ষেত্রে অনেকখানি সত্য ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, "ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তদসমুদয়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"[৩৫] এ ছাড়া 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভার সঙ্গে ডিরোজিওর ছাত্রদের পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা এবং 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (Academic Association)-এর নামগত ঐক্যও দুর্লক্ষ নয়। বিশেষত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন (অবশ্য তখন ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না) বিধায় এর কিছু বিষয় তিনি জানতেন বলে ধারণা করা যায়। যেমন হিন্দু সংস্কারে নিষিদ্ধ, এমন খাদ্য গ্রহণ এবং তা উচ্চস্বরে অন্যদের মধ্যে প্রচার করা ইত্যাদি। এ রকম কিছু বাড়াবাড়ি ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা এক সময় অতি-উৎসাহের বশে করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩৬] কিন্তু তাদের সভায় বারবণিতার প্রবেশ, মদ্যপান কিংবা হৈ হট্টগোল সংক্রান্ত বিষয় ছিল তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুদের মিথ্যা প্রচারণা। প্রকৃতপক্ষে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে' যে আলোচনা হতো সে গুলো ছিল একাধারে গভীর, সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আর সেখানে যোগদান করতে আসতেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, বিশপ্স কলেজের অধ্যক্ষ, কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিশিষ্ট শিক্ষক ডেভিড হেয়ার, মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ।[৩৭] সভায় আলোচনার বিষয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেকজান্ডার ডাফ এর সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে –

> The sentiments delivered were fortified by oral quotations from English authors. If the subject was historical, Robertson and Gibbon were appealed to;

---

[৩৪] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬-২৫০

[৩৫] উদ্ধৃত; আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯

[৩৬] এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ডিরোজিওকে অন্যায় অভিযোগে হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করার চার মাস পর। ঐদিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার বিষয়ক আলোচনার এক পর্যায়ে উত্তেজিত ছাত্ররা দোকান থেকে গোমাংস নিয়ে এসে সেখানেই খায় এবং চীৎকার করতে করতে পাশের ব্রাহ্মণ বাড়িতে হাড়গুলো নিক্ষেপ করে। বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

[৩৭] বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

> if political, Adam Smith and Jeremy Bentham; if secience, Newton and Davy; if religious, Hume and Thomas Paine; if metaphysical, Lock and Reid, Stwert and Brown. The whole was frequently interspersed and enlivened by passage cited from some of our most popular English poets, particularly Byron and Sir Walter Scott.[38]

সে আলোচনা এত উন্নত ছিল যে, সভাটিকে তরুণ ছাত্রদের সভা বলে মনে হতো না। শুধু তাই নয়, উপস্থিত জ্ঞানী প্রবীণরাও তাতে উৎসাহিত হয়ে সাড়া দিতেন। আর ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে মদ্যপান করার রীতি থাকলেও তারা মোটেই মাতাল হওয়ার জন্যে তা করতেন না। এ বিষয়ে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত সংস্কার ত্যাগ করার প্রচেষ্টা। গোলাম মুরশিদ রাজনারায়ণ বসুর সূত্রে জানাচ্ছেন:

> ... নব্যশিক্ষিত যুবকগণ প্রধানত ইংরেজি আচার-ব্যবহারের অনুকরণেই মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁরা মনে করতেন মদ্যপান ও খানা খাওয়া (অর্থাৎ মুসলমানী কিংবা বিলাতী রীতিতে খাওয়া) সুসংস্কৃত মনের পরিচায়ক। তাঁদের মতে 'এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয় লাভ করা।' ...মদ্যপান করলেও এঁরা মাতলামি করাকে ঘৃণা করতেন। তা ছাড়া এঁরা আদৌ বেশ্যাসক্ত ছিলেন না।[৩৯]

বস্তুত এসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল প্রধানত উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে কলকাতার 'বাবু' তথা নব্য ধনিক শ্রেণির মধ্যে। বাবুদের মদ্যপানের সঙ্গে লাম্পট্য এবং রক্ষিতাপোষণ বা পতিতাপল্লী যাওয়া ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ,স্নানযাত্রা, নৌবিহার ইত্যাদি উপলক্ষ্যে নেশা করা থেকে শুরু করে বাঈজির খেমটা নৃত্য দেখা ও বেশ্যাগমন নিয়মিত ঘটত। অপর দিকে তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতাও এক সময় নিয়মিত সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করতেন।[৪০] কিন্তু উক্ত প্রহসনে এসব নব্য 'বাবু'দের পরিবর্তে মাইকেল কেবল 'ইয়ং বেঙ্গল'দের দিকেই নির্দেশ করেছেন তাঁর অভিযোগের আঙুল। এদিক থেকে মনে হয়, 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রথাবিরোধী কর্মকাণ্ডে বিরক্ত ও ভীত তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুরা ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কে যে সব আজগুবি অভিযোগ এনেছিল, মধুসূদন তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এর কয়েকটি অভিযোগ উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু কলেজের সহ সভাপতি এইচ এইচ উইলসন ডিরোজিওকে এই তিনটি অভিযোগ প্রশ্নাকারে জানিয়েছিলেন।

এক. আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?

---

[৩৮] বিদ্রোহী ডিরোজিও, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪
[৩৯] গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪১
[৪০] অজিত কুমার চক্রবর্তীর সূত্রে গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আপনি কি মনে করেন যে, পিতামাতার আদেশ পালন করা অথবা তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়?

তিন. আপনার মতে ভাইবোনের বিবাহ কি সামাজিক অপরাধ নয়?

ডিরোজিও এ সবের (তৃতীয়টি ছাড়া) যৌক্তিক এবং যথাযথ উত্তর করেছিলেন। কেবল তৃতীয় প্রশ্নে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে 'গুজব রটনাকারীদের' উদ্দেশে লিখেছিলেন, æI am not a greater monster than most people।"[৪১] সে সঙ্গে বৃন্দাবন ঘোষাল নামের এক ব্রাহ্মণকে গুজব রটনাকারী হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, তাঁর কাজ ছিল আজগুবি খবর সংগ্রহ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পরিবেশন করা।[৪২] উল্লিখিত প্রহসনের শেষ গর্ভাঙ্কে নব এবং তার বোন সম্পর্কে নব-র স্ত্রীকে যে সব রসিকতা করেছে সে সব উক্ত 'গুজব' আশ্রয়ে রচিত বলে ধারণা জন্মে। এসব গুজব নিয়েই তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের দল 'ইয়ং বেঙ্গল'দের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলেন প্রবল প্রচারণা। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ivg‡gvnb I ZrKvjxb mgvR I mvwnZ¨ গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রিল ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এই প্রতিক্রিয়াপন্থী ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুনেতাদের প্ররোচনায়।"[৪৩] ধারণা করা যায়, ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পর প্রহসন রচনা করতে গিয়ে মাইকেল এ সবের সত্যাসত্য যাচাই করতে পারেন নি বলে তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে সেই 'প্রতিক্রিয়াপন্থী'দেরই মনোভাব। এতে তাঁর সত্যিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ তো হলোই না, বরং সে নতুন যুগের বাণী বাহকেরা বহু বৎসর পর প্রায় বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় আক্রান্ত হন এবং এর মাধ্যমে মূলত সেই প্রাচীনপন্থীদেরই শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। অথচ ডিরোজিওর মৃত্যুর (১৮৩১ সালের ২৩ ডিসেম্বর) কিছুদিন পরই তাঁর ছাত্রদের পত্রিকা The Enquirer-এ 'গো-হাড়' নিক্ষেপের ঘটনাটিকে অন্যায় এবং এ জন্যে ভুল স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতেও প্রতিক্রিয়াশীলপন্থী 'ধর্মসভা'র আক্রমণ থেমে যায়নি। আর এ আক্রমণ থেকে যে মাইকেল নিজেও রক্ষা পাননি তা তাঁর জীবন এবং কাব্যদৃষ্টির সঙ্গে প্রহসনটির বক্তব্যের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। হয়তো সে কারণেই এ প্রহসন লেখার জন্য মাইকেল পরবর্তী সময় আক্ষেপ করেছিলেন।[৪৪]

---

[৪১] বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

[৪২] শিবনাথ শাস্ত্রীও এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন, "সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য নয়। ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।" শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

[৪৩] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ivg‡gvnb I ZrKvjxb mgvR I mvwnZ¨, কলকাতা, ১৯৬৫ পৃ. ৪৪৪

[৪৪] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

G‡KB wK e‡j mf¨Zv-র বক্তব্য যাই হোক না কেন, ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র সৃষ্টি এবং বাস্তব সংলাপ প্রয়োগে প্রহসনটি দর্শকপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়। এই সাফল্য অন্যান্য নাট্যকারকেও উক্ত বিষয়ে নাট্য রচনায় উৎসাহিত করে। সেদিক থেকে এ বিষয়ে সেরা নাটক দীনবন্ধু মিত্রের maevi GKv‘kx। এ নাটকে একজন মদ্যপ যুবক অটল এবং তার বন্ধুদের দেখা যায়, যারা একই সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অটল রক্ষিতা কাঞ্চনকে বাগানবাড়িতে রাখে আর বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপানে ব্যস্ত থাকে। অটলের এক উচ্চশিক্ষিত বন্ধু নিমচাঁদের সরস পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংলাপ এবং অপরাপর বন্ধু ভোলা, রামমাণিক্য, কেনারামের মদ্যপান সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনায় জমে ওঠে প্রহসনের কৌতুক আবহ। এদের মধ্যে নিমচাঁদ অনেকখানি ব্যতিক্রম। সে মদ্যপ হলেও লম্পট নয় বরং তার বুদ্ধিদীপ্ত সরস সংলাপের পেছনে তার দাম্পত্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতাজনিত হতাশাই প্রধান হয়ে ওঠে। শেষ দৃশ্যে অটলের পিতৃব্যের হাতে প্রহৃত হওয়ার সময়ও তার নিরাসক্ত কৌতুকাবহ সংলাপ দর্শক-পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম। এসব কারণে নিমচাঁদ হয়ে ওঠে এ প্রহসনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সুকুমার সেন-এর বিবেচনায় 'শুধু নিমচাঁদ ভূমিকার জন্যই সধবার একাদশীর মূল্য কখনও অস্বীকৃত হইবে না।'[৪৫] উল্লেখ্য যে, অনেক সমালোচক নিমচাঁদ চরিত্রের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন:

> মধুসূদন জীবনের শেষভাগে মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির নিকট যে রকম খেদোক্তি করিতেন নিমচাঁদও মাঝে মাঝে তাহাই করিয়াছে। এইসব সাদৃশ্যবশত নিমচাঁদের উপর মধুসূদনের সম্ভাব্য প্রভাব একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।[৪৬]

এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের কনিষ্ঠ সুহৃদ বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য নিম্নরূপ :

> দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন।... সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন।... নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলানাথ প্রভৃতি বন্যজন্তুর এইরূপ উৎপত্তি।[৪৭]

এদিক থেকে ধারণা করা চলে যে, দীনবন্ধু কিছুদিন হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকলেও বত্রিশ বছর পর (প্রহসনটির রচনাকাল ১৮৬৩)[৪৮] সরাসরি ডিরেজিওর ছাত্রদের পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সে ক্ষেত্রে কিছুটা জ্যেষ্ঠ ইংরেজিনবিশ মাইকেল মধুসূদনকে অবলম্বন করে তার ওপর কল্পনার রঙ চড়ানো ছিল

---

[৪৫] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৮৭

[৪৬] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬

[৪৭] 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা', বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্যসমগ্র), কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩২

[৪৮] 'maevi GKv‘kxÕর রচনাকাল bexb Zcw¯bx (১৮৬৩)-র পরেই'; অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটা সহজ। তবে এ প্রহসনের মাধ্যমে তৎকালীন ইংরেজিশিক্ষিত মদ্যপ যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রকাশ্য অনাচারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদনে দীনবন্ধু মিত্র অনেকখানি সার্থক হয়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে সময় প্রতিষ্ঠিত 'সুরাপান-নিবারণী সভা'র সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারের বক্তব্যে। maevi GKv'kx প্রকাশের পর তিনি দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, "আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।"[৪৯] তাই দীনবন্ধু মিত্রের maevi GKv'kx নাটক যে তৎকালীন সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তা অনায়াসে স্বীকার করা যায়।

সুরাসক্তির পাশাপাশি লাম্পট্যও ছিল তৎকালীন 'বাবু' সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রক্ষিতা কিংবা বারাঙ্গনা পোষণের যে চিত্র maevi GKv'kxতে রয়েছে তা ছিল কলকাতা শহরের সাধারণ চিত্র। অক্ষয় কুমার দত্তের তৎকালীন কলকাতা সম্পর্কিত একটি লেখা থেকে জানা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পিতার রক্ষিতার কাছে যাওয়ার অনুমতিও পুত্রের ছিল।[৫০] কলকাতার বাইরে মফস্বল শহর কিংবা গ্রামেও ক্ষমতাশালীদের লাম্পট্য এবং পরস্ত্রীতে আসক্তি কমবেশি ছিল। কখনো কখনো এসব অনাচার ও ব্যভিচার যৌন শোষণের পর্যায়েও যেতো বলে ধারণা জন্মে। মাইকেল মধুসূদনের অপর প্রহসন eo mwj‡Ki Nv‡o †iv (১৮৬০)-তে এ রকম একটি লম্পট চরিত্রের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকে এ চরিত্রের নাম জমিদার ভক্তপ্রসাদ। তিনি একাধারে বৃদ্ধ এবং ধার্মিক হিসেবে পরিচিত। হানিফ গাজি নামে তাঁর এক মুসলমান রায়ত অজন্মার কারণে পুরো খাজনা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। ভক্তপ্রসাদ প্রথমে অস্বীকৃত হলেও হানিফের সুন্দরী স্ত্রী-র কথা জানতে পেরে তাতে সম্মত হয়। কয়েকদিন পরে পুঁটি নামের দূতীর মাধ্যমে ভক্তপ্রসাদ অবৈধ প্রস্তাব পাঠান হানিফের স্ত্রী ফতেমার কাছে। ফতেমা বিষয়টি হানিফকে জানিয়ে দিলে সে ক্রোধে ফুঁসে ওঠে। গ্রামের পুরোহিত বাচস্পতির বিশ বিঘা জমিও জমিদার ভক্তপ্রসাদ ইতঃপূর্বে আত্মসাৎ করেছিল। জমিদার ভক্তপ্রসাদের কুমতলবের কথা হানিফ গাজি বাচস্পতিকে জানায় এবং তারা উভয়ে ভক্তপ্রসাদকে জব্দ করার জন্য ফাঁদ পাতে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক রাতে হানিফের স্ত্রী একটি পুরনো শিবমন্দিরে গেলে সেখানে ভক্তপ্রসাদও উপস্থিত হন। ফতেমাকে ভক্তপ্রসাদ প্রণয় নিবেদন করার এক পর্যায়ে হানিফ কাপড়ে মুখ ঢেকে এসে ভক্তপ্রসাদ, তাঁর চাকর গদা ও দূতী পুঁটিকে যথেচ্ছ প্রহার করে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। এর পরপরই সেখানে পুরোহিত এসে পড়লে ভক্তপ্রসাদের লজ্জার সীমা থাকে না। তিনি পুরোহিতকে এ ঘটনা চেপে যেতে অনুরোধ করে সেই জমি ফিরিয়ে দেওয়াসহ আরও পঞ্চাশ টাকা মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য প্রদানের অঙ্গীকার করেন।এবারে স্বাভাবিক বেশে হানিফও

---

[৪৯] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

[৫০] উদ্ধৃত; গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে উপস্থিত হলে ভক্তপ্রসাদ সবই বুঝতে পারেন; কিন্তু তখন তাঁর কিছু করার নেই। অবশেষে হানিফকেও দুই শত টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে ভক্তপ্রসাদ বলেন, "আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার কখন না ঘটে।"[৫১] এভাবে ধনে-মানে লাঞ্ছিত হয়ে জমিদার ভক্তপ্রসাদ তার অধীন পুরোহিত ও রায়ত হানিফের কাছ থেকে লাভ করেন উপযুক্ত শিক্ষা।

সমাজ সংস্কারের নাট্য-ধারায় রচিত হলেও 'eo mwj‡Ki Nv‡o †iv uaevi GKv'kx প্রহসনটি উক্ত ধারার বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে যায়। বস্তুত এ রচনায় সে যুগের একটি সামাজিক অনাচারকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে মধুসূদন মানব চরিত্রের এক চিরন্তন দুর্বলতার বিষয় তুলে ধরেছেন। নৈতিক চরিত্রের এ ধরনের শিথিলতা প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানেও সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় এবং সে সব কখনো কখনো হয়ে ওঠে মুখরোচক আলোচ্য বিষয়। যেমন, মধুসূদনের একজন জীবনী লেখকের সূত্রে সমালোচক প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা জানিয়েছেন, ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের বাস্তবতা মধুসূদন তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই সৃষ্টি করেছিলেন।[৫২] তা ছাড়া এ নাটকে লম্পট, কৃপণ ও প্রজাপীড়ক জমিদারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রজাদের প্রতিরোধের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এর মূল্যও কম নয়। সেকালের কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও, সম্প্রদায় নির্বিশেষে চিন্তা ও কর্মের মিল ছিল দুর্লভ। সে ক্ষেত্রে এ নাটকে মধুসূদন যে ভাবে হানিফ ও পুরোহিত সমাজপতিকে একযোগে জমিদারের লাম্পট্য প্রতিরোধে শামিল করেছেন তাতে একদিকে তাঁর সমাজ-নিরীক্ষণের বস্তুনিষ্ঠতা এবং একইসঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক শিক্ষার প্রতিফলনও ঘটেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যায়, এ নাটকের সমালোচনায় প্রাচীনপন্থী লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন, জমিদার ভক্তপ্রসাদের মুসলমান নারীতে আসক্তি প্রকাশের বিষয়টি 'অস্বাভাবিক'[৫৩] ও 'অসম্ভব' বলে মধুসূদনের নিন্দা করেছিলেন। অথচ মধুসূদন যে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন তার প্রমাণ নাটকেই আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে এ বিষয়ে গদাধরের সঙ্গে ভক্তপ্রসাদের কথোপকথনে পাওয়া যায়:

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও নষ্ট করবো? [অর্থাৎ ইহকালটা ইতোমধ্যে মাটি হয়েছে]

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

---

[৫১] eo mwj‡Ki Nv‡o †iv, মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২৬৮

[৫২] æMr Yogindranath Basu points out that certain incidents in the play are founded on fact and that the character of Bhaktaprasad is conceived after a very close relative of Madhusudan's own", P. Guhathakarta, The Bengali Dramas- Its Origin and Development, London, 1930. P.85.

[৫৩] অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪; আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ভক্ত । দীনবন্দো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক – তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; – বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? ...[৫৪]

– একইভাবে ভক্তপ্রসাদের ভাইঝি সমতুল্যা পঞ্চী-র দিকেও তার দৃষ্টি একই রকম। ভক্তপ্রসাদকে প্রণাম করার পর পঞ্চীর সংলাপ:

পঞ্চী । ... ও মা। এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্‌।

এর পরে ভক্তপ্রসাদ পঞ্চীর মাকে জিজ্ঞেস করে :

ভক্ত । ... বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাকবে।

ভগী । ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত । (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমরে বধ করেন– আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা।[৫৫]

এভাবে নাট্যকার ভক্তপ্রসাদ চরিত্রটিকে লাম্পট্যের চরম নির্দশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সে কারণেই তাঁকে পরিণত করেছেন জাত-বিজাত কিংবা ধর্মাধর্ম জ্ঞানহীন। একে বাস্তবতার কোন ব্যত্যয় হয়েছে বলে মনে হয় না। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাই এ প্রসঙ্গে বলেন :

> বিগত শতাব্দীর ব্রাহ্মাণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতেন; মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার এই মনোভাবের বিরোধী ছিল বলিয়াই তিনি এখানে নির্বিচারে এই মুসলমান কৃষকনারীর চরিত্রটি আনিয়া যোগ করিয়াছেন।[৫৬]

কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার ধর্মীয় আবহে রামগতি ন্যায়রত্নের মতো সংস্কারপন্থীদের প্রভাবই ছিল বেশি। তাই ধারণা করা যায় যে, এ রকম প্রাচীনপন্থীদের বাধার মুখে বেলগাছিয়া থিয়েটারে প্রহসনটি আর মঞ্চস্থ হয় নি। কারণ, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্চরচন্দ্র সিংহের প্রবল উৎসাহেই মধুসূদন 'ভগ্ন শিবমন্দির' নামে প্রথমে প্রহসনটি রচনা করেছিলেন।[৫৭] এবং পরে এ রচনার অদ্ভুত নামটিও দিয়েছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র।[৫৮] অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে উৎসাহী রাজাভ্রাতৃদ্বয় (অপর ভাই রাজা

[৫৪] মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।
[৫৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮
[৫৬] আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৪
[৫৭] সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
[৫৮] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতাপচন্দ্র সিংহ) বিনা কারণে এ নাটকের অভিনয় যে বন্ধ করেন নি, তা স্পষ্ট। অবশ্য পুস্তকাকারে মধুসূদনের প্রহসন দুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সে কারণে তিন বছরের মধ্যেই সে গুলো দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। কয়েক বছর পরে eo mwj‡Ki Nv‡o †iv নাটকটি ১৮৬৭ এবং ১৮৬৮ সালে অভিনীত হয় কলকাতার কয়েকটি মঞ্চে।[৫৯] তা ছাড়া দীনবন্ধু মিত্রসহ অন্যান্য নাট্যকারও এ নাটকের অনুসরণে একাধিক নাটক রচনা করেন। সংস্কারমূলক ধারার এ সব নাটক রচিত কিংবা মঞ্চস্থ হয়েছিল প্রধানত কোলকাতা কেন্দ্রিকভাবে। ঢাকা, বরিশাল, যশোর এবং অন্যান্য মফস্বল শহরে কোন কোন থিয়েটার কিংবা স্থানীয় সংগঠন সাময়িকভাবে কয়েকটি নাটক মঞ্চায়ন করলেও সেগুলো উল্লেখযোগ্য ধারার সৃষ্টি কওে নি। এর অন্যতম কারণ হলো, দেশের জেলা বা মফস্বল শহরগুলোতে উচ্চ কিংবা মধ্য বিত্ত শ্রেণির বিকাশ পর্যাপ্ত মাত্রায় হয় নি। ইংরেজ সরকার কিংবা দেশীয় ভূমি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এক বিশাল আকারের শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির অবস্থানের ফলে কলকাতায় সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা এবং নাট্য রচনা ও মঞ্চয়ানের ধারা সূচিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, মফস্বলের বেশির ভাগ জমিদারও সে সময় কলকাতায় অবস্থান করে নায়েব গোমস্তা কিংবা বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও পত্তনিদারদের দিয়ে জমিদারি চালাতেন। ফলে কলকাতা শহরে অবস্থানকারী এই সুবিধাভোগী শ্রেণি কর্তৃক সূচিত সমাজ সংস্কারমূলক নাটক যেমন একদিকে মফস্বল ও গ্রামের তথা দেশের বৃহত্তর গণমানুষ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন ছিল, তেমনি এই বিশাল কৃষি ও শ্রমজীবী শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামও ছিল এ সব নাটকে অনুপস্থিত।[৬০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে কৃষকদের অবস্থা দিন দিন করুণ হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার পাওয়ার পর থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল কৃষকদের নিংড়ে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। যেমন ১৭৬৪ সালে যেখানে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৬৫ লক্ষ টাকা সেখানে ১৭৬৮-৬৯ অর্থ বছরে আদায় করা হয় ১,৫২,৫৪,৮৫৬ টাকা। এর এক বছর পর ১৭৭০-৭১ অর্থ বছরে বাংলা ও বিহারে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশের বেশি বা এক কোটিরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। অথচ সে বছরই ইংরেজরা ১,৪০,০৬,০৩০ টাকা রাজস্ব আদায় করে।[৬১] এ পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে কোম্পানি যে ভীষণ হিংস্রতার আশ্রয় নিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি কোম্পানির বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের ব্যবসার নামে নানা লুঠতরাজের শিকারও ছিল এ কৃষকরাই। পরবর্তী সময় – ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা এ দেশে চালু করে চিরস্থায়ী

---

[৫৯] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০-৭২

[৬০] "১৮৭২ সনের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মাত্র ৩ শতাংশ লোক শহরবাসী।" সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস [উনবিংশ শতাব্দী], কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭

[৬১] সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোবস্ত; যাতে জমিদারদের মাধ্যমে তারা নিয়মিতভাবে খাজনা আদায় করতে পারে। এ ব্যবস্থা কৃষকদের আরো বিপর্যস্ত করে দেয়। কারণ এর ফলে দেশে এমন কিছু নতুন জমিদারের আবির্ভাব ঘটে, যাদের সঙ্গে কৃষি এবং কৃষকের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিচারপতি জর্জ ক্যাম্বেলের ভাষায় :

> বড় বড় জমিদাররা, কদাচিৎ দুই একজন ছাড়া, নিজেদের জমিদারীর উন্নতির জন্য একটি কপর্দকও খরচ করেন না। তিনি নিজে চাষ তো করেনই না, চাষের উন্নতির জন্য কোন নতুন উন্নত কলাকৌশলও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন না। ... তিনি শুধু চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য যা কিছু তাঁর নিজের পাওনা তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করেন। যতটা পারেন বেশি করে আদায় করার চেষ্টা করেন।[৬২]

বলা বাহুল্য, খাজনা ও অন্যান্য আদায় তিনি নিজে করতেন না, এর ভার দেওয়া হতো তালুকদার ও পত্তনিদারের কাছে। এ সব পত্তনিদারও ক্রমান্বয়ে দরপত্তনিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার, গাঁতিদার ইত্যাদি (প্রায় ২০ জন) মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে উক্ত দায়িত্ব হস্তান্তর করতো।[৬৩] অর্থাৎ মধ্যস্বত্ব ভোগীর এক বিশাল জনগোষ্ঠীও শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল ছিল কৃষকের উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর। উল্লেখ্য, খাজনা বা রাজস্ব আদায় করেই কৃষককে তারা নিস্তার দিত না, বিভিন্ন পূজা পার্বণ এবং উৎসবের খরচ হিসেবেও আদায় করতো বিভিন্ন উপরি বা 'আবওয়াব'। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৮৪৪ সালে মেদিনীপুর মাজনুমুথা জমিদারিতে মোট একষট্টি প্রকার কর ও 'আবওয়াব' আদায় লক্ষ করা গেছে।[৬৪] শুধু খাজনা ও আবওয়াব নয়, জমিদাররা কৃষক ঠকানোর জন্য বিভিন্ন অপকৌশলেরও আশ্রয় নিত। যেমন, তারা ছোট মাপের নল বা কাঠি ব্যবহার করে জমির মাপ নিয়ে উদ্বৃত্ত জমির জন্য পুনরায় খাজনা আরোপ করত। স্থায়ী রায়ত বা খোদকস্ত কৃষককে উচ্ছেদ করার নিয়ম না থাকলেও জমিদার তাদেরকেও উচ্ছেদ করে নতুন ভূমি বন্দোবস্ত করত উচ্চ হারে। সে সময়ের পত্রিকা থেকে জানা যায়, জমিদাররা বিভিন্ন ছলে বলে-কৌশলে প্রজাদের যেভাবে অত্যাচার করতো, তার হিসেব রাখা ছিল মুশকিল। প্রজাদের যা কিছু সম্পত্তি বা ভোগ্যবস্তু সবই জমিদার তার নিজের বলে মনে করতো। এমন কি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে শুরু করে প্রজাদের দেহ ও দৈহিক পরিশ্রমকেও তারা মনে করতো তাদের কেনা বস্তু। অবাধ্য বা বিদ্রোহী প্রজার শাস্তি বিধান করার জন্যে জমিদাররা ডাকাত, লাঠিয়াল ও গুণ্ডা পুষতো। অবাধ্য প্রজার ওপর প্রয়োগ করা হতো, এ রকম ১৮টি শাস্তির তালিকা পাওয়া যায় সে সময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। এর মধ্যে কারারুদ্ধ করে উপবাসী রাখা, চুনভর্তি ঘরে বন্ধ করে রাখা, 'দণ্ডাঘাত', চর্মপাদুকা প্রহার, 'বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা

[৬২] উদ্ধৃত; বিনয় ঘোষ, বাংলায় সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১।

[৬৩] "কোন কোন অঞ্চলে মধ্যস্বত্ব এত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় যে, জমিদার ও রায়তের মাঝখানে কুড়িজন পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় অর্থাৎ এক জমির কুড়িজন উপস্বত্বভোগী।" সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ. ৬

[৬৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

বক্ষঃস্থলদলন', ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ, পিছনে দুই হাত বেঁধে বাঁশ দিয়ে মোড়া দেওয়া উল্লেখ্যযোগ্য।[৬৫] এ সব অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়ে চাষীরা অভুক্ত কিংবা আধপেটা খেয়ে হলেও জমিদারের খাজনা দিতে বাধ্য হতো। খাজনা শোধ করার জন্য যে সব মহাজন কৃষকদের ঋণ দিত তারাও কৃষককে বন্দী করতো নতুন শোষণের জালে। এ বহুমুখী শোষণে কৃষকরা হয়ে পড়তো দিশেহারা। কয়েকজন ইংরেজ তাঁদের লেখায় তৎকালীন কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। যেমন 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান এডভোকেট'-এর সম্পাদক রেভারেন্ড টি. বোয়াজ ভারতের কৃষকদের 'Probebly the most oppressed people in the world' বলে অভিহিত করেন।[৬৬] তৎকালীন বাংলার ভাইসরয় চার্লস ইলিয়ট কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেছিলেন:

> আমি মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, ব্রিটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার পরিপূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কি সুখ, তাহা ইহারা কখনো জানিতে পারে না।[৬৭]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তৎকালীন কৃষকের উপরিউক্ত অবস্থার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন জমিদার বা ভূস্বামীদের। এ প্রবন্ধে তিনি জমিদার যে সব উপায়ে কৃষকের সর্বনাশ করতো তার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা উদাহরণসহ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।[৬৮]

এ ভাবে জমিদার, ইজারাদার ও মহাজনের শোষণ এবং সেইসঙ্গে ইংরেজদের জোরপূর্বক রাজস্ব আদায়ের পরিণামে দেশে চলতে থাকে একের পর এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। একটি হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের কৃষকরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে চব্বিশ বার। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দুই কোটি আশি লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৬৯] টানা দুর্ভিক্ষ এবং জমিদার মহাজনের অত্যাচারের

---

[৬৫]. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮৫।

[৬৬] স্বপন বসু, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯

[৬৭] উদ্বৃত; সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯

[৬৮] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র); কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৯১-২৯২।

[৬৯] æIt has already been noted that while in the first half of the nineteenth century there were seven famines with estimated total of 1.5 million deaths, in the second half of the nineteenth century there were twenty four with an astimated total of 28.5 million deaths and eighteen of there twenty four famines fall into the last quarter of the nineteenth century. R. Palme Dutt. India To-Day, Calcutta, 1986. p. 308.

Dhaka University Institutional Repository

কবল থেকে বাঁচার জন্য অনেক কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতো। বেশির ভাগই এর প্রতিকার করতে না পেরে মুখ বুঁজে সহ্য করতো সব অত্যাচার। তবে কখনো কখনো বাংলার কৃষকরা সম্মিলিতভাবে এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে; প্রতিবাদ করেছে, প্রতি-আক্রমণ করে জমিদারকে দিয়েছে নানা রকম শাস্তি। যেমন, জমিদারকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করা, গোরু কিংবা শুয়োরের মাংস খেতে বাধ্য করা, এমনকি কখনো কোন অত্যাচারী জমিদারকে হত্যাও করা হয়েছে। The Friend of India পত্রিকা থেকে জানা যায়, ১৮৫১ সালে হুগলি জেলার এক অত্যাচারী জমিদারকে প্রজারা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ১৮৫৫ সালে আরেক জমিদারকে ঘুম থেকে তুলে তার মাথা কেটে নেওয়া হয়।[৭০] এ সব ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও জমিদারদের বিভিন্নমুখী শোষণ থেকে পরিত্রাণের জন্য কখনো কখনো বাংলার কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামও পরিচালনা করেছেন। যেমন চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও যশোর জেলায় তিতুমিরের নেতৃত্বে KlK we‡`vn (১৮৩১-৬৩), ফরিদপুরের দুদু মিয়ার নেতৃত্বে divqRx Av‡›`vjb (১৮৪১-৫৭), সিধু ও কানুর নেতৃত্বে mvIZvj we‡`vn (১৮৫৪-৫৫), bxj we‡`vn (১৮৫৯-৬০), পাবনার ঈশানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরন পাল, ক্ষুদি মোল্লা, রোমজান সরকার ও অন্যান্যদের পরিচালনায় wmivRMÄ KlK we‡`vn (১৮৭৩) ইত্যাদি। এ সব বিদ্রোহের মধ্যে কয়েকটিতে বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সংস্কারচিন্তার প্রাধান্য থাকলেও এতে পাশাপাশি জমিদার মহাজনদের বিশেষ অত্যাচার-পীড়ন-শোষণ কিংবা ব্রিটিশ শাসন বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদানও ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। যেমন, চব্বিশ পরগণায় তিতুমিরের ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে ছিল নিছক মুসলমান ধর্ম সংস্কার। কিন্তু তাতে হিন্দু জমিদাররা অন্যায় হস্তক্ষেপ– যেমন, তিতুমিরের শিষ্যদের দাড়ি রাখার ওপরও খাজনা আরোপ– করলে তারা একসময় আইন হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। ক্রমপরিণতিতে এই শিষ্যরা বাংলার কৃষক সমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি জমিদার, নীলকুঠি এবং মহাজনদেরও আক্রমণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিতুমির তাঁর অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘোষণা করেন এবং নিজেই বিভিন্ন জমিদারের ওপর কর ধার্য করেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তিতুমিরের নেতৃত্বে এ বিদ্রোহ পরিণত হয় অত্যাচারী শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে। শিল্পতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পূর্বে এ ধরনের ধর্মাশ্রয়ী শ্রেণিসংগ্রাম বিভিন্ন দেশে লক্ষ করা যায়। W C Smith তাঁর *Modern Islam in India* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন:

> ... the struggle was a pure class struggle and the communalistic confusion of the issue evaporated. The movement made use of a religious ideology, as class

---

[৭০] স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

> struggles in Pre-industriailstic society have often done, but though religious it was not communalist.[৭১]

এ কারণে তিতুমিরের উল্লিখিত সংগ্রামে মুসলমানদের পাশাপাশি সমর্থন দিয়েছিল হিন্দু সমাজের একাংশ। ফলে প্রায় সমস্ত বাংলায় ছড়িয়ে পড়া এ বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজ সরকারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৭০ সালে কলকাতা হাইকোর্টে উক্ত বিদ্রোহের সমর্থনে একটি মামলা পরিচালনাকালে বিখ্যাত ইংরেজ অ্যাডভোকেট এনেস্টি বহু স্বদেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকের মনগড়া বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেছিলেন যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ মূলত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এ বিদ্রোহ ছিল ভারতের বৈদেশিক শাসন উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে :

> কলিকাতা হাইকোটে এনেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়া যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য যে স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে জ্বলন্ত প্রেরণা যোগাইয়াছিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।[৭২]

একইভাবে ফরিদপুর অঞ্চলে হাজি শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে সূচিত ফরায়েজি আন্দোলনও প্রথম পর্যায়ে ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু পরবর্তী সময় তাঁর ছেলে দুদু মিঞার নেতৃত্বে এ আন্দোলন জমিদারদের অন্যায় সেস্ বা খাজনা আদায় ও নীলকরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে থাকে। ফলে এ আন্দোলন দরিদ্র মুসলমান কৃষকসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং তাঁর অনুসারীর সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চল সাঁওতাল পরগণায়ও এ সময় সরকারি খাজনা বৃদ্ধি ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা শুরু করে আন্দোলন। দেখা গেছে, ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভেঙে সরকার প্রায় দশগুণ খাজনা বৃদ্ধি করেছিল বলে সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়। সেই সঙ্গে যে সব মহাজনের কাছ থেকে তারা ঋণ গ্রহণ করত তারাও সাঁওতালদের শোষণ ও অত্যাচার করত বিভিন্ন অন্যায় প্রক্রিয়ায়। সাঁওতালরা সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে হামলা শুরু করে জমিদার মহাজনদের ওপর। শুধু তাই নয়, তারা শীঘ্রই নিজেদের দেশের রাজা এবং সাহেবদের তাড়াবার ঘোষণা দেয়। বিহারের একাংশ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বিরাট অঞ্চলে বিস্তৃত হয় তাদের প্রাধান্য। এ সব অঞ্চলের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালিরা এ বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানরা সাঁওতালদের সাহায্য করেছিল সক্রিয়ভাবে।

---

[৭১] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
[৭২] সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন বাংলাদেশকেও আলোড়িত করেছিল। ফেব্রুয়ারিতে বহরমপুরের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হাজার হাজার কৃষক এগিয়ে এসেছিল তাঁদের সমর্থনে। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাঁদের সঙ্গে সিপাইদের কার্যকর যোগাযোগ না ঘটায় সে উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ছাড়া শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিরা এ বিদ্রোহে সমর্থন দেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, কলকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সময় ঘটা করে ব্রিটিশ সরকারে প্রতি ভক্তি ও সমর্থন প্রকাশে হয়ে উঠেছিলেন তৎপর।

১৮৬০ সালে নীল চাষীদের বিদ্রোহও সারা বাংলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। নীলকুঠির মালিকরা চাষীদেরকে টাকা ও বীজ দাদন দিয়ে ভালো জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। কিন্তু উৎপাদিত নীলের ন্যায্য দাম তো দিতই না, পুরো দামও কখনো চুকিয়ে দিত না। ফলে কৃষকরা বাধ্য হত বছরের পর বছর জমিতে নীল চাষ করতে। এর মধ্যে চাষের খরচ বেড়ে গেলেও তা পুষিয়ে দেওয়া হত না। চাষীরা এ সবের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা নীল চাষ করতে না চাইলে তাদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হত সশস্ত্র বাহিনী। দরিদ্র কৃষকদের অত্যাচার করা, হত্যা করা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, স্ত্রী কন্যাদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা, কুঠিয়ালদের নিয়মিত ব্যাপার ছিল। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট E W L Tower তদন্ত কমিশনের সামনে বলেছিলেন, “আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কয়েকজন রায়ৎকে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করা হইয়াছে। অন্য কয়েকজনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। আর কয়েজনকে প্রথমে বর্শায় বিদ্ধ করিয়া পরে গুম করা হইয়াছে।”[৭৩] সুপ্রকাশ রায়ের মতে, আফ্রিকার নিষ্ঠুর ইংরেজ দাস ব্যবসায়ীদেরই এ সব নীলকুঠিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। এদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করেও কোন সুফল পাওয়া যেতো না।[৭৪] অগত্যা বাংলাদেশের অসহায় কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেরাই এর প্রতিকারে এগিয়ে এলে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। বারাসত, নদীয়া থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ, পাবনা, যশোর, রাজশাহী ও ঢাকা অঞ্চলের কৃষকরা যোগ দেয় এ বিদ্রোহে। তৎকালীন কলকতার শিক্ষিত সমাজ (নীলকুঠির মালিক গুটিকয় বাঙালি ছাড়া) ও অন্যান্যরা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে এ বিদ্রোহে। কেবল রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরসহ কয়েকজন নীলকরদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। এ সময় এক সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “বিভিন্ন জেলায় আমার কয়েকটি নীল কুঠি আছে, আমি দেখেছি নীলচাষ ও সাহেবদের বসবাসের ফলে দেশ ও জনসাধারণ খুবই উপকৃত হয়েছে।”[৭৫] উল্লেখ্য যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের নীলকরপ্রীতি শুধু মৌখিক বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর ইউনিয়ন ব্যাংকের ৯০% মূলধন নীলকুঠিগুলোতে বিনিয়োগ

---

[৭৩] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

[৭৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

[৭৫] উদ্ধৃত; স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন।[৭৬] কিন্তু কৃষকদের পক্ষে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সমাজ এবং কিছু ইংরেজেরও সমর্থন থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ সফল হয়।

নীল বিদ্রোহের কয়েক বছরের মধ্যে পাবনা জেলার কৃষকরা ঈশান চন্দ্রের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কয়েকজন জমিদার অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি, ভূয়া মাপে নতুন জরিপ, অন্যান্য কর আদায় করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের গ্রাম লুঠ করলে এ বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। বিদ্রোহী কৃষকরা প্রথমে সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসকের কাছে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধের এবং এ প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানায়। পরবর্তী সময় তারা জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদার ও ধনীদের বাড়িতে হামলা করে তাদের পক্ষে আসার আহ্বান জানায়। আহ্বানে সাড়া দিলে তারা সেই ধনী বা জমিদারের কোন ক্ষতি করত না। এর অন্যথা হলেই সে বাড়ি লুঠ করত বিদ্রোহীরা। তবে এ বিদ্রোহ সম্পর্কে জমিদারদের অতিরঞ্জিত বিবরণ সে সময়ের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আতঙ্কিত জমিদারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। এ কারণে তিনিও বিদ্রোহী কৃষকদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণসহ সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সে সঙ্গে তিনি সাজাদপুরের জমিদারি রক্ষার জন্য কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেন একদল সশস্ত্র পাঞ্জাবিকে।[৭৭] শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ কিছুটা সহজে দমন করতে পারলেও কৃষকের কয়েকটি দাবি মানতে বাধ্য হয় সরকার।

জমিদার মহাজনদের শোষণ অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক ও নিম্নশ্রেণির উপরি-উক্ত সংগ্রামসমূহের বেশিরভাগই উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সুষ্ঠু সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত না হওয়ায় সেগুলো পরিপূর্ণ সাফল্য হয়তো লাভ করতে পাওে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সবের মধ্য দিয়ে বাংলার কৃষকসহ শ্রমজীবী মানুষের লড়াকু মনোভাব, ঐক্যচেতনা, সংগ্রামী দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের উচ্চতম আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উক্ত সংগ্রামসমূহের বেশিরভাগই উনিশ শতকের বাংলা নাটকে উপেক্ষিত থেকেছে। ব্যতিক্রম কেবল দীনবন্ধু মিত্রের bxj ‘cY (১৮৬০) এবং মীর মশাররফ হোসেনের Rgx‘\i ‘cY (১৮৭৩) নাটক। এর প্রথম নাটকে দীনবন্ধু মিত্র নীলকুঠিয়ালদের হাতে এ দেশের কৃষকসমাজ যে ভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হচ্ছিল তার বাস্তব চিত্র বিশ্বস্ত দর্পণের মতই তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য যে, নাটক রচনার সময় নাট্যকার ছিলেন ইংরেজ সরকারের ডাক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। এ উপলক্ষ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করার সময় নীল চাষীদের দুরবস্থা নিজের চোখেই দেখেছিলেন।

---

[৭৬] Chittabrata Palit এর Tensions in Bengal Rural Society থেকে উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
[৭৭] স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪–১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

একই সঙ্গে তিন দেখেছিলেন শক্তিমান কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ মরণপণ সংগ্রাম। স্বভাবতই তিনি কৃষকদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করেন এবং মূলত তাঁদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যেই এ নাটক রচনা করেন।[৭৮] এ নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে গোলক বসু নামে এক সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার অবলম্বনে। তাঁর বড় ছেলে নবীনমাধব সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তদারক করার পাশাপাশি গ্রামের কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করেন। আর ছোট ছেলে বিন্দুমাধব লেখাপড়া করে কলকাতায়। ওদিকে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে। গোলক বসু গত বছর তাঁর পঞ্চাশ বিঘা জমিতে নীল চাষ করে ঋণের টাকা তুলতে পারেন নি। তার ওপর আরো দশ বিঘা বেশি জমিতে নীল চাষ করার হুকুম দিয়েছে নীল কুঠিয়াল। অথচ সব জমিতে নীল চাষ করলে পুরো বৎসরের খাবারের সংস্থান হবে না। কিন্তু কুঠিয়াল কোন আপত্তি শুনতে প্রস্তুত নয়। এ দিকে তাঁর প্রতিবেশী সাধুচরণের সন্তানসম্ভবা কন্যা ক্ষেত্রমণির ওপর কুদৃষ্টি পড়ে কুঠিয়াল রোগ সাহেবের। একদিন চারজন লাঠিয়াল পাঠিয়ে সে ক্ষেত্রমণিকে অপহরণ করে। সেই সঙ্গে চাষীদের সহায়তা করার জন্য নবীনমাধবের ওপর ক্ষুব্ধ নীলকররা নবীনের পিতা গোলকবসুর নামে ঠুকে দেয় মিথ্যা মামলা। রোগ সাহেব বন্দী ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করতে চাইলে সে বাধা দেয় এবং ভীষণভাবে আহত হয়। এমন সময় জানালা ভেঙে নবীনমাধব এবং মুসলমান চাষী তোরাপ সে কক্ষে প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে সাহেবের হাত থেকে। কিন্তু বাড়িতে ফিরে ক্ষেত্রমণি অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। ওদিকে মামলা মিথ্যে হলেও কুঠিয়ালের সঙ্গে যোগসাজশ থাকায় গোলক বসুকে মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাজতবাস দেয় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট । অপমানিত গোলক বসু সেখানে আত্মহত্যা করেন। এ অবস্থায় পিতৃশ্রাদ্ধ নিয়ে কথা বলার সময় নীলকর গোলক বসু সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি করলে তাকে আক্রমণ করে বসে নবীনমাধব। সুযোগ পেয়ে সাহেবের লাঠিয়ালরা নবীনবাধবকে আঘাত করে মৃতপ্রায় করে ফেলে। মুমূর্ষু অবস্থায় নবীনমাধবকে বাড়িতে নিয়ে এলে তারও মৃত্যু ঘটে। স্বামী ও পুত্রহারা হয়ে গোলক বসুর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী উন্মাদ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে হত্যা করে ছোট ছেলে বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতাকে। এক সময় সাবিত্রীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং নিজেই পুত্রবধূ সরলতার মৃত্যুর জন্য দায়ী জেনে অনুতাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা, সংলাপ রচনা এবং কোন কোন চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকারের সীমাবদ্ধতা[৭৯] থাকলেও নীলকরদের অত্যাচারের বৈশিষ্ট্য, ইংরেজ পরিচালিত বিচারালয় এবং

---

[৭৮] এর ভূমিকায় তিনি বলেন, "নীলকরনিকরকরে bxj ‘cY অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।" মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, পূর্বোক্ত

[৭৯] "মৃত্যুদৃশ্যের আধিক্য, করুণরসের আতিশয্য, প্রতিবাদীর দুঃখভোগ প্রভৃতি", অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১১০; "... তাঁহার ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের দেহ অনাশ্রিত – কেবলমাত্র কতকগুলি সদ্‌গুণের

Dhaka University Institutional Repository

নীলচাষীদের দুর্ভোগের চিত্র পরিস্ফুটনে তিনি বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হননি। এ প্রসঙ্গে অজিত কুমার ঘোষ বলেনছেন: “bxj ‘cY-এ বর্ণিত একটি কথাও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত নহে”।[৮০] এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে সময়ের ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে লেখা হয়:

> নীলদর্পণের বর্ণনায় যদি কোন মহাত্মার সন্দেহ থাকে তবে বারেক এ প্রদেশে আগমন করিয়া নীলকরের অত্যাচার ও বিচার প্রণালী ও অস্মদের অবস্থা ক্ষণকাল অবলোকন করিলেই বর্ণিত পুস্তকের একটি কথার প্রতিও অবিশ্বাস করিবার কারণ থাকিবে না।[৮১]

এমনকি ক্ষেত্রমণির অপহরণের বিষয়ও ১৮৬০ সালে গঠিত নীল কমিশনের তদন্তে পাওয়া একটি সত্য ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে।[৮২] এ সব কারণে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুলভাবে আদৃত হয় bxj ‘cY নাটক। এটিকে কেন্দ্র করে সে সময় বাংলাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা স্মরণ করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত নীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না–ঘটনা সকল সত্য কি না–অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না। নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, তোরাপ আমাদের ভালোবাসা কাড়িয়া লইল, ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।[৮৩]

নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সমমত পোষণ করে এক ইংরেজ মিশনারি ((James Long) এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং এর কিছু কপি পাঠানো হয় ভারত ও ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে। অনুবাদক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজ প্রশাসন এ নাটকের প্রতি রীতিমত ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রকাশক পাদ্রি জেম্স লঙ কে অর্থ ও একমাসের কারাদণ্ড ঘোষণা করে। দেশে এ বিচারের প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই প্রহসনের বিচারের নিন্দা জানানো হয়। পাশাপাশি জেম্স লঙ বহু ইংরেজসহ দেশবাসীর ভালোবাসা ও অভিনন্দনে সিক্ত হন। এমন কি এ মামলা নিয়ে রচিত হয় দুই অঙ্কের একটি প্রহসন, যা মূল নাটকের পর প্রদর্শন করা হতো।[৮৪] অবশ্য ইংরেজদের প্রতিক্রিয়া এতেও থামেনি, নাটকটির অভিনয়ের সময়ও কোন কোন অসহিষ্ণু ইংরেজ

সমষ্টিমাত্র হইয়া রহিয়াছে।” “... উচ্চ শ্রেণীর সংলাপে দীনবন্ধু যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বাস্তব জীবনের কথ্যভাষা নহে...। তাহার ফলেও চরিত্রগুলির কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।” আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬

[৮০] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

[৮১] উদ্ধৃত; স্বপন কুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

[৮২] এপ্রিল, ১৮৬০ সালের ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকা অনুসারে আর্চিবল্ড হিলস নামক ইংরেজ কুঠিয়ালের লোকজন হরমণি নামে নদীয়ার এক সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করেছিল। সূত্র : স্বপন বসু, পূর্বোক্ত

[৮৩] শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

[৮৪] স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪–৪৬

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্চে হামলা চালিয়েছিল বলে জানা যায়। যেমন, লক্ষ্মৌ শহরে bxj ‘cY মঞ্চায়নের সময় ‘ক্ষেত্রমণি উদ্ধার’ দৃশ্যে চাষী তোরাপ ইংরেজ রোগ সাহেবকে আঘাত করতে উদ্যত হলে কয়েকজন ইংরেজ তলোয়ার নিয়ে মঞ্চে উঠে ভন্ডুল করে দিয়েছিল অনুষ্ঠান।[৮৫] একজন সমালোচকের মতে, একটি নাটককে কেন্দ্র করে আলোড়নের এমন উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নেই।[৮৬]

bxj ‘cY নাটকের এ জনপ্রিয়তা ও সাফল্য পরবর্তী কয়েকজন নাট্যকারকে সমাজচিত্রপ্রধান ‘দর্পণ’ নাটক রচনায় উৎসাহিত করে। সে ধারায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে অজ্ঞাত নাট্যকারের mvÿvr‘cY (১৮৭১), প্রিয়লাল ও ললিত মোহনের fviZ ‘cY (১৮৭২), প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের cjøxMvg ‘cY (১৮৭৩), মীর মশাররফ হোসেনের Rgx‘vi ‘cY (১৮৭৩), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের †Kivbx ‘cY (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের †Rj‘cY (১৮৭৫), Pv-Ki ‘cY (১৮৭৫) ইত্যাদি। এ সব নাটকের মধ্যে বিষয় ও রচনা সৌকর্যের দিক থেকে Rgx‘vi ‘cY শ্রেষ্ঠ। ইতঃপূর্বে জমিদারের কৃষক শোষণের যে নানামাত্রিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার কিছু অংশের প্রতিফলন এ নাটকে বস্তুনিষ্ঠভাবে ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মীর মশাররফ হোসেন নিজে জমিদার বংশের সন্তান হওয়ার কারণে এর বহু বিষয় তিনি স্বাভাবিকভাবেই জানতেন। সে সব অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করে তিনি রচনা করেছেন Rgx‘vi ‘cY নাটক। এর ভূমিকায় তিনি দিয়েছেন সে স্বীকারোক্তি :

যেমন, “জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।”[৮৭]

নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, জমিদার হায়ওয়ান আলীর অধীনে এক দরিদ্র কৃষক আবু মোল্লা। সম্প্রতি আবু মোল্লার সুন্দরী স্ত্রী নুরুন্নেহার-এর ওপর জমিদারের কুদৃষ্টি পড়েছে। জমিদার বহুভাবে নুরুন্নেহারকে হাত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। একবার বিনা কারণে আবু মোল্লাকে ধরে এনে জমিদার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ধার্য করে এবং সে টাকা না দেওয়া পর্যন্ত তাকে বেঁধে রাখে কাছারিতে। জমিদারের পক্ষে বৈষ্ণবী কৃষ্ণমণি গিয়ে নুরুন্নেহারকে জানায় যে, সে বৈঠকখানায় হাজির হলেই ছাড়া পাবে আবু মোল্লা। কিন্তু সে প্রস্তাবও নুরুন্নেহার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এবার সে আবু মোল্লাকে ছেড়ে দিয়ে অপহরণ করে নিয়ে আসে মোল্লার স্ত্রীকে। সে সন্তানসম্ভবা জেনেও জমিদার তাকে বলাৎকার করলে সে রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণ করে। এ কারণে জমিদারের বিরুদ্ধে অত্যাচারসহ খুনের মামলা দায়ের করে আবু মোল্লা। কিন্তু ইংরেজ ডাক্তারের মিথ্যা রিপোর্ট, মিথ্যা সাক্ষ্য এবং সর্বোপরি বিচারকের পক্ষপাতিত্বের কারণে জমিদার

---

[৮৫] সূত্র: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৮

[৮৬] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

[৮৭] মীর মশাররফ হোসেন নাট্য সমগ্র (সম্পা. আবুল আহসান চৌধুরী), ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭০

Dhaka University Institutional Repository

বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। মামলায় জয়লাভ করে আবু মোল্লার বাড়ি ঘর লুঠ করে তাকে গ্রাম ছাড়া করে জমিদার হায়ওয়ান আলী।

বাংলার তৎকালীন জমিদারদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপরি-উক্ত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। জমিদারদের লাম্পট্য, অত্যাচার, মিথ্যা সাক্ষ্য, জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করে সুবিচার না পাওয়া ইত্যাদি ছিল সে সময়ের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। শুধু তাই নয়, লেখক তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, কুমারখালীতে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে নাটকের প্রদর্শনী শেষে দর্শকের সঙ্গে ভুক্তভোগী চাষা আনার মোল্লাকে (আবু মোল্লার প্রকৃত নাম) পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং নাট্যোল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তিও তখন জীবিত ছিলেন।[৮৮] এ বিবেচনায় বলা যায় যে, নাটকে উক্ত সত্য ঘটনার প্রকাশ নাট্যকারের দুঃসাহসিক এবং প্রজা-হিতৈষী মনোভাবের পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য, এ নাটকে কৃষকদের ওপর জমিদার যে বহু রকম অযৌক্তিক কর আরোপ এবং শাস্তি প্রয়োগ করতো তারও উদাহরণও লক্ষ করা যায়। মীর মশাররফের Rgx'`vi 'cY নাটক আরো একদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটি হলো, এ নাটক রচিত হয়েছে সিরাজগঞ্জ বা পাবনা কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে। উক্ত বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে নাটকটির রচনা এবং মঞ্চায়ন বিদ্রোহী কৃষকদের উদ্দীপিত করেছিল–এমনটা বলা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, সে সময়ের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র এক সমালোচনায় উক্ত বিদ্রোহের সময় এ নাটকের প্রকাশ ও প্রচারকে আগুনে ঘি ঢালার কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন।[৮৯] স্মরণীয় যে, ইংরেজসৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং একইসঙ্গে ইংরেজ সরকারের কর্মকর্তা বঙ্কিম শ্রেণিগতভাবে বরাবরই ছিলেন ইংরেজের প্রতি অনুগত এবং উক্ত ব্যবস্থার সমর্থক। সে সূত্রে জমিদারি ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ কৃষক বিদ্রোহের মত সামাজিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান।[৯০] আবার জমিদার বংশের সন্তান হয়েও মশাররফ হোসেন বঙ্কিমের পরামর্শ গ্রহণ না করে এ নাটকের প্রচারসহ একাধিক মঞ্চায়নও যে সম্পন্ন করেছিলেন তা তাঁর নৈতিক ও শৈল্পিক নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। তবে, পাবনা কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত এ নাটকে যে বাস্তবতার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে, তা বলা কঠিন। ১৮৭৩ সালের দিকে যখন পাবনা কৃষক বিদ্রোহ তুঙ্গে উঠেছিল সে সময় রচিত এ নাটকের প্রধান ভুক্তভোগী আবু মোল্লা কিংবা অন্যান্য কোন চরিত্রকেই অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। অথচ মীরের এক নিকট আত্মীয়ের, এমন কি সহানুভূতিশীল

---

[৮৮] পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ. ৬।

[৮৯] “আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিস্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।” উদ্ধৃত; মুনীর চৌধুরী, মীর মানস, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬

[৯০] “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজ ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি” ‘বঙ্গদেশের কৃষক’, বঙ্কিম রচনাবলী, (সাহিত্য সমগ্র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯–৩১০

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও, বিদ্রোহীদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় পাওয়া যায়।[৯১] অর্থাৎ সমসাময়িক কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বেশ ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। সে সুবাদে এবং দর্পণ নাটকের উৎস bxj ‘c‡Yi অনুসরণে হলেও Rgx‘vi ‘c‡Y কৃষক বিদ্রোহের চিত্র থাকা অসম্ভব ছিল না। কারণ, নাটকের বেশ কয়েকটি চরিত্র ও দৃশ্য পরিকল্পনায় bxj ‘c‡Yর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এ দিক থেকে নাট্যকারের বিশেষ শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নাটকে এ বিদ্রোহের রেশ দেখা যায় নি বলে ধারণা করা চলে। আর সেটি হলো ইংরেজ শাসকের প্রতি লেখকের আস্থা এবং তারই সূত্রে ইংরেজ সম্রাজ্ঞী পরিচালিত ব্যবস্থার প্রতি তাঁর সমর্থন। নাটকের একাধিক সঙ্গীত ও সংলাপে নাট্যকারের উপরি-উক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন নাটকের শেষ দৃশ্যের একটি সঙ্গীতে আছে:

কাতরে ডাকি মা তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি।।
থাক মা সাগরপারে কভু না হেরি তোমারে
রক্ষ মা প্রজাকিঙ্করে; বিনয়ে মিনতি করি।।
… … … … … … …
সবল দুর্ব্বল পরে হেন অত্যাচার করে?
রক্ষ মা দীন প্রজারে মা তোমার চরণে ধরি।।[৯২]

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বোধ করি এরকম – কয়েকটি বিশেষ দুর্বৃত্ত শ্রেণির জমিদারের অত্যাচারের কারণে ভারতের প্রজাবৃন্দের বর্তমান দুর্দশা এবং সাগরপারের ভারতেশ্বরী কৃপা করলে সহজেই তাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব; এ জন্যে প্রজাবিদ্রোহ মোটেই কাম্য নয়। প্রজাবিদ্রোহ বা কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যে জমিদারসহ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম– এ চেতনা সম্ভাবত মীর তার ইংরেজভক্ত পিতার কাছ থেকে আয়ত্ত করেছিলেন। স্মর্তব্য, তাঁর পিতা ছিলেন এক সময় নীলকুঠির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং মিঃ কেনী নামক ইংরেজ কুঠিয়ালের সঙ্গেও ছিল তাঁর পিতার সদ্ভাব। সম্ভবত সে কারণে bxj ‘c‡Yi নাট্যকার দীনবন্ধুর ওপরও তিনি কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিলেন। মীরের আত্মজীবনীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়:

> দীনবন্ধুবাবু ইংরেজের ত্রুটি, ইংরেজের কুৎসাই গাহিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়ামমতা স্নেহভাব এবং ভালোবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নেমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন,

[৯১] শান্তনু কায়সার, তৃতীয় মীর, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ১৯৫
[৯২] মীর মশাররফ হোসেন এর নাট্য সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

> যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইয়াছিলেন... সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দুশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার নাম পাতফোঁড়– যে পাতে খান সে পাতই ছিদ্র করেন... ।[৯৩]

অথচ দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষ্য দেন যে, bxj ‘c‡Yi নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধু নিজের নাম ব্যবহার না করলেও বিষয়টি তিনি গোপন করতে চাইতেন না। আর তা প্রকাশিত ও সরকারের কাছে প্রমাণিত হলে তিনি সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন ও বিভিন্নভাবে হেনস্থা হতে পারেন জেনেও সেটি প্রচারে কুণ্ঠিত হননি।[৯৪] এ সবই ঝুঁকির মুখে দীনবন্ধু মিত্রের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং নিপীড়িত কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর অবিচল সহানুভূতির পরিচয় প্রকাশ করে। যে নাটকের ইংরেজি অনুবাদকের – মাইকেল মধুসূদন দত্ত – তিরস্কার প্রাপ্তি ও চাকরিচ্যুতি ঘটে, অনুবাদ প্রকাশকের অর্থ ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়, সে নাট্যকারের জন্য তখন বাহবা পাওয়ার চেয়ে উল্লিখিত সব ধরনের দণ্ড ভোগের ঝুঁকি যে বেশি ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তা সত্ত্বেও বলা চলে যে, Rgx‘vi ‘cY নাটকে সমসাময়িক বিদ্রোহের চিত্র স্থান না পেলেও দরিদ্র অসহায় কৃষকের ও তার পরিবারের ওপর যে নির্মম অত্যাচারের নমুনা প্রতিফলিত হয়েছে তার তুলনা বাংলা নাটকে আর পাওয়া যায় না। এ দিক থেকে বাস্তবতার কিছু সীমাবদ্ধতা এবং শৈল্পিক ত্রুটিসহ উক্ত নাটক বাংলাদেশের একটি বিশেষ সময়ের সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া মীর মশাররফের আত্মজীবনীমূলক রচনা D‘vmxb c_‡Ki g‡bi K_v (১৮৯০) গ্রন্থে লেখক কুষ্টিয়ার নীলকর মিঃ কেনির অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং এ সবের বিরুদ্ধে প্রজাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কাহিনীও তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক মর্যাদার সঙ্গে। অর্থাৎ, উনিশ শতকের বাংলাদেশের কৃষকদের দুটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তাঁর দুটি রচনায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যা সে সময়ের অন্যান্য লেখকের কোন ধরনের লেখায় পাওয়া কঠিন। উল্লিখিত সময়ের অন্যান্য সংগ্রামের মধ্যে একমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত ঝাঁসির রানি নিয়ে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা বা গীতিনাট্যধর্মী wbewcZ ‘xc (১৮৭৬) এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের অসম্পূর্ণ SvÝxi ivYx (?) নাটকের নাম পাওয়া যায়।[৯৫] এ গুলো ছিল সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানা ফড়নবীশ ও ঝাঁসির রানিকে নিয়ে পরিকল্পিত দেশপ্রেমমূলক রচনা, যার মধ্যে প্রকাশ্য ব্রিটিশ বিদ্বেষ লক্ষণীয়। যেমন:

উচ্ছলিত হোক আজি অনন্ত সাগর,
ধরুক প্রচণ্ড মূর্তি প্রচণ্ড ভাস্কর,

---

[৯৩] উদ্ধৃত; তৃতীয় মীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮
[৯৪] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৫-৮২৬
[৯৫] স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

শত শত ইরম্মদ ফেলুক অম্বর,

দগ্ধ হ'ক একেবারে ইংরাজ-নিকর।[৯৬]

দ্বিতীয় নাটকটি রচনায় গিরিশ হাত দিয়েছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে। কিন্তু দুই অঙ্ক লেখার পর তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী এক পুলিশের পরামর্শে সে পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেন। আবার অন্যদিকে এক ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান লেখক শিমুয়েল পীরবক্স তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক নাটক weaewein (১৮৬০) রচনার ভূমিকায় সিপাইদের 'দুষ্ট নিমকহারাম' হিসেবে অভিহিত করে তাদের নিপাত কামনা করেছেন ভগবানের কাছে।[৯৭]

বস্তুত উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির বেশিরভাগই এ বিদ্রোহ সমর্থন তো করেনইনি বরং বিভিন্ন রচনায় এঁদের কটাক্ষ করেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায়। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশ করেছিলেন ১৮৭৭ সালে 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ (১২৮৪) সংখ্যায়। এ প্রবন্ধে তিনি সিপাহী যুদ্ধের বীরপুরুষদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে বলেছেন যে, তাঁরা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করলে ইতিহাসে, কবির বাণীতে এবং প্রস্তরের মূর্তিতে অমর হয়ে থাকতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে ভবিষ্যতে রানির জীবনের ইতিহাস রচনার অঙ্গীকারও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।[৯৮] অবশ্য পরবর্তী সময় সে অঙ্গীকার পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা শুধু নয়, পুরো উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তাদের শ্রেণিগত স্বার্থের বিরোধী বলেই উক্ত আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে যেমন একাত্মতা বোধ করে নি, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বোধ করেছেন বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত। কারণ তাদের একটি অংশ ছিল সরাসরি ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং অপর অংশ পুরোপুরি ভূমিকেন্দ্রিক না হলেও তারা মনে করতেন যে, তাদের সমাজের সমস্ত উন্নতি ও শিক্ষা দীক্ষা ইংরেজ শাসনেরই প্রত্যক্ষ অবদান। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ তাঁরা কামনা করতে পারেন নি এবং ইংরেজ-সৃষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে সমর্থনও দেন নি।[৯৯] সে কারণে উনিশ শতকের জমিদার মহাজন নীলকুঠিয়াল এবং ইংরেজ সরকার বিরোধী কৃষক-সাঁওতাল ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের ব্যাপক সংগ্রাম তৎকালীন বাংলা নাটকের বিষয় হিসেবে আসে নি আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায়।

---

[৯৬] সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
[৯৭] স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮
[৯৮] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ৬৯
[৯৯] বদরুদ্দীন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এ অবস্থানে উক্ত শ্রেণির বাঙালি বেশিদিন স্থিত ছিল না। অনতিবিলম্বে তাদের এক অংশের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্যে ভাঙন দেখা দেয় এবং শুরু হয় মৃদু সংঘাত। এর কারণ হিসেবে ধারণা করা হয়, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষিত মানুষ তৈরি হচ্ছিল, সে পরিমাণ সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকুরির সংস্থান ছিল না। উল্লেখ্য, সে সময় বাঙালি সমাজে শিক্ষিত চাকুরিজীবীর মর্যাদা ছিল সমাজের অন্যান্য বৃত্তিজীবীর চেয়ে অনেক বেশি। ১৮৮১-৮২ সালে তৎকালীন পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এর একটি লেখায় আছে:

> সমাজে বল, সভায় বল, পিতামাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর মত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা শ্রবণ সুখকর ও নয়ন তৃপ্তিকর নহে। ... যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান তাঁহার পিতামাতা, বড় চাকুরের পিতামাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন।[১০০]

কিন্তু সরকারি চাকুরির সংস্থান যথেষ্ট না থাকায় প্রতি বছর বেকারের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। এক হিসেবে পাওয়া যায়, ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭১২ জন। এর মধ্যে সরকারি ও প্রাইভেট চাকুরি লাভ করেন যথাক্রমে ৫২৮ এবং ১৮৭ জন। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি ছিল বেকার। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, দশ পনের টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশ হাজার প্রার্থী পাওয়া যেত। শুধু তাই নয়, উচ্চ বেতনের চাকুরীগুলো প্রায় সবই নির্দিষ্ট ছিল ইংরেজদের জন্য, বাঙালির মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও তাদেরকে সে সব দেওয়া হত না।[১০১] 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তাদের এক প্রতিবেদনে লেখে, "রাজকীয় কর্মের মধ্যে যে সমস্ত পদে অধিক বেতন নির্দিষ্ট আছে, কর্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষেরা প্রায় সে সমস্ত পদ স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন"।

সমস্যা ছিল বেতন কাঠামোতেও। সরকারি চাকুরীতে ইংরেজ ও বাঙালি কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য ছিল প্রকট। এমন অনেক চাকুরী ছিল যেখানে ইংরেজ বড়সাহেবের বেতন ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা, সেখানে তাঁর পরবর্তী বাঙালির বেতন ছিল ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। এ সব কারণে বহু শিক্ষিত বাঙালি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করে ওকালতি, ডাক্তারি ও প্রকৌশলীর মতো স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। স্কুল শিক্ষক ও সাংবাদিকতার বৃত্তিতেও আসেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে সচেতন এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে (জাতীয়) রাজনীতিরও সূত্রপাত করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এ সব বৃত্তিধারী রাজনীতিকরাই নির্বাচিত হন প্রধানভাবে।

---

[১০০] উদ্ধৃত; বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩
[১০১] বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

বিনয় ঘোষের মতে, "উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-স্কুলমাস্টার–এঁরাই ক্রমে দেশের রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠছিলেন। এঁদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছোট ছোট জমিদার ও ব্যবসায়ীরাও ছিলেন।"[১০২] এ রাজনীতি একান্ত শ্রেণিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলেও তাতে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের চেতনাও সন্নিবিষ্ট হতে থাকে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই জাতীয় চেতনার স্ফুরণ প্রথম লক্ষ করা গিয়েছিল এবং সেটি ছিল প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বৃহত্তর মানবিক চেতনা থেকে উৎসারিত। তাঁরা সে সময়ই ইংরেজ শাসনের নানাবিধ দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব, বিচার বিভ্রাট, ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য, অতিরিক্ত কর আরোপ, অবৈধ উপায়ে ইংরেজ কর্মচারীদের ধনসম্পদ আহরণ করে স্বদেশে পাচার ইত্যাদি বিষয় তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ এবং প্রকাশ্য সভায়ও আলোচনা করতেন নির্মোহভাবে। একই সঙ্গে ডিরোজিও এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষের দেশাত্মবোধক কবিতা, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখের প্রবন্ধ এবং বক্তৃতায় ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় চেতনার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। যেমন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছিলেন :

> রাজ্য শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বহুলোকের কল্যাণ, মুষ্টিমেয়ের ইষ্টসাধন নহে। শাসনকর্তা বিদেশী হইলে তাহারা নিজ জাতির স্বার্থই সাধন করেন। এদেশীয় লোকের স্বার্থ সাধনরূপ মহানুভবতা তাহাদের মধ্যে কৃচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদেশী শাসনই ভারতের দারিদ্রের কারণ।[১০৩]

কিন্তু তাঁদের সেই বক্তব্য প্রধানত তৎকালীন বাঙালি মধ্য বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির স্বার্থসংশ্লিষ্ট না হওয়ায় এবং সে-সাথে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের উগ্র হিন্দুসংস্কার বিরোধিতার কারণে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তবে উক্ত শতকের দ্বিতীয় ভাগে উদ্ভূত ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় চেতনা বিভিন্নমুখী উপাদান নিয়ে দ্রুত বিকশিত হয় এবং শতকের শেষ পর্বে তা অনেকখানি শক্তিও অর্জন করে। প্রসঙ্গত প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও ভারতে জাতীয়তা-ভাবের অস্তিত্ব ছিল না। এ সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন রাজ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার অধীনে এবং ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত ছিল। এমনকি ইংরেজরা বাংলায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর মারাঠা, নেপাল, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করতে গেলে বাঙালি নেতারা ইংরেজদের জয়ের জন্য প্রার্থনা করত। তেমনি ১৮২৪ সালে বিশপ হিবার উত্তর ভারত পর্যটন করে বলেন যে, হিন্দুস্থানীরাও বাঙালিদেরকে ইংরেজের মত বিদেশি ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু শতকের ষাট দশকের দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ এবং ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র ভারতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সে সঙ্গে একই ইংরেজ

[১০২] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫।
[১০৩] উদ্ধৃত; রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের যাবতীয় শোষণ ও সুখদুঃখের সমান অংশীদার হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জেগে ওঠে ঐক্যের ভাব। জাতীয়তাবোধের উপরি-উক্ত ভিত্তিসমূহ পূর্ণতা পাওয়ার পাশাপাশি এ সময় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহ্যগর্ব ও ঐতিহাসিক বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠতার স্মৃতিও সঞ্চারিত হয়। যেমন, ম্যাক্স মুলার ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা এ সময় ভারতের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক-রোমান এবং ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান ভাষার জ্ঞাতিত্ব উদ্‌ভাবন, সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচন, সর্বোপরি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনসমূহ আবিষ্কার করলে হিন্দুর অতীত ঐশ্বর্য ও গৌরব প্রায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সব বিষয় ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তার চেতনা বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। একই ভাবে আঠারো শতকের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলমানদের যে দোর্দণ্ড প্রতাপের শাসন কায়েম ছিল, তার ঐতিহাসিক স্মৃতি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা রেখেছিল জাগরূক। তিতুমিরের দীর্ঘস্থায়ী ওয়াহাবী আন্দোলনে তার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ভাবে শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির বাঙালিদের মধ্যে নবোদ্ভূত জাতীয়তার চেতনা বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। সে সময়ের নাটকেও প্রতিফলিত হয় উপরি- উক্ত মনোভাব। এ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই সাধারণ জনগণের জন্য নির্মিত হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (১৮৭২)।[১০৪] এর পূর্বে কলকাতার বিভিন্ন জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার বা মঞ্চেই অভিনীত হতো যাবতীয় নাটক। সে সবের কোন কোনটিতে টিকিট বিক্রি করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত অতিথিরাই ছিলেন সে সব নাটকের দর্শক। কিন্তু 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপিত হওয়ার ফলে যে কোন মানুষ টিকিট কিনে নাটক দেখার সুযোগ পেলেন। সে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, উক্ত থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত bxj ‘cY নাটকের মধ্য দিয়ে (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২)।[১০৫] 'ন্যাশনাল থিয়েটার' -এর কিছুদিন পর গঠিত হয় 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' বা 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' (১৮৭৩)। এ ছাড়া 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার', 'বেঙ্গল থিয়েটার', 'নিউ বেঙ্গল থিয়েটার' ইত্যাদি নামেও বিভিন্ন নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এ সব নাট্যশালার বিভিন্ন নাটকে স্বদেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা কখনো সরাসরি কখনো বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস-এর kir-m‡ivwRbx (১৮৭১) ও m‡i›'-we‡bvw'bx (১৮৭৩) নাটকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। এর প্রথমটিতে সে সময়ের শিক্ষিত যুবক যুবতীর মধ্যে যে স্বদেশের প্রতি মমতা এবং ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর তা

[১০৪] সম্পূর্ণ নাম ছিল 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়োট্রিক্যাল সোসাইটি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
[১০৫] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭–৯৮

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে নায়ক শরৎকে বীরত্ব দেখাতে হয়েছে ইংরেজ পুলিশ অফিসারসহ কয়েকজন ইংরেজের ওপর। একজন সমালোচকের মতে, উক্ত ভাব প্রকাশের আত্যন্তিকতায় নাটকের কাহিনী সব জায়গায় বাস্তবতার অনুসরণ করতে পাওে নি, হয়ে পড়েছে কৃত্রিম অবাস্তব।[১০৬] তা সত্ত্বেও বোধ করি মুল জাতীয় ভাবোদ্দীপক ভাবের কারণেই এ নাটক বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সে সময়ের দেশপ্রেম ভাবের বাহক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সমালোচনায় সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, "বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যতগুলি নাটক লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট না হউক, দুই একখানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক অদ্যাবধি বাহির হয় নাই।"[১০৭] এ তথ্য থেকে বলা চলে, সমালোচকের শিল্পগত বিচারে শরৎ-m‡iwRbx নাটক কালোত্তীর্ণ হতে না পারলেও যুগের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল বহুলাংশে।

m‡i›‘-we‡bw‘bx একটি প্রণয়মূলক সামাজিক নাটক হলেও পূর্বের জাতীয় ভাব এখানে বেশ কার্যকরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'ম্যাক্রেন্ডেল' নামক চরিত্রের মাধ্যমে এক ইংরেজ রাজকর্মচারীর ঔদ্ধত্য তৎকালীন ইংরেজদের নিখুঁত প্রতিচিত্র বলে মনে হয়। ঋণ গ্রহণের দলিল নষ্ট করে সুরেন্দ্রকে সে গর্বোদ্ধতভাবে বলে, ..."নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙালির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।"[১০৮] উল্লিখিত সংলাপে এদেশবাসীর প্রতি ইংরেজদের মনোভাব এবং তাদের পরিচালিত বিচারব্যবস্থার পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সুরেন্দ্রের প্রতি শত্রুতার কারণে ইংরেজ চরিত্রকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তাদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় এ নাটকে এসেছে মূলত ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের প্রয়োজনে। এ বিদ্বেষের তীব্রতা তৎকালীন ইংরেজদের বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল বলে মনে হয়। ১৮৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং তার দুই মাস পর ১৮৭৬ এর ১ মার্চ 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' এ নাটকের প্রদর্শনীতে অশ্লীলতার অজুহাত দেখিয়ে ইংরেজ পুলিশ নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। ৮ মার্চ বিচারে নাট্যকার ও থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুকে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যদের মুক্তি দেওয়া হয়। পরদিন হাইকোর্টে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে সেখানে উক্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং উভয়ে মুক্তি লাভ করেন।

উল্লিখিত ঘটনার সময়ই বাংলা নাটকের ইতিহাসে আরেকটি উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তা হলো, সে বছরের জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড কলকাতায় আসেন প্রিন্স অব ওয়েল্স হিসেবে। হাইকোর্টের এক আইনজীবী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে হুলু ও শঙ্খধ্বনির

---

[১০৬] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২–১৪৩
[১০৭] উদ্ধৃত; অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২
[১০৮] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে তাঁকে দেওয়া হয় আন্তরিক সংবর্ধনা। ঘটনাটি তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হিন্দু সম্প্রদায় বিষয়টিকে চিহ্নিত করে জাতীয় অমর্যাদা হিসেবে। ফলে উক্ত পরিবারের কর্তা জগদানন্দকে হিন্দু পরিবারের সম্মান বিনষ্টকারীরূপে পরিগণিত করা হয়। এ সময় অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে:

> হিন্দু সমাজ সকল নিপীড়নই সহ্য করিতে পারে; কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। ... অনারেবল জগদানন্দের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি তাহাতে তাঁহার বিস্তর সম্মান হইয়াছে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যও বিস্তর হইয়াছে, তবে কেন তিনি এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু জাতির কলঙ্ক করিলেন, হিন্দু মাত্রের মনে মর্মান্তিক বেদনা দিলেন।[১০৯]

একই বিষয়ে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় লেখা হয়, æThat the national feeling had been outraged at the price the babu paid for his honour”. [১১০] এ ঘটনাকে বিদ্রূপ করে ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার’-এ উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত MR‘vb›‘ I heivR (১৮৭৬) নামে একটি প্রহসনের অভিনয় শুরু হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়ের পর পুলিশ প্রহসনটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলে এটি অভিনীত হয় nbgvb PwiÎ নামে। তৎকালীন পত্রিকা ‘ভারত সংস্কারক’ এর বিরুদ্ধে সাবধান করে লেখে:

> ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতর রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্তচক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর হোরাঙ্গজিবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে সেই নাটক অভিনীত হইয়াছে। যাহা হউক এরূপ নাটকের জন্য গবর্ণমেন্ট মুদ্‌গর প্রস্তুত করিয়াছেন।[১১১]

এই nbgvb PwiÎ নাটকও পুলিশ বন্ধ করে দিলে এবার পুলিশকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয় *The Police of Pig and Sheep* নামের একটি প্রহসন। এটি ১ মার্চ তারিখে m‡i›`-we‡bv`bx-র সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হলে ইংরেজ সরকার নাট্যশালাকে সংযত করার জন্য প্রথমত এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে প্রহসনগুলো নিষিদ্ধ করে। আর বছরের শেষে সত্যিকার ‘মুদ্‌গর’ হিসেবে চালু করা হয় ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন’ (১৮৭৬) বা Dramatic Perfomances Act 1876। এ আইনের বলে তৎকালীন ইংরেজরা সব ধরনের সরকার বিরোধী নাট্যাভিনয় বন্ধ করে দেয়।

বস্তুতপক্ষে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনটি ১৮৭৬ সালে জারি হলেও নাট্যতাত্ত্বিকদের মতে, এর প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়েক বছর ধরে এবং এর সূত্রপাত হয় প্রধানত bxj`cY নাটকের প্রকাশ

---

[১০৯] প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২–৩৩
[১১০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২
[১১১] উদ্ধৃত; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

থেকে।[১১২] লক্ষণীয় কলকাতায় স্থাপিত প্রায় সব নাট্যশালায় (বেঙ্গল থিয়েটার ছাড়া) ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এ নাটকের অভিনয় চলেছে বহুবার ও বহু স্থানে। শুধু তাই নয়, এ নাটকের ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারক দৃশ্যগুলো–বিশেষভাবে পক্ষপাতমূলক বিচার ব্যবস্থা, ইংরেজ কর্তৃক এদেশবাসীকে পীড়ন, নারীদের বলাৎকার চেষ্টা, ইংরেজ চরিত্রকে পাল্টা আঘাত ইত্যাদি – অন্যান্য নাটকেও অনুসৃত হতে দেখা যায়। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত নাটক m‡i›'-we‡bw'bx তেও রয়েছে প্রায় অনুরূপ দৃশ্য। যেমন – সুন্দরীদের প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডেলের লালসার উল্লেখ (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক), ম্যাক্রেন্ডেলের বুকে সুরেন্দ্রের পদাঘাত (১ম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক), পক্ষপাতমূলক ইংরেজ বিচারালয়ের দৃশ্য (৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক), ম্যাক্রেন্ডেল কর্তৃক বিরাজমোহিনীকে বলাৎকার চেষ্টা, বিরাজমোহিনীর পলায়ন, পরে আহত অবস্থায় আবার তাকে ধরে আনা (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) এবং কারাগারে কয়েদীদের বিদ্রোহ, ইংরেজ- বিরোধী উক্তি ও ম্যাক্রেন্ডেলকে হত্যা (৩য় অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক)।[১১৩] এ সব কারণে bxj'cY নাটকের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় প্রথম থেকেই উত্তেজিত বোধ করেছে এবং এ ধরনের নাট্যাভিনয়ের নিয়ন্ত্রণ, নিষিদ্ধ ও সংশ্লিষ্টদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্তত ১৮৭৪ সালের প্রথম দিক থেকে আইন প্রণয়নের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৮৭৫ সালের ৯ আগস্ট তারিখের এক সরকারি চিঠিতে জানা যায় এ পূর্ব প্রস্তুতির উল্লেখ। ভারত সরকার উক্ত চিঠিতে সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়াকে লিখেছিল:

> ... with reference to the instructions contained in your Lordship's legislative despatch no. 9 dated 31st March 1874... it is our intention to bring before the council of the Governor General for making laws and regulations a Bill to empower local governments to prohibit any theatrical representations which in their opinion may be prejudical to the public interests...[১১৪]

এ দিক থেকে জগদানন্দ ও রাজকুমারকে বিদ্রূপ করে রচিত MR'vb›' ও ivRKgvi প্রহসন উক্ত আইন জারি করার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল মাত্র। বস্তুত জাতীয়তাবোধের চেতনাজাত তৎকালীন বিভিন্ন নাটকে ইংরেজ শাসকের প্রতি বিতৃষ্ণা ছড়ানোর যে প্রবণতা কাজ করছিল তাকে আঘাত করার জন্যই উক্ত আইন প্রয়োগ করেছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু বলা বাহুল্য, নাট্য রচনার ক্ষেত্রে সূচিত হওয়া জাতীয় চেতনা তাতে পুরোপুরি লুপ্ত হলো না; এর প্রকাশ ঘটতে লাগল ভিন্ন পথে, পরোক্ষভাবে। এর ইঙ্গিত দিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয়:

---

[১১২] জিয়া হায়দার, নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৯৪
[১১৩] উদ্ধৃত; জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
[১১৪] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

> এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেন্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। ... গবর্ণমেন্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে, যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না ...।[১১৫]

অবশ্য সরাসরি ইংরেজ বিরোধিতামূলক ভাব এড়িয়ে জাতীয়তাবোধ বিকশিত করার চেষ্টাও তৎকালীন নাটকে ছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর সচেতন প্রয়াসে এ সময়ের নাট্যকাররা প্রধানত হিন্দু পুরাণ, ধর্ম এবং ঐতিহাসিক বীরত্বের কাহিনী তাঁদের নাটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের KòKgvix (১৮৬০) নাটকে। রাজস্থানের এক ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ নাটকে †gNbv‘ea Kv‡e¨ রাবণের কণ্ঠে যে স্বদেশভক্তির প্রকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল তার অনুরণন পাওয়া যায়। বহিঃশত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত ভীমসিংহের ক্ষেদোক্তিতে উনিশ শতকের নিঃসহায় পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মাবমাননা যেন পরিস্ফুটিত:

> এ ভারতভূমির কি আর সেই শ্রী আছে। এদেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্তসকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না।... হায়! হায়! যেমন কোন লবনাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টধারী নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট কর্য্যে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে।[১১৬]

মন্তব্যটি আসলে করা হয়েছিল ইংরেজের কাছে পরাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কেই। ঐতিহাসিক কাহিনীর মাধ্যমে সমকালীন দেশ হিতৈষণার এ চেষ্টা পরবর্তী সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উল্লেখ্য, ১৮৬৭ সালে জাতীয় চেতনা প্রসারের উদ্দেশ্যে নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে গঠিত হয় 'হিন্দু মেলা'। প্রতি বৎসর কোলকাতার কোন উদ্যানে তিন চারদিন ধরে চলত এ মেলা। মেলায় বিভিন্ন প্রকার দেশীয় পণ্য, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, শরীরচর্চা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান, জাতীয় সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের মনে দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"[১১৭] হিন্দু মেলার চতুর্থ অধিবেশনের পরে নবগোপাল মিত্র National Society বা 'জাতীয় সভা' নামে অপর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এরও উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয় ভাব

---

[১১৫] উদ্ধৃত; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
[১১৬] কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩
[১১৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চারিত করা। প্রতি মাসে এর একটি করে অধিবেশন বসত এবং উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করা হত। এমনি একটি অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা করেন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে। এ বক্তৃতায় তিনি বলেন:

> আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।
>
> ... আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। [১১৮]

আবেগময় এ বক্তৃতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৎকালীন বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রতিফলন নাটকসহ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বহু বছর ধরে লক্ষ করা গেছে। এ বিষয়ে নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লিখিত হতে পারে ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাবান তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) নাম। নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে তিনি উদ্বোধন নামে কবিতায় লিখলেন:

> জাগ জাগ ভারত সন্তান!
> মাকে ভুলে কতকাল রহিবে শয়ান?
> ভারতের পূর্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ
> রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?[১১৯]

হিন্দু মেলার দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠানে পঠিত হয় কবিতাটি। পরে একই উদ্দেশ্যে তিনি নাটক রচনার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ভাষ্য,

> “হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত – কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।”[১২০]

এ কারণে তাঁর প্রথম নাটক ciæeµg (১৮৭৪)–এ তিনি অবলম্বন করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের গ্রিকরাজ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং পাঞ্জাবের নরপতি পুরুর স্বাধীনতা সংগ্রামের

---

[১১৮] উদ্ধৃত; রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩১

[১১৯] উদ্ধৃত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সম্পা: দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ২০০২, পৃ. উনিশ (সম্পাদকের ভুমিকাংশ)

[১২০] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক কাহিনী। তৎকালীন ভারতবর্ষীয় রাজাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ থাকলেও এ নাটকে পুরুকে ভারতের রাজাদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে স্বভাবতই এখানে সমীকরণটি দাঁড়ায়–আক্রমণকারী সেকন্দর শা (আলেকজান্ডার) তৎকালীন উপনিবেশবাদী ইংরেজ এবং পুরু পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী নায়ক। তার সংলাপে সেই আহ্বান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন:

ক) পুরু : ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥...

খ) পুরু। এত স্পর্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন? ...

গ) পুরু। ... স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে
ধিক সেই কাপুরুষে, শত ধিক তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সে প্রাণ লয়ে?
যে ধরে এমন প্রাণ, শত ধিক তারে। ।[১২১]

উল্লেখ্য, নাটকটি গদ্যে লেখা হলেও সৈন্যদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধে আহ্বান করতে গিয়ে পুরু এখানে কবিতার আশ্রয় নিয়েছে। অবশ্য সেকন্দর শা-র সঙ্গে যুদ্ধে পুরু এবং তার সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং পুরু বন্দী হয়। তবে বন্দী পুরুর মধ্যে ক্ষত্রিয় বংশের অমিত প্রাণশক্তি ও তীব্র স্বাধীনচেতা মনোভাব দেখে সেকন্দর শা মুগ্ধ হয় এবং পুরুকে ফিরিয়ে দেয় তার রাজ্য শাসনের অধিকার।
সমালোচকের মতে ci‡ eµg নাটকটি ভারতীয় প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে বিশেষ ভাবোদ্দীপক ভঙ্গিতে লেখা হলেও এখানে ফরাসী নাট্যকার জ্যাঁ রাসিন (Jean Racine) -এর A‡jKRvÛvi ‡' †MU (১৬৬৫) নাটকের স্পষ্ট প্রভাব আছে।[১২২] তবে প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কল্লুপর্বত প্রদেশের রানি ঐলবিলার প্রাসাদ সম্মুখের দৃশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। মূলত নাট্যকার কর্তৃক উল্লিখিত জাতীয় চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যেই কল্পিত হয়েছে এ দৃশ্য। শুধু তাই নয় এ দৃশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ

[১২১] পূর্বোক্ত, পুরুবিক্রম (তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক), পৃ. ১৮–১৯
[১২২] তুলনামূলক সমালোচনা, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর রচিত স্বদেশী চেতনার একটি গানও ব্যবহার করা হয়, যা পুরো নাটকের ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য, হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত হওয়া এ গান সে সময় বাঙালির অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বিবেচিত হত।[১২৩] গানটির কিছু অংশ লক্ষ করা যেতে পারে:

মিলে সব ভারত সন্তান, একতান-মন-প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রিসমান?
... ...
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ?
আর যত মহাবীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।[১২৪]

এ গানের প্রশংসায় মিতবাক বঙ্কিমও একদা উচ্ছ্বসিত হয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখেছিলেন:

> এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক![১২৫]

'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ ciæweµg প্রযোজনার সময় প্রদত্ত নতুন সুরে এ গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বোধ করি এ জনপ্রিয়তার কারণে উক্ত নাটকে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট তিনবার। এ ভাবে বিদেশি নাটকের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক কাহিনী এবং স্বদেশপ্রেম বিষয়ক সঙ্গীতের প্রয়োগে ciæweµg নাটকের মঞ্চায়ন অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ ছাড়া নাটকটি হিন্দি মারাঠি এবং গুজরাটি ভাষায় অনূদিত হয়ে সে সময়ের জাতীয়তাবাদ প্রচারে রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটক m‡ivwRbx (১৮৭৫)-তেও ঐতিহাসিক কাহিনীর উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাদেশিক চেতনা সঞ্চারের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর অবলম্বন ছিল জেম্স টড রচিত রাজস্থানের কাহিনী (Annals and Antiquities of Rajsthan)। এতে

---

[১২৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
[১২৪] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
[১২৫] 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন', বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৬

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, দিল্লির সুলতান চিতোর আক্রমণের এক পর্যায়ে মেবার রাজা লক্ষ্মণসিংহ চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে এক দৈববাণী শোনেন। সে বাণীতে বলা হয়, সরোজ-কুসুমসম তাঁর পরিবারের কোন রূপবতী নারীকে এ মন্দিরে বলি দিলে এবং লক্ষ্মণসিংহের বারোপুত্র যুদ্ধে নিহত হলে তিনি এ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন। প্রকৃতপক্ষে দৈববাণীটি করেছিল মন্দিরের পুরোহিত ভৈরবাচার্য ছদ্মবেশে মুসলমান মহম্মদ আলি। কিন্তু লক্ষ্মণসিংহ তাতে বিশ্বাস করে এবং নিজের মেয়ে সরোজিনীকে বলিদান করে চিতোর বাঁচাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সরোজিনী ছিল বাদলাধিপতি বিজয়সিংহের বাগদত্তা। স্বাভাবিকভাবে বিজয়সিংহ এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয় এবং লক্ষ্মণসিংহের মহিষীর সহায়তায় সরোজিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে। মহম্মদ আলির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে আলাউদ্দিনের সহায়তা করা। সে হিসেবে ভৈরবের মন্দিরে সরোজিনীকে বলি দেওয়ার মুহূর্তে বিজয়সিংহ তার সৈন্যদলসহ এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় সরোজিনীকে। কিন্তু এ সব ঘটনার মধ্যে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করলে বিজয়সিংহ নিহত হয় এবং সরোজিনীসহ রাজপুত মহিলারা জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। সমাপ্তিতে লক্ষ্মণসিংহের পারিষদ রামদাস চিতোরকে পরাধীন ভারতের সঙ্গে তুলনা করে বলে:

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধ তমসায়;
জয়-লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য নাম,
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দিশালা হায়।
... তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন;
হয়ে পদানত, দাস–ব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল – মরণই জীবন।"

উল্লেখ্য, এ কাহিনীর সঙ্গে টড রচিত রাজস্থানের চিতোর আক্রমণের সামঞ্জস্য থাকলেও এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক নয়। এটিও পূর্বের ফরাসী নাট্যকার জাঁ রাসিনের BwdÑRwbqv নাটকের ভাব অবলম্বনে রচিত। আবার জাঁ রাসিনও এর কাহিনী নিয়েছিলেন গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিদিস-এর *Iphegenia at Aulis* থেকে।[১২৬] মুনীর চৌধুরীর বিবেচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাসিন-এর রচনা সামনে রেখে গ্রিক গল্পকে রাজস্থানের কাহিনীর ছকে সাজিয়ে তুলেছেন এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রয়োজনমত সংলাপ ও দৃশ্য সংযোজন করেছেন। যেমন, এ নাটকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, এবং ষষ্ঠ অঙ্কের পুরো অংশই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা।[১২৭] এ ছাড়া পুরোহিতের ছদ্মবেশে মহম্মদ

[১২৬] মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬–২৯৮
[১২৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

আলি, ফতে উল্লা, আলাউদ্দিন ইত্যাদি মুসলমান চরিত্রও নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবন। এ সব চরিত্রের সংলাপ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে নাট্যকার জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে গিয়ে যবন-বিদ্বেষ বা মুসলমান-বিদ্বেষও সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে মহম্মদ আলির চেলা ফতে উল্লার মুখে মুসলমানি আচার-আচরণের কৌতুকময় বিবরণে হাস্যরসের সঙ্গে উক্ত মনোভাব অস্পষ্ট নয়। যেমন, আলাউদ্দিন ও তার ওমরাহদের আলোচনায় পাওয়া যায় মুসলমান বিদ্বেষভাব:

আল্লা । দেখো উজির, এবার চিতোর গিয়ে এর বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতে হবে। এবার দেখব পদ্মিনী বেগম কেমন করে তার সতীত্ব রাখতে পারে? হিন্দুরাজাকে আমি এত করে বললেম যে, পদ্মিনী-বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ কল্লেই চিতোর- পুরী নিরাপদ হবে।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! পদ্মিনীর কথা কি, হুজুরের হুকুম হলে আমি স্বর্গের পরীও ধরে এনে দিতে পারি। চিতোর শহরে একবার প্রবেশ করলেই হুজুর দেখবেন, আপনার পদতলে কত শত পদ্মিনী গড়াগড়ি যাবে।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা। সে বিষয়ে তোমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা গেল। তুমি সে যুদ্ধের উপযুক্ত যোদ্ধা বটে।

... ...

আল্লা। আচ্ছা, তুমি এ বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধে যেতে কিসে এত সাহসী হচ্ছ বলো দেখি?

১ম ওমরাও। হুজুর! বয়স এমন কি হয়েছে – হদ্দ ষাট, আর বিশেষ আপনি আমাকে যে পদ দিয়েছেন তাতে বোধ হচ্ছে যেন আমার নব যৌবন ফিরে এলো। আর এমন কার্যে যদি প্রাণ না দেব, তবে আর দেবো কিসে?

আল্লা। সে যা হোক, দেখো উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখতে না পায়।

উজির। হুজুর! কাফেরদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্তব্য বটে।

সকল ওমরাও। অবশ্য–অবশ্য, তার সন্দেহ কি- তার আর সন্দেহ কি।

২য় ওমরাহ। আমাদের বাদশাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।

৩য় ওমরাহ। আমাদের বাদশার মতো ভক্ত মুসলমান কি আর দুটি আছে।[১২৮]

তেমনি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ফতে উল্লার সংলাপ লক্ষ করা যেতে পারে:

---

[১২৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, পৃ. ৫৮–৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ফতে। (পথ চলিতে চলিতে স্বগত) এই শহর ছাড়ায়ে আরো এক কোশ রাস্তা চল্লি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আসবে। অ্যাহন মুই আরো বিশ কোশের পাল্লা মাত্তি পারি অ্যামন তাকৎ কি মোর হয়েছে। চাল-কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা রফা করে ফ্যালেছিল, ভাগ্যি দিল্লি গ্যাছেলাম, তাই খায়ে বত্তালাম। বাবা! প্যাঁজ রসুনির এমনই গুণ, মোর বুকের ছাতি হিম্মতে যেন দশ হাত ফুলি উঠেছে। অ্যাহন আর মুই কোন বেটা হ্যাঁদুর তক্কা রাহিনে। মোরা বাদশার জাত, পরোয়া কি? সব নসিবির কাম। মুই বাদশা হলি তো আগে এই হ্যাঁদু বেটাদের কুটি কুটি করে জবাই করি; আর গদিতে ঠ্যাস্ মারি, খুব লম্বা চোড়া হুকুম করি, বাগুনির কাবাব আর চিংড়ির ছালোন বেনিয়ে খুব প্যাট ভরি খাই।...

(তিন জন রাজপুত রক্ষকের প্রবেশ)...

ফতে। (স্বগত) কেডা ও? তিনজন হেতিয়ের বাঁধা সিপুই–বাপপুইরে! এইবার মলাম আল্লা–(কম্পমান)

১ম রক্ষক। কথা কোস্ নে যে – বল কে, না হলে এখুনি দেখতে পাবি।

ফতে। মুই–মুই–মুই কেউ নই বাবা–

২য় রক্ষক। কেউ নই তার মানে কি? বেটাকে ঘা কতক দাও তো হে।

ফতে। বলছি বাবা, বলছি বাবা – মেরো না বাবা – মুই মোসাফের লোক–

৩য় রক্ষক। দেখছ, এত ঢাকবার চেষ্টা করছে তবু মুসলমানি কথা ওর মুখ দিয়ে আপনি যেন বেরিয়ে পড়ছে– ও বেটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের কোনো চর হবে।

ফতে। আল্লার কিরে – মুই মুসলমান নই বাবা – মুই হ্যাঁদু – মুই হ্যাঁদু – তোমাদের জাত ভাই –

১ম রক্ষক। বেটা বলছে আল্লার কিরে, আবার বলে মুসলমান নই (উচ্চ হাস্য) বেটা এখনও ঢাকতে চেষ্টা কচ্ছিস? আচ্ছা তুই কি জাত বল দিকি?

ফতে। মুই বেরাহ্মণ ঠাকুর, মুই-মুই-ম-ম-ম-মস্‌জিদে মর – মন্দিরে ঘন্টা নাড়্যে থাকি।[১২৯]

উল্লিখিত দৃশ্য ও সংলাপে ফতেউল্লার র্নিবুদ্ধিতা হাস্যরসের যোগান দিলেও তারই সূত্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ দুর্লক্ষ্য নয়। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

---

[১২৯] পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

> ফতেউল্লার ভাঁড়ামি নির্দোষ কৌতুক-রস নয়। এর মধ্যে জাতিগত ভাবে মুসলমানের জীবনযাত্রার নিকৃষ্টতা ও হাস্যকরতার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তথাকথিত মৌলিক বা ঐতিহাসিক নাটকে প্রধানতঃ যাবনিক প্রসঙ্গগুলোই স্বকপোলকল্পিত।[১৩০]

একই উদ্দেশ্য থেকে নতুনভাবে রচিত হয়েছে ষষ্ঠ অঙ্ক। মূল গ্রিক কিংবা ফরাসী নাটকে এ দৃশ্য ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ দৃশ্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে। সে সূত্রে নাটকে দেখা যায়, আলাউদ্দিন বিজয়ী হয়ে চিতোরের রাজধানীতে প্রবেশ করে দেখে প্রতি ঘরে চিতা জ্বলছে এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুত মহিলারা জহরব্রত পালন করছে। এ দৃশ্যে অভিভূত হয় আলাউদ্দিন:

আল্লা। তাই তো! এ কি! সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটি জ্বলন্ত চিতা বলে বোধ হচ্ছে। পথঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি চিতা জ্বলছে–ওঃ! কি ভয়ানক দৃশ্য ও কি আবার? ও দিকে আগুন লেগেছে নাকি?

সৈনিক। জাঁহাপনা! ও দিকে কতকগুলি বাড়ি পুড়ছে, কোন কোন রাজপুত গৃহে আগুন লাগিয়ে গৃহসুদ্ধ সপরিবারে পুড়ে মরছে।

আল্লা। কি আশ্চর্য!

... ...

(নেপথ্যে। কতকগুলি রাজপুতমহিলার সমস্বরে)

গীত

জ্বল, জ্বল, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন! শোন রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥[১৩১]

---

[১৩০] মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫০–৩৫১
[১৩১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বিভিন্ন রাজপুত মহিলাদের কণ্ঠে উক্ত গান মোট ছয়বার গীত হয়। উল্লেখ্য যে, দৃশ্যটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বালক রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করে নাট্যকার এবং অন্যদের চমৎকৃত করেছিলেন।[১৩২] এ ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে আরও তিনটি গান।

m‡iwRbx গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে (১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬) ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে’ পরপর চারবার মঞ্চস্থ হয় এবং অর্জন করে বিপুল জনপ্রিয়তা। প্রবল স্বাদেশিকতাবোধের তৎকালীন জোয়ারে এ নাটকের বিষয় এবং উপস্থাপনা কৌশল ও ব্যাপক দর্শক আকর্ষণে সমর্থ হয়। বিশেষ করে শূন্যে ভাসমান কালী মূর্তির আবির্ভাব, জনপ্রিয় সঙ্গীতের ব্যবহার, জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি বিষয়ও দর্শক আকর্ষণের অন্যতম উপায় ছিল বলে ধারণা করা যায়। সে সময়ের *The Statesman* পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে রয়েছে তার কিছু ইঙ্গিত। যেমন বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এ রকম:

> SRIMATI SUKUMARI DUTTA, AS SAROJINI.
>
> Plenty of Songs!
>
> PATRIOTS AND COUNTRYMEN
>
> Come and support us now!
>
> NOW OR NEVER!!

কখনো বিজ্ঞাপনে থাকতো, æTHE GODDESS KALEE IN THE AIR THE CITY CHITTORE ON FIRE..”[১৩৩] রাজপুত মহিলাদের চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য উপস্থাপনার কৌশলও ছিল উত্তেজনাকর। অভিনেত্রী বিনোদিনীর Avgvi K_v রচনা থেকে তার কিছু পরিচয় নেওয়া যাক:

> ... সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্‌ করছে। তখন বিদ্যুতের আলো ছিল না, স্টেজের ওপর ৪/৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই “জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ...” গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে...।[১৩৪]

---

[১৩২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬–৪৭

[১৩৩] ভূমিকাংশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. তেইশ – ছাব্বিশ

[১৩৪] উদ্ধৃত, প্রশান্তকুমার পাল, রবীজীবনী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

এ সবের সমন্বিত ফলে m‡ivRbx নাটক নিয়ে রীতিমত মেতে উঠেছিল দেশের মানুষ। এর গানগুলো দেশের সব জায়গায় গাওয়া হতে থাকে, শেষ দৃশ্যের অঙ্কিত ছবিও বিক্রি হতে থাকে অন্যান্য হিন্দু দেব দেবীর ছবির সঙ্গে। নাটকটি যাত্রায় রূপান্তরিত হয়ে শহরে ও গ্রামের আসরে অভিনীত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণযোগ্য, "শহরে মফস্বলে রঙ্গমঞ্চে এবং যাত্রার আসরে অভিনীত হইয়া সরোজিনী নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। আর কোন বাঙ্গালা নাটক এমন সর্বত্র সমাদর লাভ করে নাই।"[১৩৫]

তবে উল্লিখিত জনপ্রিয়তা কোন কোন দর্শকের মনে বিনোদিনী কথিত উম্মাদনাও সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। নাটক চলাকালে দর্শকের প্রতিক্রিয়া ছিল অস্বাভাবিক ও মাত্রাহীন। বিনোদিনীর রচনায় পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণবেশধারী ভৈরবাচার্য সরোজিনীকে বলি দেওয়ার জন্যে খড়গ চালাবার মুহূর্তে বিজয়সিংহ ছুটে এসে তাকে নিবৃত্ত করে। এ সময় অনেক দর্শক 'মার মার কাট কাট' করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়; এর মধ্যে একাধিক দর্শক ফুটলাইট ডিঙিয়ে মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়ে রীতিমত অজ্ঞান হয়ে যায়।[১৩৬] এ ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়, m‡ivRbx নাটকস্থ সৃষ্ট উন্মাদনা দেশবাসীর মনে কতটুকু স্বাদেশিকতাবোধ জাগাতে সক্ষম হয়েছিল, তা যেমন বলা মুশকিল, তেমনি এ উন্মাদনায় তথাকথিত যবনবিদ্বেষ যে সক্রিয় ছিল না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াও কঠিন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমহেন বসু, হরলাল রায়, অমৃতলাল বসু, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারও তাঁদের রচিত বিভিন্ন নাটকে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সচেতনভাবে প্রতিফলিত করেছেন। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের fviZgvZv (১৮৭৩) রূপক নাটকে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপ ও গানের মাধ্যমে ভারতের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে এর অবসান ঘটাবার জন্য। সুকুমার সেনের মতে, এ নাটকের মর্মকথা হিন্দু মেলায় পরিবেশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি" এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারত সন্তান" গানের মধ্যে নিহিত।[১৩৭] কাহিনীতে আছে: দুঃখিনী ভারতমাতা তাঁর নিদ্রামগ্ন সন্তানদের তাঁর দুঃখ ঘোচানোর নির্দেশ দেন। সন্তানরা খাবার চাইলে মা বলেন, "বাবা, মায়েতে কি দুধ আছে, যে তোদের দেবো, বাছা শরীরে কি রক্ত আছে সব চুষে খেয়েছে।[১৩৮]

এরপর তিনি সন্তানদের কাজকর্মের চেষ্টা করতে বললে সন্তানরা বলে:

---

[১৩৫] সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

[১৩৬] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

[১৩৭] সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

[১৩৮] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১ম। মা আমাদের চারিদিক বন্ধ। কোনদিকে যাই মা? আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ মা, কি কোরবো মা? কেমন করে খাব মা?

... ...

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন পর্যন্ত খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের তাঁতগুলি পর্যন্ত বন্ধ।...[১৩৯]

মা এবার মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাতে পরামর্শ দিলে সন্তানরা বলে যে, তাঁর কোন দোষ নেই, তাদের কান্না সাগর পার হয়ে তাঁর কাছে যেতে পারে না। তবুও মায়ের কথায় আবার ডাকার চেষ্টা করলে এক সাহেব এসে জানায় যে, মহারাণী এদেশের কেউ নন, তিনি 'ইংলন্ডেশ্বরী'। তাঁর ভাবনা-চিন্তা কেবল তাঁর দেশ এবং দেশের সন্তানদের জন্য। এটুকু বলে সে ভারত সন্তানদের পদাঘাত করে চলে যায়। এবার দ্বিতীয় সাহেব এসে মাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে, নতুন গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ঘুচিয়ে দেবেন সবার দুঃখ। এরপর ধৈর্য, সাহস এবং ঐক্য চরিত্র প্রবেশ করে এবং ভারতবাসীকে তাদের অনুসরণ করার আহ্বান জানায়।

কাহিনীতে সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। একই সঙ্গে ইংরেজরা যে এদেশীয় বণিক ও পুঁজি মালিকদের ব্যবসা বাণিজ্যে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তারও ইঙ্গিত রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণি যে ইংরেজ শাসনের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ কামনা করতে পারে না, সে দুর্বলতাও দৃষ্টি এড়ায় না।

পনেরো মিনিটের এ রূপক দৃশ্যের অভিনবত্ব দর্শকদের বেশ মুগ্ধ করেছিল। 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' এর উপস্থাপনায় দর্শক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল:

> দৃশ্যের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘ নিশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল।[১৪০]

উল্লিখিত নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নাট্যকার f\i‡Z heb (১৮৭৪) নামে আরো একটি রূপক নাট্য রচনা করেন। এ নাটকে দেখানো হয়েছে ভারত দখলকারী মুসলমানদের বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতসন্তানরা সংগ্রামবিমুখ ও অসহায়। বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে মুসলমানের কথা বলা হলেও নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল দর্শকের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা সৃষ্টি করা। তাই নাটকের একটি সংলাপে পাওয়া যায় এ পরাধীন অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান। যেমন,

---

[১৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

[১৪০] উদ্ধৃত; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণমন,

লভিতে সে ধন কররে যতন।

মনে কর সেই আর্য্যসুতগণে,

হরিণ ভবনে, সিংহ সম রণে।

ঐ শোন কাঁদে ভারত জননী।

হাহাকার করি লুটায়ে ধরণী।

হারায়ে উজ্জ্বল স্বাধীনতা মণি।[১৪১]

কিরণচন্দ্রের অনুকরণে অন্যান্য নাট্যকারও দেশাত্মবোধক রূপক নাট্য রচনা করেছিলেন। যেমন হারাণচন্দ্র ঘোষ-এর fviZ 'twLbx (১৮৭৪), নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের GB wK †mB fviZ (১৮৮২), কুঞ্জবিহারী বসুর ag‡ÿ Î (১৮৭৫) ইত্যাদি।

সাধারণ নাটকে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব অন্যান্য নাট্যকারের রচনায়ও লক্ষ করা যায়। এ দিক থেকে প্রথম আসে নাট্যকার হরলাল রায়ের †ngjZv (১৮৭৩) নাটক। পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত এই রোমান্টিক নাটকে পরাধীনতার বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, সত্যসখার একটি সংলাপে আছে : "স্বর্গতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করবে, তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারতসন্তান প্রাণত্যাগ করুক।"[১৪২]
তাঁর অপর নাটক e‡½i mLvemvb (১৮৭৪) রচনায় বখতিয়ার খিলজির বাংলাদেশ অধিকারের কাহিনী অবলম্বনের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ প্রকাশের চেষ্টা আছে। তবে এ নাটকে যে পরিমাণ মুসলিম বিদ্বেষ দেখানো হয়েছে তাতে উক্ত চেতনা খণ্ডিত হয়ে পড়েছে বলে অনুমান হয়।

নাট্যকার মনোমোহন বসু পৌরাণিক নাটকের মোড়কে সমকালীন ভারতের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন nwikP›' (১৮৭৫) নাটকে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের বিচার, রাজস্ব, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় এ নাটকে কৌশলে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমালোচকের মতে, তৎকালীন সংবাদপত্রে উত্থাপিত সমস্যাবলীর সঙ্গে এসবের সামঞ্জস্য ছিল অনেকখানি।[১৪৩] এ নাটকে ইংরেজকে তুঙ্গ দ্বীপবাসী রাজা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি গানের কিছু অংশে তার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয় :

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,

যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,

কেমনে হরিল কেহ না জানিল

[১৪১] উদ্ধৃত; প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩.
[১৪২] উদ্ধৃত; সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
[১৪৩] প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

এগ্নি কৈল দৃষ্টিহীন।

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,

সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষী শেষে

হায় গো রাজা কি কঠিন্। [১৪৪]

এ গানের বক্তব্যের সঙ্গে উৎপল দত্ত পরিবেশিত নিম্নোক্ত তথ্য তৎকালীন ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন,

"প্রাথমিক লুণ্ঠনের পর আর ভারতের শিল্প পুঁজি জমে ওঠারই কোনো সুযোগ ইংরেজ শাসক দেন নি। ১৮৭০-এর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধির পর বছরে তিন কোটি পাউন্ড ভারত থেকে চলে যেত ইংল্যান্ডে।[১৪৫]

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের †h´e‡b †hvwMbx (১৮৭৬) নাটকে পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ এবং ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মুসলমান শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ উপলক্ষ্যে মূলত সে সময়ের পরাধীন ভারতের মর্মবাণী তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কারাগারে বন্দী পৃথ্বীরাজের সংলাপে সে ইঙ্গিত ভাষারূপ পেয়েছে। যেমন –

... লুটচে ঐ লুটচে, ভারতের সর্বস্ব লুটচে। ভারতবাসিগণ! দুরাত্মা ম্লেচ্ছেরা ভারতের সর্বস্ব লুটচে, চেয়ে দেখ। ওঠ, ওঠ, নিদ্রা ত্যাগ কর। তরবারি ধর, তরবারি ধর, জননী ভারতভূমিকে রক্ষা কর। সমরে প্রাণত্যাগ কর, বীরগতি লাভ হবে।[১৪৬]

নাট্যকার প্রমথনাথ মিত্র Rqcvj (১৮৭৬) নাটকে গজনীর সুলতান মাহমুদের সঙ্গে লাহোরের রাজা জয়পালের সংগ্রামের পটভূমিতে দেশাত্মবোধ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া ভারতে মুলসমান আক্রমণ ও অত্যাচার কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি (প্রায় দশটি) নাটক। যেমন হরিমোহন ভট্টাচার্যের mg‡i Kvwgbx (১৮৭৫), মহেন্দ্র লাল বসুর wP‡Zvi ivRmZx cwÙbx (১৮৮৫), রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর fviZ weRq (১৮৭৫), নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের fvi‡Zi mLkkx hebKe‡j (১৮৭৫) কালীচরণ পালের A¯ÍwgZ mh¨ (১৮৭৬), মনোরঞ্জন গুহের fviZ ew›'bx (১৮৭৬) ইত্যাদি।

বাংলা নাটকের অন্যতম প্রধান দিকপাল গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৪–১৯১২)-এর বিভিন্ন নাটকেও দেশাত্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রধানত পৌরাণিক নাটক রচনা করলেও তাঁর কয়েকটি রূপকধর্মী গীতিনাট্য এবং ঐতিহাসিক নাটকে আছে সে সময়ের জাতীয় চেতনার প্রতিফলন। যেমন,

---

[১৪৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

[১৪৫] উৎপল দত্ত, গিরিশ মানস, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩

[১৪৬] উদ্ধৃত; সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

রূপক গীতিনাট্য gnvcRv (১৮৯০)-য় তাঁর গভীর দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর একটি গানে আছে :

নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায় ॥
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়।[১৪৭]

উল্লেখ্য, গীতিনাট্যটি কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল।[১৪৮] বোধ করি সে জন্যে বৃটানিকার প্রতি আবেদন নিবেদনের ছাপ রয়ে গেছে এর কাহিনীতে। ঐতিহাসিক নাটক wmivR‡ÏŠjv (১৯০৫)-র মাধ্যমেও গিরিশ তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকেও বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র। কারণ ভারতীয় অন্যান্য জাতির চেয়ে বাঙালিরা ছিল সুনির্দিষ্ট জাতীয় স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যের অধিকারী এবং তাদের দৃঢ় ঐক্যচেতনা উক্ত আন্দোলন বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছিল। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন আন্দোলনের কেন্দ্র বিনষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[১৪৯] স্বভাবতই এ সিদ্ধান্ত শিল্পপতি ব্যবসায়ী বা জাতীয় বুর্জোয়া, জমিদার, মধ্যশ্রেণিসহ বাঙালির প্রায় সকল স্তরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং এর বিরুদ্ধে সারা বাংলায় শুরু হয় ব্যাপক জাগরণ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ উক্ত সিদ্ধান্তের দুই মাসের মধ্যেই ইংরেজের কাছে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয় এবং ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার আবেগময় কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করেন। এ নাটকে তিনি সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে চিত্রিত করেন স্বাধীনতাপ্রেমিক শৌর্যবীর্যের প্রতিনিধিস্থানীয় এক চরিত্র হিসেবে।[১৫০] ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে নাটকটি মঞ্চস্থ (৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[১৫১] এ নাটকে

---

[১৪৭] গিরিশ রচনাবলী (সম্পা. দেবীপদ ভট্টাচার্য), ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৩৮

[১৪৮] গিরিশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫০

[১৪৯] "... ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আগেভাগেই আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।" ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮৬, পৃ. ৪৯৭

[১৫০] যদিও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের Seir Mutaqherin গ্রন্থে সিরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "... he was ignorant of the world, and incapable to take a resonable party, being totally destitute of sense and penitration and yet having a head so obscured by the smoke of ignorance, ... that he knew no distinction betwixt good and bad, nor betwixt vice and virture". উদ্ধৃত; অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

[১৫১] গিরিশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭–৩৬৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায় নির্বিশেষে ইংরেজের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান শোনা যায় সিরাজের সংলাপে। যেমনঃ

বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ–
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।[১৫২]

নাটকটির জনপ্রিয়তায় বিচলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার এর অভিনয় এবং প্রচার বন্ধ ঘোষণা (জানুয়ারি, ১৯১১) করে। এ দিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বিদেশী পণ্যবর্জন এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। স্বদেশী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এ সংগ্রাম সারা বাংলায় গণ-জাগরণ সৃষ্টি করে। ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে স্বদেশী আন্দোলন বিস্তৃত হয় অন্যান্য প্রদেশে। এ পটভূমিতে গিরিশ gxiKwmg (১৯০৬) নামে অপর একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপন করেন। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা wmivR‡Ïŝjvকেও ছাড়িয়ে যায়। ‘মিনার্ভা থিয়েটারে’ এ নাটক প্রতি শনিবারে একটানা সাত মাস চলেছিল। এ নাটকে মীরকাসিমের একটি সংলাপে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে এ ভাবেঃ

> ... আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, আমার হৃদয় অধীর; – কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হতে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান; – শত্রুদমন বা প্রাণ বিসর্জ্জন।[১৫৩]

G Kvi‡Y gxiKwmg নাটকও বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার। পরবর্তী নাটক QÎcwZ wkevRx (১৯০৬)- ও গিরিশের স্বাদেশিক চেতনার প্রকাশ। শিবাজী মধ্যযুগের একজন মারাঠী হিন্দু বীর হলেও এ নাটকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিবাজীর একটি সংলাপে বিষয়টি এসেছে এ ভাবেঃ

---

[১৫২] গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৫৬৩
[১৫৩] গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

> স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই।[১৫৪]

এ নাটক সম্পর্কে সে সময়ের পত্রিকা 'বসুমতী'তে লেখা হয়:

> ... শিবাজীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন শিবাজী দেশ বিশেষে, যুগবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধরাতলে যখন অত্যাচার প্রবল হয়, দরিদ্র উৎপীড়িত হয়, দেবমূর্তি চূর্ণ হয়, সতীলক্ষ্মীগণ পাষণ্ড-হস্তে নিগৃহীতা হন – তখনই সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন... ।[১৫৫]

gxiKwm‡gi মতো Qî cwZ wkevRx নাটকও লাভ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এটি সে সময় একই সঙ্গে 'মিনার্ভা' ও 'কোহিনুর' দুটি থিয়েটারে অভিনীত হতে থাকে। সে সময়ের স্টেট্সম্যান পত্রিকার মতে, মিনার্ভায় এ নাটক একটানা দশ মাস চলার পরও এর প্রতিটি অভিনয়ে মিলনায়তন দর্শকে কানায় কানায় ভরে যেত।[১৫৬] বলা বাহুল্য, এ কারণে পূর্বের দুটি নাটকের সঙ্গে Qî cwZ wkevRx নাটকও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

এ ধারার অন্যতম নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) স্বদেশী পটভূমিতে mvevm evOwj (১৯০৬) নাটক রচনা করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের যশোগাথা তুলে ধরেন। বিদেশী পণ্য বর্জন এবং দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশী দ্রব্য ব্যবহারের চেতনা সৃষ্টিতে এ নাটক সে সময় পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নাটকে ব্যবহৃত রজনীকান্ত সেন-এর একটি গান সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল :

> মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
> মাথায় তুলে নে রে ভাই;
> দীন-দুখিনী মা যে তোদের
> তার বেশি আর সাধ্য নাই।
> ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
> অপার স্নেহ দেখতে পাই;
> আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ

---

[১৫৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
[১৫৫] গিরিশচন্দ্র , পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২
[১৫৬] æThough it has been running for about ten weeks now the large auditorium was crammed in every part and early in the evening the sale of tickets had to be stopped, the large overflow helping to fill the adjacent playhouse". cited, গিরিশচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

...   .

আয় রে আমরা মায়ের নামে

এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই –

পরের জিনিস কিনব না, যদি

মায়ের ঘরের জিনিস পাই।[১৫৭]

একইভাবে ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে দেশবাসীর অন্তরে শক্তি ও সাহস জোগাবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর রচিত cZvc-Aw‘Z¨ (১৯০৩) ও cjvkxi cvqwðË (১৯০৭) নাটক দুটির অবদান ছিল দেশাত্মবোধ জাগরণে।

এ সময়ের আরেকজন প্রতিভাধর নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধের সচেতন প্রচার আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনিও টডের গ্রন্থ থেকে রাজস্থানের কাহিনী নিয়ে cZvcwmsn (১৯০৫), ‘Mv‘vm (১৯০৬) ও †gevi cZb (১৯০৮) নাটক রচনা করেন। তবে বিশ্বস্তভাবে ইতিহাস অনুসরণ এবং একই সঙ্গে চরিত্রসমূহ দ্বন্দ্বময় করে তোলার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থকতা অন্যান্য নাট্যকারের চেয়ে ছিল বেশি। cZvcwmsn নাটকে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রাজপুত বীর প্রতাপের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমালোচকের মতে, “প্রতাপের সংগ্রামশীলতা ও দেশের জন্য দুঃখবরণের কাহিনী সে যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।”[১৫৮] তাঁর পরবর্তী নাটক ‘Mv‘vm-এ তৎকালীন ঐক্যচেতনা প্রসারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি চেষ্টা করেছেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণী ফুটিয়ে তোলার। কাশেম ও দিলীর খাঁ চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর যুগের ভাব রূপায়িত করেছেন। মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর একটি সংলাপ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

> হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে ভাই ব'লে, আলিঙ্গন করুক. দেখি সম্রাট্! সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।[১৫৯]

বলা বাহুল্য, এ সংলাপ সতের শতকের ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের সেনাপতির নয়, এটি বিশ শতকের স্বদেশী আন্দোলনের চেতনার হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা মাত্র। তুলনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে দেশাত্মবোধ বা জাতীয় চেতনার প্রভাব কিছুটা কম।

---

[১৫৭] উদ্ধৃত; বাংলা স্বদেশী গান, গীতা চট্টোপাধ্যায়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৮০

[১৫৮] দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি ও নাট্যকার, রথীন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ২৬২

[১৫৯] দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (সম্পা. রথীন্দ্রনাথ রায়), ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

biRvnvb (১৯০৮) কিংবা mvRvnvb (১৯০৯) নাটকে উক্ত প্রভাবের চেয়ে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের তাড়না ছিল প্রবল। তা সত্ত্বেও এ নাটকসমূহে ব্যবহৃত বেশ কিছু সঙ্গীতে স্বদেশপ্রেম এবং দেশীয় ঐতিহ্যের প্রকাশ বেশ স্পষ্ট। এ দিক থেকে সাজাহান নাটকে সুজার স্ত্রী পিয়ারার কণ্ঠে কীর্তনের সুরে শোনা যায় দুটি গান, যথাক্রমে জ্ঞানদাস রচিত বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' এবং চণ্ডীদাসের – 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম'। গান দুটি পিয়ারা চরিত্রের মানস প্রবণতা কতটুকু ধারণ করতে পেরেছে সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে, এগুলোতে বাঙালির একান্ত আপন সত্তার সুর যেন স্পন্দিত হয়ে ওঠে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে চারণ বালকদের কণ্ঠে শোনা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গান। এ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকেও পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে যুগচেতনার মর্মবাণী। এ কারণে কলকাতার রঙ্গমঞ্চ ছাড়াও তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।[১৬০]

দেখা যাচেছ ইংরেজদের অনুসরণে বিনোদনের উদ্দেশ্যে সূত্রপাত ঘটেছে আধুনিক বাংলা নাটকের। আর এ যাত্রায় সহায়তা এসেছে মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ থেকে। কিন্তু নাট্যশিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে দ্রুত নাটকে যুক্ত হয় সামাজিক সমস্যা। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শুরু করে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বিষয়ও নাটকে স্থান করে নেয়। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দী তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে সে সংগ্রামে ছিল সমাজ প্রগতির উপাদান। এ সময়ের বাংলা নাটক উক্ত রাজনীতির সবলতা ও দুর্বলতার উভয় দিক কম-বেশি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। সবলতার দিক থেকে: তৎকালীন অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষক সমাজের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের bxj ‘cY, মীর মশাররফ হোসেনের Rgx‘vi ‘cY, দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের Pv-Ki ‘cY এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের eo mwj‡Ki Nv‡o †iv ইত্যাদি নাটকে। এর সঙ্গে সমাজ-সংস্কারমূলক এবং ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কারণ, এসব নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে উদীয়মান বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তশ্রেণির পক্ষে সামন্ত-সংস্কার এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা। উল্লেখ্য, অধিকৃত ভারতকে শোষণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিল তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসেবে এখানে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই

[১৬০] æSome of the dramas of Dwijendralal Roy reflected the national spirit in a most imposing manner and there was hardly any important town or village in Bengal in which one or other of his works was not staged”. Life and Time of C.R. Das, by Prithwis Ch. Roy. উদ্ধৃত; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৬৬–৬৭

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।[১৬১] ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার মাধ্যমে ঘটে তার আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনী। এ সময়ের নাটকের অন্যতম দুর্বলতা ছিল – জাতীয় ভাবোদ্দীপক কিছু নাটকের বক্তব্য সমাজ-প্রগতির পক্ষে পরিপূর্ণভাবে স্থিত না থাকা। বিশেষ করে, জাতীয়তাবাদী ভাব প্রকাশক রোমান্টিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় নাটকগুলোতে ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতারও জন্ম দিয়েছে। স্মর্তব্য, এ প্রবণতা নাট্যকারদের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়, তা ছিল মূলত তৎকালীন মধ্য ও উচ্চ শ্রেণির রাজনীতি-চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। এ রাজনীতির উৎস সন্ধানে গেলে বলতে হয়, উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে সূচিত হওয়া জাতীয়তাবাদের চেতনা ব্যক্ত হয়েছিল – ধর্মীয় পরিভাষায়। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, হিন্দু ঐতিহ্য আবিষ্কারে গৌরববোধ, সর্বোপরি হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সমন্বয়ে উক্ত জাতীয়চেতনা হিন্দু জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন:

> হিন্দু মেলার (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠাতারা যে জাতীয়তাবাদী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা খাঁটি বাঙালি হবার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যা করছিলেন সেটা হলো নিজেদেরকে অর্থাৎ হিন্দু মধ্যবিত্তকে, বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। এই কাজ যে কোন-একটি প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; বহু প্রতিষ্ঠানেই এই ঘটনা ঘটছিল। এর ফল শুভ হয় নি, হবার কথাও নয়।[১৬২]

লক্ষণীয় যে, এর নামকরণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে অ-হিন্দুর অংশগ্রহণের ব্যাপারে নির্বাধ আহ্বান ছিল অনুপস্থিত। বিষয়টি সে সময়ই কারো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উক্ত কারণে এর নাম পরিবর্তনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও জানানো হয়েছিল। 'আর্যদর্শন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয় :

> ভারতের সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্তত একদিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন, এমন একটা উপলক্ষ্য চাই, এমন একটি স্থান চাই। আমরা মেলার অধ্যক্ষদের নিকট করজোড়ে এ ভিক্ষা চাই, তাহারা যেন এ মেলাকে কোন সংকীর্ণ ভিত্তির উপর ন্যস্ত না করেন। আমাদের ভিক্ষা তাহারা যেন এ মেলাকে এখন হইতে "হিন্দু মেলা" নাম না দিয়া 'ভারত মেলা' নাম দেন। যেন ইহা ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়।... আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার রুদ্ধ রাখিব না।[১৬৩]

---

[১৬১] "বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ অধিকারের ফলে ভারতবর্ষে যে নতুন বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভারতীয় সমাজে যে নতুন সামাজিক শক্তির অবির্ভাব ঘটেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। স্বার্থগুলোর বস্তুগত বিরোধের ফলেই জন্ম হয়েছিল এই জাতীয়তাবাদের।" ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, এ আর দেশাই, কলকাতা, ১৯৮৭. পৃ. ১৩৭

[১৬২] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙালীর জাতীয়তাবাদ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩২৯

[১৬৩] উদ্ধৃত; সুকান্ত পাল, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য, এ আবেদনে মেলা কর্তৃপক্ষ সাড়া দেননি, নামও পরিবর্তিত হয়নি। বস্তুতপক্ষে সে সময়ের শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণি, ইংরেজের বিরুদ্ধে সাধারণ জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় উক্ত নেতৃত্বের স্বার্থ এবং নিম্নশ্রেণির জনগণের স্বার্থ মোটেই এক ছিল না। সে ক্ষেত্রে ধর্মই ছিল এ সব বিরোধী শ্রেণির মধ্যে ঐক্যের সহজ পথ।[১৬৪] আর এ ব্যাপারে ইংরেজ শাসকের প্রশ্রয়, উৎসাহ এবং উস্কানী-নীতি ছিল বরাবরই সক্রিয়। ফলে এক সর্বপ্লাবী ধর্মচেতনা বাঙালির ভাব-সংস্কৃতিক্ষেত্র অধিকার করে রেখেছিল। এই সর্বাঙ্গীন ধর্মপ্লাবন থেকে নাট্যসাহিত্য দূরে থাকতে পারে নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রধানত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত এ ধারা সক্রিয় ছিল। দেখা গেছে, এ পর্যায়ে হিন্দু অবতার, মহাপুরুষ, পুরাণ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে লেখা হয়েছে প্রায় ৭০টির মতো নাটক। এ সবের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্র বা কাহিনী নির্ভর নাটকের প্রোটাগনিষ্ট চরিত্ররা সুযোগ পেলেই বিদেশি বিজেতা মুসলমান বা ‘যবন’ (ইংরেজ শব্দের পরিবর্তে)-এর বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করেছে, দেশপ্রেমের আস্ফালন করেছে। এর ফলে নাট্যকারের উদ্দেশ্য যা-ই থাক, সাধারণ দর্শকের মনে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ সৃষ্টি মোটেই অসম্ভব ছিল না। বিভিন্ন নাটক নিয়ে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকে সরোজিনীকে এক ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী মুসমলমান বলি দিতে প্রস্তুতি নেওয়ার দৃশ্যে প্রেক্ষাগৃহে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হতো। এ দৃশ্যে উত্তেজিত দর্শকের মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বেসামাল প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তৎকালীন অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১৬৫]

---

১৬৪ সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক রজনী পাম দত্তের ভাষায় “The Orthodox Nationalist believed that in this way they were building up a mass national movement of opposition to imperialism”. R Palme Dutt, Ibid, p. 328
বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, “ধর্ম ছিল ঐতিহ্যের মধ্যে অভ্যাসের ভেতরে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্তের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আশ্রয়ের। বিদেশী শাসক যতই কৃপা করুক, সম্মান করতো না; আত্মসম্মান রক্ষা করবার একটা জায়গা দরকার ছিল। ধর্মের কাছ থেকে সেটা পাওয়া গেল। তাছাড়া ধর্ম একটি আত্মপরিচয়ের ব্যাপারও হয়ে দাঁড়ালো। এই পরিচয় নিয়ে গর্ব করা যায়, এর ভিত্তিতে নিজেদেরকে সংগঠিত করা চলে এবং এর সাহায্যে নীচে যাদের অবস্থান সেই জনগণকে কাছে ডেকে বিনামূল্যে ব্যবহার করাও সম্ভব হয়।” সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮–৩৯

১৬৫ কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বললেন “সব মিথ্যে, সব মিথ্যে ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর, [বিনোদিনীর ভুল হচ্ছে, নাটকে তখনও ভৈরবাচার্য্যের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়নি] অমনি সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! জন-দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। উদ্ধৃত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ছাব্বিশ (ভূমিকাংশ)

Dhaka University Institutional Repository

একই নাট্যকারের জনপ্রিয় নাটক AkægZx (১৮৮৯) নিয়েও বাংলা এবং বাংলার বাহিরে, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে, বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে ছিল। এ নাটকে প্রতাপসিংহের এক কল্পিত কন্যার সঙ্গে প্রণয় ঘটে মুসলমান যুবরাজ (আকবর-পুত্র) সেলিমের। মুসলমান যুবকের সঙ্গে হিন্দু রাজকন্যার এই কল্পিত প্রণয়ের কাহিনীতে মহারাষ্ট্রের হিন্দুরা এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, সেখানে আশঙ্কাজনকভাবে বাঙালি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। পরে উদয়পুরের তৎকালীন রাজা ফতেহ্ সিং-এর কাছে পত্র দিয়ে নাট্যকার তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, পরবর্তী সংস্করণে বিষয়টি সংশোধিত হবে।[১৬৬] নাট্যকার গিরিশ ঘোষের mrbvg (১৯০৪) নাটকেও লক্ষ করা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সৎনামীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তীব্র মুসলমান বিদ্বেষ। এ কারণে নাটকের চতুর্থ প্রদর্শনীতে (২১ মে ১৯০৪) একদল উত্তেজিত মুসলমান প্রতিবাদ জানালে ‘ক্লাসিক থিয়েটার’ কর্তৃপক্ষ সে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[১৬৭] নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে আপত্তিকৃত অংশ সংশোধন করে দেন নাট্যকার। উল্লেখ্য, ‘সৎনামী’ হিন্দু সম্প্রদায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করে একাধিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। উক্ত বিজয়ের কারণে এমন ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাদেরকে তলোয়ার দিয়ে কাটা যায় না, এমনকি গুলিও বিদ্ধ হয় না তাদের শরীরে। এক সময় আওরঙ্গজেবের কাছে পরাজয় ঘটলেও তাদের প্রাথমিক সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে সে সময় বহু হিন্দু কৃষক জনতা সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। কিন্তু গিরিশের নাটকে কল্পিত চরিত্রের আধিক্য ও অতিরঞ্জিত ঘটনায় ইতিহাসের চেয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভাব ও মুসলিম-বিদ্বেষ। দেবীপদ ভট্টাচার্যের মতে, mrbvg নাটকে গিরিশ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Av›‘gV (১৮৮২) উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের সূচনাকালে নাটকে সমকালের জাতীয়তাবাদী হিন্দু মানসই বিম্বিত হয়েছে ইতিহাসের সূত্রকে আশ্রয় করে।”[১৬৮]

অথচ bxj ‘cY, eo mwj‡Ki Nv‡o †iv, Rgx‘vi ‘cY ইত্যাদি নাটকের লেখকদের সে রকম বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি। কারণ এ নাটকসমূহে ইংরেজ বা জমিদারের নিগ্রহের শিকার সরাসরি শোষিত শ্রেণি তথা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোটা কৃষক সমাজ। অর্থাৎ বাস্তব শোষণ এবং তার প্রতিরোধমূলক বিষয় নিয়েই এ নাটকগুলো রচিত হয়েছে; অতীতের ভাব-ঐতিহ্য আশ্রয় করার প্রয়োজন পড়ে নি। তাই এ নাট্যকারদের শ্রেণিগত অবস্থান যা-ই হোক না কেন, নাট্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা তাঁদের শোষিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। পক্ষান্তরে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচয়িতারা উল্লিখিত শোষণ প্রক্রিয়া বিষয় হিসেবে না আনায় তাঁদের প্রাধান্য দিতে

[১৬৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ত্রিশ–ছত্রিশ (ভূমিকাংশ)
[১৬৭] গিরিশ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, (সম্পা. দেবীপদ ভট্টাচার্য), কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫ (ভূমিকাংশ)
[১৬৮] দেবীপদ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে তৎকালীন হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রবণতাকে। এর ফলে অনেক সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পাওয়ার পাশাপাশি নাটকের শিল্পমান হয়েছে দুর্বল। বঙ্গীয় নাট্যশালার তৎকালীন প্রাণপুরুষ, বহু নাটকের রচয়িতা গিরিশ ঘোষের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এ কথা অনেকখানি প্রযোজ্য। তৎকালীন ভক্তিবাদের জোয়ারে তিনি ব্যক্তিগতভাবেই শামিল হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক নেতা রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। একই সঙ্গে বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে সে ভাব হয়ে ওঠে আরও প্রবল। শুধু তাই নয়, এ ভক্তিধর্মের আদর্শ তিনি তাঁর নাটকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য। সুকুমার সেন-এর মতে:

> ... [রামকৃষ্ণ] পরমহংসদেবকে আদর্শ করিয়া গিরিশচন্দ্র যে কতকটা নূতন পথে চলিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে ইহাও বলিব যে, ভক্তিরসের প্রবলতা গিরিশের রচনাকে দর্শকদের উপাদেয় করিয়াছিল তাহার শিল্পকে উন্নত করে নাই।[১৬৯]

প্রসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিযোগিতামূলক নাট্যশালায় দর্শক আকর্ষণের প্রয়োজনে গিরিশকে যেমন একদিকে দুই মাস পরপর নতুন নাটক লিখতে হয়েছিল তেমনি প্রাধান্য দিতে হয়েছিল তৎকালীন দর্শক রুচিকেও।[১৭০] এমনকি দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিকে লক্ষ রেখে কখনো কখনো তাঁকে চরিত্র নির্মাণ করতে হয়েছিল। এ সব কারণে গিরিশচন্দ্রের নাটক সমসাময়িক দর্শকরুচির অনুগামী হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। তাই সমালোচকের এ মন্তব্যও সমর্থনযোগ্য যে, "সাধারণ বাঙালির মনে ধর্মভীরুতা ও ন্যায়ান্যায়বোধের যে ধারণা আছে গিরিশের আদর্শ তাহারই অনুগত।"[১৭১] বলা বাহুল্য, একই কারণে উক্ত প্রবণতা অন্যান্য নাট্যকারকেও প্রভাবিত করেছে সমানভাবে। আর এর সমন্বিত ফল হিসেবে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের বাংলা নাটকে দেখা দিয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রগতি-বিরোধী উপাদান। সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ এ সম্পর্কে বলেন:

> ...উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজে (এই) প্রগতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগেই প্রগতি পরাগতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যে বিধবা বিবাহের সমর্থনে এক কালে বহু গ্রন্থ রচিত হইতে দেখিয়াছি সেই বিধবার প্রণয় ও পরিণয় কাঠোরভাবে নিন্দিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গিরিশচন্দ্রের নাটকে। যে নারীকে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তি

---

১৬৯ সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

১৭০ "তাঁহার গ্রন্থ রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বহস্তে পুস্তক লিখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন এবং অপরে লিখিতে থকিতেন। ..."
"... রচনাকালে গিরিশচন্দ্র কখনও বসিয়া কখনও বেড়াইতে বেড়াইতে এত দ্রুত বলিয়া যাইতেন যে, কলমে কালি তুলিয়া লইবার অবকাশ হইত না; এ নিমিত্ত তিন চারিটি পেন্সিল কাটিয়া লইয়া তাঁহার সহিত লিখিতে হইত। ..." "... পৌরাণিক নাটকগুলির এক-একখানি লিখিতে গিরিশচন্দ্রের এক সপ্তাহের অধিক সময় লাগিত না।..." অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬–১৭৭

১৭১ সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল করিয়া মাইকেল ও দীনবন্ধু সূর্যালোকিত মুক্ত জগতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাকেই আবার শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া অসূর্যম্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিশ্চিত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৌরাণিক আদর্শপ্রাপ্ত সতীত্ব ও স্বামীভক্তির এক ধন্বন্তরী সুধা খাওয়াইয়া তাহাকে নিস্তেজ ও সম্মোহিত করিয়া রাখিলেন।[১৭২]

বস্তুতপক্ষে শাসক ব্রিটিশের উন্নত পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তৎকালীন নেতারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন নি। আর এ ব্যর্থতা অনেক পরিমাণে শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গিজাত বললে ভুল বলা হয় না। কারণ সে সময়ের বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব হয় নি যে, একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণির প্রগতিশীল ও বিকল্প সংস্কৃতিই হতে পারে ব্রিটিশদের চেয়ে উন্নততর সংস্কৃতি।[১৭৩] অথচ এর পরিবর্তে রাজনীতির ক্ষেত্রে, সনাতন ধর্মকে জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড করে তোলায় এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রচারের কারণে জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত ও শক্তিহীন। শুধু তাই নয়, জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে বহু সচেতন মুসলমানের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পেছনে হিন্দুয়ানীর ঐ বাড়াবাড়ি যে অনেকাংশে দায়ী তাতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সন্দেহ থাকে না। রজনী পাম দত্ত তাঁর India Today গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন:

> ... The insistence on orthodox religion as the heart of the national movement, and the proclamation of the supposed spiritual superiority of the ancient Hindu civilisation to modern æWestern" civilisation (What modern psychologists would no doubt term a compensatory delusion), inevitably retarded and weakened the real advance of the national movement and of political consciousness, while the emphasis on Hinduism must bear a share of the responsiblity for the alienation of sections of Muslim opinion from the national movement.[১৭৪]

জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি এ সময় মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার স্বতন্ত্র সংগঠনও গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন মৌলভী আব্দুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩), সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৬) ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন বিষয়ে দাবি দাওয়া

---

[১৭২] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

[১৭৩] æThey could not, on the basis of experience then in India, have any conception of the rising working class outlook and culture which alone can be the alternative and successor to bourgeois culture going byond it, taking what is of value and leaving the rest". R. Palme Dutt. Ibid, p. 327

[১৭৪] R. Palme Dutt, Ibid, P. 326

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করতে থাকেন স্বতন্ত্রভাবে। এই সূত্রে ব্রিটিশ শাসকও তাঁদের স্বাতন্ত্র্যকে কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার পথে চালনা করতে সমর্থ হয়, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লিগ' গঠনের মধ্য দিয়ে।

তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাসমূহ স্বাভাবিকভাবে নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের বাংলা নাটক প্রথম থেকেই সমাজ ও রাজনীতিকে অঙ্গীকৃত করেছে এবং তাতে সাফল্য লাভ করেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। যেমন, তৎকালীন নাটকের ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনা দমনের জন্যেই সরকার 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রচলন করে। আবার সে সময় রচিত সমাজ সংস্কারমূলক কোন কোন নাটকের প্রাসঙ্গিকতা এখনও বিদ্যমান। বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ের এ সাফল্য বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে আজও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

বাংলা নাটকের উল্লিখিত (জাতীয় ভাবোদ্দীপক) পর্যায়ে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁর বালক বয়সে উক্ত নাটকসমূহে উপস্থাপিত দেশাত্মবোধ এবং ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তাঁকেও প্রভাবিত করেছিল। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের m‡iwRbx নাটকের জন্য তিনি যে গান লিখে দিয়েছিলেন তাতে পাওয়া যায় এর আভাস। একই উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রের ciæweµg নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের একটি গান সংযোজিত হয়:

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।[১৭৫]

অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে গানটি আর ব্যবহার করা হয় নি। এ বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক দ্বারা প্রভাবিত হলেও সে চেতনা তাঁর নিজের নাটকে খুব একটা লক্ষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যচিন্তার স্বকীয়তায় তৎকালীন যুগবৈশিষ্ট্য অনেকাংশে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ এই বলে মনে হয় যে, তিনি বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের জন্য নাটক রচনা করেন নি; বরং 'রঙ্গমঞ্চ' (১৯০৩) নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, তাতে "কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন"-এর প্রাধান্য।[১৭৬] তিনি নাটক লিখেছেন প্রথমত, তাঁর একান্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার রসে সিক্ত মানসচেতনা প্রকাশের দাবিতে এবং

[১৭৫] উদ্ধৃত; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৯
[১৭৬] 'রঙ্গমঞ্চ', রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিল্পচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা-সংকলন (সম্পা. সতেন্দ্রনাথ রায়), কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৪৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের মানসভূমি কর্ষণের তাগিদে। ফলে তাঁর নাট্যধারা বিকশিত হয়েছে সমসাময়িক বাংলা নাটকের ধারা থেকে স্বতন্ত্র পথে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তাঁহার নাট্য রচনার সূত্রপাত হইলেও সমসাময়িক বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাহার কোন যোগ ছিল না"।[১৭৭]

বাংলা নাটকের সমসাময়িক ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের উক্ত অন্বয়হীনতা একটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক হয়েছিল। তা হলো, গিরিশ-অমৃতলাল-এর নাটকের মতো তাঁর নাটক সাধারণ দর্শকরুচির অনুগামী হয় নি। নান্দনিক এবং ভাবগৌরবের দিক থেকে এক প্রকার পরিস্রুত রুচির ছাপ তাঁর নাট্য আবহে সর্বদাই বিরাজমান থেকেছে। নেতিবাচকতার দিকটি হলো, তাঁর নাটক তৎকালীন নগরকেন্দ্রিক বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদনির্ভর রাজনীতিকে সরাসরি প্রতিফলিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আর ব্যাপক গণমানুষ তথা গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবির সঠিক প্রতিফলন ঘটানো অনেক নাট্যকারের মতো রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও শ্রেণিগতভাবে তেমন সহজ ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় কয়েকজন নাট্যকার রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং নারী অধিকার ভিত্তিক কয়েকটি নাটক রচনা করলেও সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণ দর্শক কিংবা পাঠকপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক সে সীমাবদ্ধতা অনেকখানি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল, যা পরবর্তী আলোচনায় লক্ষ করা যাবে।

---

[১৭৭] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০–৩১১

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

iex› ‘bvU‡K ivRbxwZ : c_g ce

ev j¥xwK cªZfv: নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা ev j¥xwKcªZfv (১৮৮১) একটি গীতিনাটক। ঠাকুরবাড়ি-প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্দজ্জন সভা'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১) অভিনীত হওয়ার জন্য নাটকটি রচিত এবং মুদ্রিত হয়। এর কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড় বছরের লন্ডন প্রবাস কাটিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন (১৮৮০)। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন – রবীন্দ্রনাথের এ ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া।[১] ইতোমধ্যে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ KweKvwnbx (১৮৭৮) এবং কাব্যোপন্যাস ebdj (১৮৮০) প্রকাশিত হয়েছে। সে সঙ্গে 'ভারতী' তে প্রকাশিত হচ্ছে ভানুসিংহের কবিতাসমূহ কয়েকটি অনুবাদ কবিতা, গান এবং য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রধারা। বাল্যকালে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে না হলেও পারিবারিক শিক্ষাপদ্ধতির কল্যাণে বিলেতি কলেজে পড়বার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তারই সুবাদে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে তাঁর পড়াশুনা চলেছিল বেশ স্বচ্ছন্দভাবে।[২] কিন্তু খুব সম্ভবত 'ভারতী'তে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রে কিছু বিষয়ে তাঁর মতামতে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিভাবকেরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসছিলেন।[৩] এসব পত্রে ইংরেজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির পার্থক্য, আয়ারল্যান্ড ও ভারতীয় উপনিবেশ সম্পর্কে 'হাউস অব কমন্স'-এর রাজনৈতিক বক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর খোলামেলা মন্তব্য ও বিশ্লেষণ প্রকাশ পাচ্ছিল।[৪] বলা বাহুল্য, এর কোন কোন বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছিল যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে রাজনৈতিক মতামত। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল বলেন :

> ... তিনি যখন লেখেন, 'আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বরদের প্রতি টান', কিংবা তাঁদের প্রতি ইংরেজ সদস্যদের আচরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন – তখন বুঝতে পারা যায় জোড়াসাঁকো

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর Rxeb¯§wZ-তে এবং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংল্যান্ড যাওয়ার কারণ হিসেবে ব্যারিস্টারি পড়ার কথা উল্লেখ করলেও প্রশান্তকুমার ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ যাত্রার পূর্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বয়সের সনদপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং "... বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫-১৯৩৫) লন্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য যে কোচিং ক্লাস খোলেন তাতে ১৮৭৯-এর শেষদিকে বা ১৮৮০-র প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথও যোগ দেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন"। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৪০-৪৩।

[২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

[৩] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪১৫ পৃ. ৯৪-৯৫

[৪] য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯০, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরবাড়ি ও হিন্দুমেলার স্বাদেশকিতার আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়ে তাঁর মনে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জাগ্রত হয়ে উঠেছে।[৫]

বস্তুত এ সময় রবীন্দ্রনাথের মনে ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমালোচনার উভয় মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল বলে মনে হয়। লন্ডনে যে ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তিনি ছিলেন, তাঁদের এবং কয়েকজন শিক্ষক সম্পর্কে করা প্রশাংসাসূচক মন্তব্যে পাওয়া যায় সে মনোভাবের পরিচয়। তেমনি ইউনির্ভাসিটি কলেজে তাঁর প্রিয় শিক্ষক হেনরি মরলির কাছে জমা দেওয়া প্রবন্ধে করেছিলেন ইংরেজ চরিত্রের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে কিছু আলোচনা।[৬] তাঁর রচনা এবং প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন হেনরি মরলি।

লন্ডন থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গান ও নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যুক্ত হন। এ সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের রচিত gvbgqx গীতনাট্য প্রস্তুত করছিলেন অভিনয়ের জন্য। একইসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিলে দেশি ও পাশ্চাত্য সুর মিশিয়ে রচনা করছিলেন নতুন নতুন গান। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথও ওই নাটকের জন্য একটি গান 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি' রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত gvbgqx বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিনাট্য রচনা-প্রচেষ্টা। কিছু সংলাপ গদ্যে লেখা না হলে এটি এ ধারার প্রথম রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারত।[৭] gvbgqx অভিনয়ের কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ ev j¥xwKcwZ fv রচনা করেন।

এ সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায়, সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন বলতে যা বোঝানো হয় তা ভারতে খুব একটা ছিল না। ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী কিছু সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কয়েকটি মিছিল সভা এবং বিবৃতির মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকত। বস্তুত ভারতের জাতীয় রাজনীতির সংঘবদ্ধ সূচনা ঘটে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার সূত্রে। এর আগে কয়েকটি বিছিন্ন সংগঠন যেমন 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' (১৮৪৩), 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'প্যাট্রিয়ট এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৬৫), 'হিন্দু মেলা', (১৮৬৭) 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬), প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্তের প্রবেশ শুরু হয়। আর এ সবের মধ্যে প্রধানভাবে ভারতীয় হিন্দুদের মনে ব্যাপক আকারে স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনা জাগাতে সমর্থ হয় 'হিন্দু মেলা'। কিন্তু এর উদ্যোক্তারা এতে কেবল হিন্দুদের প্রাধান্য দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে

---

[৫] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

[৬] "মেজদা একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভারতবর্ষে ইংরেজ" সম্বন্ধে। তাতে ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ব্যবহারের সব তথ্য। আমি অনেকটা তারই উপর লক্ষ রেখে ও কিছু রঙ চড়িয়ে ইংরেজদের নিন্দে করে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তার ডেস্কে চালান করে দিলুম", উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

[৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এ জাগরণ অনেকখানি খণ্ডিত হয়ে পড়ে।[৮] প্রসঙ্গত সে সময় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয় নি বলে যে কোন সমষ্টির ধর্মভিত্তিক পরিচিতিই ছিল প্রধান। অপর দিকে 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' ছিল জমিদার আইনজীবী এবং শহুরে মধ্যবিত্তদের গঠিত সংগঠন। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান কিছুটা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠনের চেষ্টা চালাতে থাকে। স্মর্তব্য 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের যে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয় তা-ই পরবর্তী সময় 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

'হিন্দুমেলা'র স্বাদেশিকতাবোধ যে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে উজ্জীবিত করেছিল তার কিছু পরিচয় আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের m‡iwRbx নাটকে প্রযুক্ত গানে এবং ইউরোপপ্রবাসীর পূর্বোক্ত পত্রে। এর নবম অধিবেশনে কবি 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন যা সে সময়ের দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিল বলে জানা যায়।[৯] কবিতার কিছু অংশ নিম্নরূপঃ

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,

গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি–

কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,

কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়!

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,

কেন রে ভারত কেন তুই, হায়.

আবার হাসিস্! হাসিবার দিন

আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

১৮

---

[৮] এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, "সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির এ দেশের উপর দাবি দাওয়া আছে ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহ বিধির (১৮৭২) প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন।" উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

[৯] æ... Baboo Rabindranath Tagore, the yongest son of baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, has composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience". Indian Daily News থেকে উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ভারত-কঙ্কাল আর কি এখন,

পাইবে হায় রে নূতন জীবন

ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,

আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।[১০]

জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধের পাশাপাশি একসময় তাঁর মনে ইংরেজ বিদ্বেষও যে জন্ম নিয়েছিল তা ইউরোপপ্রবাসীর পূর্বোক্ত পত্রে টের পাওয়া যায়। তবে এ সময় রচিত e√j¥xKc√Zf√ নাটকে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত মনোভাব প্রকাশিত হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সূত্রে রচিত বলে নাটকটি হয়ে উঠেছে সঙ্গীতের মাধ্যমে নাট্য উপস্থাপনার একটি প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ প্রসঙ্গে বলেন : "বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নতুন পরীক্ষা – অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব নহে।"[১১] নাটকের সূচনা ঘটে অরণ্যে বনদেবীর শান্তি প্রার্থনায়। দস্যুদলের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে বনের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। পশুরা আতঙ্কিত, পাখি করে না গান, বনের 'শ্যামল তৃণদল' ভেসে যায় রক্তে। এর পরেই দস্যুরা আসে গ্রাম লুঠ করা সম্পদ নিয়ে, নিজেদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করে সে সম্পদ। দস্যুদের সর্দার বাল্মীকি একদিন নরবলি দিয়ে কালীপূজা করার ঘোষণা দেন। এ উদ্দেশ্যে এক অসহায় বালিকাকে ধরে নিয়ে আসে দস্যুরা। কিন্তু বালিকার জন্য বনদেবীর কান্নায় বাল্মীকির প্রাণ কাতর হলে তিনি ছেড়ে দিতে বলেন সে বালিকাকে। দস্যুরা তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার ধরে নিয়ে আসে। এবার বাল্মীকি বালিকাকে মা সম্বোধন করে বলেন:

আয় মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।

কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!

নয়নে ঝরিছে বারি এ কি মা সহিতে পারি!

কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।[১২]

এ ভাবে দস্যু সর্দারের মনে করুণার জাগরণ ঘটলে তিনি তীর ধনুক ত্যাগ করে দস্যুদের প্রাণী শিকারেও বাধা দিতে থাকেন। যেমন,

রাখ্ রাখ্ ফেল ধনু, ছাড়িস নে বান।

---

[১০] রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৭ (সুলভ সংস্করণ), পৃ. ১১-১২

[১১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ১১৬

[১২] রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

হরিনশাবক দুটি   প্রাণভয়ে ধায় ছুটি

চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।

...   .

থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুন খেলা রাখ,

আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।[১৩]

এক পর্যায়ে ব্যাধদলের হাতে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে বাল্মীকির মুখ থেকে নিঃসৃত হয় ছন্দোবদ্ধ পদ। নিজের কণ্ঠে ছন্দোবদ্ধ পদ শুনে দস্যু সর্দার বাল্মীকি নিজেই বিস্মিত ও বিমোহিত হন। এ অবস্থায় তাঁর হৃদয়ে আবির্ভাব ঘটে দেবী সরস্বতীর। এতে তাঁর মনে হয় 'জগত-চরাচর' সবই যেন কবিতাময় হয়ে উঠেছে। শেষ দৃশ্যে সরস্বতীর পরিবর্তে হঠাৎ লক্ষ্মীর আবির্ভাব হলে বাল্মীকি তাঁকে ফিরিয়ে দেন বিনয়ের সঙ্গে। অবশেষে দেবী সরস্বতী এসে কবি বাল্মীকিকে উদ্দেশ করে বলেন:

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,

তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।

যে রাগিনী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন

সে রাগিনী তোরই কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।[১৪]

এভাবে সরস্বতী বাল্মীকির হৃদয়ে কবিত্ব শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে দিলে তাঁর মনে জাগে সৃষ্টির বেদনা। আর এ প্রক্রিয়ায় দস্যুসর্দার বাল্মীকি সর্ব মানব ও প্রাণীর প্রতি করুণা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কবিতে পরিণত হন। ছয় দৃশ্যে সমাপ্ত এ গীতিনাট্যে বিদেশি সুরে কয়েকটি গান এবং দস্যু রত্নাকরের কবি বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার কাহিনীর নাট্য-রূপায়ণে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ছায়াপাত ঘটেছে। অবশ্য কাহিনী সৃষ্টির মৌলিকতা এতে নেই বললে চলে।[১৫] কাহিনীতে সে-সময়ের প্রতিষ্ঠিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর mvi‘vg½j (১৮৮০) কাব্যের প্রভাব পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। ক্রৌঞ্চ-বধ পরবর্তী বাল্মীকির হৃদয়ে সরস্বতীর আবির্ভাবের বর্ণনা অনেকখানি বিহারীলাল থেকে গৃহীত। যেমন-

চক্ষে করি দরশন

জড়িমা-জড়িত মন,

---

[১৩] রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ. ২২০

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

[১৫] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

করুণ হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;

সহসা ললাটভাগে

জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,

জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে।[১৬]

তেমনি নিম্নোক্ত অংশ প্রায় হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে–

যাও লক্ষ্মী অলকায়,

যাও লক্ষ্মী অমরায়,

এস না এ যোগিজন তপোবনে আর![১৭]

এর অনুসরণে evj¥xwK cwZ fv-য় পাওয়া যায়–

যাও লক্ষ্মী অলকায় যাও লক্ষ্মী অমরায়

এ বনে এসো না এসো না –

এসো না এ দীনজন কুটিরে।

যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর,

আর কিছু চাহি না চাহি না।[১৮]

উল্লিখিত অনুকরণ এবং কাব্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণাদাত্রী হিসেবে কোন অলৌকিক দেবীর প্রভাব উপেক্ষা করলে নাট্যকাহিনীতে একটি চিরন্তন আবেদনের বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয়। আর তা হলো, অমানবিকতার চর্চা থেকে এক দস্যুসর্দারের মহান মানবিকতায় জাগরণের বিষয়। কাহিনীতে বাল্মীকির চরিত্রে মানবিকতা উদ্বোধনের যে দৃশ্য-পরম্পরা পুনর্চিত্রিত হয়েছে তার পরোক্ষ প্রভাব মানুষের মধ্যে সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে থাকা অসম্ভব নয়। অবশ্য এ মানবিক চেতনা এখনো রবীন্দ্রনাথের মনে কোন তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেনি যা পরবর্তী কোন কোন নাটকে দেখা যায়।

চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকারের দক্ষতার অভাব লক্ষণীয়। দস্যুদের সংলাপ ও কৃত্রিম আচরণে ভয়ের চেয়ে হাস্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। বাল্মীকি চরিত্রও নির্দ্বন্দ্ব একমুখীন হওয়ায় এটি যথেষ্ট

[১৬] বিহারীলাল চক্রবর্তী, সারদা মঙ্গল, বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ (গ্রন্থ), কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১১০
[১৭] বিহারীলাল চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
[১৮] রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণীয় নয়।[১৯] তবে বালিকা চরিত্রসৃষ্টি এবং তার প্রতি বাল্মীকির মনে করুণা জাগরণের অনুষঙ্গ পরবর্তী কয়েকটি নাটকে রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। evj¥xKcªZfv এ দিক থেকে তার ভূমিকাস্বরূপ।

এ ছাড়া উক্ত নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেশি-বিদেশি সুরের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। সঙ্গীতকে কেবল সুরের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তাকে ভাবের বাহনও করে তুলেছিলেন, তার প্রথম প্রয়োগ সম্পন্ন হয় evj¥xKcªZfvতেই।[২০] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

> ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। evj¥xKcªZfv গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।[২১]

উক্ত নাটক অভিনয়ের কিছুদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সূত্রবদ্ধ করেন এবং তা বেথুন সোসাইটির আয়োজনে প্রচুর সাংগীতিক উদাহরণ প্রয়োগসহ উপস্থাপন (২০ এপ্রিল) করেন। সে প্রবন্ধে তিনি এ দেশের সংগীতকে সুরের কাঠামোসম্পন্ন প্রাণহীন এক মূর্তির সঙ্গে তুলনা করে বলেন:

> গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলো চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাঁহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।[২২]

এ দিক থেকে evj¥xKcªZfv রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচেতনার ভূমিকাস্বরূপ হলেও সংগীতভাবনার দিক থেকে তাঁর পরিণত চিন্তার প্রায়োগিক উদাহরণ হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে

---

[১৯] সমালোচকের ভাষায়, "ইহা lack of proportion- এর দোষে দুষ্ট। ... অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া পরিবর্তন ঘটাইলে চরিত্রটি আরও সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিত।" শ্রী অশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ২০০০ পৃ. ১১১

[২০] "ইউরোপীয় সংগীতের প্রভাবে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশীয় রাগরাগিনীকে গতানুগতিকতা ও কৃত্রিমতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নানা ভাবের বাহন করিবার পরীক্ষা করিয়াছেন এই বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যে। বাংলা গানের যে মুক্তি সাধিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, বাল্মীকি-প্রতিভা সেই মুক্তির প্রথম বিজয়চিহ্ন"। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৩৯

[২১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

[২২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতচিন্তা, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

পারে। প্রায় দুই বছর পর (৫ ডিসেম্বর, ১৮৮২) বিদ্দজ্জন সভার সম্মেলন উপলক্ষ্যে একই ধারার KvjgMqv নামের একটি নাটিকা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। ivgvqY-এর কিছু অংশ নিয়ে রচিত এ নাটিকা তিনি পরবর্তী সময় evj¥xwK cÖwZfv-র দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করে দেন।[২৩]

iæ'PÐ : প্রথম ইংল্যান্ড যাত্রা ব্যর্থ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ 'ব্যারিস্টার' হওয়ার ইচ্ছায় নিজেই আবার ইংল্যান্ড যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন তাঁর পিতার কাছে। অনুমতি নিয়ে কলকাতা থেকে জাহাজে (২২ এপ্রিল, ১৮৮১) যাত্রা শুরু করেও কোন অনির্দেশ্য কারণে মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয় ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদসহ। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুটো রচনা যথাক্রমে গীতিকাব্য fMü'q (১৮৮১) এবং iæ'PÐ (১৮৮১) নাটিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে iæ'PÐ ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে মূলত একটি নাট্যকাব্য যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে মহম্মদ ঘোরির কাছে দ্বাদশ শতকের পৃথ্বিরাজের পরাজয়ের প্রেক্ষাপট। পৃথ্বিরাজের সভাসদ চাঁদকবির সঙ্গে বিতাড়িত ও অরণ্যপ্রবাসী পৃথ্বির প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়ার ভাই-বোন সম্পর্কের করুণ পরিণতির বর্ণনা আছে এ নাট্যকাব্যে। উল্লেখ্য, ভারতে মুসলিম শাসকদের আগ্রাসনের সময় দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে মহম্মদ ঘোরির সঙ্গে দিল্লী ও আজমিরের রাজপুত রাজা পৃথ্বি-র একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম যুদ্ধে ঘোরি পরাজিত হলেও পরবর্তী যুদ্ধে তিনি পৃথ্বিসহ হিন্দু সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন। উল্লিখিত যুদ্ধসমূহে পৃথ্বিরাজের বীরত্ব নিয়ে হিন্দী কবি চাঁদ বর্দাই (১১২৬-১১৯৬) রচনা করেন cw_ivRim নামে একটি স্তুতিমূলক গাথাকাব্য।[২৪] সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাল্যবয়সে পিতার সঙ্গে বোলপুর আশ্রমে উক্ত কাব্যের অনুপ্রেরণায় 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' নামে একটি বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেছিলেন।[২৫] বর্তমান নাটিকায় সেই কবি চাঁদ বর্দাই পৃথ্বিরাজের সভাসদ এবং নায়ক চাঁদকবিতে পরিণত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তবে রুদ্রচণ্ডের নামে এ কাব্যের নামকরণ হলেও তার সকল উদ্দেশ্য ও উদ্যম হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। চাঁদকবির সঙ্গে সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ ভিক্ষা নেয় কেবল পৃথ্বিরাজকে হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পৃথ্বিরাজ বন্দী অবস্থায় নিহত হলে তার সে উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। সমাপ্তিতে রুদ্রচণ্ড ও অমিয়ার মৃত্যু কাব্যটিকে বীররসের পরিবর্তে করে তুলেছে করুণ রসের উৎস। এখানে স্মরণ করা যায় যে, ইতঃপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, হরলাল রায় প্রমুখ নাট্যকাররা ইতিহাস-আশ্রয়ী ও রূপক গীতিনাট্যে স্ব-জাতির শৌর্য বীর্য এবং দেশরক্ষায় আত্মদানের মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনার চেষ্টা করেছিলেন। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ নাটিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের m‡ivwRbx

---

২৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮-৬৯

২৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬, পৃ. ২৭০

২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭৫)-র মতো প্রায় একই প্রেক্ষাপটে রচিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত চেতনা এখানে অনুপস্থিত। আবার নাট্যকাহিনীর করুণ হতাশাজনক পরিণতিও পাঠকের মনে ইতিবাচক উদ্যম সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয়। এ সব বিবেচনায় বলা চলে যে, নাট্যকাব্য রু'PÐ সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সদর্থক চেতনা সম্প্রসারণে কতটা সমর্থ তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এটাও ধারণা করা যায়, নাটকে কোন বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা হয়তো নাট্যকারের মনে আসে নি কিংবা সে কৌশল রবীন্দ্রনাথ তখনো আয়ত্ত করতে পারেন নি।

cK¬Zi cÖZ‡kva : iæ'PÐ রচনার প্রায় তিন বছর পর রচিত হয় cK¬Zi cÖZ‡kva (১৮৮৪) নাটক। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের q‡ivccevmxi cÎ (১৮৮১), KvjgMqv (১৮৮২), mÜ¨msMxZ (১৮৮২) এবং cfvZmsMxZ (১৮৮৭) গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে কবিতা, গান, eD VvKivbxi nvU উপন্যাসের পরিচ্ছেদ এবং বিবিধ প্রসঙ্গের প্রবন্ধসমূহ। এর বেশিরভাগ সময় তিনি কলকাতায় অবস্থান করলেও cK¬Zi cÖZ‡kva রচনার সময় ছিলেন বোম্বের কারোয়ার নামক স্থানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মস্থলে।

ইতোমধ্যে কলকাতার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঘটে যায় কয়েকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ সব ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ আলোড়িত হন এবং তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী কয়েকটি প্রবন্ধে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে প্রথমটি হলো ইংরেজি *Englishman* পত্রিকায় (30 April, 1882) এ দেশীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের একটি ঘৃণ্য ও অপমানজনক ব্যবহারের প্রস্তাব পেশ। পত্রিকাটির উক্ত উদ্ভাবন সম্পর্কে অন্য পত্রিকা মন্তব্য করে:

> This evening's Englishman has dircovered the sccret of correctly treating the people of Bangal. It says æKICK THEM FIRST AND THEN SPEAK TO THEM". *Age lat, peehoo bat...*[২৬]

বাঙালি সম্পর্কে এ হেন মন্তব্য কেন্দ্র করে দেশবাসীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও এ উত্তেজনায় শামিল হন এবং 'জুতা ব্যবস্থা' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) নামক একটি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে তুলে ধরেন তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া। তিনি প্রথমেই উক্ত প্রস্তাবকে ইংরেজ শাসকদের প্রবর্তিত নিয়ম ধরে নিয়ে বলেন :

> গবর্ণমেন্ট একটি নিয়মজারী করিয়াছেন যে, 'যে হেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্টের অধীনে যে যে বাঙ্গালি কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে।[২৭]

---

[২৬] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

এর পর বাঙালির দাস্য মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করে ১৮৯০ সালের (আট বছর পরের) একটি ভবিষ্যৎ কল্পচিত্র রচনা করেন। যেমন:

> আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে 'মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ?' আজকালকার বি-এ এম-এরা না কি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে।[২৮]

এমনকি লেখকের মতে, সে যুগে আশীর্বচনের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে পাদুকা প্রহার; যেমন, 'পুত্র পৌত্রানুক্রমে গবর্ণমেন্টের জুতা ভোগ করিতে থাক আমার মাথায় যত চুল আছে, তত জুতার তোমার ব্যবস্থা হউক।'[২৯] সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়ার এ রচনা তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচনা করা চলে। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে কেবল এ দেশবাসীর মনে আত্মধিক্কার সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, এর বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলেন নি। আবার এর কিছুদিন পর প্রকাশিত 'চেঁচিয়ে বলা' প্রবন্ধে (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯) তৎকালীন বাংলা সবাদপত্রে এবং সাহিত্যে প্রচারিত দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসও সমর্থন করেন নি তিনি। এ ক্ষেত্রেও তাঁর ভাষা ছিল বিদ্রূপাত্মক; যেমন,

> ... যাহার যথার্থ বল আছে সে সর্বদাই ভদ্র–সে তাহার বলটাকে গণ্ডারের শিঙের মত অহোরাত্র নাকের উপর খাড়া করিয়া রাখে না। আর যে দুর্ব্বল হয় সে লাঙ্গুল গুটাইয়া কুঁকড়ি মারিয়া থাকে, নয় সে খেঁকি কুকুরের মত ভদ্রলোক দেখিলেই দূর হইতে অবিরত ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে।[৩০]

অথচ সে সময় দেশীয় বিচারকদের জন্য বিচারিক ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত 'ইলবার্ট বিল' সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত থাকেন তিনি। স্মর্তব্য ১৮৮৩ সালে 'ইলবার্ট বিল' আনা হয়েছিল ইংরেজদের বিচার করার ক্ষেত্রে দেশীয় বিচারকদের ক্ষমতা প্রদানের যৌক্তিক লক্ষ্যে। কিন্তু ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজরা বিলটিকে Black Acts নাম দিয়ে ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করে। এ লক্ষ্যে তারা দেড় লক্ষ টাকার তহবিল গঠন করে এমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালায় যে, তৎকালীন ভাইসরয় রিপন বিলটি পাশ করাতে ব্যর্থ হন। আদালতে এ বিলের পক্ষে-বিপক্ষে বাঙালি ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষ এবং ইংরেজ ব্যারিস্টার ব্রান্‌শন্‌-এর মধ্যে

---

[২৭] 'জুতা ব্যবস্থা (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত)', রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ৩৭৬
[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮
[২৯] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯
[৩০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১

Dhaka University Institutional Repository

চলে তুমুল বাকযুদ্ধ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘটনায় লিখেছিলেন একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা। এর কিছু অংশ নিম্নরূপ:

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্‌ কেশুয়িক মিলার–
'নেটিবের কাছে খাড়া নেভার –নেভার'।
... .
হিপ্‌ হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে –তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে? "নেভার – নেভার"॥[৩১]

ইলবার্ট বিলের উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই তৎকালীন জনপ্রিয় তরুণ রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুরু হয় আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলা। প্রসঙ্গত হাইকোর্টের বিচারক নরিস সাহেব এক মামলায় আদালতে শালগ্রাম শিলা (বিষ্ণুমূর্তি অঙ্কিত) নিয়ে আসার আদেশ দিলে সুরেন ব্যানার্জি তাঁর পত্রিকায় এর তীব্র প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। নরিস সাহেব বিষয়টিকে আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য করে দুই মাসের কারাদণ্ড ঘোষণা করেন সুরেন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। দণ্ডের আদেশ শুনে আদালতে উপস্থিত ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ঢিল ছুঁড়ে আদালতের জানালার কাঁচ ভেঙে দেয়; পুলিশকেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইলবার্ট বিলের স্বপক্ষে এবং সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে এ দেশে উত্তেজনাময় যে ব্যাপক আন্দোলন হয় তার প্রধান অংশে ছিল ছাত্ররা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর মতে, এর মাধ্যমেই ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> বিশ শতকে বিশেষতঃ বিগত ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে ইহা খুব সাধারণ ও সুপরিচিত নিত্য ঘটনা হইলেও ১৮৮৩ সনের পূর্বে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ছাত্রগণের রাজনীতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে ও সক্রিয়ভাবে যোগদান করার ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন।[৩২]

শুধু তাই নয়, এ ছাত্র আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীও সমর্থন-সূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন। রবিজীবনীকার এ তথ্য দিয়ে বলছেন :

---
[৩১] উদ্ধৃত; রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৫৩
[৩২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬

Dhaka University Institutional Repository

> ... রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতাতেই ছিলেন এবং ছাত্রজনতার উত্তেজনা তাঁর না দেখারও কথা নয়, বিশেষত ঘরের মেয়ে ভাগিনেয়ী সরলা দেবীই যখন কালরঙের ফিতে আস্তিনে বেঁধে স্কুলে যেতে শুরু করেছিলেন।[৩৩]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে কিংবা ইংরেজ ও ইংরেজ-বিচারব্যবস্থার বিপক্ষে কিছু না বলে বরং 'জিহ্বা আস্ফালন' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০) প্রবন্ধে ওই রায়ের বিরুদ্ধে বাংলা সংবাদপত্রগুলির মাত্রাহীন আতিশয্যে বিরক্ত হয়ে লেখেন:

> সম্প্রতি নরিস সাহেব ও জুরিস্‌ডিক্‌সন্‌ বিল প্রভৃতি লইয়া কোন কোন বাংলা কাগজ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। তিরস্কার করিবার সময়, এমন কি গালাগালি দিবার সময়েও ভদ্রলোক ভদ্রলোকই থাকে, কিন্তু বানরের মত মুখ ভেংচাইয়া দাঁত বাহির করিয়া রুচিহীন অভদ্রের মত অতিবড় শত্রুকেও অপমান করিতে চেষ্টা করিলে নিজেকেই অপমান করা হয়, তাহাতে বিপক্ষ পক্ষের যত না মানহানি হয় ততোধিক আত্মগৌরবের লাঘব করা হয়। এরূপ ব্যবহারকে যাহারা নির্ভীকতা ও বীরত্ব মনে করেন তাঁহারা ভীরু, হীন, কারণ প্রকৃত বীরত্ব আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলে।[৩৪]

অবশ্য কারাভোগের পর মুক্তি পাওয়া সুরেন ব্যানার্জির একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন এবং একটি সঙ্গীতও পরিবেশন করেন। সুরেন্দ্রনাথের অপর একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার জন্য গঠন করা হবে একটি 'National Fund' নামে জাতীয় তহবিল। এ বিষয় নিয়েও রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনাল ফণ্ড' (ভারতী, কার্তিক ১২৯০) নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি তহবিলের ইংরেজি নামের বিরোধিতা করে বলেন যে, সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও-সব ইংরেজি বুঝতে পারেন না। একই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারের বিরুদ্ধে বলেন :

> যে সকল দেশহিতৈষীদিগের Political agitation একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা নাই। আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ... ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ... ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই, তবে আসল জিনিষটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।[৩৫]

---

[৩৩] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

[৩৪] 'জিহ্বা আস্ফালন', রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫

[৩৫] 'ন্যাশনাল ফণ্ড' রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

এ 'আত্মনির্ভর' পাওয়ার জন্য তাঁর মতে করণীয় ছিল, 'বিদ্যাশিক্ষার প্রচার' করে দেশের সমস্ত মানুষকে 'অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত' করা। এরপর তাঁর বিবেচনা, "তখন আমরা দাবী করিব, গবর্ণমেন্টকে দিতেই হইবে।"[৩৬]

উল্লিখিত ঘটনার কিছুদিন পরই রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীসহ আরো কয়েকজন বেড়াতে যান কারোয়ার-এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মস্থলে। সেখানে রচিত cKⅢZi cⅢZ‡kⅣa নাটকের কাহিনী নিম্নরূপ :

এক সন্ন্যাসী ধ্যানও তপস্যা করে অনন্ত জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি চরম উদাসীন। এমনকি নিজের মধ্যেও তিনি কোন রকম মানবিক আবেগ স্থান দিতে প্রস্তুত নন। মানব প্রকৃতির সমস্ত উপাদান তিনি 'জ্ঞান চিতানলে' ভস্ম করে দিয়েছেন। তাঁর হৃদয়ে এ সবের আর কোন স্থান নেই। এ মর্মে মানব প্রকৃতির প্রতি তাঁর বক্তব্য :

এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।[৩৭]

এ স্বাধীন চিত্ত নিয়ে তিনি একবার নগরে বেড়াতে যান সাংসারিক মানুষদের 'তুচ্ছ' কর্ম কোলাহল পর্যবেক্ষণ করতে। সেখানে তাদের রসিকতা, ক্ষুব্ধ চিত্তের আস্ফালন এবং কৌতুক দৃশ্যের সঙ্গে এক সময় তিনি দেখতে পেলেন একটি ছোট মেয়েকে সবাই ঘৃণাভরে এড়িয়ে যাচ্ছে অচ্ছুৎ অশুচি বলে। এ দৃশ্য সন্ন্যাসীর মনে করুণা সঞ্চার করে এবং মেয়েটিকে তিনি নিয়ে আসেন তাঁর পাহাড়ের গুহায়। মেয়েটিও পরম কৃতজ্ঞতায় সন্ন্যাসীকে পিতা সম্বোধন করে বলেঃ

প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর করে দিয়োনা কখনো।[৩৮]

এ ভাবে পর্বতগুহায় পিতা-কন্যার স্নেহময় আবহে দিন কাটতে থাকে। সন্ন্যাসী এক সময় বিস্মৃত হন তাঁর কঠিন সাধনার ব্রত। তিনি বুঝতে পারেন এ বালিকাই তাঁকে মানব সংসারের সৌন্দর্য

[৩৬] 'ন্যাশনাল ফণ্ড', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪
[৩৭] প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫
[৩৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি দান করেছে। তাঁর কাছে তখন জগতের সব কিছু সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে হঠাৎ সন্ন্যাসীর মনে পড়ে তার পূর্ব উদ্দেশ্যের কথা। এবার তাঁর মনে হয়, বালিকাটি বুঝি তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতেই এসেছে। এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বালিকাটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে গুহা থেকে চলে যান দূরে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে গিয়েও তাঁর পুনরায় চোখে পড়ে মানব সংসারের বিভিন্ন দৃশ্য। তিনি ভাবেন:

নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া।
যে যাহার কাজ করে গৃহে ফিরে যায়,
ছোটো ছোটো সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে।[৩৯]

এক পথিক স্ত্রী-লোককে তিনি জিজ্ঞেস করেন:

সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা!
স্ত্রী। ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গোরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিকে নিয়ে।
সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন? দুঃখ কিছু নেই?
স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু! রামরাজ্যে থাকি।[৪০]

এ সব দৃশ্যের মানবিকতা তাঁকে পুনরায় অন্তর্দ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করে–একদিকে সন্ন্যাসব্রত, অন্যদিকে চিরন্তন মানবিক আবেগ। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর মানবিক আবেগরই জয় হয়। সন্ন্যাসব্রত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি সংসারের আনন্দে ভাগ নিতে চলে যান। দেখেন জগৎ কী আনন্দময়; সবাই যেন তাঁকে দেখতে এসেছে। সে সঙ্গে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে বালিকার করুণ বিস্মিত দুটি চোখ। তিনি ভাবেন, আর বালিকাটিকে ত্যাগ করে আসবেন না :

একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী

---

[৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩
[৪০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,

বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।[৪১]

কিন্তু গুহামুখে ফিরে গিয়ে দেখেন বালিকার নিথর মৃতদেহ। মেয়েটি তার সন্ন্যাসী পিতার নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছে। এ দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসী হাহাকার করে বলেন – 'হায়, হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ'!

সন্ন্যাসী চেয়েছিলেন বালিকার প্রতি স্নেহ কিংবা মানব প্রকৃতি উপেক্ষা করে দূরে চলে যেতে। কিন্তু মানবিক অনুভূতি ও প্রকৃতি তাঁকে ফিরিয়ে আনে স্নেহের কাছে। তবু তাতে শেষ রক্ষা হয় নি; তাঁর পরম স্নেহ-পুত্তলিকাটি কেড়ে নিয়ে যেন নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে প্রকৃতি। এ কাহিনীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন, সন্ন্যাসী প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে অসীম অনন্তকে পেতে চেয়েছিলেন বিশুদ্ধভাবে। কিন্তু তাঁর সে লক্ষ্য অর্জিত হয় নি। এ জগৎ সংসারের সীমায়িত বস্তু ও বিষয়ের মধ্যেই পাওয়া যায় অসীমের সন্ধান। এ তত্ত্ব রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় cfvZ msMxZ কাব্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। কবির অন্তর গুহায় হঠাৎ বিশ্বের আলোক প্রবেশ করে কিভাবে কবিকে জগৎ সংসারের অপূর্ব লীলার মধ্যে টেনে আনল তা এ কবিতায় উচ্ছ্বাসময় ছন্দোরূপ পেয়েছে। তখন থেকেই তিনি জীবন ও জগতের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে অসীম ও অনন্তের প্রকাশ লক্ষ করতে থাকেন। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, শত্রুতা-বন্ধুত্ব, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ইত্যাদি ঘটনায় তিনি খুঁজে পান সেই অনন্তের ছবি। তাই এ নাটকে সন্ন্যাসীকে এ সংসারের বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করানোর জন্য বেশ কয়েকটি জনতা দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এর প্রভাবেই যেন সন্ন্যাসীর মনে সূচিত হয়েছে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। Rxeb¯§wZ-তে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটি অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল। এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে আমার সমস্ত কাব্য রচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। ...

---

[৪১] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।[৪২]

এভাবে নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে সচেতন প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব রূপায়ণ করার চেষ্টা রবীন্দ্র- নাটকে এই প্রথম লক্ষ করা গেল। তাই কোন কোন রবীন্দ্র সমালোচক–উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও প্রমথনাথ বিশী–cKwZi cwZ‡kva-কে রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্ব-নাটকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[৪৩] আবার অজিতকুমার ঘোষ ও আশুতোষ ভট্টাচার্য এ নাটককে চিহ্নিত করেছেন কাব্যনাটক হিসেবে।[৪৪] স্বয়ং নাট্যকারের মন্তব্যও অনেকখানি সে রকম, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।[৪৫] বস্তুত নাটকের প্রধান অংশ কাব্যে ও গানে রচিত হলেও জনতা দৃশ্যগুলো সরস গদ্যে রচিত। তাই আঙ্গিক বিচারে cKwZi cwZ‡kva-কে বিশুদ্ধ কাব্যনাটক বলা কঠিন। তবে ভাষারীতি যা-ই হোক না কেন, এ নাটকে যে একটা তত্ত্ব পরিস্ফুট করার চেষ্টা আছে তাতে সন্দেহ নেই। তাই সার্বিক বিচারে নাটকটিকে তত্ত্ব-নাটক বা রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের প্রথম রচনা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ নাটকে সরাসরি রাজনীতির কথা নেই। তবে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকাশ ঘটে নি, এমন বলা কঠিন। যেমন নাটকের মূল ঘটনা বনে ও পাহাড়ের পটভূমিতে স্থাপিত হলেও এর কয়েকটি দৃশ্য সংস্থাপন করা হয়েছে লোকালয়ে। বিশেষ করে সন্ন্যাসীকে মানবজীবনের সুখ-দুঃখময় পরিস্থিতির সম্মুখীন করার প্রয়োজনে এ সব দৃশ্যের পরিকল্পনা। আর সে সূত্রে এখানে যে সমাজকাঠামো দেখানো হয়েছে, তাতেই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র ও সমাজনীতি সম্পর্কিত লেখকের মতামতের প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত একটি চরিত্রের মুখে শোনা যায়। এটি 'রামরাজ্য', এখানে রাজা পিতা মাতার মতো প্রজার মঙ্গলসাধনে তৎপর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ রকম রামরাজ্যেও সবাই সমান সুখভোগের অধিকারী নয়। এখানে ভিক্ষুক আছে, আছে জাতপাতের সমস্যাও। এমনকি, কোন কোন চরিত্র তাদের যাপনরত জীবনের প্রতি অসন্তোষও প্রকাশ করেছে। এখানে একদিকে মন্ত্রির পুত্র বাদ্য বাজনাসহ চতুর্দোলায় চড়ে বেড়াতে যায়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ রাজপুত্রের বিয়েতে দই-ছাতু খেতে পাবে শুনেই আনন্দে আটখানা হয়। অর্থাৎ তারা এ খাবার কদাচিৎ খেতে পায়। সে দৃশ্যের কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক :

স্ত্রী লোক। হাঁ গা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে, তা মুড়িমুড়কি বিলোনো হবে না?

---

[৪২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, ১৪১-৪২

[৪৩] ক) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ১৬৯
খ) প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৩

[৪৪] অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৭৯

[৪৫] সূচনাংশ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পুরুষ। দূর মাগি, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা–

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে, তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে।[৪৬]

জনসাধারণের এই জীবনব্যবস্থা যে রাষ্ট্রকাঠামোর ইঙ্গিত দেয় তা ভারতীয় সামন্ত যুগের। কবির সমসাময়িক ভারতে কিছু সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব থাকলেও উনিশ শতক ছিল মূলত ধনতন্ত্রের যুগ। এমন যুগে রচিত নাটকে কয়েক শত বছর আগের রাষ্ট্রকাঠামো কল্পনা নাট্যকারের বিশেষ মানস-প্রবণতার কারণে হয়েছে বলে অনুমিত হয়। এ প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কৌতুক, প্রহসন ও সামাজিক নাট্য ব্যতীত প্রধান নাটকগুলোতে বরাবর লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়েই তিনি সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো পরিহার করে প্রাচীন সামন্ত-সমাজ ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সমালোচক এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তব্যের নিত্যকালীন আবেদনের প্রসঙ্গ।[৪৭] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একাধিক রূপক সাংকেতিক নাটকে নিত্যকালীন সমস্যার পাশাপাশি আধুনিক জীবন ও সমাজের সংকটও আলোচিত হয়েছে। তাই সমালোচকের এ ধরনের বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। বরং মনে হয়, ভারতের প্রাচীন সমাজের প্রতি, জীবনব্যবস্থার প্রতি কবির এক ধরনের অনিবার্য আকর্ষণ হয়তো ছিল। উল্লেখ্য যে, evj¥xwK cwZfv-র জন্য সামন্ত বা প্রাচীন সমাজ-কাঠামো ব্যবহার কিছুটা অপরিহার্য হলেও এ নাটকে তা অপ্রতিরোধ্য ছিল না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই ভারতে ঋষি, মহর্ষি, স্বামী, পরমহংস ইত্যাদির আবির্ভাব বেশ ঘটেছিল।

সামগ্রিক বিবেচনায়, ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক পরিবেশে রচিত নাটকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের পটভূমি ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত ভারতবাসীর কাছে উক্ত রামরাজ্য-সুলভ রাষ্ট্রীয় পটভূমি সমকালের শাসক শোষককে যেন যবনিকার অন্তরালে নিয়ে যায়। সে সঙ্গে নাটকে চিত্রিত, রাজমহিমা স্বাভাবিক, সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় বিষয়টি চলে যায় সমকালীন ব্রিটিশ রাজের অনুকূলে। অপরদিকে নাটকের সাধারণ মানুষ যখন ভিক্ষা করে কিংবা জীবন ধারণের আবশ্যিক উপাদান লাভ না করেও 'রামরাজ্যে থাকি' বলে ঘোষণা দেয়, তখন তা এর চেয়ে উন্নত জীবনব্যবস্থার জন্য উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে পারে না। এর ফলে সমীকরণটি দাঁড়ায় এ রকম যে, রামরাজ্যের মতো আদর্শ রাষ্ট্রেও

[৪৬] প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

[৪৭] ভবতোষ দত্ত, 'রবীন্দ্র নাটকের পূর্ব সূত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণিভেদ থাকবে, ধনী-গরিব বৈষম্য থাকবে। তাহলে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, ‘সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা’cKwZi cwZ‡kvaÑশুধু তত্ত্ব প্রচারের নাটক থাকে নি; তাতে নাট্যকারের রাজনৈতিক মতাদর্শও পরোক্ষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে মনে হয় প্রথম তত্ত্ব নাটক হিসেবে cKwZi cwZ‡kva- এ রচয়িতার বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের আত্যন্তিকতায় উপরি-উক্ত রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সচেতন বিবেচনায় আসতে পারে নি। নইলে নাটকের কয়েকটি জনতা-দৃশ্যে সাধারণ মানুষের কথোপকথন ও জীবনাচরণের যে প্রাণবন্ত ছবি উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে তাঁদের প্রতি নাট্যকারের গভীর অনুরাগের পরিচয় সুস্পষ্ট। সমালোচক এডওয়ার্ড টমসনের মতে:

> The best things, dramatically in Natur’s Revenge, are the conversations on the road, which are full of simple obvious humour.... The humour, however, it may jade a subtle preception, is racy and natural; almost any group of Bengali villagers can improvise the same kind at any time, and with success.[৪৮]

এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে পাওয়া যায় : “গ্রাম্য জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ও পল্লীবাসীদের আলাপের কৌতুককর অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত জীবন পর্যবেক্ষণের পরিচয় দেয়।”[৪৯]

আশুতোষ ভট্টাচার্য উক্ত দৃশ্যসমূহের সার্থকতার সূত্রে সাধারণ মানুষের জীবন সম্বন্ধে নাট্যকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫০] অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ, অনুরাগ কিংবা মমত্ববোধ এ পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান কিংবা অর্থনৈতিক অসঙ্গতির প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। বিশেষত তাঁর পারিবারিক আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত রুচিবোধের কারণে এবং তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাধারণ মানুষের প্রকৃত কল্যাণমুখী রাজনীতি আয়ত্ত করা হয়তো বেশ কঠিন ছিল। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম তত্ত্বনাটক cKwZi cwZ‡kva কিছু রাজনৈতিক তত্ত্বগত বিভ্রান্তিকে আলিঙ্গন করেছে বলে ধারণা জন্মে।

bwjbx : কারোয়ার থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে হয় খুলনার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের এগারো বছরের বালিকা ভবতারিনী দেবীর সঙ্গে। ভবতারিনীর পিতা বেনীমাধব রায় চৌধুরী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেটের সাধারণ কর্মচারী। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর নতুন নাম দেওয়া হয় ‘মৃণালিনী’ এবং সে সঙ্গে তার ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ের

---

[৪৮] Edward Thompson, Rabindranath Poet & Dramatist, London, 1948 (2nd edition), p. 48

[৪৯] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩

[৫০] আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হয়।[৫১] বিয়ের পরপরই রবীন্দ্রনাথের কাছে পিতার আদেশ আসে জমিদারি তদারক করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। সে প্রস্তুতির সঙ্গে লেখকের Qwe I Mvb কাব্যের কবিতা ও অন্যান্য রচনার কাজও চলতে থাকে সমানভাবে। এ সময় বাংলা ও বিহারের জমিদারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় (১৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৩) কলকাতার টাউন হলে। সভায় দেশি ও ইংরেজ জমিদাররা সরকারের কাছে কিছু দাবি দাওয়া পেশ করে। জমিদারি স্বার্থের কারণে ইংরেজদের সঙ্গে দেশীয়দের এ যোগসাজশকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন 'টৌনহলের তামাশা' শিরোনামে। এর কিছুদিন পর রচিত হয় তাঁর প্রথম গদ্য নাটক bwjbx (১৮৮৪)। তেরো পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয় দৃশ্যে রচিত এ নাটকের মূল বিষয় হলো – ভুল বোঝাবুঝির ফলে ত্রিভুজ প্রেমের অচরিতার্থতা এবং একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে তার সমাধান। এর কাহিনীতে আছে: নীরদ ও নলিনী উভয়ে পরস্পর অনুরক্ত হলেও একসময় নীরদের প্রকাশ্য আহ্বানে সাড়া দিতে নলিনী সঙ্কোচ বোধ করে। এতে নীরদ নলিনীকে ভুল বুঝে দেশ ছেড়ে চলে যায় বিদেশে। সেখানে তার সঙ্গে নীরজার প্রেমের সম্পর্ক হয় এবং নীরদ তাকে বিয়ে করে। তারা দেশে ফিরে আসলে কিছুদিন পর নীরদ বুঝতে পারে নলিনীর গভীর প্রেমের স্বরূপ। পরবর্তী সময় এ নিয়ে তীব্র সংকট সৃষ্টি হলে হতাশা ও গ্লানিতে নীরজার মৃত্যু ঘটে। এ ভাবে শেষ পর্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়ে মিলন হয় নীরদ ও নলিনীর।

এ ক্ষুদ্র নাটকের পাত্র পাত্রীরা কোন দেশ-কালের আবহে যেমন 'স্থাপিত নয়', তেমনি তাদের রক্ত-মাংসের মানুষ করে গড়ে তোলারও চেষ্টা লক্ষ করা যায় না। এর দৃশ্য সংস্থান করা হয়েছে 'কানন' 'গৃহ', 'দেশ', 'বিদেশ' ইত্যাদি নামে। চরিত্রগুলোর সামাজিক অবস্থানের কোন নির্দেশ না থাকায় এ সম্পর্কিত কোন বক্তব্য আশা করা বৃথা। অবশ্য এ নাটিকা রচনার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে উপর্যুক্ত প্রত্যাশা হয় তো সঙ্গত নয়। রবীন্দ্র জীবনীকার জানাচ্ছেন, ঠাকুরবাড়ির তরুণ–তরুণীরা স্থির করেছিলেন যে, অভিনেতারা একটি প্লট-এর বিভিন্ন অংশ নিজেরাই রচনা করবেন। পরিকল্পনামতো একটি খসড়া নাটক তৈরি হলেও তা কেটে ছেঁটে চলনসই অবস্থায় রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ।[৫২] অবশ্য, এভাবে bwjbx রচিত হলেও তা শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয় নি ঠাকুরবাড়ির এক বিপর্যয়ের কারণে। আর সেটি হলো, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের এক সময়ের কাব্য ও শিল্পচর্চার প্রথম সাথী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা।

gvqvi †Ljv: এর কিছুদিনের মধ্যে, bwjbx-র পর পর প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ ^kkem½xZ (১৮৮৪) এবং fvbymsn VvK‡ii c`vejx (১৮৮৪)। এ ছাড়া 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী' ও অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কবিতা, গান ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রবন্ধ। রাজনীতি বিষয়েও এ

[৫১] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ. ১৯২-৯৩
[৫২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত. পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সময় তিনি 'হাতে কলমে' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তা পাঠ করেন একটি সভায়। প্রবন্ধে আগের মত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের–তাঁর ভাষায়–অন্তঃসারশূন্য স্বদেশহিতৈষিতার প্রতি ধিক্কার দেওয়ার পাশাপাশি অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিবিধানে আইরিশরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা হলো মারের বিপরীতে মার। তাঁর ভাষায়:

> ... অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের ঔষধ নাই– অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া। যাহারা খৃষ্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোন ঔষধ কি তাহারা মানে! ... ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিশ জাতি। তাহারাও খুনী, ... এই জন্য ডাকের পরিবর্তে ডাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে।[৫৩]

কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত, 'আমরা ত খুনী জাত' নই, তাই সে ব্যবস্থা এ দেশীয়দের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ দেশের মানুষের প্রয়োজন আত্মমর্যাদাজ্ঞান; আর তা আহরণের জন্য দরকার–ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি। এ বিষয়ে তাঁর আহ্বান: "আমরা আমাদের ভাষার [,] আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা করি না কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে।"[৫৪]

এর কিছুদিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যস্ততার কারণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের পদ লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দায়িত্ব পেয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন উৎসাহেও নতুন আঙ্গিকে (কীর্তন ঢঙে) বেশ কিছু (২৪টি) ব্রাহ্ম সংগীত রচনা করেন, যে গুলো উক্ত সমাজের পঞ্চপঞ্চাশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে গীত হয়। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় ব্রাহ্মদের উদ্যোগ। যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশে এ সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ ত্রাণ সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সংগীত পরিবেশন ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন একটি সভায়। রাজনীতিতে এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো 'জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) পার্টির জন্ম। ইতঃপূর্বে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া, মিছিল, সভা ও বিবৃতি প্রদানের জন্য ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজদের চাপের মুখে বিচারবিভাগের সংস্কার বিষয়ক ইলবার্ট বিলের অপমৃত্যু, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড এবং এর আগেও ব্রিটিশ সরকারের দমন পীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে ওই

[৫৩] উদ্ধৃত; 'হাতে কলমে', রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

[৫৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনগুলোর ব্যর্থতা এদেশীয় জনগণের কাছে ধরা পড়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে গণ আন্দোলন পরিচালনায় সক্ষম এমন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণির ভারতীয়দের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে –১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে–বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশে দেশীয় মালিকানার ১৫৬টি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[৫৫] কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র-কারখানার মালিকদের অনুকূলে শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে দেশের নব্য উত্থিত বুর্জোয়াদের পড়তে হয় বিভিন্ন অসুবিধায়। এতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় বুর্জোয়াদের শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একইসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আইনজীবী, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ মধ্যবিত্ত শ্রেণিও তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকারের মুখোমুখি অবস্থানে আসতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে একের পর এক দুর্ভিক্ষে পর্যুদস্ত কৃষক সমাজের ভেতরে জন্ম নেয় চরম ক্ষোভ। নতুন গড়ে ওঠা শিল্প-শ্রমিকও নাগপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কয়েকটি ধর্মঘটে তাদের দাবি আদায় করে নতুন চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ১৮৮৪ সালে বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মিল হ্যান্ডস এসোসিয়েশন' নামে ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন।[৫৬] ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত, সুপ্রকাশ রায় প্রমুখের মতে, এ সময় ভারতের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দানা বাঁধার পূর্ব মুহূর্তে মূলত ব্রিটিশ সরকারের গোপন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' দল। তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের পরামর্শে এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম উক্ত উদ্যোগের প্রকাশ্য রূপদান করেন। হিউম তাঁর এ কাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

> I could not then, and do not now, entertain a shadow of doubt that we were then truly in exterme danger of a most terrible revolution....
>
> ... I was shown seven large volumes (corresponding to a certain mode of dividing the country excluding Burma, Assam and some minor tracts) containing a vast number of entries... all arranged according to dirtricts, subdistricts, sub-divisions and the cities, town and villages include in these. ... Many of the entries reported conversations between men of the lowest classes, `all going to show that these poor men were prevaded with a sense of hopelessness of the existing state of affairs, that they were convinced that they would starve and die, and that they wanted to

---

[৫৫] R. PALME DUTT, INDIA TO-DAY, Calcutta, 1986, p. 308

[৫৬] সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৩ পৃ. ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

> do *sonething*. They were going to do something, and stand by each other, *and that something meant violence.*[57]

কংগ্রেসের প্রথম সভা বসে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বরে, বোম্বাই শহরে। উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W.C. Bonergjee)। পরবর্তী সময় তিনি তাঁর *Introduction To Indian Politics* (1898) গ্রন্থে হিউমের বক্তব্য সমর্থন করেন এবং হিউমের নাম গোপনের বিষয়ে বলেন, æLord Dufferin had made it a condition with Mr. Hume that his name should not be divulged so long as he remained in the country”.[৫৮] এ ভাবে সম্ভাব্য বিপুল গণ-অভ্যুত্থান থেকে ব্রিটিশ সরকারকে রক্ষা করতে সফল হওয়ার জন্য হিউম নিজেই জাতীয় কংগ্রেস দলকে ‘Safety-Valve’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মূলত এ প্রক্রিয়ায় কংগ্রেসকে প্রথম থেকেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার ষড়যন্ত্রে কাজে লাগানো হয়। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় এ প্রসঙ্গে বলেন:

> সরকারী উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভের বহু পূর্বেই ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীও নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইয়াছিল। তাহাদের সাফল্য যখন আসন্ন হইয়া উঠে তখনই বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।[৫৯]

এ কারণে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর ভাষণে কংগ্রেসকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে।[৬০] শুধু তাই নয়, সে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে যেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস-এর কার্যক্রম ছিল সরকারের কাছে কিছু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিবছর তিন দিন ব্যাপী সম্মেলনে ইংরেজিতে সভাপতির দীর্ঘ ভাষণ এবং প্রচুর বক্তৃতার পর এসব

---

[৫৭] Sir William Weddenburn, æAllan Octavian Hume, Father of the Indian National Congress” গ্রন্থ থেকে R. P. Dutt-এর উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

[৫৮] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫

[৫৯] সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

[৬০] æIt is our good fortune that we are under a rule which makes it possible for us to meet in this manner (cheers). ... Such a thing is possible under British rule and British rule only (loud cheers). Then I put the question plainly: Is this congress a nurssery for sedition and rebellion against the Bsitish Government (cries of No, No!) or, is it another stone in the foundation of the stability of the Government? (cries of Yes, Yes).” Congress Presidential Addesses. Vol. 1 থেকে উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

দাবি দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করা হতো। সে সঙ্গে সরকারি কিংবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় হতো সংবর্ধনা ও ভোজের আয়োজন। এ প্রসঙ্গে রবিজীবনীতে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন:

> কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যে সরকারী সহযোগিতা সর্বাধিক পাওয়া গিয়েছিল (এই) মাদ্রাজ কংগ্রেসে। মাদ্রাজের গর্ভনর Lord Connermara গভর্নর জেনারেলের পরামর্শে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু প্রতিনিধিদের সম্মানে মিঃ নর্টন প্রদত্ত ডিনার পার্টিতে যোগ দেন ও পরের দিন সন্ধ্যায় গভর্নর হাউসে প্রতিনিধিদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন, গভর্নরের ব্যাণ্ড তাদের স্বাগত জানায়। মাদ্রাজের শেরিফও প্রতিনিধিদের জন্য ডিনার পার্টির আয়োজন করেন।[৬১]

সম্মেলনের পর সারা বছর নেতা কর্মীদের সময় কাটতো বিভিন্ন পেশাগত কাজে। একজন ঐতিহাসিকের মতে, 'কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। ছিল তিনদিনের এক মেলা'।[৬২] এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের শ্রেণিগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি। এর বেশিরভাগ নেতা ছিলেন সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান, যাদের মধ্যে ছিল জমিদার, ইজারাদার, শিল্পপতি, আইনজীবী প্রমুখ। অথচ এ সময় গ্রামাঞ্চলে কৃষকসহ বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বহু সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-জমিদার বিরোধী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করেছিল। শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই এ সব সংগ্রামের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন যোগ ছিল না।

কংগ্রেস সৃষ্টির এ সব বিষয় রবীন্দ্রনাথের গোচরে এসেছিল কিনা জানা যায় না। এ সময় তিনি 'ভারতী', 'বালক' ও অন্যান্য সাময়িকীতে কবিতা, হেঁয়ালী নাট্য, গান ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর eD VvKivbxi nvU উপন্যাসটি ivRv emšÍ ivq নামে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ (৩ জুলাই, ১৮৮৬) হয়। কেদারনাথ চৌধুরীর নাট্য রূপায়ণে এটিই বাণিজ্যিক থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনার প্রথম উপস্থাপনা। বহু বছর পর কবি নিজে এ উপন্যাসের দুটো নাট্যরূপ cvqwðË (১৯০৯) ও cwiÎvY (১৯২৯) নামে প্রকাশ করেন। তবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে (১৮৮৬ সালে) আগত ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের সম্বর্ধনা সভায় (আনুমানিক ১ জানুয়ারী, ১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথ 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়েছিলেন রামপ্রসাদী সুরে। গানটি ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিকের জন্য রচিত

---

[৬১] প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৮৫

[৬২] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৭৪, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৯০; তৎকালীন এক নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনেই কংগ্রেসকে বলেছিলেন 'তিন দিনের তামাশা'। রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত পৃ. ৫৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ছাব্বিশ গানের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য কীর্তন, রামপ্রসাদী, হিন্দী-ভাঙা এবং দেশজ সুরে রচিত এ সব গান শুনে রবীন্দ্রনাথের পিতা অতীব প্রীত হয়ে তাঁকে পাঁচশত টাকার চেক পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।

এ সময় (নভেম্বর, ১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথের Kwo ও †Kvgj কাব্য এবং কয়েক মাস পর i\Rwl (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭) উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এর কিছু দিন পর তিনি সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে রচনা করেন gvqvi †Ljv (১৮৮৮) গীতিনাট্য। কলকাতায় স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখী সমিতি'র অনুরোধে পূর্ব প্রকাশিত bwjbx নাটিকার কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ গীতিনাট্য ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরে মঞ্চস্থ হয়। gvqvi †Ljv-কে বহুদিন পর নৃত্যনাট্য (১৯৩৭) হিসেবেও রূপ দিয়েছিলেন কবি। উক্ত গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন পর রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ivRv ও ivYx (১৮৮৯)।

ivRv I ivYx : এর মধ্যে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন (১৮৮৭) মাদ্রাজে এবং চতুর্থ অধিবেশন (১৮৮৮) এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ঠাকুরবাড়ির জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের সূত্রে পরিবারের অনেকেই উৎসাহী হয়ে উঠেছেন কংগ্রেসের প্রতি। মাদ্রাজে যাওয়া বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্যে জানকী ঘোষালের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এ সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা যায় চতুর্থ অধিবেশনে ঠাকুর পরিবার কর্তৃক ইভনিং পার্টির আয়োজনে। উল্লেখ্য, মাদ্রাজ অধিবেশনে অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিদের সম্মানে ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন ব্যারিস্টার ইয়ার্ডলি নর্টন এবং মাদ্রাজের শেরিফ। তার প্রতি-উত্তরে চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি জর্জ ইয়ুল এবং ব্যারিস্টার নর্টনের সম্মানে ঠাকুর পরিবার ইভনিং পার্টির আয়োজন করে। উক্ত পার্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথও কয়েকদিন ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন বলে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন।[৬৩] কিন্তু ivRv I ivYx নাটকে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় স্থান পায় নি।

এর কাহিনীতে বলা হয়েছে: জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব তার রানি সুমিত্রার প্রেমের মোহে রাজকাজে উদাসীন। রানির আত্মীয়স্বজন রাজ্য জুড়ে গড়ে তুলেছে অত্যাচারের আখড়া। জনগণের হাহাকার ধ্বনি রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে না। রাজমন্ত্রী সে খবর রানির কাছে জানালে রানি বিক্রমদেবকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও রাজার মনোভাব পরিবর্তিত হয় না। অগত্যা রানি পুরুষের ছদ্মবেশে পিতৃরাজ্য কাশ্মীর গিয়ে তার ভাই কুমারসেন-এর সাহায্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। এ দিকে রানির পালানোর সংবাদে বিক্রমদেবের মোহ যায় কেটে; তার মধ্যে জাগে যুদ্ধের নেশা। সে নিজেই এবার বিদ্রোহী সামন্ত রাজাদের আক্রমণ ও বন্দী করতে শুরু করে। এ রকম কয়েকজন পলাতক রাজাকে রানি ধরে নিয়ে আসে বিক্রমদেবের

---

[৬৩] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

কাছে। এতে রাজা অপমানিত বোধ করে এবং রানির সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হয়। বন্দীরাও এ বিষয়ে রাজাকে উত্তেজিত করলে রাজার সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে শ্যালক কুমারসেনের ওপর। এবার রাজা তাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর আক্রমণ করে। কাশ্মীর-রাজ কুমারসেনের খুড়ো বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে এবং কুমার সেনকেও সমর্পন করতে চায় বিক্রমদেবের হাতে। কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ তাদের প্রিয় রাজকুমারকে লুকিয়ে রাখলে তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া শুরু করে বিক্রমদেব। এ পর্যায়ে কুমারসেন উত্তেজিত হয়ে বিক্রমদেবকে আক্রমণ করতে চাইলে সুমিত্রা তাকে বরং আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানায়। এদিকে বিক্রমদেবের রুদ্ররোষ একসময় স্তিমিত হয়ে আসে এবং সে গোপনে কুমারসেনের বাগদত্তা ইলার পিতার রাজ্য ত্রিচূড় রওনা হয়। সেখানে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারে কুমারসেনের প্রতি ইলার গভীর প্রেমের পরিচয়। এতে কুমারের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং সে নিজেই হয়ে ওঠে কুমার ও ইলার মিলন-প্রত্যাশী। এক সময় রাজার বাল্যবন্ধু দেবদত্ত এসে তার মনে জাগিয়ে তোলে পুরনো প্রেমের স্মৃতি। এতে রানি সুমিত্রার প্রতি তার আকর্ষণ আবার দেখা দেয়। ওদিকে পালিয়ে থাকা রাজপুত্র কুমারসেনের আত্মসম্মানবোধ হয়ে ওঠে তীব্র। সব বিষয় বিবেচনা করে সে বিক্রমদেবের কাছে আত্মসমর্পণ না করে জীবন বিসর্জন দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুমারের ছিন্ন মস্তক নিয়ে রানি সুমিত্রা কাশ্মীর রাজদরবারে উপস্থিত হয় এবং বিক্রমদেবকে তা প্রদর্শন করেই ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। কুমারের বাগদত্তা ইলাও সে দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কেবল কুমার-ইলার পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ শংকর প্রচণ্ড হৃদয়-বেদনা নিয়েও স্বস্তি প্রকাশ করে কুমারের উদ্দেশে বলে:

বৎস, প্রাণাধিক বৃদ্ধের জীবন ধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল।...[৬৪]

উল্লিখিত কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার যা উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, তা হলো–জগৎসংসারের সঙ্গে অন্বিত হয়েই প্রেমে সার্থকতা আসে, আসক্তির মধ্যে নয়। প্রসঙ্গত এ বক্তব্য কবির তৎকালীন gvbmx (১৮৯০) কাব্যের কিছু কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছিল। উক্ত কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য; তা হলো:

---

৬৪ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

> সত্য হউক, মিথ্যা হউক, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা, ইহাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি। ভোগবাসনা মানুষের মনে মোহ উৎপন্ন করে, মোহ হইতে জাগে বিভ্রম, এই বিভ্রম মানবের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দেয়, বৃহতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে। কাজেই 'নিবাও বাসনা-বহ্নি'। প্রেম অনন্ত, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার মধ্যে তাহার খণ্ড অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে ডুবিয়া গেলে প্রেমের সমগ্রতা উপলব্ধি করা যায় না।[৬৫]

ivRv ও ivYx নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিক্রমদেবের মাধ্যমে নাট্যকার উক্ত ভাবই ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের ঘটনা পরম্পরা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের চরিত্রসমূহ নাটকে এসেছে মূলত সেই ভাবের পরিপুষ্টি সাধন করার জন্য। সুমিত্রার প্রেমে মোহাবিষ্ট রাজা বিক্রমদেব আত্মকর্তব্য বিস্মৃত হয়ে সত্য প্রেমের কল্যাণ-আবহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। রানির পালানোর ঘটনায় জেগে ওঠে তার কর্তব্য নিষ্ঠা; জাগে পৌরুষ। একের পর এক যুদ্ধে সে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে থাকে। কিন্তু এ জাগরণেও আছে হিংসার উন্মত্ততা, আছে উদগ্র রাজাভিমান। প্রেমের প্রশান্ত সৌন্দর্যের সন্ধান কিংবা সমগ্রতার উপলব্ধি তাতে ছিল না। এ সব সে লাভ করে কাশ্মীর রাজ-মহিষী ও নিষ্ঠুর হিংসার প্রতিমূর্তি রেবতীর কাছে এবং এর বিপরীতে কুমার-ইলার শাশ্বত কল্যাণচেতনার প্রেমের পরিচয়ের মধ্যে। ফলে তার হৃদয়ে ঘটে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন; সে উন্মুখ হয়ে ওঠে কুমার-ইলার মিলন সাধনে। একই সঙ্গে রানি সুমিত্রার সান্নিধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্যও হয়ে ওঠে ব্যাকুল। এ অবস্থায় কুমারসেন-এর আত্মবিসর্জন এবং সুমিত্রার মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে নিদারুণ বিভ্রান্তির দুঃখজনক পরিণতি হিসেবে।

উক্ত বিবেচনায় নাটকটিকে চিহ্নিত করা যায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রেম-ভাবনার অন্যতম প্রকাশ রূপে। সে দিক থেকে এটি bwjbx কিংবা গীতবহুল gvqvi †Ljv নাটিকার বাস্তব পরিবেশ সংলগ্ন সম্প্রসারণ বলে গ্রহণ করা সঙ্গত।[৬৬] লক্ষণীয় যে, নাটকের সূচনায় কবি নিজেই gvqvi †Ljv নাটিকার শেষ গানের উল্লেখ করে বলেছেন:

> ... সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে। –
>
> এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম
>
> প্রেম মেলে না।

---

[৬৫] নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ১৪১০, পৃ. ৫৪।

[৬৬] 'ভাবের দিক দিয়া ইহা তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকগুলিরই সমপর্যায়ভুক্ত।' আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

শুধু সুখ চলে যায়

এমনি মায়ার ছলনা।[৬৭]

তবে বাস্তব জীবন ও পরিবেশে বক্তব্য বিষয়ের সম্প্রসারণ ঘটলেও নাটকে বিধৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা যথারীতি প্রাচীন যুগের। মোহাবিষ্ট রাজার রাজকাজে ঔদাসীন্য ছাড়া নাটকের কাহিনী ও বক্তব্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেই বললে চলে। অবশ্য তৎকালীন ভারত কিংবা বাংলা ও এর আশে-পাশের অঞ্চলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ এবং ঔপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বক্তব্যধর্মী নাটক একেবারে প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করা মুশকিল। বিশেষ করে এ নাটকেই একটি জনতা দৃশ্যে উৎপীড়িত ও ক্ষুধার্ত মানুষদের মধ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকারী হিউম উল্লিখিত 'কিছু একটা' (something) করার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'রাজপথ'-এর কিছু সংলাপে রয়েছে এর পরিচয়। যেমন:

কিনু নাপিত। ও রে ভাই, কান্নার দিন নয়। অনেক কেঁদেছি। তাতে কিছু হল কি?

মনসুখ চাচা। ঠিক বলেছিস রে, সাহসে সব কাজ হয়–ঐ যে কথায় বলে 'আছে যার বুকের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা'।

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ করব।

কিনু নাপিত। ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কী বল খুড়ো, তুমি তো স্মার্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুঠপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল। কিছু না, খিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা! জানিস তো অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন। তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকো ঠাকুর। তবে তাই হবে। তা, আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে, আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরাব।

কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

মনসুখ। আমার একগাছা লাঙল আছে, এবার তাজপরা মাথাগুলো মাটির ঢেলার মতো চষে ফেলব।[৬৮]

---

[৬৭] রাজা ও রাণী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, সূচনা অংশ।
[৬৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

–অবশ্য রাজা বিক্রমদেবের বাল্যবন্ধু দেবদত্তের চালাকিতে তাদের সে পরিকল্পনা অঙ্কুরেই নস্যাৎ হয়ে যায়। তবে এতে এটা স্পষ্ট যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া যে খুবই স্বাভাবিক তা–হিউমের মতো প্রমাণ না দেখেও–রবীন্দ্রনাথের বোধ করি অজানা ছিল না। আবার এ রকম বিদ্রোহ যে সহজ কৌশলে দমন করে ফেলা যায় সে বক্তব্যও নাটকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দুর্লক্ষ নয়।

wemRb : ivRv I ivYx প্রকাশের এক বছরের মধ্যে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নাটক wemRb (১৮৯১)। ইতঃপূর্বে রচিত ivRwl (১৮৮৭) উপন্যাসের প্রথম পর্বের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়। পূর্ববঙ্গে জমিদারি তদারকির দায়িত্ব পেয়ে এ সময় তিনি সপরিবারে অবস্থান করছিলেন শিলাইদহে। এর এক পর্যায়ে সাজাদপুরে কিছুদিন একা থাকার সময় এটি রচিত হয়। একইসঙ্গে চলছিল gvbmx-র বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা রচনা। কলকাতা ছেড়ে দূরে থাকার কারণে সে বারের ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবে তিনি ছিলেন না এবং কোন নতুন গানও তিনি রচনা করেন নি। তবে ইংল্যান্ডযাত্রী কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলের সম্মানে ঠাকুর পরিবার-প্রদত্ত ভোজ সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও ব্যস্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে বোম্বাই তে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে (১৮৮৯) স্থির হয় যে, কংগ্রেসের গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ ইংল্যান্ডের জনসাধারণকে জানাবার জন্য এগার জনের একটি প্রতিনিধি দল সেখানে প্রেরিত হবে। এ দলে ছিলেন হিউম, জর্জ ইয়ুল, ইয়ার্ডলি নর্টন, ফিরোজ শা মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, উমেশচন্দ্র বোনার্জি প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যক্তিত্ব।[৬৯] অবশ্য wemRb নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নয়, স্থান পেয়েছে কয়েক বছর আগে আলোচিত ধর্মসংস্কার প্রসঙ্গ। ১৮৮৫ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মনোনীত হওয়ার পর কবি কিছুটা কর্তব্যের তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দু মতাবলম্বীর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। শশধরসহ নব্য হিন্দুরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মদের নিরাকার উপাসনা তত্ত্ব হিন্দু ধর্ম বিরোধী। এর বিরুদ্ধে 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' (১৮৮৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, পৌত্তলিকতায় ঈশ্বরকে এক বিশেষ সীমার মধ্যে (মূর্তির মধ্যে) আবদ্ধ করে তাঁর উপাসনা করা হয়। তাঁর মতে এ মূর্তি কল্পনা উদ্রেক করার জন্য সৃষ্টি হলেও কিছুদিন পর মূর্তির সে ক্ষমতা থাকে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং এভাবে পরোক্ষ উপায়টাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৭০] কিছুদিন ধরে চলেছিল এ বিতর্ক। এর এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ivRwl উপন্যাস। এবার wemRb নাটকেও দেখা গেল কবি ঈশ্বর উপাসনা হিসেবে মূর্তিপূজা এবং তাঁর উদ্দেশে পশু বলি দেওয়ার সংস্কার অর্থহীন ও অমানবিক

---

[৬৯] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

[৭০] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের মত হলো, ÒwemRbÓ আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ[৭১]...”। প্রায় অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন এডওয়ার্ড টমসন। তাঁর মতেঃ

> The theme of *Sacrifiee* had been implicit in many on obscur page of Indian religious thought. But Rabindranath play first gave its protest a reasoned and deliberate place in art. He attacks bigotry with the weapon most dangerous to it, the sarcasm of parody.[৭২]

---

[৭১] নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা ১৪১০, পৃ. ২৭৪

[৭২] Thomson, Edward, পূর্বোক্ত, পৃ. 91-92

Dhaka University Institutional Repository

অবলম্বিত বিষয়টি সমসাময়িক হলেও রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের কাহিনী ও পরিবেশ কল্পনা করেছেন ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে। ত্রিপুরা রাজ্যের মন্দিরে কালী দেবীর পূজায় পশু বলি প্রচলিত। একবার অপর্ণা নামে এক অনাথ বালিকার ছাগশিশু বলি দেওয়া হলে সে কান্নায় আকুল হয় এবং এ বিষয়ে রাজার কাছে অভিযোগ করে। ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য আপর্ণার কান্নায় রাজা গোবিন্দমাণিক্য বেশ বিচলিত হয় এবং তার রাজ্যে পশু বলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতে রাজপুরোহিত রঘুপতি, শিষ্য জয়সিংহ এমনকি রানিও রাজার প্রতি হয়ে ওঠে রুষ্ট। পুরোহিত ধর্ম বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ অস্বীকার করে। ও দিকে রানি গুণবতী সন্তান কামনায় পশু বলি দিতে উৎসাহী। কিন্তু রাজঘোষণায় তাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হলে রঘুপতি শুরু করে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে সে রাজ্যহত্যায় প্ররোচিত করতে থাকে। কিন্তু ভীরু নক্ষত্ররায় তাতে অসম্মত হলে এ কাজের দায়িত্ব নেয় রঘুপতির পুত্রবৎ শিষ্য জয়সিংহ। তবে ইতোমধ্যে অপর্ণার প্রভাবে জয়সিংহের মনে পশুবলি নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তবু সে গুরুর প্ররোচনায় তার আদেশ পালনে হয় কৃতসংকল্প। রঘুপতি তাকে বুঝিয়েছে, একমাত্র রাজরক্তে হবে দেবীর সন্তুষ্টি। এ দিকে জয়সিংহ জানতে পেরেছে যে, সেও এক রাজবংশেরই সন্তান। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফাল্গুনের শেষ রাতে জয়সিংহ একাকী দেবীর সামনে এলে উদ্বিগ্ন রঘুপতি রাজরক্ত এনেছে কি না জানতে চায়। জয়সিংহ নিজে দেবীর সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে এবং আত্মঘাতী হয়ে নিজের রক্তই নিবেদন করে দেবীকে। জয়সিংহের আত্মহত্যায় অকৃতদার রঘুপতির পিতৃহৃদয় হয়ে ওঠে রক্তাক্ত। এতে রঘুপতির চৈতন্যোদয় হয় এবং সে বুঝতে পারে যে, দেবী মূর্তি দেহে মনে পাথর ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তার উদ্দেশে পূজা তথা পশু বলি অর্থহীন। এর ফলশ্রুতিতে হতাশা আর ক্ষোভে সে সেই দেবীমূর্তি নিক্ষেপ করে পাশের গোমতী নদীতে।

কয়েকটি জনতা দৃশ্য ছাড়া প্রধানত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এ নাটক রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত রীতির শ্রেষ্ঠ রচনা বলে কয়েকজন সমালোচক উল্লেখ করেছেন।[৭৩] নাটকে প্রধান সংঘাত বেধেছে গভীর হৃদয়বৃত্তি ও সর্বপ্রাণির প্রতি উদার মমত্ববোধের ইতিবাচক শক্তির সঙ্গে অন্ধ সংস্কার, মূঢ়

[৭৩] ক) "নাটক হিসেবে 'বিসর্জন'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রচনা। তাহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার মধ্যেই সর্বাধিক নাট্যিক গুণেরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষত একটি সমসাময়িক অতি জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক বোধের বাহন ছিল বলিয়া ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হয়।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
খ) "সমগ্র রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের মধ্যে 'বিসর্জন' আখ্যানবস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস-কৌশলে ঘটনার দ্রুত প্রবাহে, নাটকীয় চমৎকারিত্বে পাত্রপাত্রীর অন্তরস্থিত ভাব ও বাহিরের কর্মের সম্মিলিত দ্বন্দ্বসংঘাতময়, বেগবান রূপের প্রকাশে, মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতায়, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ... রূপক-সাংকেতিক গণ্ডীর বাহিরে যে-সমস্ত নাটক আছে তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই 'বিসর্জন' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, ১২৮
গ) "বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের অন্যতম। হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধর্মাচার কখনো প্রকৃত ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব।" অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রান্ত অধিকারবোধের নেতিবাচক শক্তির। প্রথম পক্ষের অপর্ণার মাধ্যমে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যে উদার মানবিক প্রেমচেতনার সঞ্চার ঘটে তার বিরুদ্ধে পুরোহিত রঘুপতির নেতৃত্বে রানি গুণবতীসহ সংগঠিত হয় প্রতাপের শক্তি। উভয় পক্ষের সংঘর্ষের মাঝখানে সংশয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে জয়সিংহ। দ্বন্দ্বের তীব্রতায় একদিকে জয়সিংহের যেমন প্রাণ বিসর্জন ঘটে, তেমনি রঘুপতি কর্তৃক দেবীমূর্তির বিসর্জনে ঘটে হিংস্র ধর্মাচারের ওপর অহিংসা ও সর্বজীবে প্রেম ও মৈত্রীময় আচারের প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্য, এ ধর্মাচার বা বক্তব্য বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত। সর্বজীবে প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর যে শিক্ষা বৌদ্ধ ধর্মে প্রচারিত, তা-ই এখানে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে ধারণা করা যায়। কয়েকজন আলোচকও পোষণ করেছেন উক্ত মত। যেমন নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,

> "বিসর্জনে" দেখি পুঁথিগত আচারগত ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং মানবধর্মকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করা হইয়াছে।[৭৪]

অজিতকুমার ঘোষ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করেছেন এভাবে :

> 'বিসর্জন' নাটকে হিংসাত্মক বলিদান প্রথা হইতে যে বিরোধী শক্তির প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সমস্যার রূপায়ণে নাট্যকার বৌদ্ধ আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে চালিত হইয়াছিলেন। ধর্মের নামে জীব হিংসার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন তাহাই যেন পুনরায় বুদ্ধদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল।[৭৫]

প্রসঙ্গত এ ধারণা শুধু বক্তব্য বিচারে নয়, অন্তর্গত লক্ষণ বিচারেও পাওয়া যায়। যেমন, এ নাটকের প্রাথমিক উৎস i\Rl উপন্যাসে পশু বলি বন্ধের ঘোষণায় রাজ সভাসদদের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট লক্ষণীয়। সে বর্ণনায় পাওয়া যায়:

> সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি"।[৭৬]

তেমনি 'বিসর্জন' নাটকে একই প্রসঙ্গে নক্ষত্র রায়ের কণ্ঠে শোনা যায়:

> "এ কী হল! শুনেছিনু
>
> মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে

---

[৭৪] নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

[৭৫] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত পৃ. ২৯০

[৭৬] রাজর্ষি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু”।[৭৭]

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন, আমাদের অনুমান ivRwl ছাড়া wemRb -এর অন্য উৎস রয়েছে; এবং তা হলো, রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত ও ১৮৮৫ সালে মঞ্চস্থ হওয়া ex‡'e PwiZ নাটক। অবশ্য গিরিশের এ নাটক আবার ইংরেজ কবি EDWIN ARNOLD রচিত *The Light of Asia (1879)* গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত এবং সে কবির প্রতি উৎসর্গীকৃত। তা সত্ত্বেও উভয় রচনা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রশংসিত ও আদৃত হয়েছিল। যেমন, কবি নবীনচন্দ্র সেন রচিত AwgZvf (১৮৯৫) কাব্য রচনার মূলেও ছিল আর্নল্ডের উক্ত কাব্যের প্রেরণা। তেমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর Kíbv (১৯০০) কাব্যের ‘বিদায়’ কবিতা রচনা করেছিলেন আর্নল্ডের কাব্যের সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ অংশ থেকে।[৭৮] আর গিরিশ ঘোষের নাটকের প্রভাবে সে সময় কেউ কেউ পূজায় ছাগবলি থেকে বিরত ছিলেন বলে গিরিশ জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন।[৭৯] তাই আর্নল্ডের কাব্যের জনপ্রিয়তা এবং গিরিশের নাটকের প্রভাব wemRb রচনায় সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা অনেকখানি। বিশেষ করে ex‡'e PwiZ নাটকের ঘটনার কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে wemRb-এর নিকট সাদৃশ্য এ অনুমানে উৎসাহ সঞ্চার করে। যেমন,

ক. বুদ্ধদেব চরিত নাটকে এক রাখালের ছাগপাল বলির জন্য নিয়ে আসার হুকুম দেন রাজা বিম্বাসার [বিম্বিসার]। সিদ্ধার্থ জানতে পারেন, রাজা পুত্র কামনায় যে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তাতেই ছাগলগুলো বলি দেওয়া হবে।[৮০]

খ. সিদ্ধার্থ রাজা বিম্বিসারকে হিংসা পরিত্যাগ করে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান এবং এক পর্যায়ে ছাগলপালের পরিবর্তে তাঁর প্রাণ বলি দিতে অনুরোধ করেন।[৮১]

গ. অবোধ প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য সিদ্ধার্থের জীবনদানের এ প্রতিজ্ঞায় রাজা বিম্বিসারের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটে। অতঃপর তাঁর ঘোষণা :

মন্ত্রি, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ–

[৭৭] বিসর্জন, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫
[৭৮] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৪২
[৭৯] অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র (সম্পা. স্বপন মজুমদার), কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২১৩
[৮০] বুদ্ধদেব চরিত, গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ২৬৮-৬৯
[৮১] পূর্বোক্ত, পৃ, ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

দেবার্চ্চনা অধিক নাহি ক আর।

আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,

হ'ল দূর, সাধু-দরশনে।

আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।[৮২]

উক্ত উপাদানগুলোর সঙ্গে wemRb-এর কয়েকটি প্রসঙ্গ যেমন, রানি গুণবতীর সন্তান কামনায় যজ্ঞ, রাজা গোবিন্দমাণিক্যের বলি নিষেধ সম্পর্কিত ঘোষণা, এবং দেবীর উদ্দেশে জয়সিংহের আত্মবিসর্জন, সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া সর্বপ্রাণির প্রতি মৈত্রী ভাবনা প্রকাশক বুদ্ধের মুখনিঃসৃত 'মেত্তাসুত্ত' বা মৈত্রীসূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। একাধিক স্থানে তিনি এ সূত্রের অনুবাদ করেছেন। যেমন :

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,

এবম্পি সব্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।[৮৩]

এ অংশটি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে পাওয়া যায়, "মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে"।[৮৪] এ সব লক্ষণ বিবেচনায় এ কথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর wemRb, নাটকে একটি হিংস্র ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে গৌতম বুদ্ধের অহিংসা বাণীর প্রচার এবং প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। উক্ত লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে উপস্থাপন করেছেন সৃষ্টিশীল নাটকীয় কৌশলে। এ কারণে wemRb নাটক বিষয় ও আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে আজও গুরুত্বপূর্ণ।

wemRb নাটকের কাহিনী, উদ্দেশ্য, পটভূমি ও চরিত্র সব দিক থেকে একক বক্তব্য উপস্থাপনে ক্রিয়াশীল এবং তা হলো ধর্ম-সংস্কার। এতে রাষ্ট্র বা রাজনীতি বিষয়ে বক্তব্য অনুপস্থিত। অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারে ধর্মও রাজনীতির বাইরে নয়। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় চিন্তা বা আধ্যাত্মিক ভাবনা সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী সময়ের রচনা ivRv ও WvKNi নাটকে, সে আলোচনা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হবে।

wPÎv½'v: wemRb প্রকাশের কিছুদিন আগে ভারতীয় রাজনীতিতে ভারত সচিব লর্ড ক্রস-এর 'Indian Councils Bill' নিয়ে শুরু হয় উত্তেজনা। লন্ডনে হাউস অব লর্ডস–এ উত্থাপিত এ বিলে

[৮২] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

[৮৩] রবীন্দ্রনাথ : বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৫ পৃ. ২০

[৮৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার খর্ব করা হয়। এর বিরুদ্ধে লন্ডনের উদারনীতিবাদী এবং ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব শুরু করে তীব্র সমালোচনা।[৮৫] রবীন্দ্রনাথও এতে বিচলিত বোধ করেন এবং কলকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে আয়োজিত সভায় উক্ত বিষয়ে পাঠ করেন 'মন্ত্রি অভিষেক' (১৮৯০) নামে একটি প্রবন্ধ। যে সব রক্ষণশীল ইংরেজ নির্বাচন পদ্ধতিকে প্রাচ্য দেশীয়দের জন্য অনুপযোগী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মতামত খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মানব প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ থাকার এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে, ভারতবাসীর কল্যাণের দায়িত্ব ভারতবাসীকে দিলে তারা অসন্তুষ্ট হবে। তবে এ যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রতি ভক্তি ও স্তুতিবশত ইংরেজ-ভারতীয় সম্পর্ক নিয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন সেগুলো তৎকালীন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদেরও মেনে নেওয়া ছিল কঠিন। যেমন, শুরুতে তিনি বলেছেন:

> ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই যিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে। অবশ্য, ইংরাজের ইহাতে আনুষঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না।[৮৬]

এ বিষয়ে সমকালীন সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 'নব্যভারত' পত্রিকায় লিখেছিলেন:

> 'ভারতের উন্নতি ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হইলেও তাহা 'মুখ্য উদ্দেশ্য' নহে; –গৌণ উদ্দেশ্য। পরন্তু ইংরাজ গবর্ণমেন্ট -অনুষ্ঠিত ভারত -উপকার 'নিঃস্বার্থ' বা 'নিষ্কাম' নহে, তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম।[৮৭]

তুলনায় একই অংশের সমালোচনায় বর্তমান সময়ের সমালোচক সৈয়দ আবুল কালাম অনেক কঠোর এবং স্পষ্ট। তিনি 'রাজনীতির রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখেন:

> [...] তাঁর এই বক্তব্য ইতিহাসের বাস্তবতাকেই উল্টে দিয়েছে। ইংরেজদের ভারত শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন। ভারতের জনগণও তাদের জীবন, অপরিসীম দুর্দশা ও রক্তের বিনিময়ে চিনেছিলেন প্রধান শত্রু ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে। তাঁরা ক্রন্দন করেননি, বরং যা করেছিলেন তা হল বারংবার বিদ্রোহ।[৮৮]

---

[৮৫] নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত পৃ, ৬৮-৬৯
[৮৬] 'মন্ত্রি অভিষেক', রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ: ২য় খণ্ড, কলকাতা
[৮৭] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
[৮৮] সৈয়দ আবুল কালাম, 'রাজনীতির রবীন্দ্রনাথ', নতুন দিগন্ত (সম্পা. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

স্মর্তব্য ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর কয়েকটি বিদ্রোহের পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা অনেক কংগ্রেস নেতার মতো রবীন্দ্রনাথেরও তখন ছিল না বলে মনে হয়। নেপাল মজুমদারও রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেন:

> ভারতবর্ষের ইংরেজ-শাসন-সংস্কারগুলির উপর সেদিন খুব সাময়িক হইলেও রবীন্দ্রনাথের কিছুটা যেন মোহ দেখা যায়। এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হীন ও জঘন্য অভিসন্ধি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মানস-পট হইতে অপসারিত হইয়াছিল। মহত্তর বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ চরিত্রই তাঁহার মানসপটে ভাসিতেছিল। ... তাহাদেরই উদ্দেশে তিনি বলিলেন, 'তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব থাকিতাম'। সেদিনের কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সমর্থনের কথাও তিনি ঘোষণা করিলেন, 'কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পরিব না ...।'[৮৯]

এই রচনার পঞ্চাশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে উক্ত ভাষণ সম্পর্কে লিখেছিলেন, তিনি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে ইংরেজদের চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলেন 'গরম ভাষায়'।[৯০] গরম ভাষার এই প্রকার 'মোলায়েম' নমুনা দেখে মনে হয় স্মৃতি কবিকে বেশ প্রতারিত করেছিল।[৯১]

'মন্ত্রি-অভিষেক' এবং wemRb একই সময় (১৫ মে, ১৮৯০) প্রকাশিত হয়। এর কয়েকদিন পর পুনরায় কবিকে জমিদারির কাজে যেতে হয় শিলাইদহে। সেখানে gnvfviZ-এর চিত্রাঙ্গদার কাহিনী নিয়ে নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের এক জটিল মনস্তত্ব নিয়ে লিখতে শুরু করেন কাব্যনাটক wPÎv½'v (১৮৯২)। শুরু করলেও এর সমাপ্তি হয় প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় পরে। মাঝখানে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ইংল্যান্ড ঘুরে এসে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য gvbmx (ডিসেম্বর, ১৮৯০)। সে সঙ্গে mvabv পত্রিকায় লিখেছেন Mí¸‡"Qi কয়েকটি অবিস্মরণীয় গল্প।

রাজনীতিতে এ সময় [২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯০] কংগ্রেসের ৬ষ্ঠ অধিবেশন সমাপ্ত হয় কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হওয়ায় এ অধিবেশনের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথেরও বেশ ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা যায়। অধিবেশনের সভাপতি ফিরোজ শাহ মেহ্তা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ

---

[৮৯] নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
[৯০] শনিবারের চিঠি (৫ জানুয়ারী, ১৯৪০) থেকে উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
[৯১] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকে রবিজীবনীকার সে অনুমান করেছেন। আরো উল্লেখ্য, এ অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও চাঁদা দিয়েছিলেন দুই হাজার টাকা। উক্ত অধিবেশনের পরপর রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মধ্য ও উত্তরবঙ্গে তিনটি কাছারি যথাক্রমে শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসর পরিদর্শন শেষ করে উড়িষ্যার জমিদারি তদারকিতে রওনা হন। সেখানে কটক কালেক্টরেটের অধীনে পান্ডুয়া, বালিয়া, ও পহরাজপুরেও ছিল ঠাকুর পরিবারের জমিদারি।[৯২] এর পান্ডুয়া-র নির্জন কুটিরে wPÎV½'V-র পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হয়। পরে কলকাতায় ফিরে আত্মীয় বন্ধুদের কাছে তা পড়ে শোনান এবং এর জন্য ছবি আঁকার নির্দেশ দেন ভাইপো, পরবর্তী সময় বিখ্যাত চিত্রকর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। অবশেষে অবনীন্দ্রের ৩৬টি চিত্র নিয়ে এবং তাঁর প্রতি উৎসর্গিকৃত হয়ে wPÎV½'V-র প্রকাশ ঘটে (সেপ্টেম্বর, ১৮৯২)।

wPÎV½'V রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশেষ ভাবের রূপসৃষ্টি। ভাবটি হলো–জৈব আকর্ষণে নয়, যথার্থ চারিত্র্য শক্তির সমর্থনে মোহমুক্ত মিলনেই প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতা নিহিত। নাটকের সূচনায় বিষয়টি নাট্যকার নিজেই বলে নিয়েছেন। যেমন,

> অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরে রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে–তখন পল্লীপ্রাঙ্গনে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র-শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধুলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্র্য-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়।...[৯৩]

---

[৯২] চিত্রাঙ্গদা (ভূমিকা), রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ. ১৬৭

[৯৩] চিত্রাঙ্গদা (ভূমিকা), রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাব কবি gnvfviZ -এর একটি আখ্যান অংশ পুনঃসৃজনের মাধ্যমে wPÎv½'v-য় রূপদান করেন। এর কাহিনীতে দেখা যায়–মনিপুর রাজ্যের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা শৌর্যবীর্যে রাজপুত্রের সমকক্ষ। তার পোষাক পরিচ্ছদ যেমন বরাবর পুরুষের মতো, তেমনি দেহেও নেই নারীসুলভ লাবণ্য। একবার সে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী বীর অর্জুনের সম্মুখীন হয়। চিত্রাঙ্গদার ব্যবহারে অর্জুন উত্যক্ত বোধ করলেও তাকে অর্বাচীন বালক ভেবে দ্রুত স্থানত্যাগ করে। ইতোমধ্যে চিত্রাঙ্গদার মনে অর্জুনের প্রতি ঘটে প্রেমের সঞ্চার। সেই মোহে চিত্রাঙ্গদা তার পুরুষবেশ ত্যাগ করে এবং অর্জুনকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু নারীসুলভ কোন আকর্ষণ-শক্তি তার না থাকায় অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রহ্মচর্যের দোহাই দিয়ে। অপমানিত চিত্রাঙ্গদা দেবতা বসন্ত ও মদনের শরনাপন্ন হয়ে তাকে এক বছরের জন্য রূপবতী করার প্রার্থনা জানায়। তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, সে হয়ে ওঠে অনিন্দ্য সুন্দরী। সে-রূপের মোহে এবার ব্রত ভঙ্গ হয় অর্জুনের। সে চিত্রাঙ্গদার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতে থাকে এবং চিত্রাঙ্গদাও অর্জুনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। অবশ্য এ অবস্থায় আত্মপরিচয় গোপন রাখে চিত্রাঙ্গদা।

এ দিকে কেবল দেহজ রূপ লাবণ্যের প্রতি অর্জুনকে আত্মসমর্পিত হতে দেখে চিত্রাঙ্গদার মনে ভিন্ন চৈতন্যের উদয় হয়। তার মনে হয় অর্জুন কেবল তার স্থূল সৌন্দর্যে মুগ্ধ; হৃদয় ঐশ্বর্যে নয়, চারিত্র্য শক্তিতে নয়। অথচ সে সৌন্দর্য ও লাবণ্য তার নিজের নয়; কেবল বসন্ত ও মদনের কাছ থেকে বর হিসেবে পাওয়া। এ ভাবে কেটে যায় প্রায় এক বছর। এ সময় চিত্রাঙ্গদার পিতার রাজ্যে দস্যুদলের হামলা শুরু হলে দেশবাসী চিত্রাঙ্গদার সাহায্য প্রার্থনা করে। এক বনচারীর কাছ থেকে অর্জুন এ সংবাদ জেনে চিত্রাঙ্গদার প্রতি হয়ে ওঠে কৌতূহলী। তার বীর-চিত্ত চিত্রাঙ্গদার বীরত্বব্যঞ্জক রূপের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। রূপবতী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন তার সে শ্রদ্ধার কথা জানালে চিত্রাঙ্গদা বলে তার সৌন্দর্যহীনতার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বীর চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের আকর্ষণ থাকে অটুট। অবশেষে অর্জুনের রূপজ মোহ পরিত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত হলে চিত্রাঙ্গদা তার স্বরূপ প্রকাশ করে। অর্জুনকে সে আহ্বান করে তাকে সুখে দুঃখে পাশে রাখার, সংকটে কিংবা উদ্বেগে সাথী করে নেওয়ার। তা হলেই সে হয়ে উঠবে স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী, কঠিন ব্রত সাধনার সহায়।

কাহিনীটি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্য সুষমায় এবং এমন পরিমিতি ও সংযমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এর দ্বিতীয় উদাহরণ পাওয়া যায় না। এর নৈতিকতা নিয়ে টম্‌সন কিছু পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করলেও একটি নির্দিষ্ট ভাবের রসরূপ হিসেবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এ নাট্যকাব্য সম্পর্কে বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> It is his loveliest drama; a lyrical feast, though it's form is blankverse... . It is almost perfect in unity and conception, magical in expression; a nearly flawless whole, knit together by the glowing heat of inspiration. ...[৯৪]

বস্তুত চিত্রাঙ্গদাই এ কাব্যের প্রধান চরিত্র। অর্জুন কেবল চিত্রাঙ্গদার 'ইমোশনাল অভিব্যক্তির উদ্দীপন এবং আলম্বন' বিভাবের দায়িত্ব পালন করেছে।[৯৫] রূপবতী হিসেবে অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনতিকাল পরেই চিত্রাঙ্গদার মধ্যে জন্ম নেয় আত্মাবমাননা, সৌন্দর্যের প্রতি ধিক্কার। wPÎv½'vi একটি সংলাপে এ আত্মদংশন পেয়েছে অপূর্ব ভাষারূপ। যেমন,

> আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্য ধিক্কারবেগে
> অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
> পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
> বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
> অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
> আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
> স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
> পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
> বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
> প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
> তাহার আদর। ওগো দেহের সোহাগে
> অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
> নরলোকে কে পেয়েছে আর।...[৯৬]

---

[৯৪] Edward Thompson, ibid, p. 116

[৯৫] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২০৩

[৯৬] চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

সে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন চরিত্রের মানসবিবর্তন যথেষ্ট দ্বন্দ্বময় এবং ঔৎসুক্য সৃষ্টিকারী হলেও তাদের ভাব পরিবর্তনসমূহ যথেষ্ট বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা বিশ্লেষিত ও সমর্থিত হয় নি। এর সংলাপসমূহ নাটকীয় দ্বন্দ্ব বিকাশের চাইতে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের বাহন হয়ে উঠেছে। ফলে সংলাপ দীর্ঘ হওয়ার পাশাপাশি হারিয়েছে নাট্যগুণ।[৯৭] এসব কারণে নাটকের প্রধান চরিত্র দুটি সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠতে পারে নি; হয়েছে নাট্যকারের বিশেষ ভাবের বাহন। নাট্য সমালোচক বিষয়টি সম্পর্কে বলেন:

> শাশ্বত নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতীকরূপে এখানে চিত্রাঙ্গদাকে উপস্থিত করা হইয়াছে। অর্জুনও তাহাই, অর্জুনও শাশ্বত পুরুষের আদর্শ। ইহাদের কাহারও কোন ব্যক্তিরূপ নাই। এই দুইটি আদর্শ চরিত্রের সহায়তায় কবি বিশেষ একটি তত্ত্বকে ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন।[৯৮]

রবীন্দ্র গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও wPÎV½'V-কে সম্পূর্ণ নাটক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি।[৯৯] আর নীহাররঞ্জন রায় এটিকে মূল্যায়ন করেছেন 'গীতিকাব্য' হিসেবে; নাটক হিসেবে নয়। তাঁর মতে:

> গীতিকাব্য বলিলাম এই জন্য যে, "চিত্রাঙ্গদা"র বহিরঙ্গ অর্থাৎ সাহিত্যকৃতিই শুধু কাব্য-নাটিকার, উহার সাহিত্য-লক্ষণ গীতিকাব্যের। উত্তরকালে লিখিত 'কচ ও দেবযানী' যেমন বিশুদ্ধ গীতিকাব্য লক্ষণাক্রান্ত, 'চিত্রাঙ্গদা' ও তেমনই গীতিকাব্যধর্মী; নাটকীয় চরিত্ররীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা নাট্যলক্ষণাশ্রয়ী নহে।[১০০]

তবে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন চরিত্রের উপলব্ধ চেতনার নাটকীয় বিবর্তনে এবং নর-নারীর প্রেম-সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণে এখানে যে সামাজিক বক্তব্য উঠে এসেছে তার তাৎপর্য অস্বীকারের উপায় নেই। স্মর্তব্য, অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একাধিক লেখকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রখ্যাত নাট্যকার ও সঙ্গীতব্যক্তিত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অন্যতম। তিনি প্রধানত তৎকালীন প্রেক্ষাপটে (রচনাকালে) অর্জুন চিত্রাঙ্গদার বিবাহপূর্ববর্তী দৈহিক সম্পর্কের বিষয়টি মেনে নিতে না পারায় কাব্যমূল্য থাকা সত্ত্বেও এটিকে 'দগ্ধ' করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে:

> অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন।...

---

[৯৭] 'ইহাতে নাটকীয় লক্ষণ বা গুণ বিশেষ নাই; পাত্র-পাত্রীর মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হইলেও সেগুলি কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়'। প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

[৯৮] আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

[৯৯] 'পুরোপুরি নাটকের আদর্শে ইহার বিচার হইবে না, ... ।' উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

[১০০] নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

> রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোন কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এই কুকীর্তি আরও ভয়ানক।
>
> আমি “চিত্রাঙ্গদা”-র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবদ্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।[১০১]

লক্ষণীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল wPÎv½'v-র বক্তব্য বিবেচনায় না নিয়ে কেবল কাহিনীর একটি উপাদান নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্নতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অথচ এ কাব্যের প্রেক্ষাপটে gnvfviZ-এর যে পরিবেশ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে বিবাহবর্হির্ভূত সম্পর্ক কিংবা সন্তান জন্মদানের বিষয়টি ও খুব একটা উৎকণ্ঠার ছিল না। তাই আধুনিক সমালোচকের কাছে অপ্রয়োজনীয় উৎকণ্ঠা প্রাধান্য পায় না, পায় বক্তব্যের বিষয় বা কাহিনীর পরিণতি। সমালোচক হুমায়ুন আজাদ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন:

> চিত্রাঙ্গদার শুরু ছক-ভাঙা নারীরূপে, আর তার বিলুপ্তি ঘটে ছকবদ্ধ নারীতে; ভিক্টোরীয় পুরুষতন্ত্রের তৈরি ছকে তাকে চমৎকারভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ, যাতে মুগ্ধ হয় পুরুষেরা, এবং উন্নতজাতের নারী উৎপাদনবাদীরা।[১০২]

চিত্রাঙ্গদার শেষ সংলাপের ব্যাখ্যা করেন তিনি নিম্নোক্তভাবে :

> সে দেবী নয়, দাসী নয়, তবে স্বাধীন সত্তাও নয়; সে পুরুষের সহচরী বা প্রিয় পরগাছা। সে নিজে যাবে না কোন সংকটের পথে, নিজে করবে না কোনো দুরূহ চিন্তা, নিজে গ্রহণ করবে না কোনো কঠিন ব্রত; ওই সমস্ত কাজ পুরুষের, সে-সব করবে তার স্বামী, সে হয়ে থাকবে স্বামীর সহচরী, বা শিক্ষিত দাসী।[১০৩]

কিন্তু wPÎv½'v কাব্যের পাঠ উক্ত সমালোচকের মন্তব্য সমর্থন করে না। যেমন,অর্জুনের সংলাপে যোদ্ধা চিত্রাঙ্গদার প্রতি যে মূল্যায়ন ও আকাঙ্ক্ষিত মূর্তি ফুটে উঠেছে তা অধীন ‘সহচরী’র নয়, সমদক্ষতাসম্পন্ন সহযোদ্ধার। যে শ্রদ্ধাবোধ তাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা বীরের প্রতি বীরের। যেমন:

> দেখিতে পেতেছি তারে–
> বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে,
> দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
> বিজয়লক্ষ্মীর মতো আর্ত প্রজাগণে
> করিছেন বরাভয় দান। ...

---

[১০১] ‘কাব্যে নীতি’, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৭০২-০৩
[১০২] হুমায়ুন আজাদ, নারী, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ১১৪
[১০৩] হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

…   …   …   …

সিংহিনীর মতো চারিদিকে আপনার

বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু

কেহ কাছে নাহি আসে ডরে।

…   …   …   …

রমণীর কমনীয় দুই বাহু’-পরে

স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক থাক্‌

তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কনকিঙ্কণী।

…   …   …   …

এসো এসো, দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে

পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে

দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো।…[১০৪]

একইসঙ্গে চিত্রাঙ্গদার শেষ সংলাপের সমালোচককৃত ব্যাখ্যাও মনে হয় দ্রুত চিন্তাসঞ্জাত ও বিভ্রান্তিমূলক। সংলাপটির নির্দিষ্ট অংশ নিম্নরূপঃ

আমি চিত্রাঙ্গদা

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি

নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে

পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ

মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার

যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,

আমার পাইবে তবে পরিচয়।[১০৫]

---

[১০৪] চিত্রাঙ্গদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪-৯৫

[১০৫] চিত্রাঙ্গদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

কোন কিছু চিত্রাঙ্গদা 'নিজে করবে না' – এমন কথা তো সে বলে নি। বরং এ সব সে নিজেও করতে পারে এবং করে এসেছে। সে জন্য অর্জুনকে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রাখছে যে, যদি তার পুত্র সন্তান হয় তাকে সে-ই দেবে বীরত্বের শিক্ষা, অর্জুনকে সে বলেঃ

… গর্ভে

আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি

পুত্র হয়, আশৈশব বীর শিক্ষা দিয়ে

দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন

পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে–

তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।…[১০৬]

চিত্রাঙ্গদার আত্মবিশ্বাসপূর্ণ এ প্রতিশ্রুতি বোধ করি সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বস্তুত wPÎv½'v নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরুষের পাশাপাশি সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করারই প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রয়াস সারা বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে এমনকি রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনার বিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট উল্লম্ফন। যদিও বাস্তবক্ষেত্রে নারীর উল্লিখিত অবস্থান অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন বলে মনে হয় না।

উল্লেখ্য, অষ্টাদশ শতকের নারী অধিকার আন্দোলনের প্রবক্তা মেরী উলস্টন ক্রাফটের (১৭৫৯-১৭৯৭) অবদান এবং উনিশ শতকের জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩), সমাজতন্ত্রী ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) ও আউগুস্ত বেবেল(১৮৪০-১৯১৩)সহ অন্যান্যদের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও wPÎv½'v রচনাকালে (১৮৯১) পৃথিবীতে নারীর সমানাধিকার এমনকি ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয় নি। ১৮৯৪ সালে নিউজিল্যান্ডে প্রথম নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেলেও তা কার্যকর হয় ১৯২৮ সালে। ইংল্যান্ডে সীমিত আকারে এ ভোটাধিকার ঘোষিত হয় ১৯১৮ সালে।[১০৭] আবার উক্ত নাটক রচনার প্রায় এক বছর আগেও নারী প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরুষপন্থী এবং কিছু পরিমাণে পশ্চাৎপদ। ১৮৯০-এর জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনা শহরের কাছাকাছি থাকার সময় মহারাষ্ট্রের এক 'বিদুষী' মহিলা রমাবাইয়ের বক্তৃতা শুনতে যান। রমাবাই নারীর বিভিন্ন অধিকার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁরই স্বদেশী প্রতিক্রিয়াশীল পুরুষদের ভীষণ হট্টগোলে রমাবাই বক্তৃতা থামিয়ে দিতে বাধ্য হন। এ ঘটনা সম্পর্কে *The Indian Messenger* পত্রিকায় লেখা হয়ঃ

---

[১০৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

[১০৭] মালেকা বেগম, নারীমুক্তি আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮১ পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

> ... the Poona patriots, it seems have no sympathy with social reform. There is a party who are bitterly opposed to all ideas of social advancement. ... some of these men by their hisses and obscene remarks compelled Pandita Ramabai, who intended to deliver series of lectures on the condition of child-widows,...[১০৮]

সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে পত্র’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন fviZx I evjK পত্রিকায়। এতে তিনি নারী পুরুষের সমানাধিকার, পুরুষ অধীনতা, নারীর সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, সন্তানধারণ প্রক্রিয়ার কারণেই নারী পুরুষের চাইতে হীনবল। আর এ বলহীনতার জন্য প্রতিভা, সৃজনশীলতা ও বলিষ্ঠ বুদ্ধিতে নারী সর্বদা পুরষের চেয়ে পিছিয়ে আছে। তাঁর ভাষায়:

> আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণ পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই। আমার তো এইরকম বিশ্বাস।[১০৯]

তাই নারীর উচিত পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে নেওয়া; এটাকেই ধর্মজ্ঞান করা। তাতেই নারীজীবনের সার্থকতা, ‘মহত্ত্ব’। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কোনো ‘কাজের কথা নয়’। বরং নারীর প্রতি তাঁর পরামর্শ:

> আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারো অনুগামী হই তা হলেই বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারো অনুগামী হই তাহলে আমি স্বাধীন। স্বাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী পাশব ব্যবহার করে তবে সে ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাখাটানা কুলিকে লাথি মারে তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।[১১০]

উদ্ধৃতির দ্বিতীয় বাক্যটিকে রবিজীবনীকার ‘চরম প্রগতি–পরিপন্থী মত’ বলতে কুণ্ঠিত হননি।[১১১] আর রবীন্দ্রনাথের এই চরম পুরুষতান্ত্রিক মন্তব্যপূর্ণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁরই ন’ দিদি ও

---

[১০৮] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

[১০৯] রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৪৫১

[১১০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩

[১১১] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১২৯৬) রমাবাইয়ের অবস্থান ব্যাখ্যা ও রবীন্দ্র মন্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি লেখেন:

> ... রমাবাই পুরুষ আশ্রয়ের বিপক্ষ মতাবলম্বী নহেন, পতিভক্তি অকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না–তবে আশ্রয়ের নামে যে সকল পুরুষ-অত্যাচার সমাজে অহরহঃ সংঘটিত হয় তাহা রমাবাই মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন না। সুতরাং তাহার প্রতিকার তাঁহার বিবেচনায় অত্যাবশ্যক।... স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ– একথা তিনি যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা প্রসঙ্গে।... স্ত্রীলোকের এক রকম গ্রহণশক্তি ও ধারণ শক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তি নাই, একথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা ত বুঝিতে পারি না। ...বিশেষ স্ত্রীলোক যে বহিঃ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাইয়ের নিজের জীবনই যখন তাহার একটি দৃষ্টান্ত।[১১২]

ধারণা করা চলে যে, উক্ত প্রতিবাদের কারণে কিংবা কবির তৎকালীন উপলব্ধির ফলে wPÎv½'v-য় নারীকে সুউচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা নারীমুক্তির সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত না হওয়ায় তা গীতিকবির একান্ত কল্পনাপ্রবণ উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয়। কারণ, wPÎv½'vর কাহিনী যে সামন্ত-সমাজকাঠামোয় স্থাপন করা হয়েছে সে সময় নারী মুক্তির বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। এঙ্গেল্স-এর মতে, নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় সূচিত হয় তারও বহু পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার জন্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ সূত্রে। সে অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সন্তানের পিতৃপরিচয় পালন করে প্রধান ভূমিকা।[১১৩] সেই থেকে যে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছে তার বিভিন্নমাত্রিক প্রভাব বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজেও বহমান। তাই সমাজতন্ত্রী আউগুস্ত বেবেল-এর মতে, বর্তমান সমাজে নারী দুই স্তরের নির্যাতনের শিকার। যেমন-

> প্রথমত পুরুষের উপর সামাজিক নির্ভরতার কারণে এবং সমাজে তাদের জন্য বরাদ্দ অধঃস্তন অবস্থানের কারণে নারী নির্যাতিত হয়; ... দ্বিতীয়ত সাধারণভাবে সকল নারী, বিশেষত সর্বহারা নারী, সর্বহারা পুরুষের মতই, অর্থনৈতিক নির্ভরতার কারণে নির্যাতিত হয়।[১১৪]

স্মর্তব্য, wPÎv½'v-র অবলম্বিত gnvfviZ-এর কাহিনীতে চিত্রাঙ্গদার পূর্বপুরুষ পিতৃবংশের উত্তরাধিকারী নিশ্চিত হওয়ার জন্য মহাদেবের এরকম বর পেয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেক পুরুষ একটি

---

[১১২] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পৃ. ১১৮

[১১৩] ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, মার্কস, এঙ্গেলস রচনাবলী (২য় খণ্ড, প্রথম অংশ), মস্কো, ১৯৭২

[১১৪] অগস্ট [আউগুস্ত] বেবেল, নারী এবং সমাজতন্ত্র (অনুবাদ: হাসিবুর রহমান), সংস্কৃতি (সম্পাদক: বদরুদ্দীন উমর), বিশেষ নারী সংখ্যা, মার্চ –এপ্রিল ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

করে পুত্র সন্তান লাভ করবে। চিত্রাঙ্গদাই সেখানে ব্যতিক্রম এবং সে ক্ষেত্রেও তার পুত্রই মণিপুর রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে, এ শর্তে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিল।[১১৫] বস্তুতপক্ষে নারী প্রশ্নে রবীন্দ্রভাবনা পরবর্তী কয়েকটি গল্পে ও উপন্যাসে ('স্ত্রীর পত্র'; †k‡li KweZv ইত্যাদি) বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও পুরুষতান্ত্রিক সংস্কার থেকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। wPÎv½'v রচনার (ভাদ্র, ১২৯৮) মাস তিনেকের মধ্যে mvabv (অগ্রহায়ন, ১২৯৮) এবং অপর সাময়িক পত্রিকা mvwnZ¨ (আশ্বিন ১২৯৮)-এর কৃষ্ণভাবিনী দাস রচিত 'শিক্ষিত নারী' প্রবন্ধের সমালোচনায় তিনি নারীর শিক্ষিত হওয়া এবং পুরুষের মতো অর্থ উপার্জনে সক্ষম হওয়াকে মানতে পারেননি।

নারীর শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে তিনি এ আলোচনায় লেখেন:

> পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকর কার্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি –কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে স্ত্রী এবং জননী হইতে হইবে। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননী কর্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রী-পুরুষের বর্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।[১১৬]

বহু বছর পর, ১৯৩৮ সালে তাঁর সেই ন'দিদির উদাহরণ টেনে এক আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন:

> ... হাজার হোক এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের 'বিল্ড' সব দিক থেকেই আলদা। পুরুষের ব্রেন, তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর্-না কেন, আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম। সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের ব্রেন এতটা কাজ করতেই পারে না।[১১৭]

---

[১১৫] রাজশেখর বসু (সারানুবাদ), মহাভারত, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৯৩-৯৪
[১১৬] সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৭ পৃ. ৬৩৮-৩৯
[১১৭] উদ্ধৃত (রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' থেকে); প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি সে সংস্কার wPÎv½'vর শেষ সংলাপেও লেখকের অজান্তেই যেন ছাপ রেখে গেছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদা বলে যে, তার পুত্র সন্তান হলেই তাকে 'আশৈশব বীর শিক্ষা দিয়ে/দ্বিতীয় অর্জুন করে' গড়ে তুলবে। কন্যাসন্তান হলে একই কাজ করা হবে কি-না নাটকে তার নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ এক রাজকন্যার পক্ষে –বিশেষ কারণে– পুরুষের সম-মর্যাদা ভোগ করা সম্ভব হলেও সে প্রেক্ষাপটে অপর কন্যার কিংবা সাধারণ নারীর সামগ্রিক অবস্থান সেরূপ হওয়ার উপায় ছিল না।

এ অবস্থায় নারীর সামগ্রিক মুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৈষম্য ও লৈঙ্গিক বা পুরুষতান্ত্রিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, যা অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। উক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় না এনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর wPÎv½'v নাট্যকাব্যে কেবল বিশেষ এক পরিস্থিতিতে নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণকে বেশি মূল্য দিয়েছেন, যা মূলত পুরুষতান্ত্রিকতারই সম্প্রসারণ।

†Mvovq Mj': wPÎv½'v রচনার এক বছর পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর প্রথম হাস্যরসাত্মক নাটক †Mvovq Mj' (১৮৯২)। ইতঃপূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমৃতলাল বসু এবং অন্যান্যরা বেশ কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রহসন রচনা করেছিলেন। তাঁদের কোন কোন রচনায় হাস্যরসের পাশাপাশি ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের খোঁচা, যা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে করে তুলেছিল অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক। তুলনায় †Mvovq Mj' প্রেম-বিবাহ বিষয়ক একটি নির্ভেজাল হাস্যরসের নাটক। এই এক বছরের মধ্যে তিনি mvabv পত্রিকায় MÍ¸‡"Qi বেশ কয়েকটি বিখ্যাত গল্প, †mvbvi Zix-র কিছু কবিতা ও অন্যান্য রচনাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধও রচনা করেন। এ সব প্রবন্ধের মধ্যে ÔBsiv‡Ri AvZ¼', 'সোশ্যালিজম' (১৮৯২), অন্যতম। তবে নাটকে এসবের কোন প্রভাব লক্ষ করা যায় না।

নাটকের কাহিনী নিম্নরূপ : উকিল চন্দ্রকান্তের বন্ধু বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ, নিমাইচন্দ্র প্রমুখ। চন্দ্রকান্তই এদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিত বলে তার বাড়িতে প্রতি রবিবার আড্ডা বসে। তাদের আড্ডার বিষয় সর্বদাই নারী এবং অবিবাহিত জীবন। একদিন আড্ডার সময় পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসে তরুণীকণ্ঠের গান। বাড়িটি নিবারণ বাবুর এবং তাঁর কন্যা ইন্দুমতী ও বন্ধুকন্যা কমলমুখী থাকে সে বাড়িতে। নিবারণ বাবুর বন্ধু আদিত্য কমলমুখীকে বিপুল সম্পত্তিসহ তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। অবশ্য সম্পত্তির বিষয়টি তখনো কমলকে জানানো হয় নি। নিবারণ বাবু কমলকেও ইন্দুমতীর মতোই লালন পালন করছিলেন। এই কমলই গান গেয়েছিল সেদিন। এদিকে গান শুনেই বিনোদবিহারী স্থির করে ফেলে যে, সে ঐ মেয়েকে বিয়ে করবে। তার সে প্রস্তাব নিয়ে চন্দ্রকান্ত, বিনোদ ও নিমাই যায় নিবারণ বাবুর বাড়িতে। নিবারণ বাবু সে প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

এ দিকে আড়াল থেকে ইন্দুমতী সুশ্রী যুবক নিমাইকে দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নিবারণ বাবুর কাছ থেকে সে নিমাইয়ের কোন পরিচয় জানতে পারে না।

আবার নিবারণ বাবুর বন্ধু ডাক্তার শিবচরণও এর কিছুক্ষণ আগে তাঁর ছেলে নিমাইয়ের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে নিবারণ বাবু সে প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন। আড়াল থেকে নিমাইয়ের নাম শুনেই ইন্দুমতী তাতে মনে মনে অসম্মত হয়। কারণ তার ধারণা, নিমাই কোন আধুনিক যুবকের নাম হতে পারে না। তা ছাড়া সে তখনো জানে না নিমাইয়ের সত্য পরিচয়। একদিন সে নিমাইয়ের পরিচয় জানার জন্য উপস্থিত হয় চন্দ্রকান্তের স্ত্রী ক্ষান্তমণির কাছে। বর্ণনা শুনে ক্ষান্তমণি জানায় যে, উক্ত যুবক তার স্বামীর অপর বন্ধু ললিত চাটুজ্জে হতে পারে। ইন্দুমতী কৌশলে ললিত বিবাহিত কিনা তাও জেনে নিতে সক্ষম হয়। এ সময় নিমাইসহ চন্দ্রকান্ত বাবু বাড়ি এলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে চায় ইন্দু। এতে সে নিমাইয়ের সামনে পড়ে যায় এবং উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সে নিজেকে বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনীর মিথ্যে পরিচয় দেয়। এবার নিমাই ইন্দুকে দেখে মুগ্ধ হয়; কিন্তু সেও ইন্দুর মিথ্যে পরিচয়ই ধরে নেয় সত্য বলে। ও দিকে অসচ্ছলতার কারণে বিয়ের কিছুদিন পর বিনোদ কমলকে পুনরায় নিবারণ বাবুর বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এবার নিবারণ বাবু কমলকে তার পিতার রেখে যাওয়া বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়ে দেন। সে টাকায় কমল একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে এবং ছদ্ম পরিচয়ে বিনোদকে নিয়োগ করে উকিল হিসেবে। সব সময় ঘোমটার আড়ালে থাকায় বিনোদ কমলকে চিনতে পারে না। নাটকে বিনোদ-কমল এবং নিমাই-ইন্দুর পরিচয় বিভ্রাট বেশ হাস্যরসের যোগান দেয়। শিবচরণ তাঁর ছেলের জন্য ইন্দুমতীকে পাত্রী হিসেবে স্থির করলেও নিমাই কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। সে তার মেডিকেল কলেজে না গিয়ে বাগবাজারের রাস্তায় চৌধুরীদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে আর কাদম্বিনীকে নিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করতে থাকে। এবার শিবচরণ বাগবাজারের মেয়ের সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ের সম্পর্ক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়। ওদিকে ইন্দুমতীর পছন্দের (ভুল) পাত্র হিসেবে ললিত চাটুজ্জেকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এতে মনে মনে অপমান বোধ করতে থাকে ইন্দুমতী। এর এক পর্যায়ে বাবার পীড়াপীড়িতে নিমাই ইন্দুমতীকে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভাবে যে সে শিক্ষিত ইন্দুমতীকে তার অপারগতার কথা বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনে ইন্দুমতী তাকে ললিত বাবু মনে করে অপর দিকে নিমাই তাকে চিনতে পারে কাদম্বিনী হিসেবে। পরে উভয়েই তাদের ভুল বুঝতে পারে। তেমনি বিনোদ কমলেরও জটিলতা ঘুচে যায় এবং আনন্দিত চিত্তে সবার মিলন ঘটে।

†Mvovq Mj' নির্ভেজাল হাস্যরসাত্মক নাটক হলেও এর কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসেবে এবং চরিত্রসমূহকে বাস্তব রূপদানের জন্য লেখককে একটি নির্দিষ্ট সমাজ-কাঠামো সৃষ্টি করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সে ক্ষেত্রে ঘটেছে নাট্যকারের সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ। এদিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের সমসাময়িক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। যেমন, তৎকালীন সমাজের নারী পরিস্থিতির কয়েকটি বিষয় যেন লেখকের অনুমোদনক্রমেই উপস্থিত হয়েছে এ নাটকে। প্রথমতঃ কমলমুখী ও ইন্দুমতীর বিয়ে স্থির করার সময় উভয়ের মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা যায় নি। অর্থাৎ সে সমাজে ছেলেরা মেয়ে পছন্দ করার সুযোগ পেলেও মেয়েরা ছিল সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে নির্বিচারে মানতে হতো অভিভাবকের নির্দেশ। আবার বিয়ে করার জন্য ছেলেদের যেভাবে উদ্যোগী দেখানো হয়েছে মেয়েদের সেভাবে দেখানো হয় নি। যেমন, শুধু গান শুনে বিনোদ বিয়ে করতে চেয়েছে কমলকে। অথচ ইন্দুমতী নিমাইকে পছন্দ করলেও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তার প্রকাশ সে ঘটাতে পারেনি। তেমনি অপরিচিত যুবকের দৃষ্টিগোচর হওয়াও নারীর জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল, এমন মতও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়কে সামন্ত মূল্যবোধজাত মনোভঙ্গির প্রকাশ বলার যথেষ্ট অবকাশ থাকে, যেখানে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় অস্বীকৃত। উক্ত পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের সার্বিক মুক্তির বিষয় অভাবনীয় বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সামন্তযুগের পশ্চাৎপদ সমাজদৃষ্টি লক্ষ করা গেলেও ধনবাদী সমাজবৈশিষ্ট্যের অর্থসর্বস্বতার উপাদানও এতে রয়েছে। যেমন আইন ব্যবসায়ী বিনোদবিহারী তার ধনী মক্কেল কমলের প্রকৃত পরিচয় জানতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। তার চোখে পড়ে না, তারই স্ত্রী এবং মক্কেলের নামের মিল। এমনকি আড়াল থেকে কথা বললেও স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও সে চিনতে ব্যর্থ হয়। বিনোদের এ অর্থসর্বস্ব একাগ্রতা বস্তুত বর্তমান ধনবাদী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। এ উপস্থাপনা নাট্যকার সচেতনভাবে করতে না চাইলেও তার সমাজ পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে এ উদ্দেশ্যে চালিত করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। একইভাবে নাটকের শেষ দৃশ্যে (৪র্থ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) নলিনাক্ষের জন্য সৎ কায়স্থ কন্যা সন্ধান বিষয়ক বিনোদের সংলাপেও লেখকের সমাজদৃষ্টির পরিচয় আছে। এ সময় কায়স্থ বরের জন্য কন্যাপক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত যৌতুক দাবীর বিরুদ্ধে পত্রিকায় ও সভা সমিতিতে আন্দোলন চলছিল। উক্ত সংলাপে নাট্যকার তৎকালীন সে সমস্যা নিয়ে কটাক্ষ করার সুযোগ হাতছাড়া করেন নি।[১১৮] যেমন–

> বিনোদবিহারী। চন্দর দা, তবে আর কী! একটা খোঁজ করো। একটি সৎকায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু সুবিধে আছে –খাদ্যের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড় হয়।[১১৯]

[১১৮] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
[১১৯] গোড়ায় গলদ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রহসনটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করে †kl i ÿv নামে পুনর্লিখিত এবং অভিনীত (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭) হয়।[১২০] আর ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় উক্ত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

gwjbx : †Mvovq Mj ‘-এর চার বছর পর একটি বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্য নাটক gwjbx (১৮৯৬)। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে gwjbx পৃথক নাটক হিসেবে প্রকাশিত হয় নি; তাঁর অপর কাব্যগ্রন্থ ˆPZwj (১৮৯৬)সহ পূর্বে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে Kve¨MšÖvejx শিরোনমে এটি প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থসমূহ ছাড়া এর মধ্যে প্রকাশিত হয় q‡ivchvÎxi Wvqwi (১৮৯৩), †QvU Mí (১৮৯৪), wewPÎ Mí (১৮৯৪), K_v PZóq (১৮৯৪), Mí ‘kK (১৮৯৫) গ্রন্থ। এসময় mvabv পত্রিকায় স্বনামে এবং স্বাক্ষরহীন বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধও রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন, ‘ইংরাজ ও ভারতবাসী’, ‘রাজনীতির দ্বিধা’, ‘রাজা ও প্রজা’, ‘অপমানের প্রতিকার’, ‘সুবিচারের অধিকার’, ‘পলিটিক্স’, ‘কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ’, ‘ইংরাজের স্বদোষবাৎসল্য’, ‘ইংরাজের কাপুরুষতা’ ইত্যাদি। এসব প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসন, শোষণ, বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, ইংরেজ জাতির বৈশিষ্ট্য, এদেশবাসীর প্রতি ইংরেজদের মনোভাব, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। যেমন ‘অপমানের প্রতিকার’, প্রবন্ধে তিনি যেন ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার ইন্ধন যুগিয়েছেন রীতিমতো। তিনি বলেছেন:

> এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের স্বভাবের মধ্যে।[১২১]

এ সময় রচিত কয়েকটি কবিতায়ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি কবির সমমর্মিতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন wPÎv (১৮৯৬) কাব্যের ‘এবার ফিরাও মোরে’, ˆPZwj-র ‘দুই বিঘা জমি’ এর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া ˆPZwj-র ‘স্নেহগ্রাস’, ‘বঙ্গমাতা’, ‘অভিযান’, ‘পরবেশ’ ইত্যাদি কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক রাজনীতি-চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য gwjbx নাটকে এসব-চিন্তায় আভাস লক্ষ করা যায় না।

নাটকের কাহিনী নেওয়া হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882)* গ্রন্থের ‘The Story of Malini’ থেকে।[১২২] কাহিনীটি মহাযান পন্থী

---

[১২০] রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথঃ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, ১৯৯৫; পৃ. ৭৯
[১২১] রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৪১৬
[১২২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের গ্রন্থ সংস্কৃত 'মহাবস্তু অবদান'-এর অন্তর্গত।[১২৩] রবীন্দ্রনাথ উক্ত কাহিনীর প্রথম অংশের সঙ্গে তাঁর একটি স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে gvwjbx নাটকটি রচনা করেন।[১২৪] এর প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ভিক্ষু কাশ্যপ রাজকন্যা মালিনীকে বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণকারী হিসেবে সুখ-দুঃখ ও বিষয়-পিপাসা জয় করে সংসার বন্ধন ছিন্ন করার উপদেশ দিচ্ছেন। রাজকন্যা মালিনীর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি প্রজারা মেনে নিতে না পেরে তার নির্বাসন দণ্ড দাবি করে। দুই ব্রাহ্মণ যুবক সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরও প্রজাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রজাদের চাপে মালিনীর পিতা কাশীরাজও কন্যার নির্বাসন দণ্ডের পক্ষে। এ অবস্থায় মালিনী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সাধারণ পোষাকে মৈত্রীভাব নিয়ে জনতার সামনে এসে উপস্থিত হয়। তার নিরভিমানী রূপে ব্রাহ্মণসহ বিপুল জনতা মুগ্ধ হয় এবং তারাও সদলবলে গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্ম। এ দলে যুবক সুপ্রিয়, থাকলেও তার বন্ধু ক্ষেমংকর সচেতনভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, সে মনে মনে সংকল্প করে বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজাকে উৎখাত করার। পরিকল্পনামতো সে রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান নেয়। অবশ্য যাওয়ার আগে ক্ষেমংকর তার পরিকল্পনার কথা জানায় প্রিয় বন্ধু সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয় এ কথা কিছুদিন গোপন রাখলেও মালিনীর প্রতি দুর্বল হয়ে ওঠার কারণে রাজার কাছে সে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয়। রাজা বিদ্রোহীদের আচমকা আক্রমণে পরাজিত করে এবং বন্দী করে নিয়ে আসে তাদের নেতা ক্ষেমংকরকে। বন্ধুর গ্রেফতারে সুপ্রিয় অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে রাজার কাছে ক্ষেমংকরের মুক্তি প্রার্থনা করে। রাজা সুপ্রিয়র প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ইতোমধ্যে মালিনীকে তার কাছে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। এবার সুপ্রিয়র অনুরোধে মুক্তি দেওয়ার আগে পরীক্ষা করতে চায় ক্ষেমংকরকে। রাজা ক্ষেমংকরের কাছে জানতে চায়, মুক্তি পেলে সে কী করবে। এ প্রশ্নে ক্ষেমংকর দৃঢ় কণ্ঠে বিদ্রোহ সংঘটনের পূর্ব কাজেই ফিরে যাওয়ার কথা জানায়। এ কথা শুনে ক্ষুব্ধ রাজা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলে ক্ষেমংকরকে। তবে একই সঙ্গে ক্ষেমংকরকে তার শেষ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে বললে সে একবার সুপ্রিয়কে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী সুপ্রিয় তার সঙ্গে দেখা করতে এলে তাকে আলিঙ্গনের ছলে শিকলের প্রচণ্ড আঘাতে হত্যা করে ক্ষেমংকর। উত্তেজিত রাজা সঙ্গে সঙ্গে খড়্গ নিয়ে আসার হুকুম দেয়। প্রিয়তমের আকস্মিক মৃত্যুতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মালিনী। তবে জ্ঞান হারানোর আগে রাজার কাছে জানায় করুণাময় আর্তি, "মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমংকরে।"।

বৌদ্ধ আখ্যানের সূত্র কাহিনীতে থাকলেও নাট্যকারের সৃষ্টিশীলতা এখানে দেখা দিয়েছে প্রধানভাবে। সুপ্রিয়-ক্ষেমংকরে চরিত্র সৃষ্টি, তাদের দৃঢ় বন্ধুত্ব এবং মালিনী-সুপ্রিয়র অনুরাগের সম্পর্ক ইত্যাদি কবির নিজস্ব উদ্ভাবন। এতে কাহিনীতে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে

---

[১২৩] THE SEEKER'S GLOSSARY OF BUDDHISM, 2nd Edition, 1998, Taipei
[১২৪] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

উৎকণ্ঠাযুক্ত নাটকীয় দ্বন্দ্ব। বক্তব্যের দিক থেকে পূর্বে রচিত ‍emRb নাটকের মতো এ নাটকেও বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা ও করুণাময় মৈত্রীবাণীর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। তবে ‍emRb-এ মৈত্রীভাবনার অনুষঙ্গ বা লক্ষ্য ছিল মানবেতর প্রাণী; আর এ নাটকের অবলম্বন মানুষ, এমনকি প্রেমিকের হত্যাকারী, নরঘাতী মানুষ। কী ভাবে তিনি এ বক্তব্য প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন তা লক্ষ করা যেতে পারে।

নাটকের সূচনায় নাট্যকার বলেছেন যে, তাঁর ধর্মচিন্তা পাহাড় চূড়ার মতো মানবলোকের ঊর্ধ্বে স্থির হয়ে নেই; তা মানুষের 'মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে' বিকাশলাভ করছে। কোন দৈববাণী বা আনুষ্ঠানিক ধর্মজটিলতায় তা আবদ্ধ নয়। তাঁর মতে:

> সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।
>
> আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ, সে কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।[১২৫]

বস্তুত, 'নির্ঝরে স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির আত্মকেন্দ্রিক ভাববিলাসের সঙ্গে বাস্তব জগৎ সংসারের লীলার যে ভাব সমন্বয় ঘটেছিল তা-ই cKॄZi cॄZ‡kva নাটকে বাস্তব দৃশ্য ও সংলাপে রূপ নিয়েছে। সন্ন্যাসী অনন্তের ধ্যান থেকে ফিরে এসে স্থিত হয়েছিলেন মানব প্রকৃতিতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন– ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ, সীমার মাঝেই অসীম আর প্রেমের মধ্যেই আছে মুক্তির সন্ধান। এই প্রেমই রবীন্দ্র চিন্তায় বৌদ্ধ আদর্শের মৈত্রীভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র আদর্শ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, বৌদ্ধ শিক্ষা–'মৈত্রী -ভাবনা দ্বারা সর্বলোকের সকল প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা করা হয়; এতে মানুষের চিত্ত বৃহতের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।'[১২৬] সর্বপ্রাণের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাবের এ আদর্শ পূর্বেকার ‍emRb নাটকে হিংসাত্মক বলিদান প্রথার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবি। gwjbx-তে তা-ই উপস্থাপিত হয়েছে ভিন্ন রূপ ও পরিমণ্ডলে। তবে উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে গিয়ে নাট্যকার যে সব চরিত্র ও ঘটনা পরম্পরা সৃষ্টি করেছেন তাতে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে

[১২৫] রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৫২ পৃ. ৩৬-৩৭
[১২৬] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক হয়েছিলেন বেশ বিভ্রান্ত। যেমন, নীহাররঞ্জন রায় সুপ্রিয়র হত্যাকারী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করার যে প্রার্থনা মালিনী জানিয়েছে, সে সম্পর্কে বলেন:

> খুব কিছু ভাবিয়া বা বুঝিয়া যে সে তাহা করিয়াছিল তাহাও নহে; আপন অন্তরের ক্ষমাগুণও যে তাহার স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও মনে হয় না।... আমার মনে হয় এই শেষ মহূর্তের অপূর্ব অভিব্যক্তি কোনও ভাবের, কোনও চিন্তার বা কোনও অনুভূতির প্রকাশই নয়। মালিনীর মনকে জানিবার এবং বুঝিবার জন্য এই অভিব্যক্তির কোনও মূল্য নাই; কিন্তু রস সৃষ্টির দিক হইতে এই অভিব্যক্তি অপূর্ব, অতুল; তুলির একটি অস্পষ্ট রেখায় রবীন্দ্রনাথ এখানে যে বস্তুর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা তাঁহার নাট্যে খুব বেশি নাই।[১২৭]

অপর সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মালিনীকে দুর্বল প্রকৃতির মেয়ে হিসেবে ধরে নিয়ে তাকে একবার সুপ্রিয়র প্রতি অনুরক্ত, পুনরায় ক্ষেমংকরের প্রতিও আসক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। আবার পরক্ষণে মালিনীকে তিনি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর মন্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে:

> তর্ক উঠিতে পারে সুপ্রিয়ের হত্যাকারীকে সে কি ভালোবাসিতে পারে? যে নিজের সাধের নবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভালোবাসিতে পারে, কালক্রমে সে যে প্রণয়ঘাতীকে ভালোবাসিতে না পারিবে তাহা কে বলিল? দুর্বল প্রকৃতি অনেক সময়েই প্রবলকে, নিষ্ঠুরকে, নরঘাতী অপরাধীকে ভালোবাসিতে উদগ্রীব। আর মালিনী কত যে দুর্বল তাহা তো দেখা গেল।[১২৮]

আবার সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরকে কেন্দ্র করে মালিনীর প্রেম সম্পর্কের তথাকথিত ‘দোদুল্যমানতা’ বা ‘দ্বন্দ্ব’ নিয়েও একাধিক আলোচক বেশ ধাঁধায় পড়েছেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালীন ইংরেজ সমালোচক এডোয়ার্ড টমসন উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে:

> ... although Malini herself is a very unconvincing figure till upwards the end, where she wavers from her attraction towards supriya, drawn by the quiet fierce strength of khemankar. ... Why does Malini plead for khemankar, after he had killed supriya?...[১২৯]

অপর আলোচক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশও বলেছেন:

> It is very dificult to be quite sure – so many interpretations are possible – but in Malini, there seems to be a conflict. She is torn between two

[১২৭] নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩
[১২৮] প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত পৃ. ৮০
[১২৯] Edward Thompson, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

> impulses – or perhaps an ideal and impulse, the life preached by Gautama and the other life of love and friendship. Both were vague, I think. Was she in love with Supriya? Or with khemankar? I do not know, but you feel as if there was a deeper conflict. [১৩০]

আমাদের বিবেচনায়, এ সব মতবিভেদের উৎস প্রথমত মালিনী চরিত্র; এবং দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিশেষ মানস-দর্শন। যেমন প্রথম দৃশ্যে মালিনীর সঙ্গে ভিক্ষু কাশ্যপের যে কথোপকথন হয়, তাতে মালিনীর বৌদ্ধ আদর্শের প্রতি অনুরাগের পরিচয় বিধৃত। কিন্তু এর ভিত্তি বা আদর্শের যৌক্তিকতা যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্লেষিত হয় নি। তুলনায় wemRb-এ অসহায় বালিকা অপর্ণার কাতর ক্রন্দনে বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে যে আবেদন সৃষ্টি হয় তা গোবিন্দমাণিক্যের মতো পাঠককেও স্পর্শ করে। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তা আলোড়িত করে জয়সিংহকেও। এ সংশয়ে জয়সিংহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কের আগে পর্যন্ত। কিন্তু gwjbx নাটকে এ ধরনের ভিত্তি বা পরিবেশ রচিত না হওয়ায় মালিনী চরিত্র বৌদ্ধ আদর্শে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। মাত্র দুটি সংলাপে প্রদত্ত ভিক্ষু কাশ্যপের উপদেশ মালিনী কতটা গ্রহণ ও আয়ত্ত করেছে কিংবা তাতে কতটা স্থিত হয়েছে, তার কোন পরিচয় নাটকে পাওয়া যায় না। চরিত্রটি ‘unconvincing’ হয়ে ওঠার প্রথম সূত্র এখানে নিহিত। দ্বিতীয়ত, মালিনীর নির্বাসনকামী বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণরা তার কোন গুণের কথা ও আচরণের প্রভাবে বিরোধিতা পরিত্যাগ করে ভক্তে পরিণত হলো, তারও কোন বিশ্লেষণ নাটকে নেই। কেবল মলিন ও সাধারণ বেশে জনতার সামনে দেখা দিয়েই তাদের মন জয় করে ফেলা – রীতিমতো অবিশ্বাস্য। টমসন বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন, ‘almost ridiculous’ বলে।[১৩১] শুধু তাই নয়, চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীকে দেখা যায় সংশয়ে আকুল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়। সুপ্রিয়কে লক্ষ করে সে বলেঃ

বিশ্বে বাহিরিয়া
আজি মোর জাগে ভয়, কেঁপে ওঠে হিয়া,
কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি –
মহাধর্মতরণীর বালিকাকান্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়

[১৩০] Edward Thompson, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮-২৯

[১৩১] æIndeed, one scene – that where by her simple appearance she wins over the Brahmans who are clamouring for her banishment – is almost ridiculous; it could not be happened, could not be credible, unless with someone a hundredfold more alive and dominating than this shadowgirl”. Edward Thompson, ibid, p. 128

Dhaka University Institutional Repository

বড়ো একাকিনী আমি – সহস্র সঞ্চয়,

বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,

নানা প্রাণী – দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ

ক্ষণিকের তরে আসে।[১৩২]

এমনকি এক পর্যায়ে কাশ্যপের উপদেশ বাণী বিস্মৃত হয়ে মালিনীর মনে জাগে প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়বিরহিতা রমণীহৃদয়ের আর্তি। সুপ্রিয়কে তার যোগ্য পুরস্কার হিসেবে দেওয়ার জন্য রাজা মালিনীকে সমর্পণের ইঙ্গিত দিলে মালিনীর চিত্তে এ আবেগ সঞ্চারিত হয়। যেমন,

ওরে রমণীর মন,

কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন

মাধ্যহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা

কপোতীর প্রায়?...[১৩৩]

মালিনীর উক্ত মানস প্রতিক্রিয়া তার মুখমণ্ডলে অনুরূপ অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হলে তা রাজার চোখেও ধরা পড়ে। এতে তার পিতৃহৃদয় একই সঙ্গে হয়ে ওঠে আশ্বস্ত এবং উৎফুল্ল। এ বিষয়ে তার স্বগতোক্তি লক্ষণীয়:

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল

লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল ঊষার

যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার

তপন উদয় হতে দেরি নাই আর।

এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার

হৃদয় উঠিছে ভরি, বুঝিলাম মনে

আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে

বিকশি উঠিল–দেবী না রে, দয়া না রে,

ঘরের সে মেয়ে।[১৩৪]

---

[১৩২] মালিনী, চতুর্থ দৃশ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

[১৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

[১৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

– এ ভাবে মালিনীর মধ্যে নতুন ধর্ম সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি, প্রেমভাবের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে পুনরায় সাংসারিক মায়াময় মানবিক জগতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত। এর সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা, বিষয়-পিপাসা ও সংসার-ত্যাগ-এর মিল নেই। অর্থাৎ কাশ্যপের উপদেশ বচন এ পর্যায়ে মালিনীর জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হতে দেখা যায় না। আবার প্রেমাস্পদের (সুপ্রিয়র) বন্ধু হিসেবে ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর কৌতূহল, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে তার দৃঢ়- চিত্ততা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে। বস্তুত এটি কিছুতেই প্রশান্তচন্দ্র বা প্রমথনাথ বিশী কথিত ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর চিত্তদুর্বলতাজাত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়। এ ধরনের কোন ঈঙ্গিতও নাটকে নেই। লক্ষণীয় যে, সুপ্রিয়র প্রতি মালিনীর প্রেম-ভাবের জাগরণ ঘটলেও সুপ্রিয়র মধ্যে এ বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে বৈরাগ্যপূর্ণ নিস্পৃহ মনোভাব। অর্থাৎ প্রণয়ঘটিত বিষয় নাটকে মুখ্যস্থান দখল করেনি; এবং এটি আকাঙ্ক্ষিতও বটে। এ অবস্থায় মালিনীর প্রণয়ী নির্ধারণে সমালোচকদের এষণা অহেতুক। বস্তুত, প্রেমাস্পদঘাতী ক্ষেমংকরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা–মালিনীর অহিংসা ও সর্বজীবে প্রেমভাবজাত চিত্তের অভিব্যক্তি; এবং প্রথমাবধি মালিনীকে লেখক উক্ত ভাব-এর আবহে স্থিত করার চেষ্টা করেছেন। ক্ষমার মহত্তর গুণে বিরুদ্ধাচারী শক্তিকে জয় করার জন্য মালিনীর অবিচল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছিল নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে। যেখানে মালিনীর নির্বাসনকামী ব্রাহ্মণদের চিত্তবিকারহীন মৈত্রীভাব দিয়ে মালিনী জয় করতে সক্ষম হয়েছিল (যদিও তা যথেষ্ট বিশ্লেষিত হয়নি)। আবার একই ভাবে সুপ্রিয়র সামনেই এর পূর্বেও বন্দী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করার প্রার্থনা জানিয়েছিল মালিনী। সে দৃশ্যের কয়েকটি সংলাপ লক্ষ করা যেতে পারে।

মালিনী। – কী করেছ বলো পিতা
বন্দীর বিচার?
রাজা! প্রাণদণ্ড হবে তার
মালিনী। ক্ষমা করো – একান্ত এ প্রার্থনা আমার
তব পদে।
রাজা। রাজোদ্রোহী, ক্ষমিব তাহারে
বৎসে?[১৩৫]

---

[১৩৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে দেখা যায় প্রথম থেকে মালিনী চরিত্রে যে ক্ষমাগুণের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতে সে বরাবর স্থির থেকেছে। আপন মনোবিশ্লেষণে সংশয় ও অপরিস্ফুট প্রণয়ের উন্মেষ সত্ত্বেও ক্ষমার মহত্তর গুণ থেকে মালিনীকে স্খলিত হতে দেখা যায় নি। মূলত এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মালিনীর প্রণয় বাসনার জাগরণ, প্রেমাস্পদ হিসেবে সুপ্রিয়র আগমন ও মৃত্যুবরণ; এবং শেষ পর্যন্ত হত্যাকারীর জন্য মালিনীর ক্ষমা প্রার্থনা। এ প্রেক্ষাপটে মালিনীর চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বিকার নাট্যকারের অনুমোদনক্রমেই ঘটেছে বলে বিবেচনা করা সঙ্গত। কিন্তু এ পরিকল্পনা নাটকের সৃষ্ট বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বিত না হওয়ায় মালিনী চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব। আর সে কারণেই নাটকের বক্তব্য অনুধাবণে বিবিধ বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টির পাশাপাশি নাট্যকারের বক্তব্যও যথাযথভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে নি।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ অহিংসানীতি ও ক্ষমাগুণ রবীন্দ্র চিন্তার এ পর্যায়ে কোন তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে নি, যা তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটকে লক্ষ করা যাবে।

ˆeK‡Éi LvZv: gvwjbx র পরের বৎসর রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের অপর হাসির নাটক ˆeK‡Éi LvZv (১৮৯৭)। অবনীন্দ্রনাথ-এর N‡ivqv গ্রন্থ থেকে জানা যায়– ঠাকুর বাড়ির কতিপয় সদস্য প্রতিষ্ঠিত 'খামখেয়ালী' সভা-র দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[১৩৬] সে সভার সদস্যরা এ নাটকের অভিনয়ও করেছিলেন সফলভাবে।[১৩৭]

রাজনীতির ক্ষেত্রে এর কয়েকমাস আগে (ডিসেম্বও, ১৮৯৬) কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুর পরিবারের মোট বারোজন সদস্য যোগ দেন এ অধিবেশনে। এর সূচনাসংগীত হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটি নিজের সুরে পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলাদেবী।[১৩৮] সে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে যথারীতি জমকালো পার্টি দেওয়া হয় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সম্মানে।[১৩৯] এর একমাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্ম সমাজের সাতষট্টিতম সাম্বৎসরিক সভা। রবীন্দ্রনাথ এ সভা উপলক্ষে রচনা করেন দশটি ব্রাহ্মসংগীত। তবে ˆeK‡Éi LvZv-য় এ সবের কোন কিছুই নেই। এর কাহিনী নিম্নরূপ:

বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বড় ভাই বৈকুণ্ঠ সংসার বিষয়ে উদাসীন ও খেয়ালী স্বভাবের মানুষ। সংগীতের ইতিহাস, সাহিত্যচর্চা, গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে তিনি সময় অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, এ সব বিষয়েও তার জ্ঞান বা দক্ষতা সংসার জ্ঞানেরই মতো। নিজের রচনার খাতা থেকে

---

[১৩৬] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী রাণী চন্দ, ঘরোয়া, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ১১৩

[১৩৭] 'আমাদের সেই অভিনয় দেখে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, এ-রকম অ্যাক্টার সব যদি আমার হাতে পেতুম তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতুম।' পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

[১৩৮] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-২৫

[১৩৯] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৯

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে কিছু শোনাতে পারলে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি। পুরনো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ তাঁর অন্যতম শখ। ছোট ভাই অবিনাশও গাছপালা নিয়ে কিছুটা বাতিকগ্রস্ত। চাকুরির সমস্ত টাকা সে বৈকুণ্ঠের হাতে তুলে দেয় এবং প্রয়োজনে চেয়ে নিয়ে খরচ করে। তবে তার খরচের প্রধান খাত হরেক রকম গাছ কিনে লাগানো। বয়স চল্লিশের কোঠায় হলেও অবিনাশ এখনও অবিবাহিত। উক্ত দুই ভাইকে দেখাশুনা করে পুরনো চাকর ঈশান, আর সংসার সামলে রাখে বিপত্নীক বৈকুণ্ঠের বিধবা মেয়ে নিরু।

অবিনাশের এক সহপাঠী কেদার একাধারে প্রবঞ্চক ও দুষ্ট-বুদ্ধির মানুষ। অপেক্ষাকৃত তরুণ তিনকড়ি তার সহচর। কেদার তার শ্যালিকাকে অবিনাশের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে বড় ভাই বৈকুণ্ঠের খাতা পাঠের শ্রোতা সাজে। চীনা এক দোকানদারের হিসেবের খাতাকে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বলে বৈকুণ্ঠের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। তিনকড়ি এসব কাজে কেদারকে সাহায্য করলেও সে ঠোঁটকাটার মতো কেদারের সমালোচনা করতে ছাড়ে না। এক সময় অবিনাশকে কেদার তার শ্যালিকা মনোরমাকে দেখা যায়। অবিনাশ তাকে পছন্দ করে এবং তার উদ্দেশে উপহারসহ কবিতা লিখে পাঠাবার জন্য শুরু করে কাব্যচর্চা। এতে কেদার ও তিনকড়ির বেশ সুবিধা হয়ে যায়। তারা দুজন দু'ভাইয়ের সঙ্গে চলতে থাকে তাল মিলিয়ে। সে সূত্রে অবিনাশের বিয়ের পর কেদার তার পরিবারসহ এসে ওঠে বৈকুণ্ঠের বাড়িতে। তারা বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠের কন্যা নিরু সবাইকে নানা উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তোলে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, খাতা বই ফেলে বৈকুণ্ঠের ঘর ছাড়ার উপক্রম হয়। এমনকি বৈকুণ্ঠের কন্যা নিরুর গায়ে হাত তোলে কেদারের এক বৃদ্ধা আত্মীয়া। ছোট ভাই অবিনাশ বিয়ে করার পর-পর এসব দিকে লক্ষ না করলেও এবার সে জানতে পারে সবই। সঙ্গে সঙ্গে সে কেদারসহ তার সব আত্মীয়কে তাড়িয়ে দিলে ঘরে শান্তি ফিরে আসে।

উদার-হৃদয়, সরল ও অকপট সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ এবং স্বার্থবাদী প্রবঞ্চক কেদার কর্তৃক বৈকুণ্ঠকে প্রতারণা, তিনকড়ি কর্তৃক ফাঁকে ফাঁকে কেদারের উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেওয়া – সব মিলিয়ে নাটকে হাস্যরস বেশ জমে ওঠে। আবার এরই মাঝে তিনকড়ির অসহায়তার প্রকাশ এবং কেদারের অবিবেচক আত্মীয়-স্বজন বৈকুণ্ঠকে যারপরনাই বিব্রত করে তুললে নাটকে ঘটে করুণরসেরও মিশ্রণ। এ ভাবে ˆeK‡Éi LvZv একটি বিমিশ্র হাস্যরসের নাটক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নাটক হিসেবে স্বল্পায়তন হলেও এটি রবীন্দ্রনাথের পরিণত হাস্যরসাত্মক রচনা। †Mvovq Mj' নাটকে সাধারণ সামাজিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে লেখকের যে সব দুর্বলতা লক্ষ করা গিয়েছিল তা এখানে নেই বললে চলে। সুকুমার সেন-এর মতে, নাটকের প্রধান ঘটনা ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা-র অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া বলে এ সবের রূপায়ণও হয়ে ওঠেছে অনেকখানি

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসযোগ্য।[১৪০] শান্তি-নিকেতন থেকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে পাওয়া যায় নাট্যঘটনার সে উৎস। যেমন:

> ... বাটির সংবাদ কিরূপ, মা কেমন আছেন? আর আর সকলে কেমন আছেন? ব্যাঘ্র হন্তারক, উৎস-উৎসারক, সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ টুনটুনির নারদ বাত রোগের গারদ ... এমন যে মহাত্মা তিনি অদ্যাপি আমার ঘরটির প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন? ... তিনি বাটীতে যতদিন আছেন ততদিন আমি বাড়ি-মুখো হইতেছি না, ইহা নিশ্চিত জানিও।[১৪১]

ˆeK‡Éi LvZv রচনার পর প্রায় দশ বছর রবীন্দ্রনাথ আর নাটক রচনা করেন নি। এর পর ১৯০৮ সাল থেকে তিনি পুনরায় এক বিশেষ ধরনের– রূপক-সাংকেতিক ধারার – নাটক রচনা শুরু করেন। kvi‡‘vrme থেকে i³Kiex পর্যন্ত প্রায় ষোল বছর ধরে চলে উক্ত ধারার নাট্য রচনা।

---

[১৪০] সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

[১৪১] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq
ie»‘bvU‡K ivRbxwZ : wØZxq ce

শারদোৎসব : kvi‡'vrme (১৯০৮) রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটক রচনা শুরু হয় এবং i³Kiex (রচনাকাল ১৯২৩) পর্যন্ত তা চলে একটানা ষোল বছর। ভাব, বিষয় এবং গঠন-প্রকৃতি বিচারে এ পর্যায়ের নাটকগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে। সাধারণভাবে রূপক জাতীয় রচনায় কোন নীতিকথা, ভাব বা তত্ত্বকথাকে কোন সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় কাহিনীর আবরণে প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ঘটনার সমান্তরালে তত্ত্বজাতীয় মূল ভাবের উন্মোচন হয়ে ওঠে স্পষ্ট এবং উপভোগ্য।[1] আর সাংকেতিক রচনায় লেখকের ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির অগম্য, অনির্দেশ্য ও অনির্বচনীয় ভাব-উপলব্ধিকে আভাসে ইঙ্গিতে বা ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে।[2] রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত ধারার নাটকে লক্ষ করা যায় উপরি-উক্ত দুটি রূপের মিশ্রণ। তাই সমালোচকেরা এ শ্রেণির নাটকগুলোকে গণ্য করেন তত্ত্ব-নাট্য বা রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে। বিশ্বনাট্যে W B Yeats, Henrik Ibsen, A Strindberg, G Hauptman, M Maeterlinck, L Andreyeve প্রমুখ এ ধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগে এবং পরে উক্ত ধারার নাটক রচিত হতে দেখা যায় নি।

পূর্ববর্তী দশ বছরের ব্যবধানে কবির ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ঘটে গেছে কয়েকটি মর্মন্তুদ ঘটনা। এর সূত্রপাত হয় ১৮৯৯ সালে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বলেন্দ্রকে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এর তিন বছর পর মৃত্যু ঘটে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর (২৩ নভেম্বর, ১৯০২) মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ঊনত্রিশ বছর। স্বাভাবিকভাবে এ মৃত্যুতে

---

[1] ক) "রূপক-রচনার উদ্দেশ্য কোন নীতিকথা, ভাব বা তত্ত্বকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশ করা। রূপকে দৃশ্যত একটি আখ্যানভাগ থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্ড়রে আর একটি প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যানভাগ বর্তমান থাকে। প্রথমটির ছদ্ম–আবরণে দ্বিতীয়টি গুপ্ত থাকে। প্রথম আখ্যানভাগে যাহা বর্ণিত হয়, তাহাই তাহার আসল অর্থ নয়, দ্বিতীয় প্রচ্ছন্ন আখ্যানভাগের যাহা বর্ণনা তাহাই তাহার আসল অর্থ।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯৯; পৃ. ১৬২

খ) "...রূপকে দুইটি অর্থ থাকে–উপাখ্যানের এবং উপাখ্যান অতীত ভাবের। নীতি-কথার নীতির দিকটা পরিষ্কার, প্রত্যক্ষ এবং সাধারণভাবে বলিলে অনেক সময়েই নীরস প্রতীয়মান হয়। এই বিপদ এড়াইবার জন্যই রূপক-কার নীতিকথাকে সরস আখ্যানের আবরণের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন। ফলে শুষ্ক নীতি হইয়া দাঁড়ায় রসে ভরপুর, প্রাণবন্ড় বিস্ময়-উদ্রেককারী সজীব–সাহিত্য"। শ্রী অশোক সেন, রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৯২

[2] ক) "সংকেতের উদ্দেশ্য– যে-সত্য অতীন্দ্রিয়, জগদতীত, যে-সৌন্দর্য চিরন্ড়ন, তাহাকে ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়, আভাসে অনুভবগম্য করা। তাই সংকেতে রূপকের মতো আগাগোড়া দুইটি আখ্যানভাগের সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। একটির সহিত আর একটি যুক্ত হইয়া যায়, কোনো সমান্ড়র অর্থ-বৈশিষ্ট্য থাকে না। একটি আখ্যান-রূপের মধ্যেই আখ্যান-রূপের বাহিরের একটি তাৎপর্য জ্ঞাপন করা হয়।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

খ) "সাঙ্কেতিক শিল্পী চেষ্টা করেন যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, যাহা অশরীরী, অনাদি, অনন্ড়, অপার্থিব, সেই অমূর্ত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের সচকিত করিতে ও অবহিত হইতে। যাহার বাণী নাই কবি তাহাকে ভাষার দ্বারা মূর্ত করিবার প্রচেষ্টা করেন। যাহা দৃষ্টির অতীত, কবি সেই অরূপকে রূপ দিবার চেষ্টা করেন।" শ্রী অশোক সেন, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

কবির সাংসারিক জীবন হয়ে পড়ে অনেকখানি বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় মাতৃহারা চার পুত্র-কন্যা (বড় মেয়ে তখন স্বামীর সঙ্গে বসবাসরত) নিয়ে কবি যখন স্থির হওয়ার চেষ্টা করছেন তখনই তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকার মৃত্যু (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) হয়। এর ঠিক এক বছর চার মাস পর মৃত্যু ঘটে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৯ জানুয়ারী, ১৯০৫)। আবার ১৯০৭ সালে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরা হয়ে মারা যায় কবির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তের বছরের শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৩ নভেম্বর)। শমী মারা যাওয়ার সময় হৃদয় মথিত দুঃখ নিয়ে কবিকে দেখা যায় ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে।[৩] ধারণা করা চলে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে এতগুলো নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর শোক ও বেদনা রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পেরেছিলেন তাঁর বিপুল কর্ম ও প্রাণশক্তি এবং বিশেষ জীবনদর্শনজাত চেতনার সাহায্যে। পরে এ সম্পর্কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

> যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্ আমার শোক তাকে যেন একটুও পিছনে না টানে।... তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি – সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায় – যা ঘটেচে তাকে যেন সহজেই স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।[৪]

এ সময় ভারতীয় রাজনীতিতে সংঘটিত হয় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ এ সব ঘটনায় আলোড়িত হওয়ার পাশাপাশি এ সম্পর্কে তাঁর মতামতেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন কয়েকটি কবিতায়, গানে ও প্রবন্ধে। যেমন, ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রের অন্যতম কংগ্রেস নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তার এবং তার পরবর্তী Sedition Bill-এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পরের বছর কংগ্রেসের এক বিশেষ সভায় পাঠ করেন 'কণ্ঠরোধ' (১৮৯৮) প্রবন্ধ। এর কয়েক বছর পর লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন-উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতবাসীকে 'অত্যুক্তিবাদী' ও 'অতিরঞ্জনপ্রিয়' বলে উল্লেখ করলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদে 'অত্যুক্তি' (১৯০২) প্রবন্ধ রচনা

---

[৩] কবির এক সময়ের সহযোগী ভূপেন্দ্রনাথ স্যান্যালের লেখায় পাওয়া যায়, "যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বানোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন, এ ঘটনা তাহাকে শুনাইতে যাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। ... পরে আমরা কয়েকজন শমীর শবদেহ শ্মশানে লইয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রস্ত্তরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন।" উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০ পৃ. ৩৮৬

[৪] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৫] ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের চরম দুর্যোগমুহূর্তে কবির কণ্ঠে শোনা যায় স্বদেশ-প্রেমের অঙ্গীকার। এ সময় রচিত DrmM (১৯১৪) কাব্যের 'নববর্ষের দীক্ষা' কবিতায় পাওয়া যায়–

নব বৎসরে করিলাম পণ–
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন;
যদি এই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।...[৬]

১৯০৩ সালে কার্জন পরিকল্পিত বঙ্গবিভাজন সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশিত হলে তিনি 'বঙ্গবিভাগ' (১৯০৪) প্রবন্ধ রচনা করেন। এ ছাড়া বঙ্গবিভাজনের বিরুদ্ধে বিদেশী পণ্য বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে তিনি লেখেন 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধ। কিছুদিন পর স্বাদেশিকতাবোধ তীব্র করার অভিপ্রায়ে কলকাতায় 'বীর পূজা' এবং 'শিবাজি উৎসব' প্রর্বতন হলে তিনি সেখানে পাঠ করেন 'শিবাজী উৎসব' (১৯০৪) কবিতা। সে কবিতায় তিনি লেখেন:

হে রাজা শিবাজি.
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি–
'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'
সেদিন শুনি নি কথা – আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ

[৫] নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ. ২১৪

[৬] 'নববর্ষের দীক্ষা', উৎসর্গ (সংযোজন ১৩) রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানমন্ত্রে তব।

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন–

দরিদ্রের বল।

‘একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে’ এ মহাবচন

করিব সম্বল।[৭]

প্রসঙ্গত মহারাষ্ট্রের বীর ধর্মযোদ্ধা শিবাজী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁর ব্রত ছিল হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় ভারতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০৪-এর পর থেকে শিবাজীর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।[৮] মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক কিংবা উক্ত উৎসবের সভাপতি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মূলত হিন্দু মুসলমান মিলনের ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম বেগবান করার উদ্দেশ্যে শিবাজি চরিত্রের উক্ত অনৈতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল কিছুটা ভিন্ন কারণে। নেপাল মজুমদারের ভাষায়:

> ভারতের জাতীয় ঐক্য বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে। এটাই কবির তৎকালীন ধারণা। এই এক ধর্মরাজ্যে যে, মুসলমান ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের গৌরববোধ করিবার কিংবা মিলিত হইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই – রবীন্দ্রনাথ সেকথা তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।[৯]

শুধু তাই নয়, রাজ্যের শাসনব্যবস্থার কল্পনায়ও তিনি প্রাচীন রীতির একজন রাজাই কামনা করেন, যার সঙ্গে প্রজাদের থাকবে হৃদয়ের সম্পর্ক, ভক্তির সম্পর্ক। কারণ তাঁর মতে,

> ... ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, এ কথা সত্য। হিন্দু ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ এ কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।[১০]

১৯০৬ সালে ইংল্যান্ডের যুবরাজের আগমনে রচিত উক্ত প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি বলেন:

---

৭ ‘শিবাজি উৎসব’, সঞ্চয়িতা, ষষ্ঠ সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ ১৩৭০), কলকাতা, পৃ. ৪৭৫–৮০

৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (১৯০৫–১৯৪৭), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৯০-৯২

৯ নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

১০ ‘রাজভক্তি’, রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

> ... রাষ্ট্র ব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে মঙ্গলের প্রত্যক্ষ স্বরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজেই বহন করিতে পারি; নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই – রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই – আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।[১১]

তবে স্বদেশী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রীতিমতো নেতৃত্বের ভূমিকায়। একের পর এক দেশপ্রেমমূলক গান রচনা ও পরিবেশন করে তিনি আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখ সঙ্গীতব্যক্তিও এ সময় রচনা করেছিলেন প্রচুর স্বদেশী গান।[১২] বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটিও এ সময় রচিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে এ গান বাঙালির ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রবিজীবনীকারের মতে, এ গান গাওয়ার সময় তখনও উপস্থিত শ্রোতারা দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেন।[১৩] ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ কার্যকর হওয়ার দিনটি ঘোষিত হয় 'রাখী উৎসব'-এর দিন হিসেবে। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন আরেকটি জনপ্রিয় গান:

> বাঙলার মাটি, বাঙলার জল,
>
> বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল–
>
> পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

উৎসবের দিন সকালে 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায়ের মিছিলের পুরোভাগে থেকে কবি এ গান গেয়ে প্রথমে যান গঙ্গাস্নানে। ঘাট থেকে আসার সময় সবাই একে অপরের হাতে পরিয়ে দেন রাখী। রাস্তার পাশে ঘোড়ার আস্তাবলের মুসলমান সহিস থেকে শুরু করে মসজিদের মৌলবি সবাইকে রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলিও করা হয়।[১৪] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের N‡ivqv -তে আছে সে দিনের বিশ্বস্ত বর্ণনা:

> ... গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী

---

[১১] 'রাজভক্তি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

[১২] গীতা চট্টোপাধ্যায়, বাংলা স্বদেশী গান, দিলণ্টী, ১৯৮৩ পৃ. ৪৩

[১৩] 'Another song was sung amid hearty cheers. Such was the enthusiasm that the whole gathering stood upon their legs and joined in the chorus" উদ্ধৃত; রবিজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮; প্রশান্ডকুমার পালের অনুমান প্রথম The first song was again sung after the address of the president গানটি ছিল 'আমার সোনার বাংলা'।

[14] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিয়ে দিলেন। ... রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব। এইবারে বেগতিক–আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। ... রবিকাকার খেয়াল নেই – সোজা এগিয়েই চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো সব ডাকাবুকো লোক।..

... আমরা সব বসে ভাবছি – এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবি কাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী, কী হল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী – টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে–ওরা একটু হাসলে মাত্র।...[১৫]

কিন্তু এর কিছুদিন পর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নীতিগত মত-পার্থক্য স্পষ্ট হলে তিনি এ আন্দোলন থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়েন। এ সময় রচিত †Lqv (১৯০৬) কাব্যের ‘শেষখেয়া’, ‘বিদায়’ ‘প্রতীক্ষা’, ‘প্রচ্ছন্ন’ সমাপ্তি প্রভৃতি কবিতায় ফুটে উঠেছে তাঁর ক্লান্তি ও অবসাদের অনুভূতি। যেমন ‘বিদায়’ কবিতায় তিনি লিখলেন:

বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে
জয়মাল্য লও–না দলে দলে
জয়মাল্য লও-না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।[১৬]

বস্তুত বেশ কিছু কাল ধরে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধে কবি ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকেই স্বদেশী সমাজ, শিক্ষা, শিল্প, অর্থনীতি ও স্বদেশী সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু

[১৫] ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, কলকাতা, ১৪১৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ২৯-৩০
[১৬] ‘বিদায়’, খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের বস্তুগত নীতি নির্ধারণ যেমন করতে পারেন নি, তেমনি তাঁদের কোনো কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ জনতা কিংবা সর্বশ্রেণির জনগণকে যুক্ত করতেও সক্ষম হননি। উল্লেখ্য, প্রায় একই সময় (১৯০৪) চীনেও ড. সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে আমেরিকার পণ্য বয়কট আন্দোলন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করেছিল। কারণ তাঁর বিখ্যাত 'তিন নীতি' ছিল (১) চীনকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করা, (২) চীন থেকে মাঞ্চু রাজাদের উৎখাত করে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপন এবং (৩) সকলের জন্য জীবিকার সংস্থান।[১৭] সান-ইয়াৎ সেনের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী লিগ (থোং মেংহু) চীনে শুধু প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির আহ্বান জানায় নি, ভুস্বামীদের জোয়াল থেকে কৃষকদের মুক্ত করার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার সমতার আহ্বানও জানায়।[১৮] সে সঙ্গে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তারা গ্রহণ করে সশস্ত্র সংগ্রাম ও গণসংগঠনের পথ। এর ফলে ১৯১২ সালের প্রথম দিকেই ড. সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে গ্রামের কৃষক কিংবা শহরের নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবীদের সংযুক্ত করার মতো মতাদর্শ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু পূর্বের উদ্ধৃতি থেকে এ দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা আঁচ করা যায়। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে বয়কট আন্দোলন উপলক্ষ্য করে বাংলার পূর্বাংশে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। অভিযোগ আসে যে, এ আন্দোলনের নামে হিন্দুরা বিদেশি সস্তা ও উৎকৃষ্ট পণ্যের পরিবর্তে বেশি দামের দেশি পণ্য কেনার জন্য গরীব মুসলমানদের বাধ্য করছে। অবশ্য উক্ত বিরোধের পেছনে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রও ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে করেন কেউ কেউ। কিন্তু, বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী ভারতের জাতীয় আন্দোলন, এমন কি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য যে ভাবে উগ্র ও জঙ্গী হিন্দু উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়াতেই মুসলমানদের প্রায় সিংহভাগ অংশ এসব আন্দোলন থেকে বরাবর বিচ্ছিন্ন থেকেছে। নেপাল মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন:

> স্বদেশী আন্দোলন কালে বাংলার প্রায় সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যেই, এমন কি বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যেও এমন একটা নৈতিক ও শস্ত্রীয় ধর্মাচরণ বা হিন্দুয়ানীর প্রাবল্য দেখা দেয়, যাহা অহিন্দু বিশেষ করিয়া বাংলার বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়কে এই আন্দোলন সম্পর্কে সন্দিহান ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল– যাহা সামগ্রিকভাবে স্বদেশী আন্দোলনকেই দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল...।[১৯]

উক্ত অবিশ্বাস, বিরোধ ও ইংরেজ-এর পরোক্ষ উস্কানিতে ১৯০৬ সালে মুসলমান প্রতিক্রিয়া হিসেবে গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল। স্বাভাবিকভাবে এ দল মুসলমান জনগণের

---

[১৭] নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

[১৮] ইজরাইল এপস্টাইন, আফিম যুদ্ধ থেকে মুক্তি (অনুবাদ: মাহফুজ উলগাহ), পেইচিং, ১৯৮৫ (প্রথম সংস্করণ), পৃ. ৯১-৯২

[১৯] নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সহজে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৯০৭) প্রবন্ধে মন্তব্য করেন:

> আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু মুসলমানে বসে না-ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।... মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত – যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না – ... মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়–মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিস্কৃতি পাইবে না।[২০]

এ দিকে কংগ্রেস দলের মধ্যেও মডারেটপন্থীদের বিরোধ তৈরী হয়। এ কারণে ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায় দুই পক্ষের হট্টগোল ও হাতাহাতিতে। উক্ত ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'যজ্ঞভঙ্গ' (১৯০৮) প্রবন্ধ। এর কিছুদিন পরে পাবনায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে (১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮) তিনি পালন করেন সভাপতির দায়িত্ব। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ইতঃপূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' ও 'পূর্বাপর' প্রবন্ধে যে সব কর্মসূচি উত্থাপন করেছিলেন তারই বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইতোমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনে অস্ত্র ও বোমা ব্যবহার এবং প্রতিশোধমুলক গুপ্ত হত্যার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তৎকালীন 'কসাই কাজী' নামে কুখ্যাত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য গৃহীত হয় একাধিক পরিকল্পনা। প্রথমবার একটি বইয়ের মধ্যে বোমা পুরে তাঁকে পাঠানো হয়, কিন্তু বইটি না খোলায় তিনি বেঁচে যান।[২১] পরে (৩০ এপ্রিল, ১৯০৮) মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে তাতে নিহত হন দু'জন ইংরেজ মহিলা। বোমা হামলার সূত্রে প্রকাশ পেয়ে যায় বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের সক্রিয়তা। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং অপর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগ মুহূর্তে আত্মঘাতী হন। এর কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতার মানিকনগরে একটি বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হয় এবং গ্রেপ্তার হন আরো কয়েকজন বিপ্লবী। এ ঘটনায় দেশবাসী একদিকে বিস্মিত হয়, অপরদিকে দুঃসাহসী তরুণদের গর্বে উজ্জীবিতও বোধ করে। কংগ্রেসের মডারেটপন্থীরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাতে থাকলে চরমপন্থী তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় এর জন্য দায়ী করেন ইংরেজদের দুঃশাসনকে। এ অপরাধে

[২০] 'ব্যাধি ও প্রতিকার', রাজা প্রজা (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৮–২৯।
[২১] হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপণ্ডব প্রচেষ্টা, কলকাতা, ২০০৭ (তৃতীয় মুর্দ্রণ), পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ছয় বছরের কারাদণ্ড হয়ে যায়। উক্ত পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 'পথ ও পথেয়' (১৯০৮) নামে। প্রবন্ধে তিনি বহু কথার মধ্যে দুঃসাহসিক কাজের ক্ষীণ প্রশংসা করার পাশাপাশি অন্য প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদীদের ভর্ৎসনাও করেন। যেমন 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধের এক অংশে আছে:

> বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।[২২]

আবার 'দেশহিত' (১৯০৮) প্রবন্ধে একই বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন:

> ... রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারিদিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত র্ভৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে।[২৩]

বোমা ছোঁড়ার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের 'ভয়ংকর শত্রু' জ্ঞান না করলেও তাঁদের যে তিনি সমর্থন করতেন না, তা একটি ব্যক্তিগত চিঠি থেকেও জানা যায়। কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন:

> মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যায় পথ অবলম্বন করিলে জাতীয় চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়। আশু কোন ফল লাভের চেয়ে জাতীয় সেই চরিত্র নষ্ট হওয়া অনেক বেশি হানিকর। ... আগে দেশ স্বাধীন করি তাহার পরে ধর্ম্মের দিকে তাকাইব ইহা নাস্তিকের কথা। বিধবার ধন লুঠ করিয়া চুরি ডাকাতি খুন ও মিথ্যাচরণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিব ইহা যদি সম্ভব হয় তবে জগতে মনুষ্যত্ব একটা ফাঁকি মাত্র, ধর্ম্ম মিথ্যা–এবং ঈশ্বর নাই। ধর্ম্মভ্রষ্ট অভিশপ্ত দেশহিতৈষিতা হইতে ঈশ্বর এই হতভাগ্য দেশকে রক্ষা করুন।[২৪]

উক্ত চিঠি লেখার (৬ জুলাই) এক মাস পাঁচ দিন পর (১১ আগষ্ট) ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর হয় এবং অন্যান্যদের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর। বাঁকুড়ার গীতিকার পীতাম্বর দাস 'একবার বিদায় দে

---

[২২] 'পথ ও পাথেয়', রাজা প্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭
[২৩] 'দেশহিত', সমূহ (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪০
[২৪] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

মা’ গানে বীর ক্ষুদিরামের জন্য বাঙালির মর্মবেদনা প্রকাশের পাশাপাশি সে বিপ্লবীদের অমর করে রেখেছেন।[২৫] কিন্তু মত ও পথের পার্থক্যের কারণে বিষয়টি উপেক্ষিত থেকেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কবি রচনা করেন তাঁর প্রথম ঋতুউৎসব-এর নাটক kvi‡`vrme। এর কাহিনীতে দেখা যায়: এক দল বালক শরতের ছুটিতে গান গাইতে গাইতে পথে বেরিয়েছে। তাদের কলরবে ব্যবসায়ী লক্ষেশ্বরের হিসেবে গোল বেঁধে গেলে সে তাড়া করে বালকদের। কিন্তু রসিক ঠাকুরদা সে-বালকদলের সঙ্গে যোগ দেন বাৎসল্যের সহজ আনন্দে। অপর এক বালক উপনন্দ এসে লক্ষেশ্বরকে জানায়, তার গুরু বীণাচার্য সুরসেনের মৃত্যু হয়েছে। সুরসেন ছিলেন লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী। উপনন্দ বলে, সে-ঋণ সে পুথি নকল করে শোধ করে দেবে। সেদিন থেকেই কাজে লেগে যায় সে।

ও দিকে বেতসিনী নদীর তীরে বালকদের আনন্দের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন রাজা বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসবেশ নিয়ে। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার জন্য রাজগৌরব ত্যাগ করে নিয়েছেন এই বেশ। বালকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সন্ন্যাসী দেখেন, উপনন্দ এ আনন্দের মধ্যেও গাছের নিচে বসে পুথি নকল করছে। এ ভাবে উপনন্দের গুরুর ঋণ-শোধের বিষয় জানতে পেরে ভারি খুশি হন তিনি। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে উপনন্দও ঋণ শোধের ছুটি পাচ্ছে।

সে রাজ্যের সামন্ত রাজা সোমপাল সম্রাটের বিরোধিতা করে অখণ্ড রাজ্যের রাজা হতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে সে সন্ন্যাসীর সাহায্য চায়। বণিকও ধনপ্রাপ্তির আশায় সন্ন্যাসীর কৃপাপ্রার্থী। সন্ন্যাসী পরম কৌতুকে দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক ভাষায় উভয়কে আশ্বস্ত করেন। এ সময় বিজয়াদিত্যের মন্ত্রী সৈন্যসহ সম্রাটের খোঁজে সেখানে এসে পৌঁছলে প্রকাশ হয়ে যায় বিজয়াদিত্যের পরিচয়। এ ঘটনায় অভিভূত সোমপাল রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করলে বিজয়াদিত্য তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এর পর বালক উপনন্দের পক্ষে লক্ষেশ্বরের ঋণ শোধ করে নিঃসন্তান সম্রাট উপনন্দকে গ্রহণ করেন সন্তান হিসেবে। ঠাকুরদাকেও রাজসভার বয়স্য হিসেবে সঙ্গে নিয়ে উপনন্দসহ সম্রাট আপন রাজধানীতে ফিরে যান।

এ নাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রকৃতি বিভিন্ন ফলে-ফুলে আলো বাতাসে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। সেই আন্দযজ্ঞে ভাগ নিতে হবে মানুষকে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘটাতে হবে প্রাণের যোগ। তা হলেই বিশ্বে ভগবানের যে মহানন্দের প্রকাশ ঘটে

[২৫] সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা গানের চার দিগন্ড়, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনকে করা যাবে সুন্দর ও সার্থক।[২৬] নাটকের এক স্থানে বলা হয়েছে:

সন্ন্যাসী। পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেছে তাঁর! দেখতে পাচছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না!... সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে।...

প্রথম বালক। কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।

সন্ন্যাসী। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।

সন্ন্যাসী। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী। তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে! গাও গাও, ঠাকুর্দা, বরণের গানটা গাও।[২৭]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এ মিলনাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি নাট্যকার ঋণ শোধের সৌন্দর্য বিষয়ক একটি তত্ত্বও এ নাটকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে:

---

[২৬] শারদোৎসব (গ্রন্থ পরিচয়), রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩ (পূনর্মুদ্রণ), পৃ. ৫৪২–৪৮

[২৭] শারদোৎসব, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫–১৬

Dhaka University Institutional Repository

> প্রকৃতি আপনার ভিতরে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।[২৮]

দেবতা মানুষের মধ্যে নিজেকে দিয়েছেন। মানুষ তার কর্মে, অক্লান্ত তপস্যার দেবতার সে ঋণ শোধ করতে পারলেই তার মধ্যে ঘটে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা, ঘটে দেবত্বের বিকাশ, ঘটে সম্পূর্ণ মুক্তি। এ কারণেই সন্ন্যাসীর একটি সংলাপে পাওয়া যায়:

> আমি অনেকদিন ভেবেছি, জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি ত্যাগ করে করছে। সেজন্যই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে; বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যই এত সৌন্দর্য।[২৯]

ঋণ শোধের এই সৌন্দর্যের প্রকাশ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জগতেও প্রসারিত। উপনন্দের ঋণ শোধের কথা শুনে সন্ন্যাসী বলে:

> বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে।... লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙক্তির পর পঙক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।...[৩০]

নাটকের কাহিনী এবং বক্তব্য বিচারে এখানে প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই। অবশ্য নাট্যকারের একটি ভাবনা ছিল এ রকম যে, রাজা বিজয়াদিত্য রাজসম্মান ও গৌরব তুচ্ছ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্য বের হয়েছেন। কিন্তু এ কাহিনীতে একমাত্র ঠাকুরদা ছাড়া কোন সাধারণ মানুষের প্রবেশ ঘটে নি। ফলে সন্ন্যাসী বেশ নিয়ে রাজা বিজয়াদিত্য পেলেন না সাধারণ মানুষ হওয়ার সুযোগ। বস্তুত মূল রাষ্ট্রকাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকলে স্বাভাবিকভাবে কোন রাজার পক্ষে সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবে কোনো ব্যক্তি, হোন তিনি একজন রাজা, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে তাঁর ধন সম্পত্তি ত্যাগ করে শ্রেণিচ্যুত হতে পারেন। কিন্তু এ নাটকের রাজা যে সে পথে পা বাড়ান নি, তা স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে শেষ অংশে। বিজয়াদিত্যের আসল পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রসমূহের আন্তঃসম্পর্কসহ সবকিছু পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে যায়। সামন্তরাজা সোমপালের সঙ্গে বিজয়াদিত্যের কথোপকথনে তা টের পাওয়া যায়। যেমন:

---

[২৮] শারদোৎসব (গ্রন্থপরিচয়), পূর্বোক্ত, পৃ, ৫৪৫
[২৯] শারদোৎসব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৮
[৩০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসী! ... এখন তোমার একটা কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব–তাকে দিয়ে তোমার কোন কাজটা করাতে চাও বলো।

রাজা (নতশিরে)। তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী। তা, বেশ কথা! আমাকে যদি সম্রাট বলে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজকার্যের ত্রুটি। সে রকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্ত স্ব-হস্তে মার্জনা করে দিয়ে যাব।[৩১]

প্রকৃতপক্ষে সম্রাট বিজয়াদিত্য যেন প্রাচীন রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী শরৎকালে রাজ্য জয়ের অভিযানেই বেরিয়েছিলেন। সামন্ত রাজা সোমপাল এ জন্যই বলেছে, "মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল।"[৩২] আর সে সামন্ত রাজাকে দমন করেই বিজয় যাত্রা হলো সার্থক। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শরৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ কিংবা ঋণ-শোধের সৌন্দর্য সবই শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে গৌণ। নাট্য সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়:

> শারদ-প্রকৃতির উদার আহ্বানে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা এই শরৎকালেই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন...।[৩৩]

আবার উপনন্দের নিজস্ব শ্রমে তার গুরুর ঋণ-শোধের মধ্যে যে মানবীয় মহত্ত্ব প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল সেই মহিমাও সম্রাট বিজয়াদিত্যের রাজোচিত ঔদার্যে সার্থক হতে পারে নি। লক্ষেশ্বরকে হাজার কার্ষাপন দিয়ে উপনন্দকে সম্রাট যে ভাবে নিজপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন তাতে উপনন্দের প্রতি করুণাই প্রকাশিত হয়। উপনন্দও এ প্রস্তাব তার পরম সৌভাগ্য হিসেবে মেনে নেয় এবং বিজয়াদিত্যের পা জড়িয়ে ধরে জানায় অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।[৩৪] সুকুমার সেন এ কাহিনীর প্রেরণা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলার প্রাচীন রূপকথাকে উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে:

---

[৩১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৯
[৩২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৯
[৩৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০৩, (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১৮৪
[৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

> শারদোৎসবের আর একটি বিশিষ্টতা এই যে ইহার কাহিনীবীজ বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত রূপকথা হইতে গৃহীত। নিঃসন্তান রাজা বাহির হইয়াছেন বৈরাগ্যবেশে এবং উত্তরাধিকারীর সন্ধানে। তিনি যাহাকে লাভ করিলেন সে অজ্ঞাত কুলশীল বালক।[৩৫]

উৎস কাহিনীতে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে যেমন নির্দিষ্ট বালকের আত্মসম্মানবোধের কোন বিষয় থাকে না, তেমনি নাট্যকাহিনীতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা বিনষ্ট করা হয়েছে। এ ভাবে মানুষের শ্রমের প্রতি আস্থা এবং যে আত্মসম্মান অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'স্বদেশী সমাজ' ইত্যাদি প্রবন্ধে বারবার বলে আসছিলেন, তা-ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি উপনন্দ চরিত্রে। ফলে মানুষ যে নিজেই নিজের মুক্তিদাতা ও ভাগ্যনিয়ন্তা, এ ধারণা নাটকের পরিণতিতে ব্যাহত হয়। বরং এখানে প্রাধান্য পেয়েছে অনির্দিষ্ট ভাগ্য কিংবা কোন মুক্তিদাতা মহাশক্তির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকার বিষয়টি। তাই উপনন্দ আপন শ্রম ও কর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে নি। তার সক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তায় পর্যবসিত হয়েছে; সে নিজে হয়েছে পরানুগ্রহের মুখাপেক্ষী। এ ছাড়া উপনন্দের ত্রাণকর্তা হিসেবে রাজা বিজয়াদিত্য চরিত্রে যে মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়েছে তা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। বিশেষত এর পূর্বে আমরা 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনায় প্রাচীন ভারতের দেবতুল্য যথার্থ এক রাজার অস্তিত্ব বরাবরই ছিল। এমনকি 'বহুরাজকতা' (১৯০৫) প্রবন্ধের অংশে তিনি এও প্রস্তাব করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট যেন ভারতবর্ষে যে কোন একজন ইংরেজকে রাজা করে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।[৩৬] কারণ তাঁর মতে-

> আমরা জানি, অপরাধ ক্ষমা, অন্যায়ের প্রতিকার, দুঃখ দূর, অভাব পূরণ করা প্রভৃতিই রাজক্ষমতার সত্য পরিচয়। আমরা যদি যথার্থ রাজাকে পাইতাম, তবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতাম অভিযোগ করিতাম মার্জ্জনা চাহিতাম। তাঁহার ঔদার্য ও বদান্যতায় মুগ্ধ হইতাম, তাঁহার ক্ষমাগুণে তাঁহার সকরুণ প্রজাবাৎসল্যে তিনি আমাদের হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া যাইতেন।[৩৭]

এ নাটকের ঘটনা প্রবাহে রবীন্দ্র-কল্পিত আদর্শ রাজার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিজয়াদিত্য চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। যেমন, এ ধরনের রাজা প্রতাপ ও শক্তির অধিকারী হলেও তাঁর মধ্যে থাকবে

---

[৩৫] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৮ (আনন্দ সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ২১১

[৩৬] "... যদি কোন সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডওয়ার্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান পায়োনিয়ারের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে কোন একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট্ আমাদের রাজা করিয়া দিলিণ্ডর সিংহাসনে বসাইয়া দিন।" 'বহুরাজকতা', রাজা প্রজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

[৩৭] রবীন্দ্র রচনাবলীতে 'রাজভক্তি' প্রবন্ধের বর্জিত অংশ থেকে উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসীসুলভ মহিমা ও উদারতা। প্রজার সঙ্গে তাঁর থাকবে সহজ সম্পর্ক; দ্বিধা-সংকোচ কিংবা ভীতি তাতে প্রভাব ফেলবে না। অবাধ্য প্রজা কিংবা শত্রুকে তিনি জয় করবেন মহত্ত্ব ও উদারতা দিয়ে। অবশ্য নেপথ্যে বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর শক্তিমত্তার প্রকাশ থাকবে না, এমন নয়। এ নাটকে যেমন সৈন্যসহ বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা গিয়েছে। পক্ষান্তরে প্রজারা রাজার সঙ্গে সহজভাবে মিশলেও রাজাকে তারা মান্য করবে দেবতুল্য হিসেবে। রাজা যেন তাদের কাছে মঙ্গলের, কল্যাণের ও দেবতার প্রত্যক্ষ স্বরূপ। এ ধরনের রাজা কোন অবস্থাতেই প্রজার অমঙ্গল সাধন করতে পারে না, ক্ষতি করতে পারে না। তাই শোষণ-পীড়ন এবং তার প্রতিবাদে আন্দোলন কিংবা বিদ্রোহ কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না সেখানে। সুতরাং তৎকালীন ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা কিংবা তাদের পক্ষাবলম্বনরকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কানাইলাল বসু যখন বোমা ও রিভলবার নিয়ে হামলা করে, তাতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন থাকতে পারে না।[৩৮] শুধু তাই নয়, বাস্তবের রাজার প্রশাসন এ নাটক রচনার মাত্র কয়েকমাস আগে ও পরে ক্ষুদিরামসহ তিনজন বিপ্লবীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে এবং আন্দোলনকারীদের বিভিন্নভাবে নিপীড়ন[৩৯] চালালেও সেখানে প্রকাশিত হয় না তাঁর সহমর্মিতা ও সহানুভূতি। অর্থাৎ বাস্তবক্ষেত্রে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধেও কোন সংগ্রাম বা বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নয়। এ সব বিবেচনায় বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের kvi‡'vrme নাটকে তৎকালীন মানুষের রাজনৈতিক মুক্তির বাণী অনুপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত উপনিবেশ ভারতে জাতীয় আন্দোলনকারীদের মনে এ ভাবনার নাট্যিক প্রকাশ যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তাও নাট্যকার ভেবেছেন বলে প্রতীয়মান হয় না। কেবল শরৎ ঋতুর সৌন্দর্য প্রকাশক কয়েকটি অসাধারণ গান এবং সন্ন্যাসী বেশধারী রাজা, লক্ষেশ্বর ও সামন্ত সোমপালের কৌতূহল-উদ্দীপক দৃশ্যগুলোই নাটকের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

শারদোৎসব কে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নাট্যকার পরবর্তী সময় নতুনভাবে উপস্থাপন করেন FY‡kva (১৯২৬) নামে।

cvqwðË: পরবর্তী নাটক cvqwðË (১৯০৯) রচনার সময় কবি অবস্থান করছিলেন শান্তি-নিকেতনে। অবশ্য এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে শিলাইদহ, কলকাতা এবং একটি মামলায়

---

[৩৮] কানাইলাল ও সত্যেন বোমা হামলার সূত্রে গ্রেপ্তার হন। বোমা মামলা চলার সময় তাঁরা দু'জন তাদের প্রাক্তন সদস্য বিশ্বাসঘাতক (রাজসাক্ষী হওয়ায়) নরেন গোঁসাইকে জেলের ভেতরে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন। বিচারে দু'জনেরই ফাঁসী হয়। সুধাংশ দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপণ্ডবীদের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৯০ পৃ. ৪

[৩৯] মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পরে বহু নির্দোষ ব্যক্তি ও পরিবার পুলিশের উৎপীড়নের শিকার হয়। Explosive Substances and Indian Newspapers Act এবং Indian Criminal Law Amendment Act সহ বিভিন্ন দমনমূলক আইন করা হয় আরো কঠিন। এসব আইনের প্রয়োগ করে বাংলার তৎকালীন কয়েকজন নেতাকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ করে রাখা হয়। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

হাজিরা দেওয়ার জন্য খুলনাও ঘুরে এসেছেন। শিলাইদহে এর মধ্যে শুরু করেছে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী। শান্তি-নিকেতনের বিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছে নতুন সেশন। সেখানে তিনিও রীতিমত ক্লাস নিচ্ছেন। লেখার কাজ তেমন চলছে না †Mviv উপন্যাসের কিস্তি ছাড়া। অবশ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের উপযোগী করে gKU উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছেন তিনি এ সময়। কিন্তু এ সব বহির্মুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাঁর মনে বিরাজ করছিল কোন আনন্দঘন সত্তার সঙ্গে, আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা।[৪০] প্রতিদিন ভোরে অন্ধকার থাকতেই শান্তিনিকেতনের মন্দিরের পূর্ব তোরণতলে ধ্যানে মগ্ন হন তিনি। উপলব্ধ ভাবনাগুলো ছাত্র-শিক্ষকদের বলেন এবং ঘরে এসে লিখে রাখেন। এগুলোই পরে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয় kwšÍwb‡KZb Dc‡`kgvjv হিসেবে।

রাজনীতিতে এ সময় বোমা হামলা ও বোমা মামলার সূত্রে কলকাতার বহু নেতা বিভিন্ন মেয়াদে অন্তরীণ হওয়ায় চরমপন্থী তৎপরতা বেশ কমে এসেছে। অবশ্য ধীরে ধীরে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলাসহ অন্যান্য রাজ্যে। রবীন্দ্রনাথ এ মতের সমর্থক না হলেও একটি মামলায় সাক্ষ্যপ্রদানসূত্রে জড়িয়ে পড়েন। খুলনায় জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন কয়েকটি দেশাত্মবোধক গানের সঙ্কলন বের করেছিলেন û¼vi (১৯০৮) নামে। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কবি ইতঃপূর্বে কাব্যটি পড়ে তাঁর মতামত জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন হীরালালকে। এ সময় ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্তসহ লেখকের বিরুদ্ধে মামলা দেয়। পুলিশ লেখকের বাড়ি তল্লাশী করে রবীন্দ্রনাথের সে চিঠি খুঁজে পায় এবং তাঁকে সমন পাঠায় উক্ত মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ খুলনায় গিয়ে তাঁর সাক্ষ্যে বলেন:

> স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণের উত্তেজক কবিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তাঁর পেশা নয় সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণ উত্তেজক হলে সেটা আইনত দণ্ডণীয় হবে সেটা তাঁর জানা নেই।[৪১]

এ রকম সাক্ষ্য যে আসামীর শাস্তির পথ প্রশস্ত করবে, কবির তা অজানা ছিল বলে মনে হয় না। তাই রায় না শুনেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, "... হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পর এখানে আসতে বলেছি।"[৪২] রায়ে হীরালাল সেন-এর আঠারো মাসের কারাদণ্ড হয়। অবশ্য কারামুক্তির পরে হীরালালকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিয়োগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য, হীরালাল সেন-ই ব্রিটিশ কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় লেখক। সমকালীন রাজনীতির এ প্রেক্ষাপটে

[৪০] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০
[৪১] উদ্ধৃত; চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপণ্ডবী সমাজ, কলকাতা, ১৩৯২,
[৪২] উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্ব-রচিত eD VvKiivbxi nvU (১৮৮৩) উপন্যাস অবলম্বনে রচনা করেন CvqwðË নাটক।

এর কাহিনীতে বলা হয়েছে: যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য প্রজাপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী। যুবরাজ উদয়াদিত্যকে তিনি মাধবপুর পরগণার শাসনভার থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কারণ মানবিক কারণে উদয়াদিত্য কৃষকদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনা আদায় করেন নি। এ দিকে প্রতাপাদিত্যের খুড়ো বসন্ত রায় দিল্লির মুসলমান শাসকের অধীনতা স্বীকার করায় প্রতাপাদিত্য ক্ষুব্ধ হয়ে খুড়োকে হত্যার জন্য ঘাতক পাঠিয়ে দেন। অবশ্য নিয়োজিত ঘাতক করুণার বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধ রাজা বসন্ত রায়কে হত্যা করতে পারল না। অপরদিকে পুত্রবধূ সুরমার পিতা শ্রীপুরের রাজা যশোরের অধীনতা স্বীকার করে না বলে পুত্রবধূর ওপরও প্রতাপাদিত্য ক্ষুব্ধ। এ সময় প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁর বয়স্যসহ শ্বশুরবাড়িতে আসেন। রামচন্দ্রের সেই ভাঁড় স্ত্রী-বেশে প্রতাপাদিত্যের মহিষীর সঙ্গে রঙ্গ করায় ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রেরই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন প্রতাপাদিত্য। অবশ্য রামচন্দ্র এ অবস্থা থেকে উদয়াদিত্য, সুরমা ও বিভার সাহায্যে পালাতে সমর্থ হয়। এ অপরাধে উদয়াদিত্যের কারাদণ্ড হলে তাকে কৌশলে উদ্ধার করেন রাজখুড়ো বৃদ্ধ বসন্ত রায়। উত্তেজিত প্রতাপাদিত্য পুনরায় উদয়াদিত্যকে বন্দী করেন এবং বসন্ত রায়ের ছিন্নমুণ্ড আনার নির্দেশ দেন। এবার নির্দেশমতো কাজ করে ঘাতক। বন্দী উদয়াদিত্য রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ওদিকে রাজমহিষীর ষড়যন্ত্রে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন সুরমা। রাজকন্যা বিভাও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। অবশেষে উদয়াদিত্য, বিভা এবং মাধবপুরের কৃষক নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী দেশত্যাগ করেন কাশীর উদ্দেশে।

কাহিনী ও কয়েকটি চরিত্র ইতিহাসের পাতা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে নাট্যকার এ নাটককে (প্রথম সিংস্করণে) 'ঐতিহাসিক নাটক' বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের বিপুল কর্মযজ্ঞ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় – যেগুলো সাধারণত ঐতিহাসিক নাটকের ভিত্তি হিসেবে থাকে, এখানে তা নেই বললে চলে।[৪৩] যশোর-চন্দ্রদ্বীপের কলহ, বসন্ত রায়কে হত্যার চেষ্টা, রাজপুত্র উদয়াদিত্যকে বন্দী করা – সবই পারিবারিক ঘটনামাত্র।[৪৪] তাই কোন কোন সমালোচক এটিকে চিহ্নিত করেছেন সামাজিক নাটক হিসেবে।[৪৫] তবে এখানে উৎপীড়িত হয়েও বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, বিভা ও সুরমার অহিংস প্রতিবাদে এক বিশ্বদেবতার প্রতি আস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অপার্থিব, ঐশী শক্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং দেহাতীত কোন পরমাত্মার কাছে

[৪৩] উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ৩৫৫
[৪৪] অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫ (সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ৩২৯–৩০
[৪৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসংশয় আত্মসমর্পণমূলক গানে সাংকেতিকতার উপাদান স্পষ্ট। তাই এটিকে সাংকেতিক নাটক হিসেবে মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।[৪৬]

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাটকের আবেদন হতাশাব্যঞ্জক। লক্ষযোগ্য যে, প্রতাপাদিত্যের পশুশক্তির বিরুদ্ধে নাটকের প্রোটাগনিস্ট চরিত্ররা কোন সক্রিয় প্রতিরোধে না যাওয়ায় নাট্যদ্বন্দ্ব যেমন পরিস্ফুট হয়নি, তেমনি অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিজয়ে এ নাটক দর্শক পাঠকের মনে সৃষ্টি করে হতাশাবোধ। ব্রিটিশ শাসকের নির্মম শাসন-শোষণের ও নিষ্ঠুর দমনের বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন যখন ভারতবাসীর মনে সাহস ও প্রতিরোধ চেতনা জাগিয়ে তুলছে এবং তরুণ বিপ্লবীরা একের পর এক দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে হাসিমুখে – এমনকি কবি-রচিত গান গেয়ে[৪৭] মৃত্যু, দ্বীপান্তরসহ নানাবিধ শাস্তি গ্রহণ করছে, সে সময় এ নাটককে উৎসাহব্যঞ্জক বলা কঠিন। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঐতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বন করে বাংলায় বহু নাটক লেখা হয়েছে যেগুলোতে স্বদেশ চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা পরিলক্ষিত। যেমন, গিরিশ ঘোষের wmivR‡Ïšjv (১৯০৬), gxiKvwmg (১৯০৭), QÎcwZ wkevRx (১৯০৮), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের cZvcwmsn (১৯০৫), 'Mv'vm (১৯০৬), biRvnvb (১৯০৮), mvRvnvb (১৯০৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর cZvcw'Z¨ (১৯০৩), cjvkxi cvqwðË (১৯০৩), ev½jvi gmb' (১৯০৭) ইত্যাদি। এমনকি eD VvKivbxi nvU উপন্যাস নিয়ে কেদারনাথ চৌধুরীর ivRv emšÍ ivq (১৮৮৬) নাটক গানে ও অভিনয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪৮] সুকুমার সেনের মতে, এ নাটকের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের গান প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে।[৪৯] কিন্তু একই উপন্যাস নিয়ে রচিত cvqwðË নাটকের পাঠক কিংবা দর্শকানুকুল্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।[৫০]

সমকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছাড়া এ নাটকে কৃষক বিদ্রোহের যে উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তাও বাস্তবসম্মত নয়। এখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী বিভিন্নভাবে কৃষকদের বিদ্রোহে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসে এ চরিত্র ছিল না বলে কোন কোন সমালোচক চরিত্রটিকে অভিনব বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এটি কবির নিজস্ব প্রাণসত্তার রূপক অথচ প্রায় অবাস্তব এক

---

[৪৬] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খ=, কলকাতা, ২০০৩ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১৯২

[৪৭] আলিপুর কোর্টে পূর্বে উলিণ্ঢখিত বোমা ও সশস্ত্র বিপণ্ঢবের প্রস্তুতি বিষয়ক মামলা চলার সময় (২৬ মার্চ, ১৯০৯) বিপণ্ঢবী উলণ্ঢাসকর দত্ত কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

[৪৮] ivRv emšÍ ivq সম্পর্কে তৎকালীন 'ভারতী' (কার্তিক, ১২৮৮) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "এই সময় যে কয়খানি নাটক অভিনীত হয়, তন্মধ্যে কেদারনাথ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউ ঠাকুরাণীর হাট খুব জমিয়াছিল"। উদ্ধৃত; র=দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১.০২

[৪৯] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খ=, কলিকাতা, ১৩৬৯ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ৩৫৩

[৫০] "রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতো 'প্রায়শ্চিত্ত' বহুল অভিনীত নাটক নয়। যতদূর জানা যায় শান্ড়িনিকেতনের বাইরে কবি এ নাটক কখনও অভিনয় করেননি বা তাঁর প্রযোজনায় কোনো দিন অভিনীতও হয়নি"। র=দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র। মাধবপুরের কৃষক নেতা হলেও সে নিজে সংসারত্যাগী বাউল। অবাস্তবতার প্রথম সূত্র এখানে নিহিত। কৃষক বিদ্রোহের নেতা বাউল হলে তাদের অভাব-অভিযোগ, দাবি ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তার একাত্ম হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই পদে পদে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কৃষকদের মতান্তর ঘটেছে। যেমন, অজন্মার ফলে ফসল না হওয়ায় খাজনা দিতে অস্বীকার করে কৃষকরা। তাদের এই মৌলিক দাবি অধ্যাত্মবাদের মোড়কে ঢেকে রাখতে চেয়েছে ধনঞ্জয়। খাজনা দিতে অস্বীকার করে রাজাকে কী বলতে হবে তা সে শেখায় এ ভাবে:

> ঘরের ছেলে মেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সে অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।[৫১]

বাঁচার অন্ন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। সে অন্ন রাজা খাজনা হিসেবে কেড়ে নিতে চায়। কেবল বাধ্য হয়ে ('পেয়াদার ভয়ে') কৃষক তা তুলে দেয় রাজার হাতে। অথচ এখানে ধনঞ্জয় কথিত 'মূর্খ' প্রজারা তা-ও দিয়ে দিতে চায় রাজাকে। কেবল ধনঞ্জয়ই তাতে বাদ সাধে; তবে অদ্ভুত যুক্তিতে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে বৈরাগীর সংলাপ থেকে তা উদ্ধার করা যাক:

> প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?
>
> ধনঞ্জয়। হ্যাঁ মহারাজ, আমি-ই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না – পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি; আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই – প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণ হত্যার অপরাধী করিসনে।[৫২]

প্রকৃতপক্ষে ধনঞ্জয়ের কথা বিশ্বস করলে এ দেশে যেসব বিখ্যাত কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল যেমন, নীল বিদ্রোহ (১৮৬০), আসামের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২), মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৯৬), কিংবা প্রায় সমকালীন বাগের হাটের কৃষক সংগ্রাম ও চম্পারনের নীল বিদ্রোহ (১৯০৮) – সে সবই ভুলে যেতে হয়। উক্ত বিদ্রোহগুলোতে এ দেশের কৃষকরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তার এতটুকু লেশ এ নাটকে নেই।[৫৩] বিপরীতে ধনঞ্জয় প্রজাদেরকে মার খাওয়া এবং তা সহ্য করার গূঢ় মন্ত্র শেখায়; যেমন–

---

[৫১] প্রায়শ্চিত্ত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১২২

[৫২] প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

[৫৩] বাংলার নীল চাষীদের ব্যাপক বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে গঠন করেছিল 'নীল কমিশন' (১৮৬০)। এ কমিশনের সামনে কয়েকজন চাষী যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাতে তাদের দুরন্ড় সাহস ও নির্ভীক চিত্তের পরিচয় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস, বেটারা এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

(প্রজা) ১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড় অপমান।

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মান সম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধূলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িসনি? তবে এখনো আরো অনেক বাকী আছে।

২। বাকী আর রইল কী ঠাকুর! এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ওদিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয় । বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে– একবার খুব করে নেচে নে!

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।

এমনি করে আমায় মারো।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,

ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?

যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।[৫৪]

এমন কি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে প্রজারা রাজার কাছে যাওয়ার সময় হাতিয়ার নিতে চাইলে সে বলে:

কেন রে হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

প্রজা ২। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে–

ধনঞ্জয়। তাহলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ। তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয় তবে এই খানেই তোরা থাক।[৫৫]

যেমন: "দিনু ম-ল– আমার গলা কেটে ফেললেও আমি নীল বুনব না–; পাঞ্জু মোলণ্ডাহ– আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু আমি নীল বুনব না। জামি মোলণ্ডা– বরং বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব, ভিক্ষা করে খাব, তবু নীল বুনবনা"। উদ্ধৃত; প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, কলকাতা, ১৩৮৫ পৃ. ৭২

[৫৪] প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৭

[৫৫] প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ পেয়াদা মারলে প্রজারা কেবল পড়ে পড়ে মার খাবে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করবে না কিংবা প্রতিশোধ নিতেও চাইবে না। মার কেমন করে খেতে হয় তাই শুধু শিখবে। ধনঞ্জয়রূপী রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব সম্পর্কে এক কমিউনিস্ট নেতা বলেছিলেন :

> মারের বিরুদ্ধে দরখাস্তও লিখো না, লড়াইও কর না, তোমার মার খাওয়া যাতে ধন্য হয় তাই করো, অর্থাৎ তোমার অন্তরের রিপুকে প্রশ্রয় দিও না, অন্তরের রিপুকে তাড়িয়ে যে মারে তার চেয়ে বড়ো হও, তবেই তোমার মার খাওয়া ধন্য হবে।[৫৬]

এমন কি এ মারের চোটে মারা গেলেও ক্ষতি নেই। তাই ধনঞ্জয় বলেঃ

> বেটারা কেবল তোরা বাঁচতে চাস্ – পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন মরতে দোষ কী হয়েছে? যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি! ওরে সেই গানটা ধর্।
>
> গান
>
> বলো ভাই, ধন্য হরি।
>
> বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।[৫৭]

বস্তুতপক্ষে এ নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজাবিষয়ক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। দেবতার প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলে রাজা স্বৈরাচারী হলেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা সঙ্গত নয়। এ ভাবনা সক্রিয় ছিল বলেই প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রজা কিংবা অন্য কেউ সংগঠিত করে নি কোন রকম বিদ্রোহ। বরং উৎপীড়িতদের কেউ মারা গেছেন, কেউ কেউ বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন। বলা বাহুল্য, এ রকম মনোভঙ্গি প্রজাদের কোনরকম অভাব-অভিযোগ উপস্থাপন কিংবা দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে প্রেরণা যোগাতে পারে না। তাদেরকে করে রাখে অনির্দেশ্য ও রহস্যময় কোন শক্তির মুখাপেক্ষী। নাটকের ঘটনা বিন্যাসের এ অবাস্তবতা নাটকের রস নিষ্পত্তিতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্র আলোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ

> ... সুতরাং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের আবর্ত-সংঘাতে নাটকীয়ত্ব কোথাও তেমন জমিয়া উঠে নাই। প্রতাপ রাজদণ্ডের অহংকারে স্ফীত হইয়া প্রজাপীড়ন করিতেছে, ... কিন্তু উদয়াদিত্য বসন্ত রায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, সুরমা, বিভা কেহই নির্যাতিত হইয়া প্রতি আক্রমণের চিন্তা করে নাই, অন্যায় ও অত্যাচারের বলিস্বরূপে পরিণত হইয়া অসহায়ভাবে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে।[৫৮]

---

[৫৬] রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেনের ছদ্মনাম), 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা,' মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (অখণ্ড), সম্পাদনা : ধনঞ্জয়, দাশ, কলকাতা ২০০৩, পৃ, ১১৩

[৫৭] প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

[৫৮] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোন কোন সমালোচক ধনঞ্জয় চরিত্রের অহিংস আত্মিক সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস নেতা গান্ধী অনুসৃত রাজনৈতিক মতাদর্শের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। এ সূত্রে একজন রবীন্দ্র-জীবনীকার ধনঞ্জয়কে বলতে চেয়েছেন 'মহাত্মা গান্ধীর অগ্রদূত'।[৫৯] ধনঞ্জয়ের সংলাপ ও ক্রিয়ার সঙ্গে গান্ধীর দর্শন এবং কর্ম-পদ্ধতির বেশ মিল রয়েছে বটে। তবে তাকে গান্ধীর অগ্রদূত বলা যায় কি না তা বিচারসাপেক্ষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) আন্দোলন শুরু হয় ১৮৯৩ সালে। এর কয়েক বছর পর, ১৮৯৭ সালে সেখানে ছয় হাজার ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের ধর্মঘট গান্ধী বন্ধ করে দিয়েছিলেন হিংসাত্মক হয়ে পড়ার আশঙ্কায়। দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন ইংরেজ সরকার সে কারণেই উক্ত সিদ্ধান্তকে সম্মানজনক ও সুবুদ্ধি-প্রণোদিত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[৬০] সে ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের মধ্যে এ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোচরীভূত হয় নি, এ অনুমান কষ্টকর। বস্তুত বুয়র যুদ্ধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেখানে গান্ধীর গৃহীত রীতি-কৌশলও তাঁর জানা ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে স্বয়ং গান্ধী যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রায় প্রতি বছর কংগ্রেসে নেওয়া হতো দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার বিষয়ক প্রস্তাব।[৬১] সুতরাং ধনঞ্জয়কে গান্ধীর অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করার সুযোগ নেই। আর গান্ধীবাদের স্বরূপ সম্পর্কে বিশ্লেষকদের মত হলো, এটি শোষক শ্রেণির স্বার্থের রক্ষাকবচ এবং জন-সাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের হাতিয়ার বিশেষ।[৬২] এ দৃষ্টিকোণ থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সংলাপ ও আচরণে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতিফলন নেই। বরং তার এই অধ্যাত্মবাদ যে কোন দমন পীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধে শোষিত শ্রেণিকে নিরুৎসাহিত করে। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের অজান্তেই তাঁর মানবতাবাদী মূল্যবোধের বিরোধিতা করে c¨vqwðË নাটক।

প্রসঙ্গত ধনঞ্জয় বৈরাগীর রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সংলাপ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের বলছে "সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী"?[৬৩] এ সংলাপের ভিত্তিতে উক্ত জীবনীকার বলেছেন যে, এ নাটকে ডেমোক্রেসির

---

[৫৯] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, কলকাতা, ১৪০১, (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ৭৫

[৬০] সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৪–১৫

[৬১] প্রশান্ডকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

[৬২] ক) ১৯৩৪ সালে গান্ধী নিজেই জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিদের বলেন, "আপনারা নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে, শ্রেণী সংগ্রাম এড়াইবার জন্য আমি আমার সমস্ড় শক্তি ও প্রভাব নিয়োগ করিব। যদি অন্যায়ভাবে কখনও আপনাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা হয় তবে আমি আপনাদের হইয়া সংগ্রাম করিব"। উদ্ধৃত; সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬১

খ) এ বিষয়ে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ বলেন, "অহিংসার প্রতি তাঁর [গান্ধীর] অন্ধবিশ্বাস একটি অন্ড়ঃসারশূন্য বুলিমাত্র, অপরিণত ভারতীয় বুর্জোয়াদের কাপুরু্ষতার প্রতীক"। উদ্ধৃত; সৈয়দ শাহেদুলণ্ডাহ, লেনিনবাদীদের চোখে গান্ধীবাদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৯

[৬৩] প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

চরম আদর্শ... প্রজার ‘Sovereign right’ তত্ত্ব ঘোষণার কথা আছে।[৬৪] কথাটি মেনে নেওয়া কঠিন। প্রথমত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিভূ হিসেবে রাজার অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এটি দাসযুগ কিংবা সামন্তযুগেই সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত গণতন্ত্রে অর্ধেক রাজত্ব-তো জনগণের নয়ই, বরং এতে সরকারের নামে ধনিক শ্রেণিকে জনগণের শ্রমশোষণ এবং তাদের দমন করার অধিকার দেওয়া হয়।[৬৫]

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সংলাপ লক্ষ করা যাক:

প্রতাপাদিত্য। ... মাধবপুরের প্রায় দু’বছরের খাজনা বাকী – দেবে কি না।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এতবড়ো আস্পর্ধা।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?[৬৬] [নিম্নরেখা বর্তমান লেখকের!]

উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখাযুক্ত সংলাপগুলো প্রাথমিকভাবে একজন সচেতন নির্যাতিতের একান্ত দাবির মতো মনে হয়। তাই সমালোচকেরা ধনঞ্জয়কে ‘নির্ভীক যোদ্ধা’,[৬৭] ‘অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু দুঃখী দুর্গতদের পরম সুহৃৎ’[৬৮] বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ এখানে স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করা হয়েছে কৃষক শ্রেণি বা প্রলেতারিয়েতের মানবিক অধিকার। যেমন, এখানে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে – জমিদারে কাছে কৃষকের খাজনা দেওয়ার নিয়ম। নিম্নরেখাযুক্ত দ্বিতীয় সংলাপ অংশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষকের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পর বাকি ফসলের ওপর জমিদার বা রাজার অধিকার রয়েছে। কেবল এ দু’বছর ফসল কম হওয়ায় তা দেওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য পেয়াদা পাঠিয়ে ক্ষুধার সে অন্নটুকুও যে নিয়ে নেওয়া হবে না তার নিশ্চয়তা নাটকে নেই। তাই, বৈরাগী সত্যিকার অর্থে হতে পারে না ‘নির্ভীক যোদ্ধা’ (যুদ্ধ

[৬৪] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

[৬৫] ক) ‘আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণির সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি মাত্র।’ কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, মার্কস, এঙ্গেলস রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ২৮

খ) ‘রাষ্ট্র হল সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে’। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১ম অংশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

[৬৬] প্রায়শ্চিত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

[৬৭] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

[৬৮] নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ১৪১০ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৩২০

Dhaka University Institutional Repository

সে নিজেও করে না, অন্যকেও যুদ্ধে উৎসাহ দেয় না), 'দুঃখীর সুহৃৎ' কিংবা কৃষক সমাজের নেতা। বরং এ নাটকে কৃষকনেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সে কৃষকের শত্রুপক্ষের মতবাদ ও স্বার্থ মেনে নিয়ে শ্রেণি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। মোদ্দা কথায়, সে আসলে শোষকের দালাল।

cvqïðË রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক ধারার প্রথম দিকের নাটক বলেই হয় তো এতে কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুসরণও হতে পারে এর উৎস। বিশেষত ইতিহাসের প্রতাপাদিত্য চরিত্রটির প্রিতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়েও এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা। আর ধনঞ্জয় বৈরাগী অনেকাংশে কবির মতবাদ প্রচারের বাহন। এ দিক থেকে রাজা, রাজত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ে তার মতামত কবি রবীন্দ্রনাথেরই অনেক দিনের লালিত বিশ্বাস।[৬৯] ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ সময় ব্যক্তিজীবনে কবি আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে মানসিক স্থিতিলাভের চেষ্টা করছিলেন। এ অবস্থায় ঔপনিবেশিক বা আধুনিক রাষ্ট্রের সংগঠন, তার মূল লক্ষ্য এবং এর সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তীক্ষ্ণ মনোসংযোগ তিনি করতে পারেন নি বলে অনুমান করা যায়। ফলে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস এবং ঔপনিষদিক সামাজিক কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে cvqïðË নাটকের কোথাও কোথাও মানবতা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে।

পরবর্তী সময় তিনি এ নাটক আরো সংহত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে রচনা করেছিলেন cwiÎvY (১৯২৯) নামে।

ivRv : রাজা (১৯১১) নাটক রচনার কাজ শেষ হয়েছে ১৯১০ সালের নভেম্বরে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা একটি নতুন নাটক লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। এ নাটক সে অনুরোধে লেখা হলেও স্বাভাবিকভাবে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে কবির তৎকালীন মানস-ভাবনা। এর কিছুদিন আগে থেকে শান্তিনিকেতনের বিভিন্নমুখী ঝামেলা সামাল দিয়ে তিনি খুঁজছিলেন বিশ্রামের অবকাশ। জ্বর ও অর্শ রোগের প্রকোপে শরীরও এ সময় অনেকখানি বিপর্যস্ত। পুত্রবধূকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, সত্যিই তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।[৭০] রবিজীবনীকার-এর মতে "এখানে ছুটির বাসনা, দূরে চলে যাবার ইচ্ছা অনেকটাই নির্জনে ঈশ্বরোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত।"[৭১] সে অবকাশ পাওয়া গেল সেবার পূজার ছুটিতে। চলে গিয়েছিলেন শিলাহদহে, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূর সংসারে। সেখানে রথীন্দ্রনাথের কৃষিসংক্রান্ত

---

[৬৯] "একালে এ বৈরাগীর অর্ধেক মহাত্মা গান্ধীর চিত্র, বাকি অর্ধেক কবির স্বকীয় এবং সব মিলে কার্যতঃ জীবনবাদী কবির কল্পলোকের বস্তু।" ড. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯৬ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ) পৃ. ১৭৮

[৭০] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

[৭১] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু টাকা ব্যয় করে গবেষণাগার, গ্রন্থাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে সঙ্গে কুঠিবাড়ির ছাদের ওপর তৈরি হয়েছে একটি ছোট ঘর, সেখানেই অবস্থান নেন তিনি। এসেছিলেন কিছুটা অসুস্থ হয়ে, কিন্তু অল্পদিনেই শরীর, মন হয়ে উঠল সুস্থ ও প্রফুল্ল। কয়েক মাস আগে MxZvÄwj-র গানগুলো লেখা হয়েছে, চলছে MxwZgvj¨ ও kwšÍwb‡KZb Dc‡'kgvjv-র গান ও প্রবন্ধ রচনা। এ সবের মধ্যে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা অরূপ-ভগবানবিষয়ক ভাব রূপায়িত হচ্ছে। নতুন পরিবেশে ঘটল সে ভাবের পরিপুষ্টি। অজিত কুমার চক্রবর্তীকে এ পরিবেশে তাঁর মনোভাব জানিয়ে লিখলেন,

> এই সমস্ত মিলে আমাকে এমনি ভিতরের দিকে টেনে নিচ্চে, এমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বুকের মাঝখানটাতে আকর্ষণ করছে সে আমি বলতে পারি নে, কি করব বল, আমার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে – আমার হাতের থেকে কলম কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে – বই এবার আনিনি – তাতে খুব উপকার পেয়েছি – নিজের মধ্যে যে বিজনবিহারী আছে দায়ে পড়ে তার সঙ্গ এবং পরিচয় লাভ করচি – তার পেটে যে এত কথা আছে তা কেবল বই পড়ে পড়ে আমরা ভুলে যাই।...[৭২]

মনের এ অবস্থায় রচিত ivRv নাটক সে সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারই নবতর প্রকাশ।[৭৩]

রাজনীতিতে এ সময় চলছিল সন্ত্রাসবাদীদের বিভিন্নভাবে দমন পীড়নের পর্যায়। আলিপুরের বোমা মামলার চূড়ান্ত রায়ে অরবিন্দসহ সতের জন মুক্তি লাভ করেন। অন্যদের যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদের দ্বীপান্তরের সাজা হয় (১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯১০)। এ সব সাজা, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাতটি বিপ্লবী সমিতি নিষিদ্ধকরণ, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাশী সত্ত্বেও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চলতেই

---

[৭২] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

[৭৩] ক) "রাজা নাটকের ভাব, উপজীব্য হইতেছে, মানব-হৃদয়ের ভগবৎ-উপলব্ধির ইতিহাস"। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২০০

খ) "রাজা অধ্যাত্মরসের নাট্য", অজিত কুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা (মিত্র ঘোষ সংস্করণ), কলকাতা, ১৩৯৫ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৮৭

গ) "'গীতাঞ্জলি' – 'গীতিমাল্য'– 'গীতালি' পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ অরূপ-সাধনায় নিমগ্ন তখন তিনি অরূপ-তত্ত্ব বিষয়ক নাটক 'রাজা' (অরূপ রতন) রচনা করেন।" অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০

ঘ) "'রাজা' নাটকে ভগবদনুভূতির এক অভিনব রূপ ও তাহার সমস্যা প্রকটিত হইয়াছে"। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

ঙ) "'Dakghar' and 'Raja' are both exceptional among Rabindranath's plays being the only two which can be described as religious, as distinct from spiritual, dealing as they do with the relation between God and man." Hiren kumar Sanyal, 'The Plays of Rabindranath Tagore', A Centenary Valume: Rabindranath Tagore 1861-1961, New Delhi-1992, P. 237

চ) "'রাজা' প্রকৃতপক্ষে গীতাঞ্জলিরই নাট্যরূপ মাত্র"। আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

ছ) "রাজা নাট্যে এক অভিনব পন্থায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং জগৎ চালনার ধারা প্রতীকের দ্বারা রূপায়িত করিয়াছেন"। অশোক সেন, পূর্বোক্ত পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। বোমা মামলায় সরকার পক্ষের দুই প্রধান ব্যক্তি– ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ ও খান বাহাদুর পদকপ্রাপ্ত শামসুল আলম (২৪ জানুয়ারী) এবং আশুতোষ বিশ্বাস (১০ ফেব্রুয়ারী) যথাক্রমে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত ও চারুচন্দ্র বসুর গুলিতে নিহত হন। শুধু তাই নয়, পুরনো নেতাদের স্থানে আসতে থাকেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাসবিহারী বসু প্রমুখের মতো নতুন নেতৃত্ব।[৭৪] ওদিকে ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর (১৯১০) অত্যন্ত সাদামাটাভাবে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশন। আর ইতঃপূর্বে সরকার ঘোষিত 'মর্লি-মিন্টো সংস্কার' যে আসলে একটি ধাপ্পা ছিল তা হয়ে উঠেছে স্পষ্ট।

অবশ্য রাজনীতির উপরি-উক্ত কোন বিষয় ব্রহ্ম-বিষয়ক নাটক ivRv-য় স্থান পায় নি। MxZvÄwjতে পরম পুরুষের সঙ্গে ভক্ত হৃদয়ের প্রেমের, অভিসারের ও মিলনের যে আকুতি প্রকাশিত তা-ই এখানে নাট্যকাহিনীর রূপ লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে, এই ভাব অনেকখানি বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতিরূপক।[৭৫] রাজা এখানে স্বয়ং ভগবান, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। অসীম ব্রহ্ম নিজেকে (রানি সুদর্শনারূপে) সীমায়িত করেছেন জীবাত্মা বা মানবত্মায়। তাই ভগবান ও মানবের মধ্যে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে নিত্য সম্বন্ধটি হচ্ছে প্রেমের। এই প্রেমেরও নানা রূপ; পিতা-মাতা রূপে, সখা-সখী রূপে, দাস-দাসী রূপে কিংবা বধূ-প্রণয়িনী রূপে ভগবানের প্রেমরস আস্বাদন করা যায়। কাহিনীতে তা এসেছে নিম্নোক্তভাবে:

রানি সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন হয় কেবল অন্ধকার কক্ষে। রানির খুব ইচ্ছা হয় রাজাকে দেখবার। রাজা বসন্ত উৎসবে হাজার জনের একজন হয়ে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন রানিকে। রানির মতো প্রজারাও কখনো রাজাকে দেখে নি। অনেকের বিশ্বাস, এ দেশে রাজা আদৌ নেই। বসন্ত উৎসবে আগত অনেক বিদেশি রাজাও এ বিষয়ে সন্দিহান। এঁদের মধ্যে কাঞ্চীরাজ একেবারে নিশ্চিত যে, এ দেশে রাজা নেই। সকল রাজাই মনে মনে সুদর্শনাকে আকাঙ্ক্ষা করে। এক পর্যায়ে কাঞ্চীরাজ প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেন রানিকে অপহরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আগুন দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি নিজেই আত্মরক্ষা করেন পালিয়ে। রানি সুদর্শনা রাজবেশী সুদর্শন এক জুয়াড়িকে রাজা ভেবে তার শরনাপন্ন হন এবং ভুল বুঝে লজ্জা ও সংকাচে মুষড়ে পড়েন। এমন সময় রাজা এসে উদ্ধার করেন সংকুচিতা রানিকে। কিন্তু আগুনের আলোতে রাজার কুশ্রী রূপ দেখে রানি রাজার প্রতি বিতৃষ্ণ হন এবং এক সময় ফিরে যান পিতৃরাজ্যে। এ অবস্থায় স্বামীত্যাগী সুদর্শনাকে বিয়ে করার জন্য সাত দেশের রাজা তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। তাঁদের হাতে বন্দী হন সুদর্শনার

[৭৪] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭–৩৯

[৭৫] "এক হিসাবে রাজা-সুদর্শনার বিরহমিলনের ব্যাপারকে বৈষ্ণব-ভাবনায় কৃষ্ণ-রাধার অভিসারের প্রতিরূপক বলিতে পারি"। সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

পিতা কান্যকুব্জরাজ। রাজারা পরামর্শ করে সুদর্শনাকে স্বয়ম্বরা হওয়ার আহ্বান জানান। সেই স্বয়ম্বর সভায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হন রাজার বন্ধু বলে কথিত ঠাকুরদা। তিনি জানান যে, রাজা সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। যুদ্ধে কাঞ্চীরাজ পরাজিত হন এবং অন্যরা রণে ভঙ্গ দেন। এবার রানি মনে-প্রাণে রাজাকে কামনা করলেও রাজা রানিকে না নিয়ে ফিরে যান নিজরাজ্যে। এতে অভিমান ও বেদনায় মোহ্যমান হয়ে পড়েন রানি। অগত্যা সব অভিমান ও পূর্ব-অহংকার ত্যাগ করে তিনি নিজেই পায়ে হেঁটে ফিরে যান সেই অন্ধকার কক্ষে। এ ভাবে রাজার কুশ্রী, কালো, ভয়ানক রূপের মধ্যেই তিনি তাঁর পরম পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাজাকে তিনি বলেন:

> প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে, তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম– ... তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।[৭৬]

উল্লেখ্য, নাটকের এ কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছেন ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২) গ্রন্থ থেকে। এ গ্রন্থের কুশ-জাতকের বিস্তৃত অংশ 'The Story of Kusa' অবলম্বনে নাটকটি রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন বিশেষ উপলব্ধির গূঢ় তত্ত্বই এখানে রূপায়িত হয়েছে।[৭৭] সে সঙ্গে বর্জিত হয়েছে জাতক কাহিনীর (দেবরাজ ইন্দ্র-সম্পর্কিত) আলৌকিক বিষয়সমূহ। এ কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, রানি সুদর্শনার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ বধূরূপে। অর্থাৎ প্রেমের মধ্য দিয়েই সুদর্শনার ভগবান উপলব্ধির রূপ প্রকাশিত। উক্ত সম্পর্ক বিষয়ে বেশ কয়েকটি গান (MxZvÄwj -র অন্তর্ভুক্ত) তিনি রচনা করেছেন মাস চারেক আগে। এর মধ্যে দুটি (১২০ এবং ১২১ সংখ্যক) গানের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

১২০

---

[৭৬] রাজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫–২৬৬
[৭৭] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯–৮০

Dhaka University Institutional Repository

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
... ...
তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে–
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।[৭৮]

১২১

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
... ...
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

---

[৭৮] গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৯৫–৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে

তবু আমার হৃদয় লাগি

ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে

প্রভু নিত্য আছ জাগি।

তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে

তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে

মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে

সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।[৭৯]

যথাক্রমে ২৭ ও ২৮ আষাঢ়, ১৩১৭ সালে রচিত উক্ত দুটি গানে i\/R\/ নাটকের তত্ত্ব যেন বীজরূপে পাওয়া যায়। ২৮ আষাঢ় (১২ জুলাই, ১৯১০) অজিত কুমার চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছেন:

> আমি বর্ষায় পরিপূর্ণ গোরাই নদীর উপর বেশ একটি গভীর আনন্দ অনুভব করচি। এখানকার কাজকর্ম্মের সঙ্গে জড়িত বলেই এখানকার শান্তিটি আমার কাছে খুব নিবিড় হয়ে উঠেছে – আমি এমন একটা বিশেষ উপলব্ধির মধ্যে আছি যা পূর্বে আমার সুস্পষ্ট ছিল না।[৮০]

ধারণা করা চলে উক্ত উপলব্ধি উপ্ত হয়েছিল i\/R\/-র বীজ হিসেবে। সম্ভবত এ সময়ই (তারিখবিহীন) একটি চিঠিতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ক্ষিতিমোহনকে তিনি জানাচ্ছেন:

> বীজ কিছুকাল মাটিতে পুঁতে রেখে দিতে হয় তবে অঙ্কুর বেরয়। আমার নাটকের বীজ এখন মনের তলাকার অন্ধকারে পোঁতা আছে। অঙ্কুর বেরলেই তার সঙ্গে লাগা যাবে– তার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না।[৮১]

সে অঙ্কুরের বিকশিত রূপ i\/R\/-য় রানি সুদর্শনা প্রেম-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারে নি। অহংজাত বিভ্রান্তি তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল ভগবানের সান্নিধ্য থেকে। অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং এসে আহ্বান করেন সেখানে তাঁকে উপলব্ধি করতে না পারলেই ভুল হয়, বাইরের মায়া চোখ ভোলায়। সুদর্শনা রাজাকে বাইরে খুঁজতে গিয়ে জুয়াড়ির রূপে ভুলেছিল। অবশেষে অনেক অপমান ও দুঃখের সাধনায় সে পুনরায় ফিরে পেল সেই প্রভুকে। কবির কথায়:

---

৭৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

৮০ উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

৮১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার প্রভুর সঙ্গলাভ করিল,... এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।[৮২]

আপাত দৃষ্টিতে i\R\ নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরম পুরুষের সঙ্গে মিলন সাধনের যে তত্ত্ব নাটকের কাহিনী-কাঠামোয় উপস্থাপিত হয়েছে তারই কোন কোন অংশে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শ। যেমন, কাহিনীতে রাজা একটি দেশের কর্ণধার হিসেবে উপস্থাপিত বলে ঐ দেশের প্রজার সুখ-শান্তি বজায় রাখা কিংবা দুঃখ লাঘবের ভার তাঁর উপরই বর্তায়। লক্ষণীয় দেশের প্রজারা এ দাবি প্রকাশও করেছে। কিন্তু পূর্বের c\q\ðË নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো এখানেও ঠাকুরদা চরিত্রটি তা নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে তার প্রহেলিকাময় আধ্যাত্মিকতায়। 'কুঞ্জবনের দ্বারে' দৃশ্যে দেখা যায়, দেশে ধর্মের রাজা নেই বলে নাগরিকরা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করছে। তাদের কথোপকথন লক্ষ করা যেতে পারে:

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাতদিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকাল মৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে, তবু তো এখনো দু'ছেলে আছে আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

দ্বিতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে ত গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন-জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা! ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কি রকম দেখো না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকাগুলোরই থাকবার কষ্ট হয়।

---

[৮২] রাজা-র অভিনেয় রূপ 'অরূপ রতনে'র ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫২

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্ না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি – আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনদিন পুরস্কার দেয়। তা, যা ভাই, আনন্দ করে বলে বেড়া গে – রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব – সব সুরই ঠিক এক তানে মিলবে।[৮৩]

প্রজারা তাদের সন্তানের অকাল মৃত্যু, অন্নাভাব ও দারিদ্রের জন্য যতই রাজাকে দায়ী করতে চাইছে, ঠাকুরদা ততই এ সব দুঃখ দৈব ও অনিবার্য বিধান হিসেবে হাসিমুখে মেনে নেওয়ার তত্ত্ব প্রচার করছে।

এ জন্য কোন কোন সমালোচক এ রাজাকে ‘স্বার্থিক প্রয়োজন ও প্রার্থনার সম্পর্কের উর্ধ্বে’, স্থাপন করে উক্ত বিষয়টি মেনে নিতে চেয়েছেন।[৮৪] বস্তুত এখানে রাজার প্রতীকে ভগবান-উপলব্ধির বিমূর্ত ভাব উপস্থাপনের প্রচেষ্টা হলেও ঐহিক ও সামাজিক মানুষের কাছে বাস্তব রাজা-প্রজা সম্পর্কটিই প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, রাজার বাহ্যিক শাসন কিছু নেই– বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাজার বাহ্যিক কর্তব্য সম্পর্কে এ রকম অভিযোগ সমালোচক এডওয়ার্ড টমসনও করেছিলেন: æThe king in ‘Raja’ refuses to exercise any of the ordinary prerogatives of kingship to punish treason or resent insult.”[85] মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র এবং দুঃখ যন্ত্রণার জন্য বর্তমানে দায়ী গুটিকয় মানুষের অন্যায় স্বার্থপরতা।[৮৬] আবু সয়ীদ আইয়ুব তাই ঠাকুরদা সম্পর্কে বলেছেন, “আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুরদার গভীর জ্ঞান থাকলেও মার্কসীয় সমাজবাদ বিষয়ে ছিলো না।”[৮৭] সে সঙ্গে তিনি এটাও যোগ করেন যে, “নাট্যকারেরও বোধ হয় ‘রাজা’ রচনাকালে সমাজ-চেতনা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিপুষ্ট ছিলো না।[৮৮] বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোই মার্কসবাদ বিষয়ে গভীর আগ্রহী ছিলেন না। প্রসঙ্গত কবি দ্বিতীয়বার (১৮৯০ সালে) লন্ডন যাওয়ার কয়েক বছর আগে চার্লস ডারউইনের Descent of Man

---

[৮৩] রাজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

[৮৪] ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

[৮৫] Edward Thompson, Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist, London, 1948 (2nd Edition), p. 212

[৮৬] ‘সোশ্যালিজম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, “ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজম কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে, সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।” রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ৬৮৭

[৮৭] আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থ জনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭ (প্রথম সংস্করন), পৃ. ৫৬

[৮৮] আবু সয়ীদ আইয়ুব, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭১), কার্ল মার্কস-এর Das Kapital (১৮৮৭), ও মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর Communist Menifesto (১৮৮৮) গ্রন্থগুলো ইংল্যান্ড তথা সারা বিশ্বের চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ সবের কিছুই তখন রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। নেপাল মজুমদার কিছুটা বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মন্তব্য করেছেন:

> ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এই ইংল্যান্ডকে তিনি কেন দেখিতে পাইলেন না। উনিশ শতকের শেষভাগে যে সব মহামনীষী ইংল্যান্ডে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধন-সম্পদে জগতের যে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল – তাহার সিংহদরজা রবীন্দ্রনাথের নিকট উন্মুক্ত হইল না।[৮৯]

কবি সেবার ইংল্যান্ড থেকে ফিরে 'সাধনা' পত্রিকায় 'সোশ্যালিজম' (১২৯৯) নামে প্রবন্ধ লিখলেও উক্ত লেখকের ধারণা, কবি সে সময় মার্কস-এঙ্গেলসের মূল কোন রচনা পাঠ করেন নি। তাঁর ভাষায়:

> কবি সেই সময় মার্কস-এঙ্গেলসের মূল কোন রচনা পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মার্কসবাদের জটিল ও গভীর দার্শনিক এবং আর্থনীতিক-রাজনীতিক তত্ত্বাদিও অধ্যয়ন, অন্তত তাহার গভীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।[৯০]

তেমনি ১৯৩০ সালেও কবি – রাশিয়া সফর শেষে আমেরিকায় – এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, æI cannot judge their communism as a philosophy of life because I don't know enough about it.[৯১] এ সব কারণে মনে হয় ivRv নাটকের গরিব প্রজাদের দুঃখের কারণ তিনি সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পান নি। সে দৃষ্টিতে দেখলে উক্ত আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বিকল্প কাহিনীর মাধ্যমে হতে পারত। কিন্তু MxZvÄwj-MxwZgvj¨ পর্বের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে স্বার্থ সংঘাতময় পৃথিবীর স্থূল সুখ-দুঃখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া কিছুটা অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয়।[৯২] তাই ivRv নাটকে রবীন্দ্রনাথ পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের তত্ত্বকথা প্রকাশ করতে গিয়ে শোষণমূলক সমাজের প্রতিই তাঁর পরোক্ষ সমর্থন ব্যক্ত করে বসেছেন।

নাটকের মূল তত্ত্ব প্রসঙ্গেও বলা যায় যে, পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে মানবের মুক্তির যে তত্ত্ব এখানে প্রকাশিত হয়েছে তা বৈজ্ঞানিক বা সমাজতাত্ত্বিক কোন দিক থেকেই সত্যের কাছাকাছি

---

[৮৯] নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
[৯০] নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১
[৯১] The Boston Herald (14th October, 1930) থেকে উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৩য় খ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১০৩
[৯২] জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইসারলিং এ সময় রবীন্দ্রনাথকে দেখে 'Travel Diary গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন 'higher more spiritual world'- এর অধিবাসী বলে। উদ্ধৃত; প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

নয়। পৃথিবীর বহু ভাববাদী দার্শনিক ও ধর্মীয় গুরু এ সব মতবাদ প্রচার করলেও আধুনিক বিজ্ঞান তা বাতিল করেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তুজগতে আমরা বসবাস করছি তা-ই একমাত্র বাস্তব, অতীন্দ্রিয় কোন সত্তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। আর সামাজিক বিজ্ঞান মতে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ঈশ্বর, শয়তান, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা।[৯৩] শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এ সব মতবাদ (আধ্যাত্মিক) প্রকারান্তরে শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। কার্ল মার্কস তাই ধর্মকে তুলনা করেছিলেন আফিমের সঙ্গে।[৯৪] কারণ কিছু সংখ্যক স্বার্থবাদী মানুষ এর নেশায় মাতিয়ে বিপুল জনগণকে শোষণ করে এবং তাদেরকে নম্র ও সহিষ্ণু থেকে সে অত্যাচার মেনে নেওয়ার প্ররোচনা দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর i³Kiex নাটকে নিজেই এ প্রক্রিয়াটিকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ ivRv নাটকে বিজ্ঞান-বিরোধী সে আধ্যাত্মিক মতবাদই পরিবেশিত হয়েছে সাংকেতিকতার আড়ালে। এ কারণেই রবীন্দ্র গুপ্ত ivRv নাটক সম্পর্কে বলেছেন গণনাটকের আসরে এর অভিনয়ের দাবি জরুরি নয়।[৯৫] তেমনি নাট্যকার ও নাট্যতাত্ত্বিক উৎপল দত্ত জপেন দা'র জবানিতে বলেছেন, "অরূপ রতনের (ivRv) মতন নাটক প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লবের অন্তরায়।"[৯৬]

বস্তুত ivRv নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশেষ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ভাবের নাট্যরূপ। এ লক্ষ্যেই পরিকল্পিত হয়েছে চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য-বিন্যাস; ও প্রযুক্ত হয়েছে প্রচুর গান (২৬টি), যার বেশির ভাগ গীতবিতানে প্রেম ও পূজা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং কবির মতে, রাজা চরিত্রটি এখানে শুধু দেশের রাজা নন, অলীক বিশ্বরাজ, অরূপ-ভগবান। তাই এতসব অলীক ভাব ও বিষয় পরিস্ফুট করার জন্য যে সামাজিক সমস্যা চলে এসেছে তার বাস্তব সমাধান আশা করাও হয়তো সঙ্গত নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের ivRv নাটকটি বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত অধ্যাত্মরসের নাটক হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য নাটকের মতো এ নাটকেরও একটি অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করে নাম দিয়েছিলেন Ai~c iZb (১৯২০)। আবার এ নাট্যকাহিনীকেই তিনি ১৯৩১ সালে kvc‡gvPb নামে নৃত্যনাট্য-রূপও দিয়েছিলেন।

---

[৯৩] ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ধর্ম প্রসঙ্গে, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.৭

[৯৪] "ধর্ম হল নিপীড়িত জীবনের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হল আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম"। 'কার্ল মার্কস', হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনায় প্রদত্ত রচনার ভূমিকাংশ, কার্ল মার্কস, ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৮১, পৃ. ৪০

[৯৫] রবীন্দ্র গুপ্ত, সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৯৮

[৯৬] উৎপল দত্ত, জপেন দা জপেন যা, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

APjvqZb: ivRv প্রকাশের প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে (২৯ জুন, ১৯১১) রচিত হয় APjvqZb নাটক। এটি প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১৮) এবং পরে (২ আগস্ট, ১৯১২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন রচনার দেড়মাস আগে কবির বয়স প্রঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। কলকাতার 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ' এ উপলক্ষ্যে তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে সংবর্ধনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু কিছু লোক এর বিরোধিতা করে এবং কবিকে এ উদ্যোগের প্রবক্তা ভেবে শুরু করে তাঁর নিন্দা প্রচার। স্বভাবতই কবি এতে দুঃখিত হন এবং উদ্যোক্তাদের বলেন এ কাজে বিরত হতে। কবি আর কলকাতা গেলেন না। ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মীদের নিয়ে শান্তিনিকেতনেই উদ্‌যাপিত হয় কবির পঞ্চাশতম জন্মদিন। জন্মোৎসবের আগের দিন অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর কবিতার এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরদিন আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, ঋগ্বেদ ইত্যাদি থেকে মন্ত্র, মঙ্গলগীত ইত্যাদির মাধ্যমে সূচনা হয় উৎসবের। কলকাতা থেকেও বহু ভক্ত এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কিন্তু কবি পুরোপুরি খুশি হতে পারেন নি। নিরুদ্ধ অভিমান নিয়ে দু'দিন পরেই তিনি কলকাতা হয়ে চলে যান শিলাইদহ এবং সেখানে রচনা করেন APjvqZb নাটক।

রাজনীতিতে এ সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই। কেবল ৬ মে তারিখে ইংল্যান্ডের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু ঘটলে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তিন দলের ব্রাহ্মরা সম্মিলিতভাবে উপাসনা করেন। এ উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর রচিত 'যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসরি' গানটি গীত হয় সে সভাস্থলে। উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ 'সাম্রাজ্যেশ্বরী' নামে একটি শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।[৯৭] ভারতের এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশন সমাপ্ত হয় অত্যন্ত সাদামাটাভাবে। সিদ্ধান্ত হয় পরবর্তী ২৬তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। এর জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হলে সেখানে ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

APjvqZb-এর কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত পূর্বোক্ত বৌদ্ধ কাহিনীমূলক গ্রন্থের 'The Story of Panchaka' থেকে। অবশ্য সম্পূর্ণ জাতক কাহিনীর পরিবর্তে তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন কেবল মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের পাণ্ডিত্য ও মূর্খতার বৈশিষ্ট্যসমূহ। ফলে এটি হয়ে উঠেছে একান্ত তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এর কাহিনীতে আছেঃ আচার্য অদীনপুণ্যের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত বিদ্যাপীঠ এক সময় প্রাণহীন প্রথা ও যুক্তিহীন সংস্কারের অনুবৃত্তিতে এক অচলায়তনে পরিণত হয়। পুঁথি ও শাস্ত্রের অনুশাসনে শিক্ষার্থীদের প্রাণের বিকাশ সেখানে হয়ে ওঠে রুদ্ধ ও বিকৃত। এমন

[৯৭] প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

কি উঁচু প্রাচীর ঘেরা এ অচলায়তনে বিভিন্ন রকম পাপের ভীতিতে স্বাভাবিক আলো-বাতাসও প্রবেশ করতে পারে না। এ সমস্ত নিয়ম নীতির মধ্যে ছাত্র পঞ্চকই একমাত্র ব্যতিক্রম। অচলায়তনের অনুশাসনগুলোর কোন বাস্তব যুক্তি খুঁজে না পেয়ে সে ওসব শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক। এতে পঞ্চকের বড় ভাই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপঞ্চক খুবই উদ্বিগ্ন। কিন্তু আচার্য পঞ্চকের প্রতি স্নেহশীল। পঞ্চকের মধ্যেই যেন তিনি খুঁজে পান সত্যিকার প্রাণধর্মের স্পন্দন। পঞ্চক যে অচলায়তনের বাইরে গিয়ে নিচু জাতের শোণপাংশুদের সঙ্গে মেশে তাতেও তাঁর অসম্মতি নেই।

একদিন আশ্রমবালক সুভদ্র সহজাত কৌতূহলে অচলায়তনের উত্তর দিকের শাস্ত্রকথিত একজটা দেবীর জানালা খুলে ফেলে। তিনশ' পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে জানালা কেউ খোলে না। এ নিয়ে ভীষণ আলোড়ন শুরু হয় অচলায়তনে। মহাপঞ্চক শাস্ত্র ঘেঁটে বের করল এর প্রায়শ্চিত্তের বিধান। সুভদ্রকে ছয় মাস মহাতামস সাধনা করতে হবে, এতটুকু আলোকরশ্মি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। সবাই সুভদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করার উৎসাহ যোগায়। কিন্তু তাকে নিরস্ত করে আচার্য স্বয়ং ও পঞ্চক। এতে আশ্রমের পণ্ডিত, ছাত্র সবাই আচার্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এমন সময় সেখানকার রাজা মন্থরগুপ্ত অচলায়তনে আসেন এবং তাঁর নির্দেশে আচার্য ও পঞ্চককে বহিষ্কার করে পাঠানো হয় অস্পৃশ্য দর্ভক পল্লীতে। একদিন শোনা গেল, অচলায়তনের গুরু আসবেন। ওদিকে স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত এক শোণপাংশু যুবকের শিরচ্ছেদ করলে তারা তাদের গুরু দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। অচলায়তনবাসীর আরাধ্য কোন দেবতা বা শক্তি তাদের বাধা দিতে পারে না। আবার সে দাদাঠাকুর অচলায়তনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ শঙ্খবাদক এবং বাগানের মালী জানায় যে, তিনি অচলায়তনেরই গুরু। মহাপঞ্চক গুরুর যোদ্ধবেশ দেখে তাঁকে মানতে অস্বীকার করে। কিন্তু সশস্ত্র শোণপাংশুদের উপস্থিতিতে সে কিছু করতে না পেরে বসে ধ্যানস্থ হয়ে থাকে। এবার দাদাঠাকুর তাঁর দলবল নিয়ে আচার্যের খোঁজে দর্ভকপল্লীতে গেলে দেখা গেল তিনি তাঁদেরও গোঁসাই। অবশেষে সবাইকে নিয়ে দাদাঠাকুর আবার নতুন এক আয়তন গড়ে তোলায় ব্যাপৃত হন। সেখানে পঞ্চক, মহাপঞ্চক সবাই পায় যোগ্যতামত নেতৃত্বের ভার।

এ নাটক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি ভগবৎ সাধনার বাধা অপসারণের নাট্যরূপ। তাঁদের মতে, অচলায়তনের বাসিন্দারা হলো জ্ঞানবাদী, শোণপাংশুরা কর্মবাদী এবং দর্ভকরা ভক্তিবাদী। তারা প্রত্যেকে আপন গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল বলে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের বিচ্ছিন্নতায় সাধনা বিঘ্নিত হচ্ছিল। গুরু এসে সবাইকে স্থিত করে তৈরি করলেন সাধনার পথ। প্রমথনাথ বিশী[৯৮] ও আশুতোষ ভট্টাচার্য [৯৯]এ রকম মত দিয়েছেন।

[৯৮] "মহাপঞ্চকের অচলায়তনের সাধনা জ্ঞানমার্গে, শোণপাংশুর অচলায়তনের সাধনা কর্মমার্গে; এবং দর্ভকদলের অচলাতয়নের সাধনা ভক্তিমার্গে। এই তিন দল বিভিন্ন তিন মার্গে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, তিন মার্গের মধ্যে তাহারা

Dhaka University Institutional Repository

আবার কারও কারও মতে অচলায়তন ভারতবর্ষের প্রতীক। শোণপাংশুরা হলো বিভিন্ন সময় আগত বিদেশি জাতিসমূহ, আর দর্ভকরা এখানকার অনার্য নিম্নশ্রেণির মানুষ। ভারতবর্ষ সবাইকে তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ আত্মস্থ করে বৃহতের ও মহত্ত্বের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করে চলেছে।[১০০]

সার্বিক বিবেচনায় দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। লক্ষণীয়, ১৯০৮ সালে 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং †Lqv ও MxZvÄwj-র কিছু কবিতা ও গানে সবাইকে নিয়ে এক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার এবং সবার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, †Lqv-র 'প্রার্থনা' কবিতায় পাওয়া যায় :

আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক সারে।[১০১]

তেমনি MxZvÄwj-র ১০৬ সংখ্যক (ভারততীর্থ) গানে এ মনোভাব অধিকতর মূর্ত হয়ে উঠেছে:

এসে হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ

কোনরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করে নাই, তাহারা নিজ নিজ সাধনপন্থাকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পন্থা বলিয়া ভাবিয়াছে, সেইজন্য কেহ গুর“র প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারে নাই অথচ তিন দলই একই গুর“র অন্বেষণ করিতেছে।" প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭

৯৯ "শোণপাংশুরা কর্মচঞ্চল জাতি। একটা কিছু করিতে পারিলেই তাহারা খুশী। তাহাদের অফুরন্ড় প্রাণাবেগে কোন নীতিতেই তাঁহারা বাঁধা থাকিতে পারে না। শোণপাংশুদের মধ্যে পঞ্চক দেখিয়াছে মুক্তি। এই মুক্তিও অবশ্য যথার্থ মুক্তি নয়; কারণ, ইহাদের কর্মস্পৃহা কোন লক্ষ্যে তাহাদিগকে লইয়া যায় নাই। ... দর্ভকেরা অন্ড়্জ জাতি। কিন্তু ইহারা রসের সাধনা করিয়াছে। তাহারা ভক্তিপথের পথিক। এই সাধনাতেও অন্ধতা আছে। এই অন্ধতা যুক্তিহীন বিশ্বাসের কর্মহীন শান্ড়্র।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত,পৃ. ২০৭

১০০ "অচলায়তন আমাদের ভারতবর্ষ। অতি সুপ্রাচীনকালে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আদি-গুর“ সাধনক্ষেত্ররূপে তপোবনরূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই আদিগুর“ উপনিষদের ঋষিরা। তাঁহাদের সাধনা ছিল জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের পথে মুক্তির সাধনা। তারপর সাধনার উদ্দেশ্য কেন্দ্রচ্যুত হইল, এই সাধনা নানা বাধা ও জঞ্জাল সৃষ্টির ফলে শেষে অচলায়তনের মত সংকীর্ণ বদ্ধরূপের মধ্যে হইা আবদ্ধ হইল; ... তারপর যেন ভগবানের ইঙ্গিতে অদৃশ্য গুর“র পরিচালনায় বাহির হইতে উন্মুক্ত কর্মপন্থীর দল সেই প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া সেই অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িল। ... ইহারাই শক, হুন, যবন, পারদ, পাঠান, মোগল এবং শেষে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি। এই শোণপাংশুর দল বার বার ভারত অচলায়তনে ঢুকিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া বাইরের আলো হাওয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে। তারপর ভারত তাহাদের গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সমস্ড় শক্তি নিজেদের শক্তির সহিত মিশাইয়া নতুন করিয়া, বৃহৎ করিয়া আয়তন গড়িয়াছে। ... এই সমন্বয় সাধনের শক্তি ভারতবর্ষের অন্ড়র্নিহিত শক্তি–ইহাই তাহার সভ্যতার প্রাণবস্তু।"উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

১০১ খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খ“, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

এসো এসো খৃস্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন

ধরো হাত সবাকার,

এসো হে পতিত, করো অপনীত

সব অপমান ভার।...

... সবার-পরশে-পবিত্র-করা

তীর্থ নীরে

আজি ভারতের মহামানবের

সাগরতীরে।[১০২]

এছাড়া kwš Íwb‡KZb Dc‡'kgvjv-র একটি প্রবন্ধেও তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে নতুন সত্য সভ্যতার জন্ম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়:

> ভারতবর্ষের সাধনভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে – ভয় নেই, কোন অভাব নেই – এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পঙ্‌ক্তিতে বসে যাবে।[১০৩]

এ সব উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, সর্বমানবের ঐক্যে ভারতবর্ষ গড়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা কবি এতদিন পোষণ করে আসছিলেন তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে APjvqZb নাটকে। অবশ্য শেষোক্ত জাতি ইংরেজ যে মূলত সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন-অভীপ্সা নিয়েই এসেছিল তা কবি তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।[১০৪] তবে এ নাটকে সংস্কারাচ্ছন্ন জড় হিন্দু সমাজকে যে তীব্র আঘাত করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ভারতবর্ষে জন্মসূত্রে নির্ধারিত বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস ও বর্ণাশ্রম প্রথায় যে অস্পৃশ্যতার সংস্কার ছিল তার বিরুদ্ধে এ নাটক বেশ বড় আঘাত। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের অপবিত্র আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে। বংশ পরম্পরায় এ ধারা সৃষ্টি করেছে এক অমানবিক অবস্থা। এতে শূদ্ররা বিবেচিত হয় সর্বনিম্ন শ্রেণির ও অস্পৃশ্য হিসেবে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের মূল শ্রমজীবী শ্রেণি এরাই। এ দিক থেকে ভারতীয় শ্রমজীবীরা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত তো বটেই, সামাজিক দিক থেকেও নিগৃহীত,

[১০২] গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪
[১০৩] 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১, (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩৭৭
[১০৪] আশি বছর বয়সে এসে তাঁর এ মোহ যে ভেঙেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, 'সভ্যতার সঙ্কট', প্রবন্ধে। সভ্যতার সঙ্কট, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৬৩৫

Dhaka University Institutional Repository

অপাংক্তেয়। পাশাপাশি এ দেশের বিপুল সংখ্যক মুসলমান, খ্রিস্টান বা ইংরেজ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও তাদের চোখে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ 'অস্পৃশ্য'। সহজেই ধারণা করা চলে যে, এ নাটকের শোণপাংশুরা এই মুসলমান ও ইংরেজদের প্রতিনিধি এবং দর্ভকরা এ দেশের অবহেলিত শূদ্র শ্রমজীবী।[১০৫] লক্ষণীয় শোণপাংশুরা যে পশ্চিমের প্রতিনিধি, তা স্পষ্ট করার জন্য এ নাটকের পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে (¸ i") 'শোণপাংশু' স্থানে 'যূনক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[১০৬] মহাপঞ্চকের সঙ্গে দাদাঠাকুরের কয়েকটি সংলাপে আছে সে পরিচয়। যেমন–

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী–এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল।...[১০৭]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর e½wj fvlvi Awfavb-এ জানাচ্ছেন, 'যবন' শব্দের সংস্কৃত অর্থ চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বহিরিস্থিত ম্লেচ্ছ বোঝালেও আধুনিক বাংলায় তা মুসলমান ও খ্রীস্টান উভয়কে বোঝায়।[১০৮] ও দিকে দর্ভকরা এ দেশের নিম্নশ্রেণির মানুষ তা স্পষ্ট হয় অচলাতয়ন আক্রান্ত হওয়ার সংবাদে তাদের উদ্বিগ্নতা থেকে ('বাবা ঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি – দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে')।[১০৯] অতএব নিম্ন শ্রেণি ও অস্পৃশ্য জনতা দিয়ে সনাতন হিন্দু সমাজের প্রতীক অচলায়তন ভেঙে ফেলা চিরকালের অবহেলিত বিরাট এক মানবগোষ্ঠীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। এ চেষ্টা মানবিক চেতনায় ভাস্বর এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অগ্রসর চিন্তার পরিচায়ক। নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে মন্ত্রসর্বস্বতা ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে যে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে এ সবের অসারতা ও অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। যেমন:

---

[১০৫] "আলোচ্য নাটকে [অচলায়তন] অঙ্কিত ম্লেচ্ছ, শোণপাংশু ও অস্পৃশ্য দর্ভক যে কাদের ছদ্মনাম, তা বুঝে ওঠা কঠিন নয়। এদের যথাক্রমে মুসলমান ও নিম্নস্থানীয় হিন্দুদের রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।" স্বরোচিষ সরকার, 'অস্পৃশ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ', সীমার মাঝে অসীম (সম্পা. আবু হেনা মোস্তফা কামাল), ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪১

[১০৬] রবিজীবনীকার-এর মতে 'যূনক' শব্দটি 'যবন' শব্দ সংশিøষ্ট। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩ পৃ. ২২৭

[১০৭] গুরু, রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৯৪২

[১০৮] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

[১০৯] অচলায়তন, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

মহাপঞ্চক।   ... আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুন ঘুন ঘুনাপয় ঘুনাপয় স্বর বসত্বানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক।   ওঁ তট তট তোতয় তোতয় – আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক।   আবার দাদা। মন্ত্রটা শেষ করো বলছি।

পঞ্চক।   একটা কথা জিজ্ঞাসা করি– এ মন্ত্রটার ফল কী?

মহাপঞ্চক।   এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্যোদায়-সূর্যাস্তে ঊনসত্তর বার জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক।   রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয় – দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।[১১০]

এ ধরনের অযৌক্তিক মন্ত্রোচ্চারণ যে জড়বুদ্ধিকেই আহ্বান করে তারও উল্লেখ আছে নাটকে। সে সংলাপগুলো লক্ষ করা যাক:

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বম্ভর, আমরা যাই। ও একটু পড়ুক [গমনোদ্যত]

পঞ্চক।   ওহে বিশ্বম্ভর। তট তট তোতয় তোতয়–

বিশ্বম্ভর।   কেন। আবার ডাকো কেন?

পঞ্চক।   সঞ্জীব, জায়োত্তম, তট তট তোতয় তোতয়

সঞ্জীব।   কী হয়েছে? পড়ো-না!

পঞ্চক।   দোহাই তোমাদের একেবারে চলে যেয়ো না। ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে, জগৎটা বিধাতা পুরুষের প্রলাপ নয়।[১১১]

এক জায়গায় অস্পৃশ্যতার অযৌক্তিকতা নিয়ে বলা হয়েছে:

প্রথম শোণপাংশু।   কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক।   বলতে পারি নে – কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস – সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

---

[১১০] অচলায়তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০
[১১১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে তবে ছাড়ি।

... ...

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়–কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশু। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু! কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।...

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না?

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই–কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।[১১২]

লক্ষণীয় যে, পুরাতন অযৌক্তিক সংস্কার ও জড়তার অচলায়তনে এ আঘাত যে সে সময়ের সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করবে তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। এ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মত হলো:

> "অচলায়তন লেখায় যদি কোন চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।"[১১৩]

এ কারণে কোনো কোনো সমালোচক APjvqZb নাটকে রবীন্দ্রনাথকে সশস্ত্র সমাজ বিপ্লবের সমর্থক হিসেবেও দেখাতে চেয়েছেন।[১১৪] কথাটি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য সমাজের আমূল পরিবর্তন এবং সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তির জন্য সক্রিয়

---

[১১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০–৩১

[১১৩] অচলায়তন (গ্রন্থ পরিচয় অংশ) রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮

[১১৪] "কিন্তু প্রশ্ন এই, রবীন্দ্রনাথ নিপীড়িত অস্পৃশ্যদের দিয়া এই সনাতন অচলায়তন সমাজকে ভাঙিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন কেন? রবীন্দ্রনাথ কি সশস্ত্র সমাজ-বিপণ্ঢবকে সমর্থন করিলেন?" নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১–৩২

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামশীলতা।[১১৫] কিন্তু নাটকে অর্থনৈতিক শোষণ নিরসনের লক্ষ্যে সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। যে পরিবর্তন এখানে প্রার্থিত তা মুখ্যত ধর্মীয়, গৌণত সামাজিক। দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোণপাংশুদের অভ্যুত্থানে অচলায়তন ভেঙেছে বটে, কিন্তু রাজা মন্থরগুপ্তের পতন হয়েছে কি না, তা এখানে স্পষ্ট নয়। আবার নতুন শক্তি হিসেবে দাদাঠাকুরের অভ্যুদয় হলেও তিনি মূলত ধর্মীয় গুরু হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর লক্ষ্য সব জাতিকে নিয়ে নতুন ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা; নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা নয়। সে সমাজে আচার্য পুরোহিত কিংবা পঞ্চক-মহাপঞ্চকের মতো পরশ্রমজীবীর নেতৃত্ব তিরোহিত হয় নি। অথচ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাম্য এবং উৎপাদনের সুষম বণ্টন ছাড়া উক্ত পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক বলার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন এখানে হয়েছে, সেটিও মৌলিক কি না বলা কঠিন। অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার সংগ্রামে একজন গুরুর অবিসংবাদী নেতৃত্ব আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটায়। সে সঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্রসর্বস্ব ধ্যানমগ্ন মহাপঞ্চককে যে ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে ঘোষিত হয় ভারতীয় তান্ত্রিকতার গুণকীর্তন। যেমন:

মহাপঞ্চক।	... আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম–যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্রও আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।...
প্রথম শোণপাংশু।	ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।
দাদা ঠাকুর।	ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।
দ্বিতীয় শোণপাংশু।	ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না।
দাদা ঠাকুর।	শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শও করতে পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছায় না।[১১৬]

আবার শেষ দৃশ্যে দাদাঠাকুরের সংলাপে – 'মেলো তোমরা দুই দলে' – যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, তার গুরুত্বও বিবেচনার দাবি রাখে। এখানে দুই দল বলতে স্পষ্টত আশ্রমিক বা স্থবিরক এবং শোণপাংশুদের বোঝানো হয়েছে। আর নাটক রচনার সময় শোণপাংশু হিসেবে কেবল ইংরেজই

---

[১১৫] "'বিপণ্ডব' বা Revolution-এর আক্ষরিক অর্থ আমূল পরিবর্তন। যে পরিবর্তন প্রচলিত পুরনো কাঠামোকে ধ্বংস করে নতুন কাঠামোর জন্ম দেয়, তারই নাম বিপণ্ডব। মার্কসীয় মতে বিপণ্ডব দুই ধরনের – বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপণ্ডব ও প্রলেতারিয়েত বিপণ্ডব। এই বিপণ্ডব এক অতি আকাঙ্ক্ষিত ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ এর ফলেই সামাজিক অবস্থা নিম্ন থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। এর অর্থ হলো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী থেকে প্রগতিশীল শক্তিশালী শ্রেণীতে ক্ষমতার হস্ড়ান্ড়র" সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানের শব্দ পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৪৬–৪৮

[১১৬] অচলায়তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত ছিল এবং তারাই যে নাট্যকারের উদ্দিষ্ট তা ইতঃপূর্বে ‘ভারততীর্থ’ গান ও ‘ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা’ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত। সে ক্ষেত্রে এ নাটক প্রকারান্তরে ভারতের ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ত কাঠামোর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সমন্বয়সমর্থক বলে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সমসাময়িক কালে শুধু নয়,[১১৭] রবীন্দ্র-চিন্তায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলনের ধারণা সক্রিয় ছিল বহু বছর ধরে। বিশেষ করে যখন দেখা যায় ১৯২৬ সালে ইতালিতে স্বৈরাচারী মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও তিনি ব্যক্ত করেছেন অনুরূপ ধারণা।[১১৮]

উক্ত বিষয়সমূহ বিচারে, APjvqZb নাটকে ‘সশস্ত্র সমাজবিপ্লব’ প্রচার করা হয়েছে, বলা যায় না। বরং সংস্কারের জড়তার পরিবর্তে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – সকল শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্রহ্মমুখী করার চিন্তা। এ জন্যেই অচলায়তনের গুরু, শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর আর দর্ভকদের গোঁসাই এক দেহে লীন। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত বহু বিচিত্র প্রাণধারার মূল উৎস এক এবং অভিন্ন। অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতার মন্ত্রেই মানুষের জীবনসাধনা বা অধ্যাত্মসাধনার সাফল্য নিহিত। এ মন্ত্রের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এখানে অস্বীকার করছেন না; অস্বীকার করছেন মনন-বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণপ্রথা। APjvqZb-এর সমালোচক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন:

> অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। ... মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে নিক্ষিপ্ত করা হয় মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী   হইতে পারে।[১১৯]

বস্তুতপক্ষে যথার্থ অধ্যাত্মসাধনার বিঘ্ন মন্ত্রসর্বস্বতাকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত মন্ত্রসর্বস্বতার বাধা, আচার-ব্যবহার ও সংস্কারের বাধা মিলে যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছিল, তা চূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে জ্যোতির্ময় আলো। ¸iæ নাটকের সমাপ্তিতে MxZvwj-র ১০১

---

[১১৭] এ সময় (১৬ ডিসেম্বর, ১৯১১) আমেরিকার আইনজীবী Myron H Phelps- এর কাছে লেখা চিঠিতে ‘তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনের পন্থা-পদ্ধতির কথা লিখেছেন, যা এই সময়ে তাঁর রচনার মূল সুর হয়ে উঠেছিল’। প্রশান্ড় কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৪৫

[১১৮] রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনি কথোপকথনের কিছু অংশ কবির ব্যক্তিগত সচিব প্রশান্ড়চন্দ্র মহলানবিশ লিখে রেখেছিলেন। তা থেকে Alex Aronson-এর উদ্ধৃতি : “R .... The present moment offers a great opportunity for a true unity of East and West. It will have great significance in history, and I hope we shall succeed in our efforts.” Alex Aronson, RABINDRANATH THROUGH WESTERN EYES. CALCULTTA, 1978, P. 63

[১১৯] অচলায়তন (গ্রন্থ পরিচয়), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬–৭

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যক গান প্রয়োগে নাট্যকারের সে বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে।[১২০] উল্লেখ্য, APjvqZb-এর শেষে কিংবা অন্য স্থানেও গানটি ছিল না। গানের কিছু অংশ লক্ষ করা যেতে পারেঃ

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়

তোমারি হউক জয়।

তিমির -বিদার উদার অভ্যুদয়

তোমারি হউক জয়।[১২১]

উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট যে, APjvqZb নাটকে এক ধরনের সংস্কারের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপর এক সংস্কার। তাই এ নাটক লেখকের সচেতন উদ্দেশ্যের দিক থেকে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন পুরোপুরি ধারণ করতে পারে নি। তবে লেখকের রচনায় তাঁর মানসদৃষ্টির পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত চেতনার সৃজনশীল প্রকাশও ঘটতে পারে। এ নাটকে তা-ই ঘটেছে বলে ধারণা করা যায়। এখানে অস্পৃশ্যতার অমানবিক সংস্কার বিরোধিতার পাশাপাশি নিম্নশ্রেণির মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্ত হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সমর্থন। এটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের লালিত রাজনৈতিক দর্শনের বিপরীত মতাদর্শ। যিনি পেশীশক্তিতে কিংবা অস্ত্রের সাহায্যে দাবি আদায় কিংবা শত্রু নিধনের বিরোধী, তিনিও বাস্তবতার নিরিখে এ নাটকে অস্ত্র ব্যবহার, এমন কি মৃত্যুকেও সংগ্রামের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পূর্বের cvqïðË নাটকে অত্যাচারী রাজার কাছে প্রতিবাদ জানাতে যাওয়ার সময় কৃষকরা হাতিয়ার নিতে চাইলে তাতে বাধা দিয়েছিল তাদেরই নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী। অথচ এ নাটকে ব্রহ্মসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়কেও স্বাগত জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দাদাঠাকুরের সংলাপ স্মরণ করা যাক, "কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।"[১২২] ধারণা করা চলে, অন্তত শোণপাংশুদের দ্বারা অচলায়তন আক্রমণের দৃশ্য উপস্থাপনার প্রেরণা এসেছে এ অঞ্চলের জমিদার ও ইংরেজ বিরোধী কৃষক-বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে।[১২৩] রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে অহিংসবাদী হওয়ায় এ ধরনের বিদ্রোহ সমর্থন করতে না চাইলেও তাঁর অনন্য শিল্পীসত্তায় উক্ত ঐতিহ্যের অস্তিত্ব ছিল যুগপৎ ক্রিয়াশীল। এই ক্রিয়াশীলতাই APjvqZb নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে সমাজের বাস্তব উপাদানসমৃদ্ধ কাহিনী-কাঠামোর সাযুজ্য ঘটিয়েছে, যার অভিঘাতে তৎকালীন সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল কাঙ্ক্ষিত চাঞ্চল্য। বস্তুবাদী সমালোচনার দৃষ্টিতে, নাট্য উদ্দেশ্যের শাস্ত্রীয় সীমাবদ্ধতা

---

[১২০] গুরু, পূর্বোক্ত, পৃ.

[১২১] গীতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

[১২২] অচলায়তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

[১২৩] এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, এ আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শোণপাংশুরা পুরোপুরি সচেতন ছিল না। এ দিক থেকে কৃষক বিদ্রোহের বিষয়ের সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক। সে কারণেই তাদের সংগ্রামকে সমাজ বিপণ্ডব বলা যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

সত্ত্বেও উপরি-উক্ত সাফল্য বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। সে সঙ্গে এও প্রত্যক্ষ করা যায় যে, অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নাটকে কিছুটা হলেও বিচরণ করেছেন সমাজ- বাস্তববাদী পথে।[১২৪] এ দিক থেকে রবীন্দ্র নাট্যধারায় APjvqZb একটি মাইল-ফলক।

WvKNi: APjvqZb রচনার ছয় মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহুল আলোচিত নাটক WvKNi (১৯১২) রচিত হয় (রচনা : সেপ্টেম্বর, ১৯১১)। এটি রচনার সময় তিনি অবস্থান করছিলেন শান্তিনিকেতনে। এ সময় কবি আর্থিকভাবে কিছুটা অসচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন বলে জন্মোৎসব পালনের ঋণ তখনো শোধ হয় নি। পাশাপাশি তাঁর শরীরও ছিল অর্শ রোগে কাতর। ভাবছিলেন হাতে কিছু টাকা হলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে 'আয়ুর প্রদীপকে আর একবার' উস্কে দিয়ে আসবেন।[১২৫] শারীরিক ও মানসিক অবস্থার এ পর্যায়ে লিখলেন ছোট নাটক WvKNi।[১২৬] শান্তিনিকেতনবাসীদের উদ্দেশে দেওয়া এক বক্তৃতায় এ নাটক সম্বন্ধে কবি বলেন:

> ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু উৎসবের জন্য লিখিনি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল, চল, বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। ... যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যে অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায়

---

[১২৪] "এই নাটকটির রচনার মূলে কবির বাস্ড়ব সমাজবোধ ও মানবীয়তাবোধ বিশেষ ভাবে কাজ করেছে এবং কবি যেহেতু অরূপাদর্শে সমাজের গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই হেতু এখন থেকে এই অনুমান করা যায় যে, কবি শুধু অরূপ সাধনাতেই সমাহিত থাকবেন না, বাস্ড়ব জীবনের মধ্যে অরূপকে এবং অরূপের মধ্যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করবেন।" ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৭

[১২৫] 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্র থেকে উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

[১২৬] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

> লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই, এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।[১২৭]

WvKNi রচনার এই ছিল পটভূমি। তবে লেখক এখানে 'গল্প নেই' বললেও ভেতরে ফল্গুধারার মতো একটি আখ্যানের অস্তিত্ব রয়েছে। সেটি এরকম: নিঃসন্তান মাধবদত্ত ঘোর বিষয়ী লোক। তার সম্পত্তি আছে প্রচুর কিন্তু ভোগ করার উত্তরাধিকারী নেই। তাই স্ত্রীর এক অনাথ ভাই পো অমলকে সে গ্রহণ করে পোষ্য হিসেবে। ছেলেটিকে সে বেশ আদর যত্ন করে। কিন্তু অমল খুব অসুস্থ। তাই মাধবদত্তের ভাবনার শেষ নেই। কবিরাজের মতে শরতের রোদ হাওয়া ছেলেটির স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অমলকে প্রায় আলো-বাতাসহীন ঘরে থাকতে হয়। তার কিশোর প্রাণ ছটফট করে বাইরে যাওয়ার জন্য। একটি আধখোলা জানালার পাশে বসে সে বুভুক্ষুর মতো তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। দূরের পাহাড়, নীল আকাশ আর পাহাড়ি ঝর্ণা যেন তাকে ডাকে হাতছানি দিয়ে। রাস্তার পথিক, ফেরি-অলা, প্রহরী, হরকরা, বালকের দল সবাইকে ডেকে ডেকে সে গল্প করে। পায়ে মল বাজিয়ে ফুল তুলতে যায় শশী মালিনীর মেয়ে সুধা। অমল সুধার কাছে ফুল চায়।

একদিন তাদের বাড়ির সামনে বসে রাজার ডাকঘর। প্রহরী তাকে জানায়, রাজা তাকেও চিঠি লিখবেন। এ নিয়ে গাঁয়ের মোড়ল বিদ্রূপ করে এক টুকরো সাদা কাগজ অমলকে দিয়ে বলে রাজার চিঠি এসেছে তার কাছে। অমল সে কথা বিশ্বাস করে এবং তা ঠাকুরদাকে পড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। ঠাকুরদা অমলকে কষ্ট দিতে চান না। তাই তিনি বানিয়ে বানিয়ে বলেন – এ সত্যিই রাজার চিঠি, রাজা লিখেছেন, রাজকবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অমলকে দেখতে আসবেন। দেখা গেল সে রাতে সত্যিই রাজদূত ও রাজকবিরাজ দরজা ভেঙে এলেন অমলের কাছে। রাজকবিরাজ খুলে দিলেন ঘরের সব দরজা-জানালা। দূর আকাশের তারার আলো এসে পড়ল সে ঘরে। তখন অমলের চোখে নামল ঘুমের ঢল। এমন সময় ফুল নিয়ে এসে সুধা জানতে চাইল অমল কখন জাগবে। রাজকবিরাজ বললেন, রাজা এসে ডাকলেই অমল জেগে উঠবে। সুধা চলে যাওয়ার সময় বলল, অমল জেগে উঠলে তাকে যেন কানে কানে বলা হয়, সুধা তাকে ভোলে নি।

কবির মন্তব্য ও নাটকের কাহিনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, WvKNi রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক নাটক। রবিজীবনীকারের মতে, অমলের মৃত্যুর সঙ্গে কবির কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাযুজ্য আছে।[১২৮] স্মর্তব্য ১৯০৭ সালের ২৪ নভেম্বর গভীর রাতে শমীন্দ্রের মৃত্যুর সময় তীব্র

---

[১২৭] শান্‌ড়্‌দেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ২০১-২

[১২৮] "আমাদের অনুমান, ডাকঘর [১৩১৮] নাটকের অমল শমীন্দ্রনাথেরই আদলে গড়া।" প্রশান্‌ড়্‌কুমার পাল, রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৭ (প্রথম আনন্দ সংস্করণ), পৃ. ৩৮৭, অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে Edward Thompson -কে জানিয়েছিলেন যে, অমল চরিত্রে তাঁর শৈশবের ছায়া আছে। টমসনের ভাষায় "Amal, he said, was his own youth". Edward Thompson, ibid, p. 212

Dhaka University Institutional Repository

বিষাদগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ছিলেন ধ্যানস্থ হয়ে। এ নাটকের সারা অবয়বেও আবেষ্টন করে আছে বিদায়-সংক্রান্ত এক গভীর বিষাদের ভাব। নাটকে এ বিষাদাত্মক ভাব দুই প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এটি এসেছে সুদূরের প্রতি অমলের গভীর আকর্ষণ হিসেবে। কোনো কোনো সমালোচক এটিকেই WvKN‡ii ‘মূল ভাব’ বলে চিহ্নিত করেছেন।[১২৯] এবং পরে মৃত্যু-পরবর্তী জগতের আভাসের সঙ্গে বাস্তব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে উক্ত ভাব।[১৩০] কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ সব লক্ষ করা যেতে পারে; যেমন–

এক. সুদূরের প্রতি আকর্ষণ:

ক) অমল। ... আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই – যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।[১৩১]

খ) অমল। আমাদের জানালার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় – আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।[১৩২]

দুই. মৃত্যু পরবর্তী জগতের আভাস ও মৃত্যু:

ক) অমল। ... তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে যেখানে কোন জিনিসের কোন ভার নেই – যেখানে শুধু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, ... আচ্ছা ফকির সে দেশে কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়।

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।[১৩৩]

খ) ঘুমের প্রতীকে অমলের মৃত্যু দৃশ্যে:

রাজকবিরাজ। ... এইবার সকলে স্থির হও। এলো, এলো, ওর ঘুম এলো। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব – ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও – এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত। (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাত জোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো

---

১২৯ “বাস্ড়বিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূল ভাব।” অজিত কুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত পৃ. ১২৪

১৩০ ”মৃত্যুর দ্বারাই নির্মল, নিস্পাপ আত্মা তাহার চিরন্ড়ন, মুক্ত আনন্দময় সত্তা ফিরিয়া পায় এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করে। মৃত্যু তো শেষ নয়, ধ্বংস নয়, অবলুপ্তি নয়–সে তো নব জীবনের সিংহদ্বার, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের অবতরণিকা, সে তো মানবের পরম বন্ধু।” উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

১৩১ ডাকঘর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খ , পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯

১৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪

১৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণ। এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন। তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা। চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।[১৩৪]

উদ্ধৃতির দৃশ্যে (দুই.খ) অন্ধকার ঘরে কেবল তারার আলোতে অমলের নিষ্পাপ আত্মাকে যেন অসীম অনন্ত সৌন্দর্যলোকে পাঠাবার নিপুণ আয়োজন রচিত হয়েছে। এমন কি অমলের আত্মার সেই যাত্রাকে ঠাকুরদা সম্মানও জানিয়েছেন হাতজোড় করে।[১৩৫] কারণ, এই মৃত্যু কেবল ইহজীবনের অন্তিমতা ঘোষণা করছে না বরং এ দেহখাঁচা ফেলে, জড়ের বন্ধন ঘুচিয়ে অসীম অনন্ত ভগবান বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ রচনা করে দিচ্ছে।[১৩৬] জার্মানি ভ্রমণের সময় (১৯২১) সেখানে WvKNi প্রযোজনা দেখে কবি এন্ডরুজকে লিখেছিলেন:

> অমল হল সেই মানুষ যার আত্মা মুক্ত পথের আহ্বান শুনেছে। মানী লোকের কড়া মতামতের খাড়া দেয়াল আর অভিজ্ঞ লোকের বিধিবদ্ধ অভ্যাসের বেড়া এ সবের হাত থেকে সে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু বিষয়ী লোক মাধব দত্ত তার চঞ্চলতাকে মারাত্মক রোগের লক্ষণ বলে ধরে নিলে। ... এ দিকে জানালার সামনে ডাকঘর বসেছে। অমল রাজার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকে। সে চিঠি রাজার কাছ থেকে তার মুক্তির বাণী নিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত রাজবৈদ্য এসে দ্বার খুলে ফেললেন। প্রচলিত ধর্মবিধি ও বিষয়বিত্তের জগতে যা মৃত্যু বলে পরিচিত, তা-ই অমলকে আত্মার মুক্তলোকে স্বচ্ছন্দ জন্মের অধিকার এনে দিলে।[১৩৭]

সমালোচক P. Guhathakurta[138] এ মত সমর্থন করলেও প্রমথনাথ বিশী[১৩৯] ও ক্ষুদিরাম দাস[১৪০] অমলের দৈহিক মৃত্যুকে স্বীকার করতে চান নি। অথচ এখানে ঘুমের প্রতীকে যে মৃত্যুই বোঝানো হয়েছে তা নাটকের দৃশ্য সংস্থাপন, চরিত্রের সংলাপ ও আচরণে স্পষ্ট। এন্ডরুজের প্রতি

---

[১৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫

[১৩৫] ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোতে WvKNi এর অভিনয়ে শেষদৃশ্যের একটি ফটোগ্রাফে দেখা যায় ঠাকুরদারূপী রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ অমলের পাশে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪

[১৩৬] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭

[১৩৭] রবীন্দ্রনাথ এন্ডর ুজ পত্রাবলী (Letters to a Friend), অনু. মলিনা রায়, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ, ১২২–২৩

[১৩৮] "All is quiet now. The oil lamp is blown out for the star light to stream in. Hush Amal sleeps. His life's day is done." P. Guhathakurta. The Bengali Drama, Its Origin and Development, London, 1930, p. 202

[১৩৯] তাঁর মতে, "ইহা যে মৃত্যু নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। বিশেষ অমল তো মরে নাই, স্পষ্টই উলিণ্ঢখিত আছে রাজার ডাকের অপেক্ষায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র।" প্রমথনাথ বিশী ,পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

[১৪০] তাঁর ধারণা, "শেষ দৃশ্যে অমলের নির্মীলতাবস্থা যে মৃত্যু এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আর সুধার উক্তি অনুসারে অমল পৃথিবী থেকে বিযুক্তও নয়। অরূপানুভব জীবনেই লভ্য। ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, পূর্বোক্ত পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

কবির পূর্বোক্ত চিঠিতেও মৃত্যুর কথাই স্বীকৃত হয়েছে। আর প্রমথনাথ বিশী নিজেও যখন বলছেন যে, মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত অবসান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি,[১৪১] তখন এই পার্থিব মৃত্যুকে অস্বীকার করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

বস্তুতপক্ষে সুদূরের প্রতি, মৃত্যুর প্রতি কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। এমন কি স্থূল দেহের বন্ধন থেকে মানবাত্মাকে গ্রহণ করার জন্য পরমাত্মার আগমনকে কবি এর আগে ও পরে কয়েকটি গানে দুয়ার ভেঙে গৃহে প্রবেশ করার অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন। DrmM (১৯১০) কাব্যের "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' কবিতায় (পরে গান) তা ছিল এ রকম:

আমি চঞ্চল হে

আমি সূদূরের পিয়াসী

দিন চলে যায়, আমি আনমনে

তারি আশায় চেয়ে থাকি বাতায়নে

ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।[১৪২]

স্মর্তব্য, এ গান WvKNi-এর প্রথম অভিনয় (১০ অক্টোবর, ১৯১৭) উপলক্ষে সুরারোপিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণী তা পরিবেশন করেন।[১৪৩] তেমনি MxZgvj¨(১৯১৪)-র একটি গানে বলা হয়েছে:

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি

ভাঙল ঝড়ে

জানি নাই তো তুমি এলে

আমার ঘরে।

সব যে হয়ে গেল কালো

নিবে গেল দীপের আলো,

আকাশ পানে হাত বাড়ালেম

---

[১৪১] "মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ড় অবসান হিসাবে কোনো তত্ত্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এ রকম মতবাদ তাঁহার তত্ত্বের বিরোধী"। প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

[১৪২] উৎসর্গ (৮ সংখ্যক কবিতা), রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

[১৪৩] সীতা দেবী-র 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৭ম খ', কলকাতা, ২০০২ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

কাহার তরে।[১৪৪]

MxZvÄwj -র একটি গানে দুয়ার খোলা, মৃত্যুর পরেও বেঁচে ওঠা এবং পরমাত্মার সঙ্গে মিলনে এ জীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হওয়ার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে একসঙ্গে। যেমন:

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।
মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।[১৪৫]

WvKNi নাটকে উক্ত ভাবগুলো ছাড়া কবির আরও একটি বিশেষ উপলব্ধির বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে; এবং তা হলো – বিশ্বচরাচরের সমস্ত কর্মযজ্ঞে এক আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি। MxZvÄwj-র উক্ত গানের মতো রবীন্দ্র-মানসের অন্যতম প্রবণতা হলো খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, সসীমের মধ্যে অসীমের লীলা প্রকাশের ভাব অনুধাবন। অমলের কয়েকটি সংলাপ ও ভাবনায় এর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই ডাক হরকরার পরিশ্রম, প্রহরীর ঘণ্টা বাজানো, দূরের পথিক, সুধা ও অন্যান্য বালকের সঙ্গ এত ভালো লাগে অমলের। দই-অলাকে সে বলে:

> না না আমি কখনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাস্তার ধারে, তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল দই, দই, দই–ভাল দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।[১৪৬]

---

[১৪৪] গীতিমাল্য (৬৭ সংখ্যক), রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪
[১৪৫] গীতাঞ্জলি (১৩০ সংখ্যক), রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২–০৩

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রহরীকে বলে:

> বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা – আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে। দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায় – পিসেমশায় কোথাও কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনে ঐ কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে – তোমার ঐ ঘন্টা বাজে – ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।...[১৪৭]

তেমনি ডাক হরকরার রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ধনী-গরিব সবার ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগে অমলের।

বস্তুত জীবন ও জগতের সমস্ত কাজের মধ্যে, সত্তার মধ্যে অমলের অফুরান আনন্দের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই ঔপনিষদিক ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিশেষ প্রকাশ।[১৪৮] ছোট বেলায় উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে তাঁর মনে সচেতন ভাবে এই উপলব্ধির সূত্রপাত ঘটে[১৪৯]; এবং পরে cfvZm½xZ-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার সময় বাস্তব জগতের সঙ্গে তার অন্বয় সাধিত হয়।[১৫০] দেখা যাচ্ছে, 'কোথাও যাওয়ার ডাক', 'মৃত্যুর কথা' এবং পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মৃত্যুপরবর্তী অসীম আনন্দময় কোন জগতে চলে যাওয়া – এ সব কিছুকেই রবীন্দ্রনাথ WvKNi নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করেছেন। আর এই বিষয় সমূহ তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তার অনুবর্তী। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিষয়টিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এ ভাবে:

---

১৪৬ ডাকঘর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

১৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮

১৪৮ "রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ সত্য স্বতঃপ্রকাশ, কোনো প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। একেবারে প্রথম যুগের কাব্য-কবিতা-সঙ্গীত ও গদ্যরচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লেখা পর্যন্ড় সব লেখার মধ্যে এই সত্যের পরিচয় আছে– কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ রূপান্ড়রিত, কোথাও একেবারে স্পষ্ট।" শশীভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস, কলকাতা, ১৯৯২ (প্রথম সুগ্রীম সংস্করণ) পৃ. ১

১৪৯ "এই মন্ত্র চিন্ড় করতে করতে মতে হত, বিশ্বভুবনের অস্ড়িত্ব আমার অস্ড়িত্ব একাত্মক। 'ভূর্বুবঃ স্বঃ' এ ভূলোক, অন্ড়রীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখ“। এই বিশ্বব্রহ্মা“ের আদি অন্ড়ে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্ড়রে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।" মানবসত্য ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খ“, কলকাতা ১৩৯২, পৃ. ৪২২

১৫০ "একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পলণ্ঢবান্ড়রাল, হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মূহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। ... সেই দিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। ... আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্ড় দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি শরীরের গঠন তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্বার্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গ লীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। ..." জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খ“, কলিকাতা ১৩৯২, পৃ. ৩৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

> বিশ্বের বাধাহীন, বন্ধনহীন, সীমাহীন পরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিবার পরম ইচ্ছা মানবাত্মার সহজাত। ইহাতে তাহার অসীমত্ববোধ পূর্ণ হয়, ইহাতেই তাহার সার্থকতা। সমস্ত সৃষ্টি পরমাত্মার আনন্দরূপ, নিখিল বিশ্ব তাহারি বিচিত্র সৌন্দর্যের মহামহোৎসবক্ষেত্র। এই আনন্দরূপ পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যোগসূত্র হওয়াই চরম আধ্যাত্মিক সফলতা। নিষ্পাপ অমলিন মানবাত্মা ইহাই তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে।[১৫১]

রচনার ব্যাখ্যা হিসেবে শুধু নয়, কবি ব্যক্তিগতভাবেও অনুরূপ বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন বলে কয়েকটি তথ্যে ধারণা জন্মে। যেমন কন্যা মীরা দেবীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে (১৯৩২ সালে) কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা কবি স্মরণ করেছেন এভাবে– "যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্ আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে।..."[১৫২] মৃত্যু তাঁর কাছে ছিল বিশ্বসত্তার কাছে, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা; সে মিলনেই চরম সুখ, পরম মুক্তি।[১৫৩] নিজেকেও অনন্তের পথে যাত্রী হিসেবে বিবেচনা করে তিনি লিখেছেন বেশ কটি গান। যেমনঃ

যাত্রী আমি ওরে
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।

দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নিচে ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে ॥

... ...

দেহ দুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালো মন্দ কাটিয়ে হব পার– চলতে রব লোকে লোকান্তরে ॥[১৫৪]

এ রকম একটি গান–'সমুখে শান্তি পারাবার' – WvKNi নাটকের জন্যও লেখা হয়েছিল, যা পরে সংযুক্ত হয় নি। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন, "কবির একান্ত অভিপ্রায় অনুযায়ী এটি তাঁর

---

১৫১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

১৫২ উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

১৫৩ "উপনিষদে যে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে সে আত্মা কোনো অসঙ্গ কেবল আত্মা নয়, এ আত্মা হইল পরমাত্মা বা বিশ্বব্যাপী আত্মার সহিত যুক্ত এবং অভিন্ন আত্মা। মোক্ষ বা মুক্তি এখানে আত্মাকে বহির্বিশ্ব হইতে কোনো রকমে নির্লিপ্ত করিয়া ফেলা নয়– মোক্ষ হইল জীবাত্মাকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার সহিত সর্বাংশে যুক্ত করিয়া সেই পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং', বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু, তাহার সকলের সঙ্গেই এক হইয়া যাওয়া।" শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৫৪ গীতবিতান

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পর – ২২ শে শ্রাবণ সন্ধ্যায় এবং ৩২ শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে গীত হয়।"[১৫৫] উল্লেখ্য, এ নাটকে কোন গান সন্নিবিষ্ট না হলেও জোড়াসাঁকোর বিচিত্রায় প্রথম অভিনয়ে (১৯১৭ সালে) বাউলরূপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার মঞ্চে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' এবং পরে নেপথ্য থেকে গেয়ে উঠেছিলেন 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়ার নেয়ে' গান দুটি।[১৫৬] লক্ষণীয় যে, 'সমুখে শান্তি পারাবার' এবং 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' দুটি গানই WvKNi নাটকের মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথম গানের বাণী উদ্ধার করা যাক:

> সমুখে শান্তি পারাবার–
>
> ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
>
> তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড় পাতি–
>
> অসীমের পথে জ্বালিয়ে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ॥
>
> মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
>
> হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
>
> হয় যেন মর্ত্যের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়–
>
> পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা অজানার ॥[১৫৭]

নিজ জীবনের চিরনিদ্রার সময় এবং শ্রাদ্ধবাসরে উক্ত গান গীত হওয়ার অভিপ্রায় জানানোর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে উপনিষদের 'ভাবনা' যে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল তার প্রমাণ রেখে গেছেন।[১৫৮]

বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ 'আধ্যাত্মিক' দর্শন অধিবিদ্যাপ্রসূত, যা বাস্তব পৃথিবী ও লৌকিক জীবনকে এড়িয়ে যেতে চায়। আর লৌকিক জীবনই যদি অস্বীকৃত হয় তাহলে এই পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা, অন্যায়-পীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয় হয়ে পড়ে গৌণ। আবার জগতের সবকিছুকে ভগবানের লীলার প্রকাশ বলে ধরে নিলে বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিকতাকে অস্বীকার করা হয় এবং

---

[১৫৫] শেষ লেখা, গ্রন্থ পরিচয় (বিজ্ঞপ্তি), রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬শ খ , পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৮

[১৫৬] সীতাদেবী-র পূণ্যস্মৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত; র ন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, (প্রথম আনন্দ সংস্করণ) ১৯৯৫, পৃ. ১৪১

[১৫৭] শেষ লেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬শ খ , পূর্বোক্ত, পৃ.

[১৫৮] এ প্রসঙ্গে শশীভূষণ দাশগুপ্তের একটি মন্ড়ব্য এরূপ: "আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে ঔষধে 'ভাবনা' দিবার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। কাজটি হইল কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো রসের মিশাল দেওয়া। রস যাহাতে বস্তুটির অনু-পরমাণুর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে, এজন্য দিনে বস্তুটির সহিত রস মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়, রাত্রিতে আবার শিশিরে রাখিতে হয়। এইরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া রৌদ্রে শুকানো এবং শিশিরে ভিজানোর মধ্য দিয়া রসের বিশোষণ ঘটে, বস্তুটি তখন রসে ভাবিত হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবন উপনিষদের রসে এইভাবেই 'ভাবনা' লাভ করিয়াছিল।" শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

লালিত হয় বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজার দর্শন। এই সূত্রে উক্ত দর্শন শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে এবং পরিণত হয় শোষকশ্রেণির অস্ত্রে। এ সব বিবেচনায় কোনো কোনো সমালোচক WWKNi-কে 'অবক্ষয়ী' শোপেনহাওয়ারি নির্বাণচিন্তার নাটক, যে চিন্তার ভালো নাম আধ্যাত্মিক মুক্তি – Deliverance through death – বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন।[১৫৯]

কবির সচেতন আকাঙ্ক্ষা ও নাট্যকাহিনীর প্রাথমিক বিবেচনায় একজন সমালোচককে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করতে পারে। কিন্তু মাও-সে তুঙ-এর একটি উদ্ধৃতিসূত্রে দেখেছি – রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক যা-ই বলুন না কেন তার চেয়ে বেশি বিবেচ্য হবে ঐ রচনাটিতে কী প্রকাশ পাচ্ছে সেটি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুক্তিবাদী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যের চেয়ে নির্দিষ্ট রচনাটির গুরুত্ব বেশি। তাই অধ্যাত্মবাদের প্রাক-ধারণাসমূহ এড়িয়ে নাট্যকাহিনীর দিকে তাকালে দেখা যায়, এই নাটকের মৌল আকর্ষণ – একটি কৌতূহলী মিশুক ও উজ্জ্বল কোমলপ্রাণ বালকের করুণ মৃত্যু। সে এই বিপুল পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দময় অনুষঙ্গ প্রাণভরে উপভোগ করতে চেয়ে নিরাময়হীন রোগে আক্রান্ত হয়ে 'নিষ্ঠুর' বিনষ্টির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। হৃদয়-মথিত এই মৃত্যুকে নাট্যকার স্বয়ং মুক্তির বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অভিযাত্রা হিসেবে দেখাতে চাইলেও সমস্ত কিছু ছাপিয়ে লৌকিক মৃত্যুই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে এবং দর্শক পাঠককে আক্রান্ত করে তীব্র মানবিক বিষাদে। সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব এ জন্যেই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে 'নিষ্ঠুর' বলে মন্তব্য করেছেন।[১৬০] বিশেষত শেষ দৃশ্যে ক্ষুদ্র বালিকা সুধার অন্তিম আশ্বাসে – 'সুধা তোমাকে ভোলে নি' – সেই বেদনা হয় আরো প্রস্তরীভূত। সুধা যেন এ পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য ফুলের ডালিতে সাজিয়ে এনে অমলের প্রাণে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অমল চলে গেছে এ সবের বহু উর্ধ্বে।[১৬১] এই অতৃপ্তি, ব্যর্থতা ও বেদনা সর্বতোভাবে লৌকিক এবং

---

১৫৯ প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: তথ্য ও তত্ত্ব,' অনুষ্টুপ, চর্তুবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫৬

১৬০ "... যাঁরা মারা যান প্রস্ফুটিত না হয়েই, আপন অত্যল্প জীবনের পরিধির মধ্যে কোনোপ্রকার পূর্ণতা অর্জন করবার সুযোগ না পেয়েই (যেমন তর ণ কবি সুকান্ড় কিংবা বালক-শিশু অমল) এঁদের ট্র্যাজিক মৃত্যুর মধ্যে কী পরিপূর্ণতা আবিষ্কার করতে পারি আমরা? শেষ পরিপূর্ণতা বলা তো প্রায় নিষ্ঠুর ঠেকে।" আবু সায়ীদ আইয়ুব, পান্থ জনের সখা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

১৬১ ক) জোড়াসাঁকোর অভিনয়ে এ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় দর্শকও এমনি মানবিক কর ণায় অশ্র সিক্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে একাধিক স্মৃতিকাহিনীতে জানা যায়। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রস্মৃতিতে বলেছেন, "... এখনো যেন দেখছি, সমস্ড় অভিনয় কক্ষ স্ড়ব্ধ। এই রকম থাকে কতক্ষণ, তারপর দূর থেকে মল ঝমঝম করে হাতে একটি ছোট ফুলের সাজি নিয়ে সুধা আসে। মিষ্টি কোমল গলায় ডাক দেয়: অমল! আমাদের দু'চোখে জল এসে যায়।" উদ্ধৃত; র ন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

খ) বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মদন মোহন মালব্য ১৯১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের একটি অভিনয়ে উক্ত দৃশ্যে হয়ে উঠেছিলেন অশ্রসজল। অমল হোম-এর স্মৃতিতে পাওয়া যায়, "... মনে পড়ে মালবীয়াজী শেষের দিকে ভাববিগলিত হইয়াছিলেন; তাহার চক্ষু সজল হইয়াছিল। ..." উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক।[১৬২] সমালোচক পবিত্র সরকারও প্রায় একই মত ব্যক্ত করে বলেছেন, "এখানে মুক্তি ও মৃত্যুর টানাপোড়েনে যে দ্ব্যর্থকতা তৈরি হয়, তাতে মুক্তির চেয়ে মৃত্যুর উপস্থিতিই হয়তো আমাদের কাছে বেশি।[১৬৩]

দেখা যাচ্ছে, অতীন্দ্রিয় সত্তার আহ্বানে অমলের আত্মার সাড়া দেওয়ার ভাবটুকু কবি যে কাহিনী কাঠামোতে স্থাপন করেছেন, তার বাস্তব উপাদানই এখানে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অমলের মৃত্যু শুধু নয়, চলমান জীবনের যে সব ঘটনায় অমল আন্দোলিত হয়েছে, সে সবের দৃশ্যগুণও ছাড়িয়ে গেছে তাদের স্রষ্টার (নাট্যকারের) ইচ্ছাকে। ফলে, দই-অলার সুর করা ডাক, নিস্তব্ধ দুপুরে প্রহরীর ঘণ্টা, লাঠির মাথায় ছাতু বাঁধা পথিক, পাঁচমুড়া পাহাড়ের ধারে শামলী নদীতীরের গ্রাম, ঝর্ণার পানিতে পা ডুবিয়ে পাহাড়ের ওপারে চলে যাওয়া, দুপুরে পিসীমার রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া – ইত্যাদি দৃশ্যে যে সুগভীর জীবনপ্রীতি লক্ষ করা যায় তাকে কেবল সাংকেতিকতার ছকে ফেলা দুষ্কর। আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়ঃ

> ডাকঘর-এর সার্থকতা তাহার সঙ্কেত নির্দেশের গুরুত্ব কিংবা, সার্থকতার উপরও নির্ভর করে নাই, ইহার মধ্যে বাস্তব জীবনদর্শনের যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই নাটকখানিকে সার্থকতা দান করিয়াছে।[১৬৪]

এ ছাড়া, প্রথম থেকে শারীরিকভাবে রুগ্ন একটি নিষ্পাপ বালকের অসহায় বন্দিত্ব নাটকে বিষাদের যে ছায়া ফেলেছে, তা অত্যন্ত সংযম ও পরিমিতির মাধ্যমে সমাপ্তিতে পৌঁছে মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। এই পরিমিতি ও সংযম নাটকটিকে প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হিসেবে। এ কারণে পাশ্চাত্য সমালোচক টমসন WvKNi নাটক সম্পর্কে কখনো 'melodrama' কখনো 'a hopeless mush and welter of sentmentalism' কিংবা 'পরোক্ষে রুগ্ন শিশু দেখিয়ে' করুণা আকর্ষণের মতো ভারসাম্যহীন মন্তব্য করলেও এ নাটকের শিল্পকৌশলের প্রশংসা না করে পারেন নি।[১৬৫] তাঁর ভাষায়ঃ

> ... But it is touching, of texture is simplicity throughout, and within its limits an almost perfect piece of art. It does successfully what both

---

[১৬২] সীতা দেবীর 'পূণ্য স্মৃতি'তে উলেস্নখ আছে যে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে রচনার পরপরই WvKNi নাটক শোনার পর শ্রোতারা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন, "... পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রোতার দল একেবারে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।" উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, ষষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

[১৬৩] পবিত্র সরকার, ডাকঘরঃ নাস্তিকের নিবিড় পাঠ, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০২,পৃ. ১০

[১৬৪] আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

[১৬৫] Edward Thompson, ibid p. 213-14

Dhaka University Institutional Repository

Shakespear and kalidasa failed to do, brings on the stage a child who neither ‘shows off’ nor is silly.[১৬৬]

উক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে এ কথা বলা যায় যে, এ নাটকে কবি পরিকল্পিত অমলের ‘অনন্তে-র পথে যাত্রা’ ভাবটি সমাপ্তি দৃশ্যের দুঃসহ আবেগকে কেবল শান্ত-স্নিগ্ধ রূপদানেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কবির অধ্যাত্ম-ভাবনা এ নাটকে শেষ পর্যন্ত শৈল্পিক উপাদানরূপেই থাকে, এবং সেটি নাটকের গূঢ় নির্যাসে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না।

প্রসঙ্গত শ্রী অশোক সেন WvKNi নাটকের সঙ্গে জার্মান নাট্যকার Gerhart Hauptman (1862 – 1946)-এর রূপক নাটক *Hanele Himmelfahrt* (1893) নাটকের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন।[১৬৭] হাউপ্‌টমান হেনরিখ ইবসেন-এর অনুসারী নাট্যকার হলেও তিনি একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিকও বটেন। তাঁর রচিত nv‡b‡j wn‡gjdvÚ নাটকে মাতৃহীন এক কিশোরী কন্যা (হানেলে) গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু নাটকে তার মৃত্যুকে দেখানো হয় প্রভু যীশুর রূপক একটি চরিত্রের সহযোগিতায় স্বর্গে প্রবেশের প্রক্রিয়া হিসেবে। যেমন:

Hannele। Mother! Mother! There’s some one in the room!

Deaconess। Where?

Hannele। There – There!

Deaconess। Why do you tremble so?

Hannele। I’m afraid, ...

Deaconess। Fear not my child. He is your friend.

Hannele। Who is it, mother?

Deaconess। Do you not know him?

Hannele। Who is he?

Deaconess। He is death!...

Deaconess। Death is the gate, Hannele!

Hannele। Is there, no other, mother dear?

---

১৬৬ Ibid p. 215

১৬৭ শ্রী অশোক সেন, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-১৫

Dhaka University Institutional Repository

Deaconess । There is no other.

Hanncle । Will you be cruel to me, death? He won’t answer! Why he won’t answer any of my questions, mother?

Deaconess । The voice of God has answered you already...[১৬৮]

উল্লিখিত দৃশ্য ছাড়াও উক্ত নাটকের কিছু সংলাপ ও অনুষঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় WvKNi নাটকে। যেমন Hannele নাটকে সরাসরি (একাধিক) দেবদূত মঞ্চে প্রবেশ করলে কল্পিত বা ছায়া চরিত্র দর্জি তাকে WvKNi-এর ঠাকুরদা-র মতো নত হয়ে নীরবে তাদের শ্রদ্ধা জানায়। সেবিকা (Deaconness) হানেলেকে জানায় “এবার তুমি স্বাস্থ্য ফিরে পাবে এবং মুক্ত বিহঙ্গের মত আনন্দে ভরে উঠবে তোমার জীবন।”[১৬৯] এ সংলাপের সঙ্গে তুলনীয় অমলের সংলাপ –

“... তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিসের ভার নেই – যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়,... আচ্ছা ফকির,

সে দেশে কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়।”[১৭০]

তেমনি Hannele নাটকের মতো WvKNi নাটকেও বালকের দলের সঙ্গে অমলের কথোপকথন এবং হানেলের জন্য শিক্ষক গটওয়াল্ডের ফুল নিয়ে আসার সাদৃশ্য রয়েছে সুধার সঙ্গে। P. GUHATHAKURTA এ প্রসঙ্গে (APjvqZb ও WvKNi সম্পর্কে) বলেছিলেন :

“... They are not dramas of circumstance. It is the permeating idea in them that matters, as in such European plays of this type as Gerhart Hauptmann’s *Hanneles Himmelfahrt*, August Strindberg’s *Dream Play*, Maurice Maeterlinck’s *Blue Bird* and Ibsen’s *When we Dead Awaken*,”[171]

উক্ত নাটকগুলোর মধ্যে হাউপ্টমানের উল্লিখিত নাটকের বিষয়, বক্তব্য, দৃশ্য ও সংলাপের সঙ্গে WvKNi নাটকের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য কাকতালীয় না হওয়ারই সম্ভাবনা। বিশেষত উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইউরোপে কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকার রূপক-সাংকেতিক ধারার অধ্যাত্মবাদী নাটকের চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বেলজিয়ান Maurice

---

[১৬৮] উদ্ধৃত; শ্রী অশোক সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪-১৫

[১৬৯] ইসমাইল মোহাম্মদ (অনুবাদ), হপ্তম্যানের তিনটি নাটক, ঢকা, ১৯৭০, পৃ. ১৭৪

[১৭০] ডাকঘর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০

[১৭১] P. Guhathakurta, ibid, P. 203

Dhaka University Institutional Repository

Maeterlinck (১৮৬২–১৯৪৯), জার্মানির হাউপ্টমান, খ্যাতিমান সুইডিশ সব্যসাচী লেখক Johann August Strindberg (১৮৪৯–১৯১২) প্রমুখ ছিলেন প্রধান। অবশ্য বিখ্যাত বাস্তববাদী নাট্যকার ইবসেন ও W B Yeats (১৮৬৫–১৯৩০) এ সময় কয়েকটি সাংকেতিক নাটক রচনা করেছিলেন।[১৭২] এই সূত্রে ধারণা করা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লিখিত নাট্যধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন এবং সে কারণেই তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকে লক্ষ করা যায় পাশ্চাত্য নাটকের এ ধারার প্রভাব কিংবা সাদৃশ্য। আরনসন ইউরোপে রবীন্দ্রনাটকের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে প্রায় একই অভিমত দিয়েছেন। যেমন:

> His plays were quite naturally associated with the symbolist movement in play-writing which flourished in Europe during the first two decades of this century."[১৭৩]

তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও অন্যান্য নাটকের মতো WvKNi নাটকও মূল উৎসের প্রভাব অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে কবিরই নিজস্ব সৃষ্টি। বিশেষ করে এ দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং গম্ভীর ভাবপরিমণ্ডলের যথার্থ প্রয়োগে, টমসনের কটাক্ষ (Tears lay very close to the surface of his imaginative countrymen)[১৭৪] সত্ত্বেও WvKNi হয়ে ওঠে এক অনুপম নাটক। আর সে নাটকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ কেবল এ দেশবাসী নয় W B Yeats রোটেনস্টাইন, স্টার্জ মুরসহ পাশ্চাত্যের বহু পাঠক ও শ্রোতা। এঁদের মধ্যে ইয়েট্স WvKNi-এর অনুবাদ *The Post office* পড়ে (দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অনূদিত) এটিকে 'masterpiece' বলে মন্তব্য করেন। রোটেনস্টাইন সে মন্তব্যসহ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

> Yeats thinks the post office a masterpiece & would like the Dublin Theatre people to produce it. He is talking the matter over with the Irish theatre people.[175]

ইয়েট্স-এর উল্লিখিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯১২ সালের ১৭ মে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরের Abbey Theatre-এ এবং ১০ জুলাই লন্ডনের Court Theatre-এ WvKN‡ii অনুবাদ মঞ্চস্থ হয়।[১৭৬] এর

---

[১৭২] প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, রক্তকরবী: তথ্য ও তত্ত্ব, অনুষ্টুপ প্রবন্ধ সংকলন (বিষয় রবীন্দ্রনাথ), সম্পাদনা: অনিল আচার্য, সব্যসাচী দেব, কলকাতা, ১৯৯৯

[১৭৩] Alex Aronson, ibid, p. 63

[১৭৪] Edward Thompson, ibid, p. 213

[১৭৫] উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, ষষ্ঠ খ–, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯–৪০০

[১৭৬] পূর্বাক্ত, পৃ. ৩৯৯–৪০০

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিন পর এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয় (১৯১৪ সালে) ইয়েট্স-এর ভূমিকায়।[১৭৭] লন্ডনের অভিনয় (১০ জুলাই) দেখে কবি ও শিল্পী টমাস স্টার্জ মূর রবীন্দ্রনাথকে জানান, æI watched your lovely little play twords the end through my tears. I think it was more of success than you have been given to understand.”[178]

উল্লিখিত মন্তব্যসমূহ অনিবার্যভাবে WWKNi নাটকের শিল্প-সার্থকতা সঠিকভাবে নির্দেশ করে। এ কারণে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরবর্তী আবেগ কেটে যাওয়ার পরও) ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বিংশ শতকের শেষ দশকেও পাওয়া যায় এ নাটক প্রযোজনার খবর। কৃষ্ণ কৃপালানী তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে WWKNi-এর একটি পর্তুগিজ উপস্থাপনায় তিনি নিজেই উপস্থিত ছিলেন।[১৭৯] সম্প্রতি জার্মান গবেষক ও অনুবাদক মার্টিন কেম্পশেন ১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডে তাঁর নিজের অনুবাদে এবং ১৯৯৩ সালে উইলিয়াম রাদিচের অনুবাদে (ইংরেজিতে) লন্ডনে WWKNi প্রযোজনার তথ্য জানিয়েছেন।[১৮০] একই সঙ্গে তিনি জানান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ নাটকের এক বিস্ময়কর প্রযোজনার সংবাদ। পোল্যান্ডের এক ডাক্তার, লেখক এবং এতিমখানার পরিচালক Janusz Korezak (১৮৭৮–১৯৪২) তাঁর প্রতিপালিত শিশুদের নিয়ে এ নাটকের অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি ছিলেন দুই শ ইহুদি শিশুর একটি এতিমখানা (Ghetto)-র পরিচালক। কিন্তু নাৎসিদের আদেশে এই শিশুদের হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে। কোরেজাককে নিজের প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায়ও কি করে সান্ত্বনা পেতে হয়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এ নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোরেজাক। গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুর একমাস আগে অভিনীত এ নাটকের এক দর্শকের বর্ণনা ছিল এ রকম:

> অমলকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে অনাথ আশ্রমের শিশুরা তার এই উচ্চারণের (মুক্তির প্রতিশ্রুতি) সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। ঘেটু'র চার দেয়ালের মধ্যে শিশুদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। দেয়ালের ফাটলের মধ্যে নাটক ডুবিয়ে শিশুরা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে দেখতো দেয়ালের অপর পারে কি ঘটছে। তারা অমলের সঙ্গে কাঠবিড়ালী নিয়ে খেলতে চাইতো।

---

[১৭৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

[১৭৮] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩

[১৭৯] ‘As late as 1949 the present writer saw its production in Rio de Janeiro in an excellent Portuguese rendering by the distinguished poetess Cecilia Meireles”. KRISHNA KRIPALANI, RABINDRANATH TAGORE A BIOGRAPHY, CALCUTTA, 1980 (Second Revised Edition), p. 219

[১৮০] মার্টিন কেম্পচেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জার্মানী (অনুবাদ : নাসিম আখতার হোসাইন ও সরদার আবদুস সাত্তার), ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৪–৫৬

Dhaka University Institutional Repository

> রাস্তায় ছুটাছুটি করতে চাইতো এবং শীতল স্রোতস্বিনীতে সাঁতার কাটার পর ফুলের বড় বড় তোড়া সাজাতে চাইতো। ... তারা শ্বাসরুদ্ধ করে অমলের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিল, মুক্তির বাণী নিয়ে কখন আসবে রাজার চিঠি। অমলের মতোই তারা অনুভব করতো রাজার চিঠি আসছে, পথে রয়েছে।[১৮১]

উক্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা ও WvKNi নাটকের বিশেষ মঞ্চায়ন ১৯৯৩ সালে ইংল্যান্ডের পরিচালক জিল পারভিন (Gill Parvin) তাঁর পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ফলে ডাক্তার কোরেজাক, এমনকি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হয়ে পড়েন এ নাটকের চরিত্র।[১৮২] এ সব দৃষ্টান্তে নাটকটির মর্মবাণীতে যে বিশ্বজনীনতা রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

dvêbx : WvKNi রচনার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর (সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) রচিত হয় dvêbx নাটক। এ সময়ের মধ্যে কবির যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ড ভ্রমণকালে ইংরেজি MxZvÄwj (Song offerings)-র কিছু কবিতার এবং কয়েকটি গল্প ও নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হলে লন্ডনের বোদ্ধা মহলে কবিকে নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায়। একই সঙ্গে অন্যান্য ভাষায়ও শুরু হয় এসবের অনুবাদ প্রচেষ্টা। অনুবাদ স্বত্ব, প্রকাশনা স্বত্ব, বিক্রয় প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়েও কবিকে কিছুটা ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। এর মধ্যে বছরের শেষ দিকে (অক্টোবর) কবি আমেরিকা ভ্রমণে গেলে সেখানেও সৃষ্টি হয় একই পরিস্থিতির। সংবর্ধনা, বক্তৃতা, কবিতা পাঠ ইত্যাদি নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েন কবি। সেখানে থাকতেই কবির প্রথম ইংরেজি কাব্য GITANJALI (নভেম্বর, ১৯১২) প্রকাশিত হয় লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে। পরের বছর (এপ্রিল, ১৯১৩) কবি পুনরায় লন্ডনে এলে বিখ্যাত ম্যাকমিলান কোম্পানি প্রকাশ করে তাঁর দ্বিতীয় অনূদিত গ্রন্থ The Gardener (অক্টোবর, ১৯১৩)। ইতঃমধ্যে চট্টগ্রামের কলেজ-শিক্ষক রজনীরঞ্জন সেন-এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের তেরোটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ *Glimpses Of Bengali Life* (১৯১৩) গ্রন্থ প্রকাশিত হলে কিছুটা বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয় কবিকে। তবে রবিজীবনীকার জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩) ক্ষেত্রে এ বইয়েরও অবদান ছিল।[১৮৩] লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে আসার পরপরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের পনের দিনের মধ্যে আসে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা। পরের বৎসর (১৯১৫) ইংরেজ সরকার তাঁকে প্রদান করেন নাইটহুড খেতাব। উল্লেখ্য, এ খেতাব ইংল্যান্ডে দেশ-সেবার স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। সে কারণে

---

[১৮১] উদ্ধৃত; মার্টিন কেম্পচেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

[১৮২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

[১৮৩] "... গ্রন্থটির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের উপকারও করেছে। তাঁর প্রতিভার মূল্যায়নে সুইডিশ অ্যাকাডেমি এই বইটিকেও অন্যতম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।" প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

ইতঃপূর্বে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও এ খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ এটি গ্রহণ করলে তৎকালীন অনেক রাজনীতিবিদ ও সচেতন ব্যক্তি ব্যক্ত করেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া।[১৮৪]

রাজনীতিতে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লি দরবার-এ পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়; এবং সে সঙ্গে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানীও স্থানান্তরিত হয় দিল্লিতে। বাংলার গভর্নর হিসেবে আসেন লর্ড কারমাইকেল। বড় লাট হার্ডিঞ্জ-এর ভাবনা ছিল যে, বঙ্গভঙ্গ রদ-এর ঘোষণায় বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হলোই না, বরং পরের বছর (১৯১২) দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানী ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি বোমা হামলার শিকার হন। বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং মৃত্যু ঘটে ছত্রধারীসহ তিন ব্যক্তির। এ ঘটনায় বসন্তকুমার বিশ্বাস, আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ ও অবোধবিহারীর ফাঁসি হলেও বেঁচে যান মূল পরিকল্পনাকারী ও বোমা নিক্ষেপকারী রাসবিহারী বসু।[১৮৫] রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে এ হামলা সম্পর্কে ব্যক্ত করেন তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। ঘটনার দু'দিন পরে (২৫ ডিসেম্বর) জগদানন্দকে তিনি লেখেন:

> কাল হঠাৎ সকালে খবরের কাগজে পড়া গেল দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কে একজন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছে। আমরা মনে করি পাপকে আমাদের কাজে লাগাব, কাজ গোল্লায় যায় তারপরে সেই পাপটাকে সামলায় কে? ... আমাদের হতভাগ্য দেশে আমরা যথার্থ ত্যাগস্বীকার করে দেশের কাজ করতে কষ্ট বোধ করি বলেই আমাদের ওখানেই একদল বীর পুরুষ বোমা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করতে চায়। এই বোমা কোনখানে গিয়ে পড়ে বল দেখি? একেবারে স্বদেশলক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের উপরে। আমাদের দেশে দুর্গতি ত নানা আকারেই বিরাজ করছে, তার উপরে আবার এই শয়তানটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিলে কে? একে ত সহজে বিদায় করতে পারবে না। এখন থেকে ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ কোন অন্ধকার থেকে এ হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের ভাঙ্গা কপালকে আরো ভাঙ্গবে।[১৮৬]

---

[১৮৪] বাংলার অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ এ সংবাদ শুনে কেঁদে ফেলেন; আর ব্যোমকেশ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, "Shall I congratulate or condole with you; whichever you please". প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ১০১

[১৮৫] শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (মুক্তি সংগ্রাম), কলকাতা, ১৯৮২ (জেনারেল দ্বিতীয় সংস্করন), পৃ. ১৫৯-৬০

[১৮৬] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা হামলার ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা শেষ হওয়ার আগে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮)। ভারতবাসীর সঙ্গে এ যুদ্ধের কোন সম্পর্ক না থাকলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বা পড়তে বাধ্য হয়। কারণ ভারতবাসীর কোনরকম অনুমতির তোয়াক্কা না করেই এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের বিপুল অর্থ ও মানবসম্পদ ব্যবহার করতে শুরু করে ইংল্যান্ড। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা উন্নীত করা হয় বারো লাখে। একই সঙ্গে তাদের অধিকাংশকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানের নামে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। [১৮৭] তৎকালীন ভারত সচিব মন্টেগু এ প্রসঙ্গে বলেন: "সমগ্র যুদ্ধে ১১,৬১,৭৮৯ জন নূতন ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, ১২,১৫,৩২৮ জন ভারতীয় সৈন্য বিদেশে যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং ইহার মধ্যে ১,০১,৪৩৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।"[১৮৮] এই ভারতীয় সৈনিকদের অনেকটা জোর করে যুদ্ধে নেওয়া হলেও কয়েকজন কংগেস নেতা (মহারাষ্ট্রের তিলক, মোহনদাস গান্ধি প্রমুখ) বেশ উৎসাহ নিয়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন ব্রিটিশ সরকারকে। তাঁদের ধারণা ছিল, এর ফলে ব্রিটিশ সরকার তুষ্ট হয়ে যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবে। কিন্তু বাস্তব হলো–বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ব্রিটিশ সরকার "ভারত রক্ষা" আইন পাশ করিয়ে কেড়ে নেয় ভারতবাসীর সমস্ত ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ ও চলাফেরার স্বাধীনতা। এ আইনের বলে গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল কমিটি তাদের যে কোন সন্দেহভাজনকে তার চলাফেরা, অবস্থান ইত্যাদির জন্যও ফাঁসিসহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার মতো ক্ষমতা লাভ করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার দৃষ্টান্ত দিয়ে জানাচ্ছেন:

> এই আইনের বলে বিশেষ বিচার কমিটির কাছে নয়টি রাজনৈতিক দলের বিচার হয়। এই দলগুলির সদস্য সংখ্যা ১৭৫। ইহাদের মধ্যে ৩৮ জনের ফাঁসি, ৫৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ৫৮ জনের নির্দিষ্ট কালের জন্য দ্বীপান্তর বা সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[১৮৯]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণের জন্য কেবল অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি ব্যবহার করা হতো। বস্তুত এ সব স্বীকারোক্তি ছিল পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের ফল। এ কারণে ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ব্রিটিশ পুলিশের এ সব বন্দী নিপীড়নকে তুলনা করেছিলেন নাৎসিদের গ্যাস প্রয়োগে ইহুদি হত্যার সঙ্গে।[১৯০]

মহাযুদ্ধের নামে ভারতবাসীর ওপর উক্ত দমন-পীড়নের সময় ইংরেজ সরকার উপঢৌকন হিসেবে কয়েকজন ভারতীয় ব্যক্তিত্বকে নাইটহুড খেতাব প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ

---

[১৮৭] সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭০
[১৮৮] শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪
[১৮৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০
[১৯০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর এবং ড. রাসবিহারী ঘোষ ভূষিত হন 'স্যার' উপাধিতে। কিন্তু ভারতবাসী যে এতে তুষ্ট হন নি, তা তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে টের পাওয়া যায়। যেমন খেতাব পাওয়ার দু'দিন পর (৫ জুন, ১৯১৫) তাঁরা লেখেন:

> æWe must however, confess that the old familiar names Dr. Rash Behari and Rabi Babu sound sweeter in our ears that Sir Rashbehari and Sir Rabindranath."[১৯১]

dvêbx রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক ধারায় সবচেয়ে নির্বস্তুকধর্মী নাটক। এখানে ঘটনার সমাবেশ প্রায় নেই বললে চলে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির একটি বিশেষ ভাব কল্পনা প্রধানত সঙ্গীত এবং কিছু সংলাপ আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে এ নাটকে। এমন কি নাটকের চরিত্র এবং ঘটনাস্থানও হয়ে উঠেছে রূপকার্থে বিশেষ তত্ত্বের বাহন। নাটকটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের নাম 'সূচনা' এবং দ্বিতীয় অংশে মূল নাটক dvêbx। দ্বিতীয় অংশ মোট চারটি দৃশ্যে বিন্যস্ত; প্রতিটি দৃশ্যের আগে গীতি-ভূমিকা হিসেবে রয়েছে চারটি বা তিনটি গান। একই সঙ্গে দৃশ্যাভ্যন্তরে গানসহ এ নাটকে গানের সংখ্যা মোট চৌত্রিশ। এই বিরাট অংকের গানের মধ্যে নাটকের ঘটনাংশ যে সামান্য তা সহজেই অনুমান করা চলে। নাটকের সূচনা অংশে দেখা যায় ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজার দুটি চুলে পাক ধরেছে বলে তিনি দুঃখে ও বৈরাগ্যে রাজকার্য প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাজকবি তাঁকে বোঝায় যে, যৌবন জীবনে-প্রকৃতিতে সদাই বিরাজমান। দেহের এক যৌবন চলে গেলেও সংসার-বিরাগী হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং সেই সংসারের ভেতরে থেকেই, তার সমস্ত কাজের মধ্যেই চলতে পারে বৈরাগ্যের সাধনা – প্রকারান্তরে যৌবনেরই সাধনা। এই মানসিক যৌবন দেহের যৌবনের ওপর নির্ভরশীল নয়, এটি বরং প্রৌঢ় বয়সের নিরাসক্ত যৌবন। কবিশেখরের এ কথায় রাজার প্রাণশক্তি ফিরে আসে; তিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যথাবিধি তৎপর হয়ে ওঠেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের জন্য অন্নের সংস্থান, প্রত্যন্ত সীমায় বিদ্রোহ দমন ইত্যাদির সঙ্গে তিনি দেখতে চান ফাল্গুনের আগমনে বসন্তোৎসবের নাটক।

দ্বিতীয় অংশ 'ফাল্গুনী' তে নবীন যৌবনের দল সর্দারের নেতৃত্বে বসন্ত উৎসব করতে পথে বেরিয়েছে। সর্দার তাদের বলে সেই মান্ধাতার আমলের বুড়োকে ধরে এনেই চলবে বসন্ত উৎসব। সে বুড়োকে খোঁজার জন্য তারা ছুটলো ঘাটে মাঝির কাছে, গেল বিশাল প্রান্তর মাঠে, সবশেষে তারা হাজির হয় পাহাড়ের গুহায়। তাদেরকে সেখানে পথ দেখিয়ে আনে এক অন্ধ বাউল। সে দলের একজন চন্দ্রহাস জানায়, বুড়োকে সে দেখেছে; এক্ষুণি গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে সে। কিছুক্ষণ পর

---

[১৯১] উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৭ম খ , পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-২

Dhaka University Institutional Repository

গুহা থেকে বালক বেশে বেরিয়ে আসে তাদেরই নেতা সর্দার। সর্দার বলে বুড়ো কেবল স্বপ্ন, সে কোথাও নেই। সর্দারকেই পেছন থেকে তারা ভুল করে বুড়ো ভেবেছিল।[১৯২]

উল্লিখিত ঘটনাংশ যে মূলত তত্ত্বের বাহন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতিতে চলছে অনন্ত বসন্তের যৌবনলীলা, শীতের রিক্ততা ও জীর্ণতা বারবার ঢাকা পড়ে বসন্তের পত্র ও পুষ্পশোভায়। তেমনি মানব জীবনেও জরা দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলেছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির অনন্ত যৌবন। নাটকের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি লিখেছিলেন:

> ... ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান– অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন।...
>
> বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে।...[১৯৩]

নাটকে সর্দার চরিত্রটি মানুষের সে প্রাণশক্তির রূপক। সে শক্তির কাজ হলো জীবনকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিরন্তর এগিয়ে নেওয়া। বলা বাহুল্য মৃত্যুতেও এ পথের শেষ হয় না; তাই গুহারূপ মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়েও সর্দার ফিরে আসে বালকের বেশে নতুন জীবনে।[১৯৪] আর এই দিব্যজ্ঞানের সন্ধান, মৃত্যুর রহস্যের সন্ধান আছে কেবল অন্ধ বাউলের কাছে। কারণ, চর্মচক্ষুতে নয়, বাহ্যিক আলোয় নয়; তিনি পথ দেখেন অন্তরের আলোয়। চরিত্রের মতো নাটকের স্থানগুলোও মূলত প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন, প্রথম দৃশ্যের ‘পথ’ হলো জীবনের চলার পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র, জীবনের স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারায় ইতঃপূর্বে cvqwðË, ivRv, WvKNi, এবং পরবর্তী g³avi নাটকেও পথ উক্ত অর্থে গুরুত্ব লাভ করেছে।

---

[১৯২] ফাল্গুনী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮০ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৮৭-১৪৫

[১৯৩] গ্রন্থপরিচয় (ফাল্গুনী), রবীন্দ্ররচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৭

[১৯৪] “মানবজীবনের আরম্ভ জন্মে নয়, অবসানও মৃত্যুতে নয়। জীবন-মৃত্যু – দুই তোরণের ভিতর দিয়া জীবনের প্রবহমান পথ প্রসারিত,–ইহাই ফাল্গুনীর বাণী।” সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘাট এসেছে জীবনের শেষ প্রান্ত তথা এক পথের সমাপ্তি বোঝাবার জন্য। আর তৃতীয় দৃশ্যের 'মাঠ' হলো স্থিতির প্রতীক, যেখানে যৌবনের দল এসে সন্দেহের সংশয়ে দোলায়িত হয়।[১৯৫] কিন্তু এসব রূপক ও তত্ত্বকথাসমূহ এখানে নাটকীয় দ্বন্দ্বমূলক কোন ঘটনায় রূপান্তরিত হয় নি। এমন কি নাটকের কিছু চরিত্র যেমন চন্দ্রহাস, সর্দার, প্রজাবৃন্দ, যৌবনের দল ইত্যাদি রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে সৃষ্ট নয়। কবি নিজেই নাটকের চরিত্র-পরিচিতি অংশে লিখেছেন:

> এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারো নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।[১৯৬]

অর্থাৎ নাট্যকারের কাছে চরিত্রের বাস্তবতার চেয়ে তাদের সংলাপ বা নাটকের রূপকার্থের বক্তব্য গুরুত্ব পেয়েছে বেশি।[১৯৭] আবার যৌবনের দলের অনুসন্ধানের ব্যক্তি বা বিষয়ও সাধারণ বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকায় তাতে নাটকীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় না। এ অনুসন্ধান একান্ত লেখকের আত্মমগ্ন ভাব-কল্পনা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় দর্শক কিংবা পাঠক তার সঙ্গে বরাবরই বিচ্ছিন্নতা বোধ করে। ফলে নাটকের হেঁয়ালিপূর্ণ সংলাপসমূহের মর্ম উদ্‌ঘাটন হয়ে ওঠে একপ্রকার অসম্ভব। এ অবস্থায় কোন নাটক আকাঙ্ক্ষিত শিল্পমান অর্জন করতে পারে না; d\êb\ নাটকও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> নাটকখানি আমাদের সম্মুখে যেন এক পরম রমণীয় নন্দন কানন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সে কাননে অসংখ্য তরুলতা নবীন শ্যামলিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, রাশি রাশি পুস্প স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া রহিয়াছে, ... – এই খানে একদল বাঁধন ছেঁড়া প্রকৃতি-পাগল ছেলে-বুড়োর দল আসিয়া নৃত্য গীতে মাতিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে কে আসিল, কে গেল, কাহার সহিত কাহার ঠোকাঠুকি লাগিল তাহা ভ্রুক্ষেপ করিয়া দেখিবার সময় নাই। সুতরাং ইহাদের দ্বারা নাটক জমিতে পারে না, এবং জমেও নাই। ইহার ভাবরাশি ভাসমান শৈবালদামের ন্যায় তরল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোনো জটিল আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হয় নাই। বসন্তের সমীরণের ন্যায় সমস্ত চরিত্রের গতি একদিকেই ছুটিয়াছে।[১৯৮]

---

[১৯৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

[১৯৬] ফাল্গুনী (পাত্রগণ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

[১৯৭] "সংলাপরচনায় তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা এক নির্বিশেষ ভাবচেতনাকেই বেশী করিয়া পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ব্যক্তি পরিচয় অপেক্ষা যৌথ মনোভাবই স্পষ্টতর হইয়াছে। ... এই রচনায় প্রধান চরিত্রগণও নির্দিষ্ট পরিচয়হীন, ভাবপ্রতিচ্ছায়ার মত অশরীরী মানস প্রক্ষেপমাত্র।" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সৃষ্টি–সমীক্ষা, দ্বিতীয় খ, কলকাতা, পৃ. ৩২৯–৩০

[১৯৮] অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের বিশেষ শিল্পরীতি, কাহিনীসংগঠনের যে সংহতি দাবি করে তাও এ নাটকে অনুসৃত হয় নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এসব বিষয় স্পষ্ট করে বলেন:

> Ôdvêbx” তে লেখক নাটকের জটিল রীতি ও রূপককল্পনাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ অন্তরের প্রতি অখণ্ড দৃষ্টি দিয়াছেন। ... তাঁহার মানস-ঐশ্বর্যের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কতটা নাটক হইল কি না হইল সে দিকে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। চরিত্রগুলি ব্যক্তিসত্তায় সংহত হইয়া উঠিল কি না, গান ও তত্ত্বকথা কতটা নাট্যবন্ধনকে স্বীকার করিল, তাহার মানস ভাবোৎসারের অজস্রতা কি পরিমাণে নাট্যকেন্দ্রিকতাবিন্যস্ত হইল প্রভৃতি শিল্পগত কূট প্রশ্নের প্রতি তিনি পুরাপুরি উপেক্ষা দেখাইয়াছেন। ফল হইয়াছে যে, 'ফাল্গুনী' নাটকের কোন পূর্বনির্দিষ্ট আঙ্গিকবিন্যাসরীতিকেই মানিয়া লইতে পারে নাই।[১৯৯]

বস্তুত যে রচনায় নাটকের আঙ্গিকবিন্যাস যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না, সে রচনাকে নাটক বলার অবকাশও খুব একটা থাকে না। সে বিবেচনায় 'ফাল্গুনী'-কে গীতিনাট্যধর্মী রচনা হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত বলে মনে হয়।

কাহিনী সংগঠন ও চরিত্র সৃষ্টি যথেষ্ট বাস্তবানুগ না হওয়ায় এ নাটকের রাজনৈতিক গুরুত্ব তেমন নেই বললে চলে। তবে 'সূচনা' অংশের রাজা যেমন দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ১৯১৫–১৬ সালে বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাদের সাহায্যার্থে অভিনীত হয় (২৯, ৩১ জানুয়ারি, ১৯১৬) dvêbx নাটক।[২০০] অবশ্য দুর্ভিক্ষের মূল উৎপাটনের রাজনীতির সঙ্গে এ নাটকের সংশ্রব খুব একটা নেই।

মুক্তধারা : dvêbxর প্রায় ছয় বছর পর রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ রাজনৈতিক নাটক g³avivi (১৯২২)। এর আগে রচিত নাটকসমূহের কয়েকটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের প্রকাশ থাকলেও তা রচয়িতার সচেতন প্রয়াসজাত ছিল না। কিন্তু g³avivi নাটকে নাট্যকার তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য অনেকখানি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রয়োগ করেছেন বলে ধারণা জন্মে। কবির ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন তথ্য, আর্ন্তজাতিক ও ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ এবং নাটকের কাহিনী ও সংলাপ পর্যালোচনায় ওঠে আসে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত।

১৯১৬ সালের ১ মে রবীন্দ্রনাথ জাপানের উদ্দেশে জাহাজে রওনা হন। বার্মা, হংকঙ ও সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানের কোবে শহরে তিনি পৌছেন ২৯ মে। এর মধ্যে জাহাজে তিনি wemRb, ivRv I ivYx, gwjbx এবং জাপানে পৌঁছে cKwZi cwZ‡kva নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। জাপানে

[১৯৯] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
[২০০] প্রশান্ড়কুমার পাল, ৭ম খ , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় তিনি জাপানিদের প্রশংসার পাশাপাশি সাবধান করেন অন্ধভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা অনুকরণের বিষয়ে। নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে জাপানের উত্থান কবি সে সময় সঠিকভাবেই লক্ষ করেছিলেন এবং একাধিক বক্তৃতায় তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সা, কোরিয়ার প্রতি তাদের অত্যাচার কাহিনী, চীনের প্রতি অপমানকর শর্তারোপসহ চুক্তি ইত্যাদি বিষয় জেনে তিনি লেখেন যথাক্রমে *The message of India to Japan, The Spirit of Japan* প্রবন্ধ।[২০১] স্বভাবতই কবির এসব বক্তব্য জাপানি শাসকগোষ্ঠীর ভালো লাগেনি। তাই জাপানি কিছু বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথের উগ্র-জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তব্যকে একটি পরাধীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের প্রতিনিধির বাণী হিসেবেই গ্রহণ করেন।[২০২] জাপান থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকার এক বক্তৃতা ব্যবস্থাপক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয় – অর্থের বিনিময়ে বক্তৃতা করার। কবি-পরিচালিত শান্তিনিকেতনের জন্য তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল বলে তিনি এ প্রস্তাব – ৪০ টি বক্তৃতার জন্য বিশ হাজার ডলার – গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য একই সঙ্গে সে সময়ের ভাবনাসমূহ প্রকাশ করার সুযোগও তিনি নিয়েছিলেন বলে ধারণা করা চলে। দেখা যাচ্ছে, যে বক্তব্য তিনি জাপানে প্রকাশ করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতা চলেছে আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতায়ও। যেমন: The cult of Nationalism প্রবন্ধে (পরে Nationalism in West নামে গ্রন্থিত) 'নেশন' সম্পর্কে তিনি বলেন:

> The Nation with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the chusrches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by dread of a new peril.[২০৩]

শুধু তাই নয়, জাপানের মতো আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার সমালোচনা করে কবি এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

> All of this organisation, this system and method, may be well enough in business. Some things are better made by machinary, but when you

[২০১] ক) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৮
খ) প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪–৯১

[২০২] "Surely such a doctrine can only be preached by a man whose country has lost its independence by an inhabitant of a pale decaying land, where all things droop to ruin" উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

[২০৩] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

> come to life, complete life, machinary has no place in that. The day will come when you will feel a real thirst for perfection of human ideals. This cannot come through any particular system, through any outward influence. You will have to go to the root, which is the soul, the spiritual life.[204]

অবশ্য কবির এসব মন্তব্য আমেরিকার বৌদ্ধিক সমাজ ও পত্রিকার সম্পাদকরা সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তবে সে সময় আমেরিকায় অবস্থানকারী কয়েকজন ভারতীয় ও বিপ্লবী – 'গদর' পার্টির অর্ন্তভুক্ত – কবির বক্তব্যের এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নিয়ে করেন কড়া সমালোচনা। উল্লেখ্য, সানফ্রান্সিসকোর *Examiner* পত্রিকায় (১ অক্টোবর, ১৯১৬) এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ, ভারত স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি বলে মন্তব্য করেছিলেন।[২০৫] তার ভাষণ এবং উক্ত বক্তব্যের সমালোচনায় 'গদর' পার্টির তৎকালীন নেতা রামচন্দ্র ভরদ্বাজ একই পত্রিকায় (৫ অক্টোবর) লেখেন:

> In spite of Tagore's literary achievements, he now stands for what we call Old India. Let it be clearly understood that there are six million monks in India who are nearly all sages and philosophers like Tagore, many of them being men of the highest spiritual attainments. They all disapprove of modern science and look for social improvement solely through individual spiritual growth. ... Indirectly and unknowingly, those who teach that knowledge of God is all, are really ruining India.[২০৬]

সে সঙ্গে তিনি কিছু তথ্য দিয়ে বলেছেন, রবিজীবনীকারের ভাষায় :

> ১৫ বছরে মার্কিনীরা যেখানে ষাট শতাংশ ফিলিপাইনবাসীকে সাক্ষর করে তুলতে পেরেছে, দেড়শো বছরের ব্রিটিশ শাসনে সেই হার মাত্র দশ শতাংশ। রবীন্দ্রনাথ কি ভুলে গেছেন, ব্রিটিশ শাসনে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা গেছে, দেড় কোটি মরেছে প্লেগে, নব্বই লক্ষ লোক যথেষ্ট আহার পায় না, হিন্দুদের বার্ষিক আয় মাত্র ন'ডলার; যুবকদের দিয়ে

---

[২০৪] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

[২০৫] "I am not one of those who say that India is prepared right now for self-government. She is going through a process of evolution, however, that I am convinced in time may lead tomorrow" উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

[২০৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

> কারাগার গুলো ভর্তি, চার শো জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, পাঁচ হাজারকে কারারুদ্ধ ও দশ হাজারকে বিনা বিচারে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে;...[২০৭]

এর পরের দিনও একই পত্রিকায় অপর ভারতীয় গোবিন্দ বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ চিন্তা-চেতনার দিক থেকে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনীতি কিংবা আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-কীর্তির জন্য ভারতীয়রা গর্ববোধ করলেও তাঁর সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি তাঁদের উৎসাহ নেই। তাঁর মতে,

> The heart of India is in the anti-British revolutionary movement, which is rapidly transforming India along modern lines. But Mr. Tagore stands aloof from the movement just as Goethe stood aloof from the German war liberation a century ago....[২০৮]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য নিয়ে এ সব লেখা প্রকাশের সময় একটি গুজবও রটে যায় যে, গদর পার্টি রবীন্দ্রনাথকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। গুজবের ফলে রবীন্দ্রনাথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্থানীয় পুলিশ ও ডিটেকটিভরা শুরু করে অতিরিক্ত কড়াকড়ি। তারা বহু ভারতীয়কে কবির সভায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়, সভা শেষে কবিকে বিশেষ নিরাপত্তায় বের করে এনে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে তাঁর কক্ষে দিয়ে আসে।[২০৯] অবশ্য রামচন্দ্রই পরে বিবৃতি দিয়ে জানান যে, তাঁদের দলের সে রকম কোন উদ্দেশ্য নাই; কারণ তাঁর মতে:

> ... প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, তাঁহার কাজ কাব্য, রাষ্ট্রনীতি নহে। সেইজন্য তাঁহাকে আমরা বিশেষ গ্রাহ্য করি না। তাঁহার ক্ষতি করিলে আমেরিকায় আমাদেরই সর্বনাশ, সে কথা আমরা জানি।... রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র আপত্তি এই যে, ব্রিটিশের সম্মান তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিয়াছে; তিনি ব্রিটিশ নাইট হইয়া আজ পৃথিবীর কাছে দেখাইতে চান যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতের কত মঙ্গল করিয়াছে;... ।[২১০]

এ দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে গুজব সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন এবং পুলিশি নিরাপত্তা থেকেও অব্যাহতি কামনা করেন।[২১১] অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'জাতীয়তাবাদ'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে এ সময় পরোক্ষভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কেও কড়া মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতের দুর্দশার কারণও নেশন, ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার

---

[২০৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭
[২০৮] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
[২০৯] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২
[২১০] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২
[২১১] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে ভারতকে নিরস্ত্র করে তার পৌরুষ ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে *North American* পত্রিকার সাংবাদিকের সামনে তিনি বলেন:

> They had no right to disarm India. They did it only that they might rule without risk. If they rule they should take the risk of rule. But now India is chained for all time. It has been deprived of the instrumentalities with which it could redeem himself. Its manhood is forever destroyed. A hole race is robbed of its natural right to defend itself.[২১২]

পরবর্তী সময় দেশে ফেরার কিছু দিন পর হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মিসেস অ্যানি বেশান্টকে ব্রিটিশ সরকার বন্দি করলে তিনি বেশান্টকে সহানুভূতি এবং ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কবির এ সহানুভূতি প্রকাশ ও অভিনন্দন কোন কোন ইংরেজ মহলে সৃষ্টি করে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। যেমন: *Quest* নামে একটি তাত্ত্বিক পত্রিকার সম্পাদক Rev. G R S Mead এতে বিস্ময় প্রকাশ করে কবিকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে হয়ে ওঠেন বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। এবার সে চিঠি উপলক্ষ্য করে কবি পত্রিকায় প্রকাশ করেন একটি ঐতিহাসিক খোলাচিঠি, যাতে 'ভারত রক্ষা আইন' এবং ইংরেজের বর্বর দমন-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, ধিক্কার ও মর্মযন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। চিঠিটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> ... আশঙ্কা হচ্ছে আপনাদের আত্যন্তিক সমস্যা-সংকটের তুলনায় আমাদেরগুলি আপনার কাছে খুবই নগণ্য বা তুচ্ছ বোধ হতে পারে, কিন্তু তাতে করে তো আর আমাদের দুঃখ নির্যাতন ভোগের তীব্রতাটা আমাদের কাছে বিন্দুমাত্রও লাঘব হবে না। ... আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক যুবক সন্দেহ অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের দ্বারা তাড়িত হয়ে হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এরই মোকাবিলা করার জন্য গর্ভনমেন্ট বা সরকার প্রচণ্ড দলননীতির সাহায্য নিয়েছেন। শুধু এক বাংলাতেই শতাধিক মানুষ বিনাবিচারে অন্তরায়িত হয়েছেন – আর তাদের বেশির ভাগকেই কারাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অথবা নির্জন কারাকক্ষে (Solitary cell) আবদ্ধ রাখা হয়েছে, যার ফলে কয়েকজন বন্দীই হয় উন্মাদ নয় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।... এ সবের বিস্তারিত আলোচনায় আমি যেতে চাই না। আমি সাধারণভাবেই বলি: এদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদির ব্যাপারটা অনুধাবন করলে দেখা যায়, এঁদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে

[২১২] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

> এবং যুক্তিসংগত কারণে একথাও আমরা ধরে নিতে পারি যে, এঁদের অধিকাংশই বিনা অপরাধে শাস্তিভোগ করছেন।[২১৩]

লক্ষণীয়, এ রকম সরাসরি ও তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব এর আগে রবীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ করা যায় নি। এমনকি উপরি-উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭) প্রবন্ধেও পাওয়া যায় না তার সে তীব্র সংক্ষুব্ধ মনের পরিচয়, প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাঁচ শতাধিক লাইনের এ প্রবন্ধের বেশ বাগবিস্তারের মধ্যে হোমরুল দাবির সমর্থনে আট দশটির বেশি বাক্য ব্যয়িত হয় নি। নেপাল মজুমদার কথিত ও উদ্ধৃত কিছু 'জোরালো' অংশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক:

> ... মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটা এই যে, কর্তৃত্বের অধিকার মানুষ্যত্বের অধিকার।...
>
> আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না'।
>
> ... আমরা বলি ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয়, স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয়, তবে তার চেয়ে না হয় ভুল করিলাম।...
>
> অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়া আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব; দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।[২১৪]

প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি আরও যুক্তি প্রয়োগ করে বলেন:

> ... মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে, তার পরে সুযোগ পাইবে, এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে – সে সব কুৎসার কথা ঘাটিতে ইচ্ছা করে না।[২১৫]

প্রবন্ধের বক্তব্য আশানুরূপ তীব্র না হলেও রবীন্দ্রনাথ এ সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে সন্দেহের বশে বিনা বিচারে আটককৃত তরুণ ও যুবকদের মুক্তি ও অসুস্থদের সুচিকিৎসার জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিচক্ষণ নেতৃত্বের মতো।

---

২১৩ উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২–২৩

২১৪ উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪

২১৫ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪০২ (সুলভ সংস্করণ), পৃ. ৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরায়িতদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব, ভারত সচিব এডউইন মন্টেগুর সঙ্গে আলাপে উক্ত সমস্যার উপস্থাপনসহ পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর মাধ্যমে মহিলাদের সভায়ও তিনি এ বিষয়ে জনমত গঠনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[২১৬] উক্ত বিষয়ে মন্টেগুর অনুরোধে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন:

> ... ক্রমবর্ধমান এই অন্যায় অবিচারকে দূর করতে হলে একমাত্র যা করা প্রয়োজন তা হলো সরকার এবং জনগণের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাতে আমরা অনুভব করতে পারি যে সরকারের মাধ্যমে নিজের দেশের সেবা করার ক্ষমতা আমাদের আছে। মানবতার অন্যতম মহান উদ্দেশ্যে পশ্চিমের মহৎ মানুষেরা আমাদের সঙ্গে যেখানে সহযোগিতা করবেন সেখানেই হবে আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল। যতদিন আমরা যান্ত্রিক এবং প্রায় মানুষ্যত্বের স্পর্শহীন বিদেশী সরকারের কাছে দয়ার নিষ্ক্রিয় পাত্র হয়ে থাকব ততদিন সংঘর্ষ হবে সীমাহীন এবং নিপীড়ন নির্যাতন হবে নিষ্ফল।[২১৭]

উল্লেখ্য, উক্ত চিঠিতে কথিত 'মহৎ মানুষ' তাঁর প্রথম জীবনের ধারণার 'বড়ো ইংরেজ'-এরই অন্যতম প্রকাশ। সেটি আরো স্পষ্ট প্রতিভাত হলো কিছুদিন পর লেখা 'ছোটো ও বড়ো' (নভেম্বর **১৯১৭**) প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে সমসাময়িক হোমরুল, অন্তরায়ন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং একই সঙ্গে ছোট ও বড় ইংরেজের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য , সশস্ত্র ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের বিরোধিতা ইত্যাদি পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। যেমন বড় ইংরেজ সম্পর্কে এখানে তিনি বলছেন:

> এ কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্বলতারই পরিচয় হয়– সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো। ... মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজ জাতির অন্তরের আদর্শ।...[২১৮]

---

[২১৬] মহিলাদের সভায় পঠিত "প্রতিমাদেবী তাঁহার ভাষণের মূল বক্তব্য কবির কাছে শুনিয়া নিয়া লিখিয়াছিলেন এবং পরে কবি স্বয়ং তাহা সংশোধন করিয়া দেন। 'রবীন্দ্রভবন'-এ প্রতিমাদেবীর ভাষণ ও প্রস্ড়বের যে খসড়া আছে, তাহাতে দেখা যায় স্থানে স্থানে কবির হস্ড়াক্ষরে সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া দেওয়া আছে।" নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১

[২১৭] ড. সনৎ বাগচী-র 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকে উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

[২১৮] কালান্ড়র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খ , কলকাতা, ১৩৯৩ (পূর্নমুদ্রণ), পৃ. ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় একই বিষয় নিয়ে রচিত হয় তাঁর 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধটিও। এ সময় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কর্ম ও বক্তব্যের কারণে তিনি বহুদিন পর পুনরায় রাজনৈতিক আবহের কেন্দ্রে চলে আসেন। এ জন্যে তাঁকে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। অবশ্য এ পদ গ্রহণে তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মত হন নি। বিনা বিচারে অন্তরীণদের বিষয়ে এ সময় হোমরুল লীগের সভাপতি ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার সুব্রহ্মণ্য আইয়ারও বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে লেখা এবং সেখানকার সংবাদপত্রে গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত, ভারতের বিজাতীয় শাসকদের সম্পর্কে তাঁর একটি চিঠি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সমালোচিত হয় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে। ভারত সচিব মন্টেগু তাঁকে ভবিষ্যতে এ রকম আচরণ বরদাশ্‌ত করা হবে না বলে শাসালে তিনি এর প্রতিবাদে ব্রিটিশ প্রদত্ত 'স্যার' ও 'দেওয়ান বাহাদুর' খেতাব পরিত্যাগ করেছিলেন।

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হোমরুল আন্দোলনের উক্ত পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় সংঘটিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭)। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে এবং মার্কসীয় তত্ত্ব অবলম্বনে সংঘটিত এ বিপ্লব সারা পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটানোর প্রেরণা সৃষ্টি করে। স্বভাবতই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নতুন সৃষ্ট শ্রমিক আন্দোলনেও এর প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল।[২১৯] ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো এ বিপ্লব ও এর নেতা ভ ই লেনিন (১৮৭০–১৯২৪) সম্পর্কে কুৎসা রটনা করলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশ পেতে থাকে রাশিয়ার বিভিন্ন ঘটনা, এমন কি লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের অনুবাদ। লেনিনকে সমর্থন জানিয়ে তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় লিখেছিলেন "অভিজাতদের জমিজমা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার ফলে সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লেনিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।"[২২০]

ধারণা করা যায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির উক্ত প্রেক্ষাপটে সে বছর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রেকর্ডসংখ্যক (৪৯৬৭ জন) প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন।[২২১] শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের গতানুগতিক ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য ও মন্টেগুর উদ্দেশে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হলেও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি, প্রেস অ্যাক্ট, অন্তরায়ন, দায়িত্বপূর্ণ স্ব-রাজ (Responsible Government), দমনমূলক আইন ইত্যাদি বিষয়ে অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের সুর হয়ে উঠেছিল বেশ কড়া। একইসঙ্গে সভাপতির আসন থেকে বেশান্টের ভাষণেও শোনা গেছে আবেদন নিবেদনের পরিবর্তে ভারতের

[২১৯] সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০–২০০০), কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১২২

[২২০] কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগোরি কতোভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৫৩২

[২২১] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

যৌক্তিক অধিকারের দাবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দায়িত্বপূর্ণ স্ব-রাজ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন্টেগু ভারতে এসেছিলেন, তার পরিবর্তে এ দেশে বিপ্লববাদের সমস্ত উৎস ও কর্মকাণ্ড উৎপাটনের জন্য লন্ডনের বিচারপতি রাউল্যাট-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি অনুসন্ধান কমিটি। মূলত যুদ্ধের পরেও যুদ্ধকালীন আইনসমূহ বলবৎ রাখার জন্যই এ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিটি দুটি বিল উত্থাপন করে ভারতীয় আইন সভায় বিশেষ আদালত স্থাপন ও বিনা বিচারে সর্বোচ্চ দুই বছর আটক রাখার ব্যবস্থাসম্পন্ন বিল দুটি দ্রুত আইন হিসেবে গৃহীত হয়। এর মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির এক রহস্যময় নেতৃত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে শুরু করেন তাঁর উদ্ভাবিত এবং আফ্রিকা ও ভারতের কয়েকটি স্থানে পরীক্ষিত অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এ উপলক্ষ্যে ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল সারা ভারতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। তবে হরতাল গান্ধির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অহিংস ছিল না; দিল্লী ও পাঞ্জাবসহ বহু জায়গায় পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালালে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। এক প্রতিবেদনে জানা যায় এতে দুইজন সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুসহ আটাশজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে এবং আহত হন একশ তেইশজন।[২২২] পাঞ্জাবে এ আন্দোলন স্থানীয় প্রশাসনের দমন পীড়নের মুখেও হয়ে ওঠে সবচে তীব্র। সেখানকার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার সামরিক আইন জারি না করে সমগ্র প্রশাসনের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে যথেচ্ছ গ্রেপ্তার ও অত্যাচারসহ সভা সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। পাঞ্জাবের অমৃতসরের জনগণ এর প্রতিবাদে ১৩ এপ্রিল (নববর্ষের দিন) স্থানীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের ময়দানে সমবেত হয়। উল্লেখ্য যে, এ ময়দানের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ ছিল কেবল একটি। জেনারেল ডায়ার সে পথে মেশিনগান বসিয়ে নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালান। এ বর্বর আক্রমণে সরকারি হিসেব অনুসারেই নিহত হন ৩৭৯ জন এবং আহত হন বারোশ জন।[২২৩] শুধু তাই নয়, এর পরপর পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে সংবাদপত্রের প্রকাশ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সেখানে কোনো ব্যক্তির প্রবেশ ও প্রস্থান বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে উক্ত ঘটনা-পরবর্তী বিক্ষোভ দমনের জন্য পাঞ্জাব প্রদেশে চলল আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও ফাঁসি। এর পাশাপাশি রাস্তায় জনসাধারণকে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা ও বেত্রাঘাত সাধারণ বিষয়ে পরিণত হল; অমৃতসর শহরে বন্ধ করে দেওয়া হল পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।[২২৪] এ সব বাধা নিষেধের কারণে ভারতীয় জনসাধারণের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এ ঘৃণ্য আক্রমণ প্রকাশিত হতে প্রায় দেড়মাস সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

[২২২] সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯০ (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ. ১৬১
[২২৩] R PALME DUTT, INIDA TO DAY, Ibid, p. 338
[২২৪] সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরীণদের দুর্ভোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। গান্ধির প্রতি তাঁর আস্থা থাকলেও আন্দোলনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি গান্ধীকে সমর্থন করতে পারছিলেন না। অহিংস বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু বিপুল জনতা পুলিশের হিংস্র আক্রমণের সময় যে নিষ্ক্রিয় থাকবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বাস্তব অবস্থাও ছিল অনুরূপ। ৬ এপ্রিলের হরতালে এবং এর পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল। কলকাতা, পাঞ্জাবের অমৃতসর, বোম্বাই ও আহমেদাবাদের সংঘর্ষে হতাহত হয় বহু লোক।[২২৫] কবি মনে করতেন কয়েকজন মহান বীরই চরম আক্রমণের মুখেও অহিংস বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনোই নয়। এমন সময় স্বয়ং গান্ধি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে একটি বাণী দেওয়ার আহ্বান জানান। এর উত্তরে তিনি গান্ধির প্রতি একটি ঐতিহাসিক খোলা চিঠি লেখেন যা প্রকাশিত হয় ১৬ এপ্রিল *The Indian Daily News* পত্রিকায়। সেখানে তিনি লেখেন:

> Power in all its forms is irrational, it is like the horse that drages the carriage blindfolded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force which is necessarily moral in itself, it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes a temptation.
>
> I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturaly begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefulness.[২২৬]

অবশ্য পত্রিকায় এ চিঠি প্রকাশের তিন দিন আগে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর ঘটনা সংঘটিত হয়। কয়েকদিন পরে প্রকাশিত এ ঘটনার নৃশংসতায় ভারতবাসী হয়ে যায় স্তম্ভিত। কিন্তু আন্দোলনের নেতা গান্ধি পুরো বিষয় না জেনে কেবল বিভিন্ন স্থানে জনতা পুলিশ সংঘর্ষের খবরেই আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর হিমালয়প্রমাণ ভুলের কারণেই সত্যাগ্রহী নয়

---

[২২৫] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, ১৮৮৬–১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯৫ (দ্বিতীয় সংস্কারণ), পৃ. ১৯২
[২২৬] প্রশান্ড় কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

এমন ব্যক্তিরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছে।[২২৭] এ দিকে বিলম্বে খবর পেয়েও রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে যান কলকাতা। সেখান থেকে এন্ডরুজ সাহেবকে গান্ধির কাছে পাঠিয়ে প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন। কিন্তু গান্ধি সে সময় সরকারকে বিব্রত না করার অজুহাতে উক্ত প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আর কলকাতার চিত্তরঞ্জন দাশও পরোক্ষে অপারগতা প্রকাশ করেন একটি প্রতিবাদ সভা ডাকার।[২২৮] অগত্যা কবি নিজেই এ ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব বা স্যার উপাধি ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। তৎকালীন ভাইসরয় চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লিখিত সে চিঠিতে তিনি লেখেন:

> কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পঞ্জাব গভর্ণমেন্ট যেসব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে।... অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবিগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিতকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।...[২২৯]

এ ঘটনার এক বছর পূর্তিতে আয়োজিত একটি সভায় পাঠানো বাণীতে তাঁর ধিক্কার আরো তীব্র হয়ে ধরা পড়েছে। যেমন:

> A great crime has been done in the name of law in the Punjab. Such terrible erruptions of evil leave their legacy in the wreckage of ideals behind them. ... The cowerdliness of powerful, who owned no shame in using their machines of frightfulness upon the unarmed and unwarned villagers, and inflicting unspeakable humiliations on their fellow-beings behind the screen of an indecent mockery of justice - not feeling for a moment that it was the meanest form of insult to their own manhood - has become only possible through the opportuninty which the late war

[২২৭] "... a blunder of Himalayan dimensions which had enabled illdisposed persons, not true passive resisters at all, to perpetrate disorders," cited, R. PALME DUTT. Ibid, p. 339

[২২৮] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭-১৮

[২২৯] কবিকৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৪১৭ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

> had given to men for constantly outraging their own higher natures, trampling truth and honour under foot.[২৩০]

অবশ্য একই সঙ্গে তিনি এ বর্বর ঘটনার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত এ ঘটনার পরের বছর (১৯২০) রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে পুরনো অনেক বন্ধুর কাছে শীতল ও আন্তরিকতাহীন অভ্যর্থনার সম্মুখীন হন। তিনি বুঝতে পারেন এ হলো তাঁর 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া। কবি বিচলিত হলেন না; বরং বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতে থাকেন ভারতীয়দের দাবি দাওয়ার কথা। এমনকি উক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডবাসীর সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর ও অন্যদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষেই জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতা সমর্থন লাভ করে। মর্মাহত কবি উভয় কক্ষের সদস্যদের সম্পর্কে এন্ডরুজকে লেখেন:

> তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে রকম নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁদের খবরের কাগজগুলোতে তারই প্রতিধ্বনি যে ভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, তা' অতি ভয়াবহরূপেই কুৎসিত।... আমাদের একটি মাত্র সান্ত্বনা ছিল, ইংরেজ জাতির ন্যায়ানুরাগের প্রতি আমাদের আস্থা। আমরা ভেবেছি, যে সহজলভ্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের শক্তিমত্ততায়, অধীন দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্ব নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে দলিত মথিত করলেও, তার মারাত্মক গরল ইংরেজ সাধারণের আত্মাকে ক্লেদাক্ত করতে পারে নি।
>
> কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে, সে-বিষ আমরা যা ভাবিনি তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে; বৃটিশ জাতির নাড়ীতে ঘুণ ধরেছে; তার মজ্জা এই দারুণ বিষের প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হতে চলেছে। আমি অনুভব করছি যে ওদের মহদানুভতির উদ্দেশে আমাদের আবেদন প্রতিদিনই ক্রমশঃ ক্ষীণতর সাড়া পাবে।...[২৩১]

উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে ধারণা করা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ কথিত 'বড়ো ইংরেজ' সম্পর্কে তাঁর পূর্বের আস্থায় চিড় ধরতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় তিনি আর বেশিদিন ইংল্যান্ডে অবস্থান সমীচিন মনে করলেন না এবং দ্রুত প্যারিসে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।[২৩২] প্যারিস থেকে তিনি হল্যান্ড ও

---

[২৩০] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩

[২৩১] উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (২য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৮ (প্রথম দে'জ সংস্করণ), পৃ. ৭১

[২৩২] "Our stay in England has been wasted. Your Parliament debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of an arrogant spirit of contempt and callousness about India have deeply grieved me, and it was with a feeling of relief that I left England." এন্ড্রুজের প্রতি চিঠি থেকে উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বেলজিয়াম হয়ে কয়েকদিনের জন্য আবার ইংল্যান্ডে আসেন এবং সেখান থেকে জাহাজে করে রওনা হন আমেরিকার উদ্দেশে। কিন্তু এর মধ্যেও ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর ক্ষোভের প্রশমন ঘটেনি। বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌স থেকে তাঁর একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠিতে সেই অনুযোগ স্পষ্ট। যেমন,

> ...I feel it clear that my relationship with the continental Europe is natural and unobstructed, being disinterested. In England, I have distinctly felt in my last visit, it is obscured owing, I am sure, to the politics that ever stands between our people and yours, conciously or unconciously. I have nothing to do directly with politics, I am not a nationalist, moderate or immoderate in my polotical doctrine or aspiration. But politics is not a mere abstraction. It has its personality and it does intrude into my life where I am human.[২৩৩]

লক্ষণীয় এ চিঠিতে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের সঙ্গে রাজনীতি ও মানুষের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্কের বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত এ সম্পর্ক থেকে রবীন্দ্রনাথও কখনো বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তাই এ সময় (সেপ্টেম্বর, ১৯২০) কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধির অসহযোগ আন্দোনের প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে সে সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করে এন্ডরুজকে লেখেন:

> ... When Non-co-operation comes naturally as our final moral protest against the unnaturalness of our political situation, then it will be glorious, because true; but when it is only another form of begging, then let us reject it. ... That such a precious treasure of power should be put into the mean and frail vessel of our politics, allowing it to sail across endless waves of angry recrimination, it terribly unfortunate for our country, when our mission is to revive the dead with the fire of the soul. ... It is criminal to turn moral force into a blind force.[২৩৪]

কিন্তু তিনি অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন না করলেও ইতোমধ্যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে সে আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ স্বয়ং এন্ডরুজ(শান্তিনিকেতনের দায়িত্বপ্রাপ্ত)ও হয়ে পড়েছেন গান্ধির ভক্ত। কবি এন্ডরুজকে লিখলেন, অনেকটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে:

> ... Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know that the political problem is growing in intensity in India and its encroachment is

---

[২৩৩] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৮ম খণ্ড, কলকাতা, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৪২
[২৩৪] উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

> difficult to resist. But all the same, we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics. I do not belong to Santiniketan.[২৩৫]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এ সময় আমেরিকায় পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের বাণী এবং তারই চর্চাকেন্দ্র হিসেবে শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ-সাহায্যের আবেদন নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করেই পুনরায় ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে (মার্চ, ১৯২১)। এবার একজন সাংবাদিক হেনরি উড নেভিনসন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করলে ব্রিটিশদের সম্পর্কে তিনি আবার স্তুতিতে মুখর হয়ে ওঠেন।[২৩৬] অবশ্য এবারও ইংল্যান্ডে বেশি দিন না থেকে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপের উদ্দেশে। প্রথমে ফ্রান্স হয়ে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া এবং চেকশ্লোভাকিয়া পৌঁছেন। অবশেষে আবার ফ্রান্সের প্যারিস থেকে প্রায় চৌদ্দ মাস পর (জুলাই, ১৯২১) ফিরে আসেন ভারতে।

ভারত তখন যুগপৎ অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনে উত্তাল। ১৯১৯ সালে দেশব্যাপী যে গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল তা ১৯২০ ও ১৯২১ সালেও চলতে থাকে। R PALME DUTT- এর মতে, ১৯২০ এর শেষে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় তাতে সে বিক্ষোভ-তরঙ্গ হয়ে ওঠে আরো প্রবল। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক ২০০ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।[২৩৭] এ অবস্থায় কবি দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকারীরা তাঁর সমর্থন লাভের জন্য হয়ে ওঠেন উদগ্রীব। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকা-খদ্দরের প্রতি সমর্থন দেওয়ার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সে-প্রস্তাব কবি গ্রহণ করতে পারলেন না।[২৩৮] বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 'অসহযোগ' আন্দোলনের ৭ দফা কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি বস্ত্র বর্জন-এর সঙ্গে কবি একমত হতে পারেন নি। তা ছাড়া কেবল উক্ত বর্জন ও চরকায় সুতা কাটা পদ্ধতিতে গান্ধি ঘোষিত 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ'-এর প্রতিও ছিল না কবির শ্রদ্ধা। এ দিকে সংবাদপত্রে অসহযোগ সম্পর্কে কবির বিভিন্ন রকম কল্পিত মন্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশের জন্য রচনা করেন 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১) নামে একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি বললেন, যে জ্ঞান বিজ্ঞানের শক্তিতে

---

[২৩৫] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

[২৩৬] এন্ডর"জকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায় "... A land should be judged by its best products, and I have no hesitation in saying that the best Englishmen are the best specimens of humanity." উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

[237] R PALME DUTT, Ibid, p. 339

[২৩৮] প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম সারা বিশ্ব জয় করে নিয়েছে তা বর্জন করা অনুচিত, এমন কি অপরাধতুল্য। জাতীয়তাবাদের সে দুর্বুদ্ধি পরিহার করে বরং এ দেশের বিদ্যায়তনকে পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞানের মিলন কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু প্রবন্ধে অসহযোগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট হয়ে না ওঠায় কয়েকদিন পরে লিখলেন 'সত্যের আহ্বান' (২৯ আগস্ট, ১৯২১) শীর্ষক প্রবন্ধ। এখানে তিনি গান্ধিকে 'মহাত্মা' হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সমালোচনাও করলেন যৌক্তিকভাবে। কেবল চরকা কেটে 'কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ' করার ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন – এটার মানে হল মানুষের 'বুদ্ধিবিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত' ছাই করে দেওয়া।[২৩৯] একই সঙ্গে বিদেশি কাপড় পোড়ানোর বিরুদ্ধেও তিনি তাঁর অবস্থান ঘোষণা করেন। এ প্রবন্ধ কবিরই ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হলে গান্ধি সে সমালোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁর *Yong India* পত্রিকায়। শুধু তাই নয়, এর কয়েক দিন পর গান্ধি স্বয়ং কলকাতায় আসেন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভের আশায়। কেবল এন্ডরুজের উপস্থিতিতে ঠাকুরবাড়িতে গান্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চার ঘন্টা আলোচনা হয়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, সে গোপন আলোচনায় কোন ফল হলোনা; উভয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তে রইলেন অটল হয়ে।[২৪০] উল্লেখ্য, কবির অপর জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়ন কর্মে সহায়তাকারী লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট-এর একটি গ্রন্থের সূত্রে উক্ত আলোচনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বের যুক্তি তুলে ধরার পাশাপাশি এ সময় গান্ধির বিশেষণ 'মহাত্মা' সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁদের কথোপকথনের কিছু অংশ লক্ষ করা যাক:

> ... 'গান্ধীজি, আপনাকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করার অনুমতি আপনি দিয়েছেন আপনার অনুগামীদের। কিন্তু আপনি কি মহাত্মা?' 'না, গুরুদেব, আমি মহাত্মা নই। কিন্তু ভারতীয়েরা স্বভাবত প্রতীক ও প্রতিমার উপাসক। গুরুদেব, তাদের একটি প্রতিমা বা প্রতীক চাই। তারা যদি আমাকেই এইভাবে গ্রহণ করে তাহলে তা কি তাদের সংহত হয়ে একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুঃখবরণে সাহায্য করবে না?' 'গান্ধীজি, আপনার দেশবাসী সম্পর্কে এমন ধারণা কি সম্মানজনক, একে কি সৎ বলা যাবে?'[২৪১]

কিন্তু এ বিবরণ সে সময় প্রকাশিত না হওয়ায় তৎকালীন রাজনীতিতে এর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ এর একদিন পরই শান্তিনিকেতনে ফিরে যান এবং পুনরায় সাহিত্য রচনায়

[২৩৯] 'সত্যের আহ্বান', কালান্ড়্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১
[২৪০] উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৭
[২৪১] প্রশান্ড়্কুমার পাল, পুর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মনোনিবেশ করেন। এক পর্যায়ে (১৯২২ সালের প্রথম সপ্তাহে) শিলাইদহে গিয়ে রচনা করেন নতুন নাটক g³avi (১৯২২)।

নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়: উত্তরকূট রাজ্যের করদরাজ্য শিবতরাই। উত্তরকূট হয়ে শিবতরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে একটি নদী মুক্তধারা। শিবতরাইয়ের চাষের ও পানীয় জল এ নদী থেকেই পাওয়া যায়। করদরাজ্য হলেও শিবতরাইয়ের কৃষকরা দুর্ভিক্ষের কারণে দুই বছর যাবৎ উত্তরকূটের রাজা রণজিৎকে খাজনা দিচ্ছে না। এ অবস্থায় মন্ত্রীর পরামর্শে যুবরাজ অভিজিৎকে নিয়োগ করা হয় শিবতরাইয়ের শাসনকর্তা হিসেবে। কিন্তু প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল অভিজিৎ বাকি খাজনা তো আদায় করলোই না বরং কৃষকদের সচ্ছল করে তোলার জন্য বহু দিন ধরে বন্ধ নন্দীসংকটের পথ খুলে দেয়। এ পথ দিয়ে শিবতরাই রাজ্যের ফসল বিক্রি করা যায় বিদেশের বাজারে। শিবতরাইয়ের পূর্বতন রাজারা পথটি বন্ধ করে রেখেছিলেন যাতে এ সব পণ্য কেবল উত্তরকূটে বিক্রি হয়। তাই নন্দীসংকটের পথ খুলে দেওয়ায় এবং খাজনা সংগ্রহ করতে না পারায় রাজা রণজিৎ অভিজিৎকে প্রত্যাহার করে নেন শিবতরাই থেকে। সে স্থানে নতুন নিয়োগ পাওয়া রাজশ্যালক চণ্ডপালের অত্যাচারে শিবতরাইবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর প্রতিকারের আশায় তারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে এসে হাজির হয় উত্তরকূট রাজ্যে। এ দিকে রাজা রণজিৎ শিবতরাইবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য রাজ-প্রকৌশলী বিভূতিকে দিয়ে সম্প্রতি মুক্তধারার স্রোত বন্ধ করে দিয়েছেন। বাঁধটি অবাধ্য শিবতরাইবাসীদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে। এ সংবাদে উত্তরকূটের অধিবাসীরা বিজাতীয় উল্লাসে মেতে ওঠে এবং বিভূতিকে জানায় সংবর্ধনা। মর্মাহত যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইবাসীদের বিপদের আশঙ্কায় বিভূতিকে বাঁধ ভেঙে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়। ও দিকে উত্তরকূটবাসীরা নন্দীসংকটের পথ খুলে দেওয়ার সংবাদে বিভূতির প্রতি হয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ। রাজা রণজিৎ বিক্ষুব্ধ প্রজার কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য অভিজিৎকে কৌশলে বন্দি করে রাখেন। আবার সে সংবাদে বিচলিত শিবতরাইবাসীরা অভিজিৎকে নিয়ে যেতে চায় তাদের রাজ্যে। এ অবস্থায় মোহনগড়ের রাজা রণজিতের খুড়ো বিশ্বজিৎ বিশেষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুবরাজ অভিজিৎকে মুক্ত করে দেয়। এতে উত্তরকূটের প্রজারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে খুঁজতে থাকে অভিজিৎকে। এমন সময় সবাই শুনতে পেল বাঁধ ভেঙে মুক্তধারা প্রবাহের কলকল ধ্বনি। সংবাদ আসে যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইয়ের দুঃখ নিবারণের জন্য বাঁধটি ভেঙে দিয়েছে। বাঁধের এক দুর্বল জায়গায় অভিজিৎ আঘাত করলে পুরো বাঁধটি ভেঙে যায়। কিন্তু এর ফলে অভিজিৎও আহত হয় এবং তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাঁধভাঙা মুক্তধারার তীব্র স্রোত।

এ নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:

Dhaka University Institutional Repository

> ... Machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে – কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে – তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে।[২৪২]

কবির উল্লিখিত মন্তব্য অনুসরণ করে অনেক সমালোচক এ নাটকে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সংঘাতের চিত্র খুঁজেছেন। তাঁদের মতে, বাঁধটি হচ্ছে যন্ত্রের প্রতীক, আর সজীব গতিমান জীবনের প্রতীক মুক্তধারা নদী। বাঁধটি জীবনের গতিরোধকারীর ভূমিকা নিয়েছে। এ বাঁধের কারণেই জীবন হয়ে উঠল বিকৃত, সংকীর্ণ, ক্লেদাক্ত ও পীড়াদায়ক। অভিজিৎ অনুভব করল যে, এ বন্ধন মোচন ছাড়া মুক্তির অন্য উপায় নেই। সেই লক্ষ্যেই অভিজিতের আত্মবিসর্জন, আত্মমুক্তি।[২৪৩] সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যন্ত্রকে দেখেছেন পাশ্চাত্যের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ হিসেবে।[২৪৪] আর অজিত কুমার ঘোষের মতে,

> মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতা এবং হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। ... এই যান্ত্রিকতার আশ্রয় লইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্রমাগত শক্তি এবং সম্পদ লাভ করিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিতেছে।[২৪৫]

কবির বক্তব্য ও সমালোচকদের মন্তব্য জানা সত্ত্বেও নাটকটির আখ্যান বিশ্লেষণে গেলে দেখা যায়, এখানে সরাসরি দুটো পক্ষ পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রথম – উত্তরকূটের রাজা ও সাধারণ জনতাসহ প্রকৌশলী বিভূতি। দ্বিতীয় – শিবতরাইবাসী, ধনঞ্জয় বৈরাগী, রাজকুমার অভিজিৎ, সঞ্জয়, রাজখুড়ো বিশ্বজিৎ, বটুক, অম্বা প্রমুখ চরিত্র। বিরোধের মূল কারণ, উত্তরকূটাধিপতি রণজিৎ কর্তৃক শিবতরাই থেকে কর আদায় করতে না পারা এবং তার ফলে উত্তরকূটের সচ্ছলতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার

---

[২৪২] উদ্ধৃত (গ্রন্থ পরিচয় অংশ); রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩২-৩৩

[২৪৩] "মুক্তধারার বদ্ধ জল বদ্ধ জীবনস্রোতের প্রতীক, নন্দীসংকটের রুদ্ধ পথ রুদ্ধ জীবনের প্রতীক, ... জীবনস্রোতে আর একবার স্বভাবের গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য অভিজিৎ জীবন ত্যাগ করিয়াছে।" প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

[২৪৪] "পাশ্চাত্য-জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি বিপুল শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে শক্তি বুদ্ধির শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি। এই যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই তাহারা বিজিত জাতিকে দমন করিতেছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে, অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, জয় করিতেছে।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

"এই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি হইতেছে যন্ত্রের সহিত প্রাণের, যান্ত্রিকতার সহিত আধ্যাত্মিকতার, বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের দৈত্যের সহিত দেবতার, মানুষের পশু অংশের সহিত দেব অংশের।" পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮

[২৪৫] অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

নিবৃত্তি না হওয়া। শিবতরাইবাসীকে কর দিতে বাধ্য করার জন্যই বাঁধ তৈরি করেছেন রণজিৎ। আবার যুবরাজ অভিজিৎ নন্দীসংকটের পথ উন্মুক্ত করায় তাকে শিবতরাই থেকে প্রত্যাহার করে নিয়োগ করা হয়েছে অত্যাচারী চণ্ডপালকে।

স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে শিবতরাইবাসী এ সব অন্যায় কাজের প্রতিকারে এগিয়ে আসবে, সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু নাটকে শিবতরাইবাসীর অনুরূপ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করা যায় না। তারা উত্তরকূট আসে মূলত রাজশ্যালক চণ্ডপালের অত্যাচার সম্পর্কে রাজাকে জানাতে এবং যুবরাজ অভিজিৎকে ফিরিয়ে নিতে। যেন রাজশ্যালক অত্যাচারী হলেও রাজা হবেন সুবিচারক, এবং তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দেবেন। নিচের উদ্ধৃতিসমূহে তা লক্ষ করা যেতে পারে:

ক) (শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ)

ধনঞ্জয়। একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে কী হয়েছে?

১। প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।[২৪৬]

[নিম্নরেখা বর্তমান লেখকের]

খ) শি ৩। এ কী বিষণ যে! খবর কী?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি?

সকলে। রাজাকে মানি নে।[২৪৭]

---

[২৪৬] মুক্তধারা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭
[২৪৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তারা যুবরাজের মত একজন সহানুভূতিশীল শাসক চায়। প্রয়োজনে জোর খাটাতেও প্রস্তুত। কিন্তু ঠিক সে সময় রাজা সেখানে উপস্থিত হলে সবাই তাকে প্রণাম জানাতে ভোলে না। যেমন:

(রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রণজিৎ। কাকে মানিস নে?

সকলে। প্রণাম!

গনেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিৎ। কিসের দরবার?

সকলে। আমরা যুবরাজকে চাই!

রণজিৎ। বলিস কী!

১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ। আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি।[২৪৮]

তাদের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী এবার রাজার কাছে খাজনা না দেবার কারণ ব্যাখ্যা করে। নিচের সংলাপে আছে তার পরিচয়:

রণজিৎ। খাজনা দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেবো না।

রণজিৎ। দেবে না? এত বড় আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ। আমার নয়?

ধনঞ্জয়। আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।[২৪৯]

কিন্তু রাজা ধনঞ্জয়কে বন্দী করে রাখলে প্রজারা নিরুপদ্রবে শূন্য হাতেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

শিবতরাইবাসীরা চলে যাওয়ার পর নাটক আবর্তিত হয় যুবরাজ অভিজিৎকে কেন্দ্র করে। সে নন্দীসংকটের পথ খুলে দিয়েছে বলে তার শাস্তি দাবি করে উত্তরকূটের জনতা। সেই বিক্ষুব্ধ জনতার

---

[২৪৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪–১৫

[২৪৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫; এখানে উদ্বৃত্ত অন্ন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস কথিত 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বের কথা মনে আসতে পারে। ধনঞ্জয় বৈরাগী যে ভাবে উদ্বৃত্ত অন্ন রাজার বলে মত প্রকাশ করেছে তাতে পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের বিষয়টি ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য এটা লেখকের সচেতন চিন্তায় ঘটেছে কি না বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

হাত থেকে রক্ষার জন্যই রাজা অভিজিৎকে বন্দী করে রাখে। যদিও অভিজিৎ সেখান থেকেও পালিয়ে যায় এবং বাঁধ ভেঙে দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। দেখা যাচ্ছে, নাটকের মূল দ্বন্দ্ব এক বিন্দুতে স্থির থাকে নি। নাট্যদ্বন্দ্বের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। প্রথম, নির্মিত বাঁধটি কেন্দ্র করে শিবতরাইবাসীসহ উত্তরকূটেরও কয়েকজনের বিরুদ্ধতায় একটি দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়, উত্তেজিত শিবতরাইবাসীর সঙ্গে খাজনা বিষয়ে রাজা রণজিতের দ্বন্দ্ব। এবং তৃতীয়, অভিজিৎকে কেন্দ্র করে উত্তরকূটবাসী ও রাজা রণজিতের দ্বন্দ্ব। সাধারণত একটি নাটকের কাহিনীতে একাধিক মূল দ্বন্দ্ব আকাঙ্ক্ষিত নাট্য অভিঘাত সৃষ্টিতে সহায়তা করে না।[২৫০] এখানে স্বার্থের ভিত্তিতে দুটো পক্ষ স্পষ্ট হলেও একক কোন দ্বন্দ্ব প্রধানভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। কর না দেওয়ার অপরাধে শিবতরাইবাসীদের জব্দ করার জন্য কাহিনীর সূচনায় যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেমন, অভিজিৎকে প্রত্যাহার, চণ্ডপালের নিয়োগ ও বাঁধ নির্মাণ – তার বিরুদ্ধে শিবতরাইবাসীদের ও উত্তরকূটের ক্ষতিগ্রস্তদের সংগ্রামের ফলে যদি বাধ ভাঙার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তা হলে কাহিনীটি বাস্তবভিত্তিক সম্পূর্ণতা পেতে পারতো। কারণ অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের মধ্যে এর প্রতিকার স্পৃহা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে, তাদের সংগ্রাম পরিণত হতো বিদ্রোহে, বিপ্লবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পথে অগ্রসর না হওয়ায় নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ বাস্তবানুগ হতে পারে নি। হয়তো ধারণা করা হয়েছে যে, সে পথ যেহেতু হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার, রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার সম্মিলিত সংগ্রাম, সেহেতু ঐ পথে ঘটবে রক্তাক্ত পরিণতি। এবং তার ফলে প্রজা কর্তৃক রাজপুরুষের অবমাননা, এমনকি হত্যার মতো পরিস্থিতির উদ্ভবও ঘটতে পারে। আর সেখানেই হয়তো কবির মন সায় দিতে প্রস্তুত নয়। প্রতিবাদী জনতার হিংসাত্মক প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।[২৫১] সত্যিকারের অহিংসবাদীর মতোই তিনি মারকে না-লাগার অনুভূতি দিয়ে জয় করতে চান, না-মারা দিয়ে ঠেকাতে চান। তিনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে চান আত্মার শক্তিতে। অথচ যৌক্তিক ও বাস্তব সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী হলে শিবতরাই রাজ্যের মানুষদের সুষ্ঠু জীবনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হতে পারতো। তারা অনাবশ্যক করভারে জর্জরিত হতো না, কৃষিকাজ ও খাওয়ার জল সমস্যার সম্মুখীন হতো না, কিংবা উৎপাদিত ফসল বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রির ক্ষতিও তাদের স্বীকার করতে হতো না।

---

২৫০ "কাহিনী যেহেতু ঘটনার অনুকরণ, একটি মাত্র ঘটনাকেই তা অনুকরণ করবে, আর সেই ঘটনাটি হবে – 'আদি-মধ্য- অন্ত্য যুক্ত একটি সম্পূর্ণ ঘটনা এবং তা এমন ঘটনা যার অংশ সমূহের মধ্যে এমনই এক জমাট ঐক্য থাকবে যে– কোন একটিকে সরিয়ে নিলে বা বদল করলে সমস্ত কাহিনীটিই বিকলাঙ্গ ও ব্যাহত হবে।" সাধন কুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২০৪

২৫১ সমালোচক ও তাত্ত্বিক বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন শক্তির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু যে শক্তি সংহত ছিল শিবতরাই-এর মানুষের মধ্যে, বৃদ্ধ বটুর মধ্যে, সমস্ত নিপীড়িত সর্বহারাদের মধ্যে, তার আগ্নেয় বিস্ফোরণ দেখান নি। এমন কি পীড়িত শক্তি যাকে নেতা বলে স্বীকার করেছিল সেই ধনঞ্জয়ও সকলের ক্ষোভকে সংগঠিত বিরুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন নি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ নির্ভর মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে তার ঐক্য ছিল না বলে।" সাহিত্য বিচারঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও নাটকের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সহায়ক হতে পারতো। কারণ এ সময় বাংলাদেশসহ সারা ভারতে একদিকে যেমন শিল্পশ্রমিক এবং রেল ও স্টিমার কমীদের ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন প্রান্তে চলছিল কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত 'কর বন্ধ' আন্দোলন। সুমিত সরকার প্রদত্ত তথ্যে পাওয়া যায়:

> গোটা ১৯২১ জুড়ে শ্রমিকরা যেন সত্যিই খেপে উঠেছিলেন বলে মনে হয়। এই সময়ে ৩৯৬ টি ধর্মঘট হয়। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৬,০০,৩৫১ জন শ্রমিক এবং নষ্ট শ্রমদিবসের পরিমাণ ছিল ৬৯,৯৪,৪২৬। ... ১৯২১-এ বাঙলার চটকলগুলোয় ১৩৭ টি ধর্মঘট হয়, তাতে যুক্ত ছিলেন ১,৮৬,৪৭৯ জন শ্রমিক।[২৫২]

এ সব ধর্মঘট ও আন্দোলন ব্রিটিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশি জমিদার, শিল্পপতি এমনকি গান্ধি ও কংগ্রেসকেও বিব্রত করে তুলেছিল। ধর্মঘট নিয়ে গান্ধির অবস্থান ছিল দ্ব্যর্থহীন; তাঁর মতে "ধর্মঘট অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনার আওতায় পড়ে না।"[২৫৩] কিন্তু এসব ধর্মঘট ছিল ভারতবর্ষের বিপুল শ্রমজীবী মানুষের ওপর বহু যুগের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ; কংগ্রেস-সূচিত অসহযোগ কিংবা খিলাফৎ আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ফল নয়।[২৫৪] এ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী থেকে সমান্তরাল ধারার নাটক আন্দোলনকারীদের মনোবল দৃঢ় করে তুলতে পারতো। কিন্তু জনগণের সংগ্রাম তথা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড কবি সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি বলে আন্দোলনের সঙ্গে যেমন একাত্ম হন নি, তেমনি নাট্যকাহিনীতেও তার প্রশ্রয় দেন নি। ফলে এক অনির্দেশ্য রহস্যময়তার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যা থেকে কোন সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ার উপায় থাকে না।[২৫৫]

---

২৫২ সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০, দ্রষ্টব্য ২১১-২৬

২৫৩ এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম : "ভারতে কোনো রাজনৈতিক ধর্মঘট আমরা চাই না। ... সমস্ড়রকম অসংযত ও ব্যাঘাত করার উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতেই হবে। ... পুঁজি বা পুঁজিপতিদের আমরা ধ্বংস করতে চাই না, বরং চাই পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে পুঁজিকে আমরা আমাদেরই দিকে কাজে লাগাতে চাই। সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটে উৎসাহ দেওয়া হবে মূর্খামি"। উদ্ধৃত; সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

২৫৪ "সমস্ড় দেশ জুড়ে শহরের ধর্মঘট আর গ্রামের জমির লড়াইয়ের ভিতর জনশক্তির যে বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছে তা কংগ্রেসেরই আন্দোলন – বিশেষ করে অসহযোগ আন্দালনেরই ফল এরকম ধারণা একেবারেই মিথ্যাচার। ... মারখাওয়া মানুষ আজ নিষ্ক্রিয়তার হাতে আত্মসমর্পণের পথ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছে। এই গণ জাগরণই জাতীয় সংগ্রামের যথার্থ শক্তি ও মর্যাদা সঞ্চার করেছে। এই গণ জাগরণের কারণ অনুসন্ধাণ করতে হবে বহু যুগসঞ্চিত অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামগ্রিক দাসত্বের ইতিহাসের মধ্যে।" উদ্ধৃত; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬ তম অধিবেশনে [২৭ ডিসেম্বর, ১৯২১] প্রতিনিধিগণের প্রতি [ভারতের কমিউনিস্ট পাটির] ইশতিহার, মুজফ্ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা, ১৯৯৬ (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ, ১২৮

২৫৫ রবীন্দ্রজীবনীকার KRISHNA KRIPALANI এ কারণেই g³a৷i৷i সমাপ্তির সঙ্গে ইবসেন-এর শেষ পর্যায়ের নাটকগুলোর সাযুজ্য লক্ষ করেছেন; "The socio-political motif of the play if such there is, seems to dissolve at the end in an undefined sense of mystic selffulfilment, as in

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত তৎকালীন সমাজের এক বিশেষ উচ্চ ও সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির সদস্য এবং একইসাথে চরম ভাববাদী দর্শনের অনুসারী ব্যক্তির পক্ষে বাস্তব জীবনের মতো শিল্প সাহিত্যের কাহিনীতেও কৃষকদের বিদ্রোহ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই মানসিকতা যে শ্রেণি-স্বার্থের রাজনীতি-উদ্ভূত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মধ্যেও। সে কৃষকনেতা হয়েও এ দেশের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ কোন সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসারী নয়। সে হয়ে উঠেছে গান্ধির মতো ভগবান-আশ্রয়ী, অহিংসবাদী নেতা। লক্ষণীয় যে, শিবতরাইবাসীরা তাকে 'ঠাকুর', 'প্রভু' হিসেবে সম্বোধন করে। এ প্রসঙ্গে গান্ধি সম্পর্কে এম এন রায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> ... আত্মার বিশুদ্ধীকরণ জাতীয় উদ্ভট মতবাদ বিত্তশালী বুদ্ধিজীবীদের ভালো লাগতে পারে, কিন্তু ক্ষুধিত মানুষের কাছে এর মোহ চিরস্থায়ী হতে পারে না। বাঁচার তাগিদ কোনো বাধাই মানে না।[২৫৬]

অবশ্য ধনঞ্জয়ের অহিংসবাদ আবার হুবহু গান্ধির সত্যাগ্রহের মতো নয়, বরং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তা-ই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মতে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন সবার জন্য নয়, কয়েকজন দৃঢ়চেতা বীরের পক্ষেই কেবল তা সম্ভব।[২৫৭] তাই ধনঞ্জয় বৈরাগী অত্যাচারের মুখে কৃষকদের নির্বিকার থাকার উপদেশ দেয়। যেমন,

ক. ধনঞ্জয়। ওরে আজও মারকে জিততে পারলিনে? আজও লাগে?

২ (প্রজা) । রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার! বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরের যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।[২৫৮]

খ. গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ঐ ষণ্ডামার্কা চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।[২৫৯]

---

some of Ibsen's lates plays" KRISHNA KRIPALANI, RABINDRANATH TAGORE : A BIOGRAPHY, VISVABHARATI, CALCULTTA, 1980, p. 311

[২৫৬] উদ্ধৃত; ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইশতিহার, মুজফ্ফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

[২৫৭] ২২০ নং সূত্র দ্রষ্টব্য

[২৫৮] মুক্তধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

[২৫৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এ রকম আধ্যাত্মিক নেতার পক্ষে সংগ্রামের মাধ্যমে দাবি আদায় অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। এক পর্যায়ে শিবতরাইবাসীর মানস-প্রবণতা সম্পর্কে রাজা রণজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ রীতিমতো প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। যেমন:

ক. রণজিৎ। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এত দিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতটা মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকী, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনে বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন? সরো-না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদের মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।[২৬০]

স্পষ্ট বোঝা যায়, রাজা রণজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সম্পর্কটি অন্তত বিরোধের নয়। আর এটি কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যখন কৃষকদের প্রতি অত্যাচার এবং তাদের দাবিসমূহ বস্তুগত দৃষ্টিতে না দেখে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণে বিচার করা হয়। এদিক থেকে নিঃসন্দেহে সে একজন যথার্থ অহিংসবাদী নেতা। তবে ধনঞ্জয়ের প্রতি রণজিতের সংলাপ যেমন, "ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে" কিংবা "রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন

---

[২৬০] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?[২৬১] দুটিতে যে সমালোচনা লক্ষণীয় তাতে গান্ধির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের ('মহাত্মা' বিষয়ে) ছায়া আছে বলে মনে হয়। তেমনি ধনঞ্জয়ের সংলাপের এক অংশে – 'যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি' – আত্মসমালোচনার যে সুর লক্ষ করা যায় তা তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে রচিত বলে অনুমান করা যায়। কারণ, গান্ধির আহ্বানে সাড়া দেওয়া স্বতঃস্ফূর্ত জনতা যে সত্যিকারের সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠে নি, তা গান্ধির মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লক্ষ করেছিলেন। এসব কারণে সে সময়ও g³a/i/ নাটকটিকে অসহযোগ আন্দোলনকেন্দ্রিক নাটক বলে মন্তব্য করা হয়েছিল।[২৬২] তাই নাটকের চরিত্রদের 'পাকিয়ে তুলতে' না পারার ব্যর্থতায় পশ্চাদপসরণকারী ধনঞ্জয়ের মতো ভারতের অহিংসবাদী নেতা মোহনদাস গান্ধি শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক উত্থান দেখে, সাফল্যের কাছাকাছি গিয়েও স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন আন্দোলন।[২৬৩]

এ ভাবে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই গণআন্দোলন-বিমুখ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এ মনোভাব তাঁর বিশেষ সামাজিক অবস্থানের কারণে হওয়ার সম্ভাবনা। তা ছাড়া অপর একটি সংলাপে জমিদার রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গিসহ উপস্থিত। যেমন, রাজা রণজিৎ কে ধনঞ্জয় বলে, 'আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।' – সংলাপটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর; কারণ রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কৃষক যে ফসল ফলায় তার একটি অংশ রাজা কেন ভোগ করবে, এ বিষয়ে বৈরাগীর মনে কোন প্রশ্ন নেই। বস্তুতপক্ষে জমিদারকে 'জমির জোঁক' পরাশ্রিত জীব, বলেও চাষীর উৎপাদনে জমিদারের (নাটকে রাজার) স্বত্ব ধনঞ্জয় বৈরাগী বা জমিদার রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারছেন না।[২৬৪] সোভিয়েত সাহিত্য সমালোচক লুনাচারস্কি এক রচনায় বলেছিলেন, "একটি শিল্পকর্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্বদা লেখকের শ্রেণীমনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে।"[২৬৫] বৈরাগীর সংলাপে নাট্যরচয়িতার এই মনস্তত্ত্ব স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। সে সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতি না করলেও,

---

[২৬১] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮

[২৬২] "এই নাটকখানি 'প্রবাসী' তে প্রকাশিত হবার পর এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করেচেন। কেউ কেউ বলেচেন ওখানা লেখা হয়েচে অসহযোগ আন্দোলনকে আক্রমণ করে"। বিজলী, পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত; র্ন্দ্রিপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

[২৬৩] বোম্বের তৎকালীন গভর্নর লর্ড লয়েড এ আন্দোলন সম্পর্কে মন্ড়ব্য করেছিলেন, "'Gandhi's was the most colossal experiment in world history; and it came within an inch of succeeding. But he couldn't control men's passions. They became violent and he called off his programme." Quoted. R. PALME DUTT, ibid, p. 351

[২৬৪] "আমি জানি জমিদার জমির জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। ... নিজেকে ছোট হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে।" 'রায়তের কথা', কালান্ড়র, পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২৭

[২৬৫] উদ্ধৃত; সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্ড়া, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা রাজনৈতিক নাটক না লিখতে চাইলেও রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। বরং সঠিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবকল্যাণ-বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য শিল্প-সাহিত্যে প্রচারিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করে এবং আর্ন্তজাতিকতাবাদে আস্থাশীল হয়ে বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা করেছেন যে কবি, তিনিই সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েন শ্রেণি-সংকীর্ণতার প্রাচীরে।

g³aviv নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। এ নাটকের অন্যতম এন্টাগোনিস্ট উপাদান একটি যন্ত্র (Machine)। এই যন্ত্রকেই অভিজিৎ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পরাজিত করেছে। কারণ, যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্র দিয়ে ভাঙলে প্রকারান্তরে যন্ত্রেরই জয় হয়; কিংবা মানুষের অধিকতর পরাজয় ঘটে।[২৬৬] নাটকে এই যন্ত্র তথা বাঁধটিও এক অপশক্তি হিসেবে প্রতীকায়িত। যন্ত্রটি শিবতরাইবাসীকে জব্দ করার জন্য নির্মিত হলেও কয়েকজন উত্তরকূটবাসী এর ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অম্বার সন্তান, বটুকের নাতিসহ আরো অনেকের জীবন বিনষ্ট হয়েছে এই বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে। তাই একাধিক দৃশ্যে শোনা গেছে অম্বা ও বটুকের আর্তনাদ। আবার নির্মিত বাঁধের বীভৎস আকৃতিও রাজা রণজিৎসহ বহু মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন করেছে। যেমন:

ক) বিভূতি। ... দেখো উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরেনি।[২৬৭]

খ) রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কি আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ ভুলে যাচ্ছেন, এটা তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

... ...

রণজিৎ। দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে।[২৬৮]

এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপেও এই যন্ত্রের ভয়ানক আকৃতির বর্ণনা রয়েছে। যেমন:

ক) পথিক। বাবা রে! ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে. মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা।[২৬৯]

---

[২৬৬] প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬
[২৬৭] মুক্তধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
[২৬৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

খ) উত্তরকূট ১। ... ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন। উত্তরকূটে যে দিকে ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।[২৭০]

একটি যন্ত্রের প্রতি নাট্যকারের এ মনোভঙ্গি আধুনিক মানুষের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যন্ত্র বহু ক্ষেত্রে মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করে অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। সর্বোপরি যন্ত্রের যথাযোগ্য প্রয়োগেই বর্তমানের বিশাল এই সভ্যতার সৃষ্টি। তাই আধুনিক মানুষের পক্ষে যন্ত্রের বিরুদ্ধতা অবান্তর বলে প্রতীয়মান হয়।[২৭১] সমস্যা হতে পারে যন্ত্রসংগঠন ব্যবস্থার মধ্যে। যন্ত্র সর্বমানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না সেটাই মূল কথা। বিজ্ঞান বা যন্ত্র সভ্যতার বিপুল সুবিধাসহ সারা পৃথিবীতে ভোগ করছে কেবল একটি শ্রেণি। সে সঙ্গে অপর এক বিশাল শ্রেণির মানুষকে তারা করছে নিপীড়ন ও শোষণ। অথচ অভিজিৎ বা g³aviv নাটক সেই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে না, সেই যন্ত্রসংগঠনকে আঘাত করে না। সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার তাই বলেন, “যন্ত্রভিত্তিক, সভ্যতার আন্তরবেদনার ও সংঘাতের যে নাট্যরূপ মুক্তধারায় দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব সামাজিক সংঘাত ও বেদনার প্রকৃত কোন মিল অথবা সঙ্গতি নেই।” [২৭২]

প্রায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন নীহাররঞ্জন রায়:

যন্ত্ররাজ বিভুতির সঙ্গে যুবরাজ অভিজিতের যে দ্বন্দ্ব তাহা সমাজ চৈতন্যের সজ্ঞান পরিচয় নয়; অভিজিৎ যন্ত্রটাকে আঘাত করিয়া ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যাহারা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে দাস করিয়াছে, তাহাদের আঘাত করেন নাই।[২৭৩]

মুনীর চৌধুরী মতে, “সমকালীন পাঠক দর্শক শ্রোতা হয়ত মুক্তধারায় মন্ত্রীর গানের চেয়ে যন্ত্রীর গানেই বেশি মুগ্ধ হবে।”[২৭৪]

এ কালের কয়েকজন মার্কসবাদী আলোচক g³aviv নাটক সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত ও চকিত মন্তব্য করেছেন। তাঁদের মতে, উত্তরকূটের রাজা এবং তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারী প্রজাদের মধ্যে

---

২৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

২৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭

২৭১ পরবর্তী সময় যন্ত্রের প্রতি কবির উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৩০ সালে শেষবারের মতো আমেরিকায় গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন- “We have nothing to blame machinery for in itself. It is men who are greedy and make use of the truths of science in order to exploit each other for their own selfish purpose.” The Boston Herold: 14th October, 1930 থেকে উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক এবং রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১০৩

২৭২ অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্র মানস, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৬৪

২৭৩ নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০

২৭৪ রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক: আনিসুজ্জামান), ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশের প্রচ্ছায়া আছে। আর শিবতরাই হলো পরাধীন ভারতবর্ষ। যন্ত্ররাজ বিভূতিকে তুলনা করা হয়েছে এ যুগের টেকনোক্র্যাটদের সঙ্গে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে তৎকালীন অহিংস প্রতিরোধ এবং অভিজিতের জীবনদানে তৎকালীন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের আত্মত্যাগের নির্দশন খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা।[২৭৫] সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোভাব আমরা ইতঃপূর্বে লক্ষ করেছি, যেখানে তিনি বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে 'উৎপাত', 'অন্যায়', 'অত্যাচার' এমন কি 'দস্যুবৃত্তি', ও 'তস্করতা' বলে অভিহিত করেছিলেন।[২৭৬] আর অভিজিৎ এখানে নিপীড়িত পক্ষের হয়ে আত্মবিসর্জন দিলেও কবির মতে সে 'মারনেওয়ালাদের' ভেতরের মানুষ, অর্থাৎ ইংরেজ পক্ষের। তাই অভিজিৎ সম্পর্কিত সমীকরণটি যুৎসই নয়। টেকনোক্র্যাট হিসেবে বিভূতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আধুনিক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তা ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। তবে উত্তরকূট-শিবতরাই সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ সম্পর্ক প্রতীকায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। সে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় অহিংসবাদী গান্ধির সমান্তরাল হিসেবে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথাও। বস্তুত তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ স্মরণ করলে এ তুলনা খুব স্বাভাবিকভাবে আসে। সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন লেখক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও এ নাটক সম্পর্কে বলেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা একটি সাংকেতিক রাজনৈতিক নাটক। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, কলোনির জনগণের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার, প্রতিরোধ এই সকল বিষয় প্রতীক আকারে এসেছে এ নাটকে। এই নাটকে দুইটি রাজ্যের নাম দেখতে পাই। উত্তরকূট – তা হলো সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের রাজ্য আর শিবতরাই হলো তারই উপনিবেশ। ... শিবতরাইয়ের জনগণের বিদ্রোহ, প্রজাবিদ্রোহকে আমরা খুব সহজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ রূপে ধারণা করতে পারি।[২৭৭]

স্মর্তব্য, g³aiv নাটক প্রকাশের কিছুদিন পর রামমোহন লাইব্রেরিতে তা পড়ে শোনাবার সময় (২১ জুলাই, ১৯২২) এর রূপকের আবরণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেকখানি মোচন করে দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন:

> যে আন্দোলনের স্রোতে দেশ আজ ওতপ্রোত তাহাকে রূপকের মধ্য দিয়ে ফুটাইয়া তোলা নাটকখানির উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য অত বড় একটা পারিপার্শ্বিক ঘটনার ছাপ উহাতে না

---

[২৭৫] হায়দার আকবর খান রনো, রবীন্দ্রনাথঃ শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২০৪
[২৭৬] দেশহিত (পরিশিষ্ট অংশ) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪১
[২৭৭] হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত; ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

> থাকিয়াও পারে না। পথকে মুক্ত করা, মানবের মিলনের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই যে সমস্ত সভ্যতার শেষ কথা, উহাই নাটকে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।[২৭৮]

উপরি-উক্ত সূত্রে আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ রূপক-সাংকেতিকতার পরিচিত আবরণে g³a\i\ নাটকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁরই আধ্যাত্মিক ও বিশ্ব মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক সংকটের আকাঙ্ক্ষিত সমাধান। যেমন, ধনঞ্জয় ও তার অহিংস অনুসারীদের আদর্শে তিনি উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনকারীদের। আবার রাজকুমার অভিজিতের মাধ্যমে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদেরও আন্দোলনকারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সহানুভতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত নাটক রচনার প্রায় দেড়মাস আগে (১৭ নভেম্বর, ১৯২১) ভারতে ব্রিটিশ যুবরাজের আগমন ঘটে এবং সে উপলক্ষ্যে বোম্বাই ও কলকাতায় হরতাল পালিত হয় সাফল্যজনকভাবে।[২৭৯] কিন্তু দেশবাসী হরতাল করলেও রাজবংশীয়ের প্রতি, যুবরাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তি, আস্থা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল বহু পূর্ব থেকে। স্মর্তব্য, ১৯০৬ সালে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ঠিক পরের বছর তৎকালীন ব্রিটিশ যুবরাজ (পরবর্তী সময় পঞ্চম জর্জ) ভারত সফরে এলে ‘রাজভক্তি’ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ কখনোই ভারতবাসীকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে নি। তাই তারা বুঝতে পারেনি যে, “রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত।”[২৮০] সে ক্ষেত্রে তাঁর মতে, ভারতের শাসনভার আমলাদের হাতে না দিয়ে কোন রাজবংশীয়কে রাজা হিসেবে নিয়োগ বা ঘোষণা দিলেই আর প্রজা অসন্তোষ থাকে না। সে সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য স্মরণযোগ্য:

> রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংল্যান্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংল্যান্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসিন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক রাখিব না, এ স্পর্ধা ধর্মরাজ কখনোই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না– ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে।[২৮১]

এদিক থেকে যুবরাজ অভিজিৎ কর্তৃক শিবতরাইয়ের শাসনভার গ্রহণ এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্য প্রাণ বিসর্জনের ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুদিন-লালিত অপর একটি ধারণার বাস্তবায়নও যে এ নাটকে ঘটেছে, তা সহজেই অনুধাবন করা চলে। বোধ করি এ জন্যেই রচিত হওয়ার পর থেকে

---

[২৭৮] উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৮ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

[২৭৯] সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

[২৮০] ‘রাজভক্তি’, রাজা প্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

[২৮১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সভায় তিনি এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাসহ নাটকটি পাঠ করে শোনান এবং নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন দ্রুততার সঙ্গে। ফলে প্রায় তিন মাসের মধ্যে নাটকটি ‘cevmx’ পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৯ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯২২), ইংরেজীতে *The modern review* পত্রিকায় (May, 1922) *The Waterfall* নামে এবং গ্রন্থাকারে (২৮ জুন, ১৯২২) প্রকাশিত হয়।[২৮২] এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটি পত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে এ নাটকের প্রকাশ যে কবির বিশেষ উৎসাহেই ঘটেছিল তা অনুমান কর কষ্টকর নয়। নাটকের বক্তব্য খুব দ্রুত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এবং ইংরেজ প্রশাসনেও গোচরীভূত হোক, এটাই যেন তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সমাধান নাটকে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে যুযুধান কোন পক্ষেরই আকাঙ্ক্ষার সাযুজ্য ছিল না।

প্রকৃত পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম না হলে, কৃষক শ্রমিকের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যও যথাযথভাবে শিল্পকর্মে ধারণ করা সম্ভব হয় না। যদি তা হতো, তা হলে এ দেশের বহু কৃষক-সংগ্রাম ও সে সময়ের ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারতেন; এবং নাটকেও প্রকাশ করতে পারতেন সে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যৌক্তিক সমাধান। সে ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে নাটকটি ব্যাপক প্রভাব ফেলতেও সক্ষম হতো। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সে সময় বিদ্রোহী কৃষকরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করার মাধ্যম হিসেবে গ্রামীণ নাটক, গান ও চারণ কবিদের আবৃত্তি ব্যবহার করেছিল।[২৮৩] g³avi নাটকেও সে সুযোগ ছিল; কিন্তু নাট্যকারের বস্তুবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা আর হয়ে ওঠে নি। বস্তুত শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সে সময়ের জমিদার, মধ্যশ্রেণি বা পাতি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের পক্ষেও শ্রমিক-কৃষকের মিলিত শক্তিকে সঠিক পথে তথা সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের লেজুড় বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণির বিরুদ্ধে পরিচালিত করা নানা কারণে সম্ভব হয় নি। লক্ষণীয় ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে কৃষকদের একটি থানা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ২২ জন পুলিশ নিহত হলে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মূলত গান্ধীর সিদ্ধান্তে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করে। সে সঙ্গে সভায় গৃহীত কয়েকটি ধারায় স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় বলা হয় কৃষকরা যেন অবশ্যই জমিদার ও সরকারের প্রাপ্য খাজনা ও কর মিটিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে খাজনা কিংবা কর বন্ধ মোটেই হিংসাত্মক কর্মসূচি ছিল না; বরং তা স্পষ্টতই ছিল শ্রেণি স্বার্থের প্রশ্নে শান্তিপূর্ণ এবং একই সঙ্গে বিপ্লবাত্মক উপায়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রমিক-কৃষক তথা শোষিত শ্রেণির স্বার্থের বিপক্ষে থাকার কারণেই গান্ধীর অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক রজনী পাম দত্ত এ জন্যই মন্তব্য

---

[২৮২] The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol. Two, Ed. Sisir Kumar Das, Delhi 1996, p. 165.
[২৮৩] ভারতবর্ষের ইতিহাস, পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৪৫

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন যে, গান্ধীর অহিংসার বুলি আসলে একটি খোলস মাত্র, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তা শ্রেণিস্বার্থ ও শোষণব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছিল।[২৮৪] কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট মত হলোঃ

> The dominant leadership of the congress associated with Gandhi called off the movement because they were afraid of the awaking mass activity; and they were afraid of the mass activity beacause it was beginning to threaten those propertied class interests with which they themselves were still in fact closedy linked.
>
> Not the question of ævioleence” or ænon-violence’ but the question of class interests in oppositin to the mass movement, was the breaking-point of the national struggle in 1922....[২৮৫]

এ প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের g³aivi নাটকের পরিণতিতে বিশ্বমানবের ‘মিলনের পথকে উন্মুক্ত’ করা, ‘পথমোচন’[২৮৬] কিংবা আধ্যাত্মিক বাণীর আড়ালে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর শ্রেণিস্বার্থ উদ্ভূত মতবাদই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। গান্ধির একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ, দিল্লির জওয়াহরলাল নেহরুসহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ক্ষুব্ধ হলেও তাদের পক্ষে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার উপায় ছিল না। কারণ তারাসহ অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই তখন জেলে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। বরং এ সুযোগে ব্রিটিশ সরকার মার্চ মাসে (১৯২২ সালের) স্বয়ং গান্ধিকেও গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অভিযোগে। ইতঃপূর্বে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার গান্ধিকে বন্দী করার সাহস করে নি। বিচারে গান্ধি সব দোষ স্বীকার করে নেন এবং বিচারক তাঁকে ছয় বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। সরকারের এ বিচারের বিরুদ্ধে সারাদেশে কোন প্রকার বিক্ষোভ কিংবা অসন্তোষ লক্ষ করা যায় নি।

emŠÍ : উক্ত ঘটনার কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিংহলসহ পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে ডিসেম্বরের (১৯২২) মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এ সময় উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য চিন্তা করা হয় একটি অভিনয়ের। এ উপলক্ষ্যে তিনি রচনা করেন emŠÍ (১৯২৩) নামে একটি

---

২৮৪ R PALME DUTT. ibid. p. 353

২৮৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩

২৮৬ প্রশান্ড়চন্দ্র মহলানবিশকে লেখা কবির চিঠি থেকে উদ্বৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাটক। প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনের বিভিন্ন আনন্দ-উপাদানের রূপ, পরিবর্তন ইত্যাদি তাঁর পরিচিত তত্ত্বের কাঠামোতে তিনি এ নাটক উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য এতে নাটকীয় কাহিনীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর (২৪টি) গান। আর আছে গানের ফাঁকে ফাঁকে রাজা ও কবির কিছু সংলাপ, যাতে গানের ভাব ও তত্ত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে। রাজকোষ প্রায় শূন্য দেখে রাজা মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে চলে আসেন বসন্তোৎসবের পালা শুনতে। কবি তাঁকে বলে যে, ঋতুরাজ বসন্তও পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিয়ে পালিয়ে যায়। নিজেকে রিক্ত করে বসন্ত লাভ করে পূর্ণতার আনন্দ। তেমনি সমস্ত প্রকৃতিও তার ঋণশোধ করে ফুলে, ফলে সৌন্দর্যে। বস্তুত তাঁর kvi‡'wrme নাটকের ঋণশোধের তত্ত্বও এখানে অনুসৃত হয়েছে। আবার নাটকে বসন্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে চির নতুন ও চির পুরাতন হিসেবে। কবির মতে:

> আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠ নূতন আর একপিঠ পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরাফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী – তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ, নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।[২৮৭]

এ তত্ত্ব তাঁর dvêbx নাটকেও লক্ষ করা গেছে, তবে সেখানে বসন্তের প্রভাব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবন চক্রেও দেখানোর প্রয়াস ছিল। emš— গীতিনাট্যটি যথাক্রমে ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৯২৩), ম্যাডান থিয়েটারে এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উপস্থাপিত হয়। এর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেন তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। নজরুল তখন দৃশ্যত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক একটি তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী কবিতা লিখে রাজদ্রোহ মামলায় দণ্ডিত হয়ে আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন। বইটি নজরুলের সাহিত্যিক বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সেখানে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, এর কয়েকমাস আগে কাজী নজরুল ইসলাম প্রকাশ করেছিলেন 'ধূমকেতু' নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা। এ সময় নজরুল সে পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী প্রার্থনা করলে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটি এরকম:

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!

[২৮৭] বসন্ড়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

অলক্ষণের তিলক-রেখা,

রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,

জাগিয়ে দে রে চমক মেরে,

আছে যারা অর্দ্ধচেতন।[২৮৮]

কবিতাটি ব্লক করে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত 'ধূমকেতু'-র প্রথম পৃষ্ঠায় এবং পরে তৃতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপর ছাপা হতো।[২৮৯] এ ধরনের একটি সম্পাদকীয়তে – ১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর সংখ্যায় – নজরুল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন:

> সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।
>
> স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপাড়ে পাড়ি দিতে হবে।[২৯০]

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের মতে, সে সময় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী দেশের কোন রাজনৈতিক নেতারও প্রকাশ্য লেখায় আসে নি। বরং ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের আহমেদাবাদ অধিবেশনে এক উর্দু কবি, ফজ্‌লুল হাসন হস্‌রৎ মোহানী পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে কঠিন মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।[২৯১] সেদিক থেকে উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যে নজরুলকে গ্রেপ্তারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। এ মামলাতেই নজরুল ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, নজরুলের hMeWYx (১৯২২) প্রবন্ধ সংকলন নিষিদ্ধ এবং স্বয়ং কবির কারাদণ্ড ঘোষণার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। অবশ্য এর কিছুদিন পর নজরুল হুগলী জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন æGive up hunger strike, our literature claims you.”[২৯২]

---

[২৮৮] মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজর–ল ইসলাম; স্মৃতিকথা, কলকাতা, ১৯১৮ (দশম মুদ্রণ), পৃ. ১৫৯

[২৮৯] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজর–ল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি, কলকাতা, ১৯৯৭ (দ্বিতীয়, সংস্করণ), পৃ. ৭৩

[২৯০] উদ্ধৃত; মুজফ্‌ফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০–৬১

[২৯১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০-৬২

[২৯২] প্রশান্‌ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৯ম খ–, কলকাতা, ২০১০ (চতুর্থ মুদ্রণ) পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

i ³Kiex : সেবারের গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ শিলং বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই রচিত হয় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও দুরূহ নাটক i ³Kiex (১৯২৬)। রচিত হওয়ার সময় (এপ্রিল-মে. ১৯২৩) নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে পরিচিত ছিল। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে পঞ্চম খসড়ায় এর নাম দেওয়া হয় 'নন্দিনী' এবং সবশেষে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩১; অক্টোবর, ১৯২৪) ও গ্রন্থাকারে (ডিসেম্বর, ১৯২৬) প্রকাশিত হয় i ³Kiex নামে।[২৯৩] বারবার ব্যাপক পরিবর্তন করার (মোট দশবার) এরকম উদাহরণ রবীন্দ্রনাটকে আর পাওয়া যায় না।[২৯৪]

এর কাহিনীতে আছে: যক্ষপুরী এক পাতাল রাজ্য। এখানে রাজা পেয়েছে সোনার খনির সন্ধান। সেই সোনা তোলার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে শ্রমিক এনে ভয়ংকর পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য রয়েছে মোড়ল ও সর্দারদের সমন্বয়ে এক দালাল শ্রেণি। শ্রমদান ছাড়া শ্রমিকদের কোন মানবিক মূল্য এখানে নেই। তাই তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় নম্বর দিয়ে। কাজে, কথায় কিংবা আচরণে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলেই শ্রমিকদের ওপর নেমে আসে নিষ্ঠুর নির্যাতন। ফলে বিভিন্ন সময় নানা অঘটনে শ্রমিকের মৃত্যু এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। এদের মধ্যে যাতে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়, সে উদ্দেশ্যে দালাল গোসাঁইও নিয়োগ করা হয়েছে। সে নামাবলি পরে শ্রমিকদের কানে ধর্মের ললিত বাণী শোনায় রাজার শোষণ-শাসন অব্যাহত রাখার স্বার্থে। যক্ষপুরীর রাজার জীবন প্রণালী বেশ রহস্যজনক। সে বসবাস করে এক জালের আড়ালে, বিশেষ দিন ছাড়া সে বাইরে আসে না। এই যক্ষপুরীতে আগমন ঘটে নন্দিনী নামে এক নারীর। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা নন্দিনীকে দেখে যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মনে ঘটে নতুন ভাবের জাগরণ। শ্রমিক কিশোর তার কাজের ফাঁকে নন্দিনীর জন্য রক্তকরবীর গুচ্ছ এনে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। পণ্ডিত অধ্যাপক আনন্দ পান নন্দিনীর সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে। শ্রমিক বিশু পাগলের সঙ্গে ভাব হয়ে যায় নন্দিনীর। এমনকি নন্দিনীকে নিয়ে সর্দারদের মধ্যেও আলোড়ন জাগে।

নন্দিনী সবাইকে বুঝতে পারলেও রাজার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। রাজা তার সঙ্গে বহু কথা বলে, কিন্তু জালের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না তাকে। নন্দিনী রাজাকে জালের বাইরে এসে পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং ফসল কাটার আনন্দ উপভোগের আহ্বান জানায়। রাজা নন্দিনীকে পছন্দ করলেও সে আহ্বানে সাড়া দেয় না। বরং রাজা নিজের অমিত শক্তির জোরে তাকে অধিকার করতে চায়। আবার নন্দিনীর সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে আছে তার সঙ্গী রঞ্জন। সে দিনরাত তারই প্রতীক্ষায়

---

২৯৩ পরিশিষ্ট অংশ, রক্তকরবী, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১১৫

২৯৪ "এখনো পর্যন্ড় জানা যায়, 'রক্তকরবী' পাঠ আছে দশটি। এর মধ্যে নটির পা¯ুলিপি শান্ড়িনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত, একটি সেখানে নেই। যেটি নেই, ... সেই পাঠ 'বহুরূপী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ১৯৮৬ সালে, ..." শঙ্খ ঘোষ, 'রক্তকরবী কয়েকটি তথ্য', অনুষ্টুপ প্রবন্ধ সংকলন (বিষয় রবীন্দ্রনাথ) সম্পা. অনিল আচার্য, সব্যসাচী দেব, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। সর্দারদের কথায় জানা যায়, রঞ্জন মানুষ হলেও যেন যাদু জানে। কিছুতেই তাকে বাধ্য করানো যায় না। সে শ্রমিকদের নিয়ে মেতে ওঠে নানারকম সৃষ্টিছাড়া কাজে। কখনো খোদাইকরদের নিয়ে করে খোদাই নৃত্য, কখনো কোদাল চালিয়ে ধরে গান। তাকে কোথাও আটকে রাখার জো নেই। সর্দাররা সিদ্ধান্ত নেয় তারা কিছুতেই রঞ্জন ও নন্দিনীর মিলন ঘটতে দেবে না। কারণ তা হলে যক্ষপুরীর সমস্ত প্রশাসন পড়বে ভেঙে। এ জন্যে বিশু পাগলকে বন্দি করে রাখে যাতে সে রঞ্জনের কোন সংবাদ নন্দিনীকে দিতে না পারে। ও দিকে তারা রঞ্জনকে পাঠিয়ে দেয় রাজার কাছে। দানবীয় শক্তিধর রাজা বিদ্রোহীদের নিজে শাস্তি দেয়, কখনও কখনও হত্যা করে। রাজা রঞ্জনকে চিনতে না পেরে তাকে হত্যা করে বসে। এমন সময় রাজার কাছে এসে নন্দিনী দরজা খুলে দিতে বলে। রাজা দরজা খুলে দিলে মৃত রঞ্জনকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে নন্দিনী। রাজা রঞ্জনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয় এবং বলে, সর্দাররা তাকে ঠকিয়েছে। রাজা সর্দারদের বন্দি করার নির্দেশ দেয়। নন্দিনী বলে এবার রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ শুরু হলো। রাজাও সে লড়াইয়ে (নিজের বিরুদ্ধে) যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় ধ্বজা পূজার সরঞ্জাম ভেঙে বেরিয়ে পড়ে নন্দিনীর সঙ্গে। ও দিকে শ্রমিকরা বন্দীশালা ভেঙে দলে দলে বেরিয়ে সর্দার ও সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। নন্দিনী ছুটে যায় সে যুদ্ধের মধ্যে। রাজা, অধ্যাপক, বিশু, ফাগুলাল সবাই 'নন্দিনীর জয়' বলে এগিয়ে যায়। দূরে শোনা যায় ফসল কাটার গান।

কবি নিজে এ নাটকের ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কখনও বলেছেন–'নাটকটি সত্যমূলক', 'রূপকনাট্য নয়'।[২৯৫] আবার কখনও নিজেই ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হয়েছেন এর রূপকত্ব; যেমন hvÎx (১৯২৯) গ্রন্থে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

> নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।
>
> এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি;

---

২৯৫ "বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যারা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সত্য। ... রামায়ণ রূপক নয়,. আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।" রক্তকরবী (প্রস্ড়াবনা অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৮

Dhaka University Institutional Repository

ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।[২৯৬]

এ ছাড়া রক্তকরবী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ *RED OLEANDERS* (1925) লন্ডনে প্রকাশিত হলে সেখানকার পত্রিকায় বিভিন্ন সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ æRed Oleaanders: Author's interpretation" শিরোনামে ইংরেজিতে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৯৭]

নাটকের কাহিনী ও কবির ব্যাখ্যা থেকে একটি বিষয় সাধারণ ভাবে বোঝা যায় যে, এর মূল বক্তব্য হলো – অবরুদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি। যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ বিপুল শক্তি সংগঠন (কবি যাকে যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) দিয়ে মাটির নীচ থেকে স্বর্ণ আহরণে ব্যস্ত। তার দুর্দমনীয় লোভের জাঁতাকলে একদিকে বহু শ্রমিকের প্রাণ পিষ্ট হচ্ছে, অপরদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য সম্ভোগ এবং মনুষ্যত্বহীনতা রাজার অন্তরতম সত্তাকে করছে বিকৃত। জালের আবরণ সেই বন্ধ, আনন্দহীন, প্রেমহীন আত্মার প্রতীক। তার ভেতরের দেব-অংশ আজ অবরুদ্ধ। সে এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে উৎসুক। সৌন্দর্য ও আনন্দের লীলাচঞ্চলতার প্রতীক নন্দিনীর কাছে তার করুণ আর্তি:

আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি – তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি – আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটু খানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।[২৯৮]

যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাবই হয়েছে রাজার অন্তরাত্মার মুক্তির প্রয়োজনে। কোনো কাজে সে নিয়োজিত নয়, সে নাট্যকারের আইডিয়ার বাহনমাত্র।[২৯৯] খোদাইকর গোকুলের প্রশ্নের জবাবে নন্দিনী তা স্বীকার করে; যেমন–

গোকুল। ... তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে। ... না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

---

[২৯৬] রক্তকরবী (গ্রন্থপরিচয়), পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৯
[২৯৭] পূর্বোক্ত; পৃ. ১২০
[২৯৮] রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৩৫৩–৫৪
[২৯৯] অজিত কুমার ঘোষ, পুর্বোক্ত; পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।[৩০০]

যে রাজাকে সবাই ভয় পায়, সেই রাজার দরজায় আঘাত করে সে বলে, "আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।"[৩০১] কখনো রাজাকে সে আহ্বান করে– "আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।[৩০২] কিন্তু বদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত রাজা জড়ত্বের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। মুক্তিপিপাসা ও অভ্যস্ততার বন্ধনে সৃষ্টি হয় সংঘাত। নন্দিনীকে রাজা বলে:

> আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে অনতে চাইনে। যে দিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন আসবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয়নি।[৩০৩]

এক সময় রাজা বুঝতে পারে, তার এই আনন্দহীন প্রতিষ্ঠাকে বেঁচে থাকা বলে না, বলে টিকে থাকা। বাঁচতে হবে প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণের মধ্য দিয়ে। একটি দৃশ্যে আছে এর ইঙ্গিত। যেমন:

> নন্দিনী। ... মা গো, তোমার হাতে ওটা কী?
>
> নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।
>
> নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে?
>
> নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিকে থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?[৩০৪]

এ রকম মুক্তি রাজার জীবনেও ঘনিয়ে এসেছে। তার ভেতরের নেতি-অংশের মৃত্যুর পর তারও মুক্তি হবে। কিন্তু তা সহজে হবার নয়। প্রতাপের অংশ চায় নন্দিনী ও তার প্রেমের প্রতীক রক্তকরবীর গুচ্ছ কেড়ে নিতে। আবার কখনও নন্দিনীর সহজ প্রাণের লীলা তার মধ্যে মুক্ত প্রাণের উদ্বোধন ঘটিয়ে দিতে চায়। রাজা বলে:

> ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি; আবার

---

[৩০০] রক্তকরবী, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫০
[৩০১] পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫০
[৩০২] পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫২
[৩০৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫
[৩০৪] পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭০–৭১

Dhaka University Institutional Repository

ভাবছি নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরি আমার মাথায় পরিয়ে দেয় তা হলে–

নন্দিনী। তা হলে কী হবে?

নেপথ্যে। তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।[৩০৫]

রাজার সেই মৃত্যুর সময় আসে ধ্বজা পূজার দিন। রাজা ধ্বজা পূজার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সে দিন বিশু পাগলকে বন্দী করা হলে তার প্রতিবাদে কারিগররা বিদ্রোহ করে। নন্দিনীও রাজার কাছে এর কারণ জানতে এসে দেখে মৃত রঞ্জনকে। রাজা-ই রঞ্জনকে খুন করেছে। তখন শুরু হয় রাজার বিরুদ্ধে নন্দিনীর লড়াই। বলা বাহুল্য, এ লড়াই বাস্তবের নয়, আত্মিক লড়াই। নন্দিনীর প্রাণ প্রাচুর্য দিয়ে রাজার অভ্যন্তরস্থ দেবশক্তিকে জাগাবার লড়াই। সে লড়াইয়ে নন্দিনীর হাত থাকে রাজারই হাতে। রাজা বলে, “আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক – তাতেই আমার মুক্তি।”[৩০৬] কারণ রাজার দেব-অংশের জয় ঘটলেই তার প্রাণ-প্রবাহ মুক্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে কবির ব্যাখ্যা হলো – “আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।”[৩০৭] নাটকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ফাগুলাল ও অধ্যাপকের সংলাপে:

ফাগুলাল। কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক?

অধ্যাপক। কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে – পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।[৩০৮]

এভাবে i³Kiex-র রাজা নন্দিনীর আহ্বানে খুঁজে পায় তার মুক্তস্বরূপ। বস্তুত ivRv থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক ধারার নাটকসমূহে বিভিন্ন কাহিনীর অন্তর্লীন প্রবণতা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত i³Kiex- তেও সাধিত হয় অবরুদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি।[৩০৯]

এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য রূপক-সাংকেতিক নাটকের মতো এ নাটকেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই বলে আপাততভাবে মনে হয়। কিন্তু কবি নিজেই Red Oleanders: Author’s interpretation রচনায় এ নাটকে তাঁর রাজনীতি ভাবনার প্রকাশ আছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

---

৩০৫ পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭১
৩০৬ পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৯৭
৩০৭ রক্তকরবী (প্রস্ত্মবনা অংশ), পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৬
৩০৮ রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯
৩০৯ “রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহাদের মূল বিষয়টি হইতেছে–মানুষের অন্ত্মরাত্মার অবরোধ ও তাহা হইতে নিস্ক্রমণ – তাহার অন্ত্মরতম সত্তার বিকৃতি ও বিকৃতি হইতে মুক্তি।” উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তিনি ইউরোপ তথা পশ্চিমা সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানের সহায়তায় পরিণত হওয়া এক বিশাল যন্ত্র সংগঠন হিসেবে। কিন্তু এই সংগঠন শক্তির মধ্যে একদিকে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহত্ত্ব যেমন হারিয়ে গেছে, তেমনি হারিয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক সত্তা। এর ফলে উক্ত যন্ত্র সভ্যতা এশিয়া ও অন্য দুর্বল জাতির মানুষকে নির্বিকারভাবে শাসন-শোষণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সার্বিক বিকাশ ব্যাহত এবং আত্মাকেও সংকুচিত করছে।[৩১০] তাঁর মতে:

> I am not competent to say how Europe hereself feels about this phenomenon produced by her science. Very likely her stout-hearted Jack is already busy making breaches in the walls of this fortress. But I can say, on behalf of inarticulate Asia, what a terrible reality for us in the West, whose relation to ourselves in so little human. The view that we can get of her, in our mutual dealings, is that of a titanic power with an endless curiosity to analyse and know, but without sympathy to understand, with numberless arms to coerce and acquire, but no serenity of soul to realise and enjoy. It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European civilisation. ... Such an objectifeied passion lacks the true majesty of human nature; it only assumes a terrifying bigness, its physionogmy blurred through its cover of an intricate network - the scientifie system. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power. ...
>
> Therefore, it should cause no surprise to anybody if a poet, belonging to a continent swallowed by the menacing shadow of Europe, gives a prominent place among the dramatis personae of his play to an apparition which now so powerfully occupies the imagination of a vast world consisting of non Western races. ... It is intensely real; its hot breath is upon us; its touch is all over our shrinking soul. It is the principal hero today in the drama of human history; and I trust I have the right to invoke it on my own play, not in the spirit of politician, but a poet, possibly a lyrical poet.[৩১১]

---

[৩১০] রক্তকরবী (গ্রন্থ পরিচয় অংশ), পূর্বোক্ত, ১২০–২১

[৩১১] পূর্বোক্ত; পৃ. ১২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এখানেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন – তাঁর নাটকে রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ থাকা বিস্ময়কর নয়। স্মর্তব্য, এর পূর্বে g3aviv নাটকের কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির প্রতিফলন থাকলেও কবি তা স্বীকার করতে চান নি। অবশ্য চৌরিচৌরা থানায় পুলিশ হত্যার ঘনটায় (৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) গান্ধিকে গ্রেপ্তার (১০ মার্চ, ১৯২২) করা হলে কবি যেভাবে শান্তিনিকেতনে g3aviv-র অভিনয় (১২ মার্চ, ১৯২২) বন্ধ করে দেন তাতে মনে হয় ওই নাটক নিয়ে তিনি খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। কারণ নাটকের অভিনয় পরিত্যক্ত হলেও নির্ধারিত সন্ধ্যায় কবি স্বয়ং এবং দিনেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি বসন্তের গান গেয়েছিলেন। আর রবিজীবনীকার জানাচ্ছেন– "'মুক্তধারা'র অভিনয় পরিত্যক্ত হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে শান্তিনিকেতনে নাটকটি কখনও অভিনীত হয়নি।"[৩১২] এ অবস্থায় i3Kiex নাটকে পশ্চিমা যন্ত্রশক্তির প্রতিনিধি তথা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীকী রূপায়ণ – কবির নিজস্ব বিশ্লেষণ মোতাবেক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ করার দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় বলেই মনে হয়। নাটকের কাহিনীতে উল্লিখিত যন্ত্রশক্তির প্রতীকীরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যক্ষপুরীর প্রচণ্ড শক্তিধর রাজা চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু ইতোমধ্যে লক্ষ করা গেছে যে, রাজা একইসঙ্গে অবরুদ্ধ মানবাত্মার প্রতীকও বটে; এবং নাটকের পরিণতিতে তার আধ্যাত্মিক মুক্তির ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নাট্যকারের বিশেষ মনোবৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁরই বিশ্লেষিত একটি গুরুতর সমাজ-অর্থনৈতিক সমস্যা এ নাটকে পরিণত হয়েছে আধ্যাত্মিক সংকটে এবং তার সমাধানও হয়েছে সে পথেই। এদিক থেকে g3aviv ও i3Kiex নাটকের সামঞ্জস্য সহজেই লক্ষণীয়। g3aviv-য় যন্ত্রশক্তির মূর্ত প্রতীক বাঁধটি অভিজিৎ নিজের প্রাণের বিনিময়ে ভেঙেছে, আর i3Kiex-তে প্রাণ ও লীলাময়তার প্রতিনিধি যথাক্রমে রঞ্জন ও নন্দিনী তাদের প্রাণের বিনিময়ে পরাজিত করেছে রাজা চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দানবশক্তিকে। সেইসঙ্গে এটাও বোঝা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ এ দুটি নাটকে রূপক ও সাংকেতিকতার আড়ালে সমসাময়িক রাজনীতির কিছু বিষয় প্রতিফলিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

উল্লিখিত বিষয় ছাড়া i3Kiex নাটকে রবীন্দ্রনাথ অপর এক রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন যা বর্তমান কালেও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। আর তা হলো, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের শ্রম- শোষণ ও উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের বস্তুবাদী তথা মার্কসীয় বিশ্লেষণ। এটি অনেকটা অভাবনীয় একারণে যে, রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না, এবং সমাজতন্ত্রীরাও তাঁর কাছ থেকে খুব একটা

[৩১২] প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৮ম খণ্ড, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা কিংবা সহানুভূতি লাভ করতে পারেন নি।[৩১৩] অথচ এ নাটকে যক্ষপুরীর যে সব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তাতে পুঁজিবাদী সভ্যতা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মূর্ত হয়ে ওঠে। নিম্নোক্ত কয়েকটি উদাহরণে তা লক্ষ করা যেতে পারে–

এক. মার্কসবাদীদের মতে, সভ্যতার ইতিহাসে বুর্জোয়া শ্রেণি বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করলেও এই শ্রেণির প্রধান ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত মালিকানা ও সীমাহীন শ্রমশোষণ। এই শ্রেণির কাছে সমাজের যাবতীয় কিছু মূল্যায়িত হয় অর্থের বিনিময়ে। মানুষের যে সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, বুর্জোয়ারা তাদের মাহাত্ম্য দিয়েছে ঘুচিয়ে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী সবাইকে এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরীভোগী শ্রমজীবীরূপে।[৩১৪]

তেমনি i³Kiex-র শ্রমিক, কারিগর, সর্দার, গোঁসাই, অধ্যাপক, পুরাণবাগীশ সবাই মকররাজ-এর মজুরীভোগী। এর মধ্যে শ্রমিক-কারিগরদের পরিশ্রম সবার চেয়ে বেশি। কখনো কখনো তা আক্ষরিক ভাবে হয়ে ওঠে পাশবিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মোড়লের সংলাপ, "পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হোক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেয়া যাবে।[৩১৫]

দুই. বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থেই সৃষ্টি করে বিশাল এক শ্রমিক শ্রেণি। এই শ্রমিকদেরকে বুর্জোয়ারা ততক্ষণই বাঁচিয়ে রাখে যতক্ষণ তারা কাজ করতে পারে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য বা পুঁজি বাড়াতে পারে। তাই শ্রমিকরা নিজেদেরকে টুকরো টুকরো করে বুর্জোয়ার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[৩১৬]

এ নাটকেও দেখা যায় ফাগুলাল, বিশু, গোকুল, অনূপ, শকলু প্রমুখ শ্রমিক তাদের প্রাণ নিংড়ে স্বর্ণ আহরণ করেই চলেছে। কিন্তু এ পরিশ্রম তাদের জন্য ইতিবাচক কোন ফল সৃষ্টি করছে না। যেমন বিশু বলে:

> সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি এক হাতের পর দুই হাত, দু'হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি – এক তালের পর দু'তাল, দু'তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে কোন অর্থে পৌঁছয় না।[৩১৭]

---

[৩১৩] "ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্‌ ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকার প্রকার-সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে গু⁻তন্ত্রের আখড়া জমল। ... রাশিয়ার জারতন্ত্র ও বলশেভিক্‌তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোঁড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তা⁻বনৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি।" রায়তের কথা, কালান্ড্‌র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খ⁻, পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২৬

[৩১৪] মার্কস-এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, মস্কো, ১৯৭০, পৃ. ৩৫

[৩১৫] রক্তকরবী-রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খ⁻, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৮৯

[৩১৬] মার্কস-এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৯

[৩১৭] রক্তকরবী, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

খনি থেকে সোনা তোলার জন্য কেবল তাদের বেঁচে থাকা। তাতে অপারগ হয়ে গেলে তার নিক্ষিপ্ত হয় রাজার এঁটো হিসেবে। নন্দিনী এই এঁটোদের দেখে আঁৎকে ওঠে:

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরির দরজা খুলে গেছে নাকি! ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে – ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি 'রাজার এঁটো'।

নন্দিনী। মানে কী?

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাংস মজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনোদিন ছিল?

সর্দার। হয়তো ছিল।...[৩১৮]

তিন. বুর্জোয়ারা তাদের বিশাল শিল্প কারখানায় বিপুল পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করে। তাদের সংগঠিত করা হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্প-বাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসেবে তারা থাকে কর্মকর্তা ও তত্বাবধায়কদের এক বহুধাপী ব্যবস্থার অধীন।[৩১৯]

তেমনি যক্ষপুরীর রয়েছে নিপুণ শ্রমবিভাগ। রয়েছে করাতী, খোদাইকর কারিগর প্রভৃতি শ্রেণি। তাদের আবাসস্থল ট, ঠ, ঞ, দন্ত্য-ন. মূর্ধন্য-ণ পাড়া প্রভৃতি। আর এদের ওপর খবরদারি করার জন্য আছে ছোট সর্দার, মেঝো সর্দার, সর্দার ও মোড়লরা।

চার. ব্যক্তিমালিকানা ও শ্রম শোষণের ফলে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা (Alienation)। বিচ্ছিন্নতা চার ধরনের হতে পারে। যেমন:

ক) উৎপাদিত দ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্নতা;

খ) উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা;

গ) প্রজাতি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা; এবং

---

[৩১৮] পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭৯-৮০
[৩১৯] মার্কস–এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা।[৩২০]

i ³Kiex নাটকে এসব বিচ্ছিন্নতার কয়েকটি স্পষ্টভাবে উপস্থিত। যেমনঃ

ক) আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিকের মতো যক্ষপুরীর শ্রমিকরাও তাদের উত্তোলিত স্বর্ণের মালিক নয়। তাই সে স্বর্ণ আহরণে তাদের আগ্রহ কিংবা আনন্দ কোনোটাই নেই। পূর্বোক্ত ‘দুই’ অনুচ্ছেদ-এর বিশুর সংলাপে (সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি...) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে তাদের কাজে উৎসাহ থাকে না।[৩২১] আর এ জন্যেই নিয়োগ করা হয়েছে সর্দার ও মোড়লদের। তারা একদিকে কারিগরদের কাজের তাড়া দেয়, আবার শ্রমিক অসন্তোষ দমনেরও চেষ্টা করে। একটি দৃশ্যে পাওয়া যাচ্ছেঃ

নন্দিনী। আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে!

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে।[৩২২]

খ) করাতী, খোদাইকর ও কারিগরদের মধ্যে শ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যক্ষপুরীর শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা সহজেই অনুমান করা চলে।

গ) আপন মানবিক সত্তা (প্রজাতি সত্তা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমিক পশুসুলভ কাজেই যেন বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।[৩২৩] তাই ছুটির সময় সে নিজেকে নেশার মাধ্যমে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়। ফাগুলালের নিম্নোক্ত সংলাপে সে ব্যাপারটি স্পষ্টঃ

ফাগুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ও কী কথা! সকাল থেকেই মদ?

ফাগুলাল। আজ ছুটির দিন। ...[৩২৪]

যক্ষপুরীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মানবিক সত্তা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যই তাদের নির্দেশ করে নামের পরিবর্তে সংখ্যা দিয়ে। তা-ই লক্ষ করা যাক বিশুর সংলাপেঃ

বিশু। ... ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই তুমি কোন সংখ্যা?

---

৩২০ এ এফ এম ইমাম আলি, সমাজতত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৭

৩২১ “শ্রমিক যখন কাজ করে তখন পরাধীন কিন্তু যখন সে কাজ করে না তখন সে মুক্ত বা স্বাধীন।” পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৩২২ রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৬

৩২৩ “In consequence, man (the worker) feels himself, acting freely in his animal functions like eating, drinking and begetting... whereas in his human functions he is nothing but animal.” H. Marcuse-এর Reason and Revolution (1974) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত; এ.এফ. এম. ইমাম আলি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৩২৪ রক্তকরবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু। আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।[৩২৫]

পাঁচ. i ³Kiex নাটকে শ্রমিক শোষণ ও অত্যাচার চিত্রের পাশাপাশি শ্রমিক বিদ্রোহের প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। এখানে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আছে একক ও যৌথ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ক্ষোভ-ঘৃণা, বিদ্রোহ এবং ব্যাপক অভ্যুত্থানের চিত্র। ফাগুলাল, বিশু, গজ্জু পালোয়ানদের মধ্যে আছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের উত্তাপ। ভণ্ড গোঁসাইয়ের মুখে নাম কীর্তন শুনে ফাগুলাল বলে, "এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দার, এতবড় অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামী সবই না।[৩২৬]

তেমনি আধমরা গজ্জু পালোয়ানের উক্তিতে ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা একসঙ্গে ঝরে পড়ে:

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে।

পালোয়ান। কেবল ঐ সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

পালোয়ান। ... দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।[৩২৭]

নাটকের শেষদিকে শ্রমিকরা যথার্থ অভ্যুত্থানের মতো রাজার বন্দীশালা ভেঙে দলে দলে লড়াইয়ে যোগ দেয়। বিশু সে সংবাদ দিয়ে বলে, "আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে।"[৩২৮]

ছয়. এ নাটকে যে ভাবে ধর্মের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার উন্মোচন করা হয়েছে তা তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের পটভূমিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে ধর্ম সরাসরি শোষক শ্রেণির হাতিয়ার তথা সেবাদাস হিসেবে উপস্থাপিত। মার্কসবাদীদের মতে, ধর্ম হলো শোষিতকে ভুলিয়ে রাখার অস্ত্র বিশেষ। তার অসহায় অবস্থার অবলম্বন।[৩২৯]

---

[৩২৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০
[৩২৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২
[৩২৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২
[৩২৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০
[৩২৯] "ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়... আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম।" মার্কস-এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

সর্দার। ... একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলায় এরা– ... ... [গোঁসাইয়ের প্রবেশ] ... ...

সর্দার। এই যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন – ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই এদের কথা বলছ? আহা এরা তো স্বয়ং কূর্ম অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন যোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা! আশীর্বাদ করি, সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।[৩৩০]

ফৌজের অত্যাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের স্বরূপটিও গোঁসাই স্পষ্ট করে দেয়, যেমন-

> বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়ু নড়ু করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মত কান তৈরি হল বলে। তবু আর কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা।[৩৩১]

সৈন্যদের পেছনে থাকে আত্মবিক্রীত কিছু গোসাঁই, পুরোহিত কিংবা মৌলানা যাতে অত্যাচারের প্রতিবাদ কেউ করতে না পারে। এর বাস্তব উদাহরণ হলো বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের পক্ষেও ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাদের এসব কার্যকলাপ বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিল এ দেশেরই একশ্রেণির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। বন্দিনী বাঙালি নারীদের অত্যাচারীর ভোগ্যা হিসেবে বিধান দিতেও সেদিন তারা দ্বিধা করে নি।

---

[৩৩০] রক্তকরবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১-৬২

[৩৩১] পূর্বোক্ত পৃ. ৩৬৩। লক্ষণীয়, সংলাপটি ফাগুলালকে (৪৭ফ) উদ্দেশ করে বলা হলেও অন্ন জোগানো ও নামাবলি তৈরির সূত্রে এটি সমস্ড় শ্রমিকের প্রতি উৎসারিত।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে পেটোয়া বাহিনীর অত্যাচার এবং তার ন্যায্যতা সম্পর্কে ধর্মীয় উপদেশ প্রলেতারিয়েতকে দেহে মনে দুর্বল করে দেয়। মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, প্রলেতারিয়েতের জন্য অন্নের চেয়েও বেশি আবশ্যক তার সাহস, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও স্বাতন্ত্র্যবোধ।[৩৩২] যক্ষপুরীর প্রশাসনও সৈন্য ও পুরোহিত দিয়ে শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে বশ করার চেষ্টা চালায়। বিশু বলে, "চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি।..."[৩৩৩] অর্থাৎ নিপীড়ন ও হরি নাম কীর্তন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সেটাও পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায় মেঝো সর্দারের সংলাপে, "... ওর যে এক পিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে।"[৩৩৪] তাই শারীরিক অত্যাচারে গজ্জু পালোয়ান একাধারে আধমরা ও ভরসাহীন হয়ে পড়লে গোঁসাইয়ের সন্তুষ্টি ও নির্মম রসিকতা – "হরি হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ একটু মিহি হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে, আমাদের নাম কীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।"[৩৩৫]

তবে চূড়ান্ত যুদ্ধে এই ভণ্ডদের স্বরূপ উন্মোচন হতে বাধ্য। জনগণ তাদের নিক্ষেপ করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। i³Kiex নাটকে তারও কৌতুকপ্রদ চিত্র আছে। নন্দিনীর কাছে গোঁসাইয়ের ভণ্ডামী ধরা পড়ে গেলে সে গোঁসাইয়ের জপমালা নামাবলি ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়। তখন গোঁসাইয়ের আর্তনাদ–

গোঁসাই। ... –আঃ ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ঐ গেল ছিঁড়ে! ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা–

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা–

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা সুদ্ধ ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম।[৩৩৬]

i³Kiex নাটকে এভাবে পুঁজিবাদী সমাজের যে নির্মোহ উন্মোচন ঘটেছে, তা এ নাটকের প্রথম পর্যায়ের সচেতন শ্রোতার মতো বর্তমান বহু মার্সবাদী সমালোচকও লক্ষ করেছেন। উল্লেখ্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের দু'মাস আগে তৎকালীন 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদকসহ কয়েকজন কবির মুখে এ নাটকের পাঠ শুনে এর অন্যতম বিষয় যে শ্রমিকের রক্ত শোষণের ঘৃণ্য চিত্র উন্মোচন তা অনুধাবন করে লিখেছিলেন (৩০ শ্রাবণ, ১৩৩১), "এ নাটক দেশ বিশেষের নাটক নয়– এ বিশ্বের

[৩৩২] মার্কস- এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
[৩৩৩] রক্তকরবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৬
[৩৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১
[৩৩৫] পূর্বোক্ত পৃ. ৩৮৪
[৩৩৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রী।”[৩৩৭] পক্ষান্তরে রবীন্দ্র জীবনীকার উক্ত বিষয়ের জন্যই নাটকটি বিশ্বজনীন হতে না পারার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর মতে, “রক্তকরবী শ্রেণি-সংঘাত, শোষিত ও শোষকের দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক বলিয়া ইহারও আবেদন বিশ্বজনীন হইতে পারে নাই...”।[৩৩৮] তুলনায় উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবেই বলেছেন:

> শ্রমিকদের ঘর্মবিন্দু ও রক্তবিন্দুর উপর নিরন্তর গড়িয়া উঠিতেছে মালিকের বিপুল মুনাফা। শ্রমিকদের শৃঙ্খলা বিধান, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন বা অন্যরূপ শোষণ ব্যবস্থার জন্য নানা প্রকারের আয়োজন রচিত হইয়াছে। মিল বা ফ্যাক্টরী-সংলগ্ন স্থানে শ্রমিকদের বাসস্থান দান, নানা ব্লকে সেই অঞ্চল বিভক্ত, সারি সারি তাহাদের ‘বাসা’, তাহারা যাহাতে শান্ত থাকে এবং কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করে তাহার জন্য সদা সতর্ক দৃষ্টি ও নানা কৌশল-প্রয়োগ ইহাদের বাসস্থানের নিকটে মদের দোকানের অবস্থিতি, তাহাদের মতি-গতি জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্য বহু প্রকারের কর্মচারীর ব্যবস্থা প্রভৃতি – ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিচিত চিত্র।[৩৩৯]

বিশিষ্ট মার্কসবাদী নাট্যতাত্ত্বিক ও নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর জপেন দা’র জবানীতে এ প্রসঙ্গে বলেন:

> শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য মজদুরকে কি করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য করে পুঁজিপতিরা, তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন মার্কস। তিনি দেখাচ্ছেন প্রক্রিয়াটা বৃত্তাকার সীমাহীন ঘানিতে বাঁধা বলদের মতন। এই অনাদি অনন্ত শ্রমের ফলে মজদুর বিয়োজিত হয় সব সুকুমার বৃত্তি থেকে, হারায় ব্যক্তিত্ব, রুচি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ... এই তত্ত্বই রক্তকরবীতে এসেছে দৃষ্টি- গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করে। যক্ষপুরীর শ্রমিকদের নাম গেছে হারিয়ে পিঠে আঁকা ৪৭ ফ আর ৬৯ ঙ সংখ্যাই তাদের পরিচয়। তাদের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তারা এক অন্ধ শোষণযন্ত্রের নাটবল্টু।[৩৪০]

এ ছাড়া, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নেপাল মজুমদার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং হায়দার আকবর খান রনো প্রমুখ i³Kiex নাটকটিকে পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ-চিত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।[৩৪১]

---

[৩৩৭] উদ্ধৃত; চিত্তরঞ্জন ঘোষ, ‘র শ-বিপণ্ডব, সাম্যচিন্ড় ও আমাদের নাট্যজগৎ’ বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা (সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ), কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২১২

[৩৩৮] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খ , কলকাতা, ১৪১৭ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ২০৭

[৩৩৯] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪

[৩৪০] উৎপল দত্ত, জপেন দা জপেন যা, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৩

[৩৪১] ক) “শোষণজীবী সভ্যতার কেন্দ্র-পুর ষটিকে তিনি ‘যক্ষপুরীর রাজা’ রূপে কল্পনা করেছেন এবং সে কল্পনার উপকরণ যুগিয়েছেন – হৃদয়হীন খনির মালিকরা–শোষণৈকব্রত পুঁজিপতিরা, এককথায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-

Dhaka University Institutional Repository

হায়দার আকবর খান রনোর মতে – "রক্তকরবী নাটকে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বীভৎসতার ছবি ফুটে উঠেছে শুধু তাই-ই নয়, এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও বিশ্লেষিত হয়েছে।"[৩৪২] একইসঙ্গে তিনি শ্রমিকদের সংখ্যায় রূপান্তর, কয়েক স্তরের শাসন-কাঠামো, শ্রমিকদের মধ্যে দালাল ও গুপ্তচর নিয়োগ, ধর্মের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে তার বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য; যেমন – "শ্রেণী চেতনাকে খাটো ও বিভ্রান্ত করার ভূমিকা পালন করে ধর্ম। মার্কস যাকে বলেছিলেন আফিমের মতো, সেই ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন।"[৩৪৩]

উপরি-উক্ত উদাহরণসমূহ থেকে এটি অনায়াসে ধারণা করা চলে যে, i ³Kiex নাটকের মূল বক্তব্য – জড়ত্বের বন্ধন থেকে মানবাত্মার মুক্তি ছাপিয়ে কাহিনীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং সে কারণে এর নাটকীয়তা ও আকর্ষণও বেড়ে গেছে অনেকখানি। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় এ নাটকের অভিনয় করতে না পারলেও পরবর্তী সময় কলকাতার বিখ্যাত নাট্যদল 'বহুরূপী' ১৯৫৪ সালে তা সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছিলেন বলে জানা যায়। লক্ষণীয় যে, এর প্রয়োগকর্তা নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রও i ³Kiex-র আধ্যাত্মিক বক্তব্যের চেয়ে উল্লিখিত বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। তাঁর সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে বিশু-র "আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল" – আহ্বানের সঙ্গে উপস্থিত শ্রমিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ইঙ্গিত – "জয় নন্দিনীর জয়" শ্লোগানের মাধ্যমে।[৩৪৪] অথচ মূল নাটকের সমাপ্তি ঘটে বিশুর নিম্নোক্ত সংলাপ-শেষে তার প্রস্থানের মাধ্যমে, "তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।"[৩৪৫] অবশ্য সবশেষে ফসল কাটার গান 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' যথাস্থানেই রয়েছে। এ দৃশ্য নিয়ে অনেক লেখক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও কয়েকজন রবীন্দ্র

ব্যবস্থা।" সাধনকুমার ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ২০০৬ (প্রথম দে'জ সংস্করণ), পৃ. ১৯১

খ) "যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, নাটকখানিতে তা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে।" – নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৮ (প্রথম দে'জ সংস্করণ), পৃ. ২২১

গ) "সুশিক্ষিত রাক্ষসের যে শোষণজীবী চরিত্রের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তার নামটি তিনি উলেণ্টখ করেন নি, ... কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা কোন অযৌক্তিক কাজ হবে না যদি চিরকালের ওই ব্যাধিটাকে এ কালের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করি।" সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের নাটকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনের সত্য', রবীন্দ্রনাথ: কালিকলম (সম্পা. আবুল হাসনাত), ঢাকা, ২০১২।

[৩৪২] হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

[৩৪৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

[৩৪৪] বহুরূপী ১০৪, রক্তকরবী প্রযোজনা ১০২ সংখ্যার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ (সম্পা. কুমার রায়) কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫৫

[৩৪৫] রক্তকরবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক তাতে কবির অভিপ্রায় ধরা পড়েনি বলেও মন্তব্য করেছিলেন।[৩৪৬] কিন্তু নাট্যকার সৃষ্ট ঘটনাবলী অনুসরণ করলে উক্ত সমাপ্তিকেই মনে হয় নাটকীয় ও বাস্তবানুগ (কারণ অন্যায় অত্যাচারের উৎখাতের জন্য নিপীড়িত শ্রেণির সমবেত সংগ্রাম বাস্তবসম্মত)। একই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, cvqwðË কিংবা g³avi নাটকে জনতার হিংসাত্মক সমবেত প্রতিরোধ না দেখালেও এ নাটকে কাহিনীর স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি দিতে গিয়ে তিনি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানকেও আহ্বান জানিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে i³Kiex রবীন্দ্র নাট্যধারায় এক ব্যতিক্রম ধর্মী সৃষ্টি যাতে তাঁর বস্তুতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অনেকখানি।

অবশ্য উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এখানে কিছু বিভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতার পরিচয়ও আছে বলে মনে হয়। যেমন, নাটকে যেভাবে পুঁজিবাদী সভ্যতার নির্মম শ্রমশোষণ, অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখানো হয়েছে তাতে ধারণা করা গিয়েছিল যে, সমাপ্তিতে কারিগর, খোদাইকর ও করাতীরা মিলে একটি সুষ্ঠু মানবিক ও বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে কিংবা সেই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করবে। কিন্তু নাটকের শেষে কবি শুনিয়েছেন ফেলে আসা অতীতের কৃষি নির্ভর জীবনের জয়গান (পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে...)।[৩৪৭] অথচ সে সমাজে মহাজন ও ভূ-স্বামীদের অত্যাচার নিপীড়নের ফলে কৃষকের যে করুণ দশা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিজেও উল্লেখ করেছেন তার 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'রায়তের কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধে। তা ছাড়া সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর্যায়ে মানুষ পশুচারণ যুগ থেকে কৃষিযুগ এবং কৃষিযুগের পর বর্তমানে শিল্পযুগ তথা পুঁজিবাদের যুগে প্রবেশ করেছে। এই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যের – উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বণ্টনের – মধ্যে যে বিপুল অন্যায় পীড়ন ও বৈষম্য বিরাজিত তারই বিভিন্ন দিক বিশ্লেষিত হয়েছে i³Kiex নাটকে। স্বাভাবিকভাবে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন উক্ত ব্যবস্থারই পরিপূর্ণ উচ্ছেদ, যাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা হয় অভ্যুত্থান বা বিপ্লব। এ বিপ্লবের লক্ষ্য কিছুতেই পুরনো কোন যুগে ফিরে যাওয়া নয়, বরং অধিকতর যৌক্তিক ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পথের ইঙ্গিত না দিয়ে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আরও পুরনো ব্যবস্থায়। তাই কোন কোন সমালোচক এ পথকে পশ্চাদপসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[৩৪৮]

---

[৩৪৬] "কিন্তু তার এই সম্পূর্ণ অভিভব স্বীকার করেও প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় কি অবিকল ধরা পড়ল অভিনয়ে?" শঙ্খ ঘোষ, রক্তকরবী ক্রিসেন্থিমাম, (কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক, কলকাতা, ১৯৮৫ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ১১১

[৩৪৭] রক্তকরবী-র প্রস্ড়াবনা অংশেও তিনি সেই কৃষিপলণ্ডী উজাড় হচ্ছে বলে আক্ষেপ করেছিলেন। যেমন, "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপলণ্ডীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে।" রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

[৩৪৮] ক) "এই পথ হয়তো কাহারও নিকট পশ্চাদপসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হইতে পারে, কিন্তু তবুও কবির পথ যে ইহাই তাহা অস্বীকার করা চলে না।"–অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আবার প্রথম থেকে যক্ষপুরীকে যেভাবে উন্মোচন করা হয়েছে তাতে রাজাকে শোষণমূলক ওই ব্যবস্থার প্রতিভূ হিসেবে দেখাই সঙ্গত। কিন্তু নাটকে রাজার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, বিবর্তন এবং নন্দিনীর প্রভাবে জালের আবরণ ছিন্ন করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদানের যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে, তা শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, এখানে রাজা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের একজন পুঁজিপতি বা বুর্জোয়ার সমান্তরাল একটি চরিত্র। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির আক্রমণের মূল লক্ষ্যই হলো, বুর্জোয়াদের হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার দখল করা। তাই এই সংগ্রামে বুর্জোয়ারা অংশ নেয় না। অবশ্য চূড়ান্ত শ্রেণি-সংগ্রামের সময় কখনও কখনও শাসক শ্রেণির একটি ছোট অংশ বিপ্লবী শ্রমিকের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। কিন্তু তারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করে সংগ্রামে শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়।[৩৪৯] এ নাটকে রাজাকে সে রকম অবস্থানে কখনো দেখানো হয় নি বলে সে সুযোগ এখানে ছিল না। তাই এ কথা স্পষ্টতই বলা চলে যে, এখানে শ্রেণি-সমন্বয়ের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজাকে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে এনে বিপক্ষে দেখানো হয়েছে সর্দার এবং তাদের আজ্ঞাবহ সৈনিকদের। রাজা নিজেই ফাগুলালকে বলে–

রাজা। ... তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গেই আমার লড়াই।

ফাগুলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

... ...

ফাগুলাল। রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

খ) "এই নাটকটির মধ্যে অনেকেই বৈপ্লবিক ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। কী করে পেলেন তা জানি না, কেননা ঐ শেষ গানটির সুরে যদি বিপ্লবের বাজনা বাজে, তা হলে তাতে বিপ্লব হওয়া কঠিন। আর রবীন্দ্রনাথ এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতেও বিপ্লবের ইঙ্গিত লেশমাত্র নেই।" হিরনকুমার সান্যাল, 'রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ: শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন (সম্পা. গোপাল হালদার), কলকাতা, ১৯৯৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ১৮০-৮১

[৩৪৯] মার্কস–এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

রাজা। ঐ-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শীগগীর কী করে সম্ভব হল? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।[৩৫০]

এ ভাবে নাটকের ঘটনা ও সংলাপ এর মাধ্যমে রাজাকে তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেন বোঝানো হচ্ছে – রাজা নয়, সর্দার বা প্রশাসন যন্ত্রই যক্ষপুরীর তাবৎ দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী। অথচ প্রথম থেকে দেখা যাচ্ছে সর্দার, মোড়ল প্রমুখ মূলত রাজার পক্ষেই প্রশাসন চালাচ্ছে। এমন কি অবাধ্য শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব রাজা নিজেই পালন করে। রাজাই এখানকার মালিক বা পুঁজিপতি, শোষক বুর্জোয়া; সর্দাররা তারই উপস্বত্বভোগী টাউট। সাধারণত বুর্জোয়ারা প্রশাসক হিসেবে তাদেরকেই ব্যবহার করে যারা সুষ্ঠুভাবে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি শোষণে সহায়তা করতে পারবে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিকারী প্রশাসন মালিক নিজের স্বার্থেই রাখে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজাকে বাদ দিয়ে তার আমলতান্ত্র বা প্রশাসন যন্ত্রকে শ্রমিকদের শত্রু হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই। সেটি করার অর্থ শত্রুকে আড়ালে থাকতে সহায়তা করা। শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামে বিষয়টি কম বিভ্রান্তিকর নয়। দেখা যাচ্ছে i³Kie\ নাটকের কাহিনীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শগত দর্শন বা ইতিহাসের অগ্রগতির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি তার বিরুদ্ধতাও একইসঙ্গে অবস্থান করছে।

প্রসঙ্গত i³Kie\ নাটকের প্রথম অংশে প্রগতিমূলক মতাদর্শের পরিচয় থাকলেও পরবর্তী অংশে তার অনুসরণ না থাকার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। এর প্রয়োজনে দুটি বিষয় পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এক. আমরা ইতঃপূর্বে লক্ষ করেছি যে, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক রাচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাংকেতিক (Symbolic) ধারার প্রেরণা এবং সাযুজ্য রয়েছে। i³Kie\-র ক্ষেত্রেও এ রকম একটি নাটকের প্রণোদনা গ্রহণ অসম্ভব নয় বলে মনে হয়; আর সেটি হলো – সুইডিশ নাট্যকার Johan August Strindberg-এর *A Dream Play* (1901)।[৩৫১] এ নাটকে দেবরাজ ইন্দ্রেয় কন্যা Agnes নিজের জালে বন্দী এক রাজকর্মচারী(Officer)কে উদ্ধার করার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে আসে পৃথিবীতে। তাদের কথোপকথন লক্ষ করা যাক:

---

[৩৫০] রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮-৯৯

[৩৫১] "তুলনীয় একটি রচনা মনে পড়ে এখানে, স্ট্রিন্ডবের্গের 'স্বপ্ন নাটক' তারও প্রতীক গড়ে ওঠে এক দুর্গ আর এক ফুলে, আত্মকারায় বন্দী অফিসার আর তাকে মুক্ত করার যোগ্য এক স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রকন্যা অ্যাগ্নেস। নন্দিনীর মতো এ-চরিত্রও প্রথমে দেখা দেয়, অপাপবিদ্ধ সারল্যে, কিন্তু বিধুর হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতায়। এ নাটকও দেখাতে চায় জড় বস্তুপি~~ে~~ থেকে চেতনার মুক্তি, অহংময়তা থেকে নির্গলিত হবার পথ।" শঙ্খ ঘোষ, 'রক্তকরবী, ক্রিসেন্থিমাম্', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

DAUGHTER.	You’re a prisoner in your own rooms. I’ve come to rescue you!
OFFICER.	I’ve been waiting for this to happen, but how could I know that you’d want to?
DAUGHTER.	It’s a strong castle – it’s got seven walls – but well, we’ll think of something....[৩৫২]

নাটকের এক পর্যায়ে DAUGHTER(Agnes)-এর সঙ্গে দেখা হয় সারা গায়ে কালি মাখা নোংরা শরীর, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দুই জন কয়লা পরিবহন শ্রমিকের সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে জানা যায় তারাও i ³Kiex-র খনি শ্রমিকের মতো বন্দী অবস্থায় জীবন-যাপন করে এবং গুমোট অন্ধকারে কাজ করতে করতে হয়ে উঠেছে মৃতপ্রায়। নাটকের The Riviera scene থেকে সে দৃশ্যের বর্ণনা ও সংলাপ লক্ষ করা যেতে পারে -

[... Two COAL HAULERS, naked to the waist, thier faces, hands, and bodies blackened with coal soot, are sitting, hunched in tired despair. The DAUGHTER and LAWYER entered at the rear.]

DAUGHTER	Oh! This is paradise!
FIRST COAL HAULER	This is hell.
SECOND COAL HAULER	Hundred twenty in the shade.
FIRST COAL HAULER	Let’s go for a swim.
SECOND COAL HAULER	Can’t. Police will come. No swiming allowed.
FIRST COAL HAULER.	But I can’t work in this heat I have had it! I’m getting out of here.
SECOND COAL HAULER	Can’t Police will come and get you. [Pause] Besides, you’d starve to death.
FIRST COAL HAULER	Starve to death? We do most of the work and we get least to eat. And the rich who don’t do nothing at all get the most. ... I

[৩৫২] A DREAM PLAY (Translated by Evert Sprinchorn), STRINDBEREG. SELECTED PLAYS AND PROSE (Edited by Robert Brustain). New York, 1964, p. 156-57

Dhaka University Institutional Repository

	wonder if it wouldn't be fair to say without being too blunt about it something's wrong somewhere? Daughter of the Gods, what do you say? ... [৩৫৩]

এই কয়লাখনির শ্রমিকরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি সমাজে তাদের অবদান সম্পর্কেও বেশ ভালো ধারণা রাখে বলেই মনে হয়। প্রথম শ্রমিকের নিম্নোক্ত সংলাপে তা স্পষ্ট:

FIRST COAL HAULER	And yet we're the foundation of society. If we didn't carry the coal, the kitchen stoves would burn no more, the rooms you live in would grow cold, the factories would close down. The lights in your streets, your stores, your homes would die. Darkness and cold would fall upon you. Yet we sweat like the damned in hell to carry the black coal. ... What wilt thou do for us?
LAWYER	[to the DAUGHTER] Do something for them .... [pause] I realise that complete equality is imposible, but why, why must there be such great inequality?[৩৫৪]

নাটকের শেষে দুর্গে লাগে বিধ্বংসী আগুন। এ অবস্থায় দুর্গের ভেতরে দেখা যায় হতাশায় মুহ্যমান বহু মানুষের মুখ। কিন্তু হঠাৎ দুর্গশীর্ষে একটি ছোট্ট কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠে বিশাল এক ক্রিসেন্থিমাম ফুল। এ ভাবে *A DREM PLAY* নাটকের বিষয়সহ কয়েকটি দৃশ্য, ঘটনা চরিত্র, সংলাপ, প্রতীক ইত্যাদির সঙ্গে i 3Kiex-র নিকট সাদৃশ্য সহজেই দৃশ্যমান। ধারণা করা যায়, এর কিছু কিছু উপাদান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন i 3Kiex নাটক।

দুই. নাটকে শ্রমিকদের অমানবিক শ্রম, কর্ম পরিবেশ, বিধ্বস্ত অবস্থা এবং একইসঙ্গে সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদানের তাৎপর্য উপলব্ধি কবিকে ভিন্ন চেতনায় স্থাপন করেছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব এবং তৎকালীন বিশ্বের বেশ কয়েকজন সমাজতান্ত্রিক বা

---

৩৫৩ Ibid. p. 209-10

৩৫৪ Ibid, p. 211

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিত্ব যেমন রম্যা রলাঁ, আঁরি বারবুস, আঁদ্রে জিদ, আপটন সিনক্লেয়ার প্রমুখের সঙ্গে তাঁর গড়ে উঠেছিল বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এঁদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধারার আমেরিকার ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ারের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসও তিনি পাঠ করেছিলেন i³Kie¤ রচনার কাছাকাছি সময়। সে সঙ্গে উপন্যাস পাঠ-উত্তর প্রতিক্রিয়া জানাবার সময় উল্লেখ করেছিলেন যে, একই বিষয়ে তিনিও একটি নাটক রচনা করেছেন।[৩৫৫] এ সব তথ্য থেকে অনুমান করা চলে যে, এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সচেতনভাবেই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণির জীবনবাস্তবতা। আর এ দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ প্রয়োগের জন্য তিনি সহায়তা নিয়েছিলেন সে – নাটক রচনার – সময় শিলং অবস্থানকারী লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের। কবির মৃত্যুর কয়েক বছর পর (১৯৪৮ সালে) অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌতে রবীন্দ্র-জীবনীকারকে সে তথ্য জানিয়েছিলেন। জীবনীকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> শিলঙে এই সময়ে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আছেন – কবির সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন– সেই-সব কথা তিনি কবির কাছে গল্পচ্ছলে বলেন। রাধাকমল জীবনীলেখককে বলিয়াছেন যে কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন; তখন কি তিনি জানিতেন যে কবির মনে একটি নাটকের প্লট জুটিতেছে।[৩৫৬]

এখানে স্মর্তব্য যে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কেবল অর্থনীতিবিদই নন, তিনি সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার একজন সমর্থকও ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনিই রবীন্দ্রনাথসহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাব নিয়ে সাহিত্যের আভিজাত্য, 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক', 'সাহিত্যে বাস্তবতা' ইত্যাদি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।[৩৫৭] এ সবের মধ্যে 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন:

> ... আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তা প্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেও প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ

---

[৩৫৫] "For years I have thought over these things, this especial phase of our modern civilisation, and only a few weeks ago I have myself finished a drama on the same subject.Ó উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৯ম খ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

[৩৫৬] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

[৩৫৭] প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৭ম খ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

> প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষিত উকিল ব্যারিষ্টার মাষ্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালি জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতী, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।[৩৫৮]

সে বিতর্কে রবীন্দ্রনাথও যুক্ত হয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন 'বাস্তব' (১৯১৪) নামক প্রবন্ধ। অতএব শ্রমজীবী শ্রেণির অবস্থা বিষয়ে নাটক লেখার সময় সেই মতাদর্শের তাত্ত্বিকের কাছে পরামর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের প্রতি সুবিচারই করেছিলেন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সে সুবাদে তিনি শান্তিনিকেতনে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা ও 'ভারতের অর্থনীতি' বিষয়ে বক্তৃতাও করেছিলেন।[৩৫৯]

i³Kiex নাটকে শ্রমজীবী শ্রেণির প্রকৃত অবস্থা যে ভাবে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ধারণা করা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদের কিছু জটিল তত্ত্বও এসময় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কারণ ইতঃপূর্বে আমেরিকায় সাংবাদিকদের কাছে বলশেভিজম বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি।[৩৬০]

এ অবস্থায় i³Kiex নাটকে প্রায় নির্ভুলভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটায় আমাদের এ অনুমানে উৎসাহ যোগায় যে, এ সময় তিনি সঠিক পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তবে অনুপ্রেরণা, প্রভাব কিংবা সঠিক পরামর্শের কারণে i³Kiex নাটকে রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটালেও শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রমজীবী শ্রেণির এককভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টি হয়তো পুরোপুরি সঙ্গত মনে করেন নি। বিশেষত আমরা পূর্বের 'রাজভক্তি' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে জেনেছি যে, রাষ্ট্র ব্যাপারের মধ্যস্থলে তিনি রাজা ছাড়া অপর কাউকে কল্পনা করতে পারেন না। তাই দেখা যায় cKwZi cwZ‡kva

---

[৩৫৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

[৩৫৯] প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, নবম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২, ৭৮

[৩৬০] ১৯২০ সালের অক্টোবরের শেষে তিনি *New York Herald* পত্রিকার সাংবাদিককে বলশেভিজম সম্পর্কে বলেছিলেন: "Of course, Bolshevism is wrong because it is thoroughly selfish. It exploits one class at the expense of all others. So selfishness is at the bottom of the conflict between the forces of capital and labor. Labor asks for shorter hours and more pay; but perposes to give nothing; capital asks for more capital but perposes to give nothing. These conflicting forces, of which labor and capital are only two, will wreck the world unless men find a new spiritual faith in whcih they can all gorw together" (বলশেভিকরা কী অর্থে 'selfish', প্রলেতারীয় সরকারের মালিকানায় কাকে, কারা 'exploit' করছে, পুঁজিপতি বা capital যেখানে নেই সেখানে 'capital' ও 'labor'-এর সংঘাত কী করে হয় ইত্যাদি বিষয় এখানে কেন এসেছে বোঝা মুশকিল)। উদ্ধৃত; প্রশান্ড় কুমার পাল, রবিজীবনী, ৮ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬.

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পরবর্তী Z\‡m¨i †'k পর্যন্ত প্রায় সব নাটকে ঋষিবৎ রাজা ত্যাগ, প্রেম ও কল্যাণের প্রতিভূ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[৩৬১] তাঁর নাটকের কোন রাজা কখনো প্রজা বিরূপ হয় না, প্রজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় না। এখানে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও ঘটনাধারায়ও তিনি রাজাকে কারিগরদের আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন।

তা ছাড়া কবি নিজে একজন জমিদার হিসেবে ছোটখাটো রাজার ভূমিকা পালন করতেন। 'রায়তের কথা' (১৯২৮) প্রবন্ধে তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "... নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে।"[৩৬২] সেই ভূমিকা বা অভিমান তাঁর নাটকের রাজা চরিত্র গঠনে অন্যতম উপাদান হিসেবে গৃহীত হয় নি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ব্যাপারটি আরো একটি কারণে সম্ভব বলে মনে হয় এ যুক্তিতে যে, তিনি নাটকের ভূমিকা ও শেষ গানটিতে কর্ষণজীবী সমাজেরই জয়গান ঘোষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, কর্ষণজীবী সমাজ এবং রাজতন্ত্রের আবাস একই সমাজ-কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত আর তা হলো সামন্ততন্ত্র। জমিদার সে সামন্ততন্ত্রেরই প্রতিভূ। তাই জমিদারি পেশায় নিযুক্ত কবি জমিদার উচ্ছেদকারী ব্যবস্থাকে – বর্তমান নাটকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকে – সে মুহূর্তে স্বাগত জানাতে পারেন নি। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছিলেন, "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।"[৩৬৩] কিন্তু আসমানদারি তথা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও জমিদার রবীন্দ্রনাথ বোধ করি সর্বংশে ত্যাগ করতে পারেন নি তাঁর শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি। এ সব কারণে বলা চলে – মানুষের জীবনবোধ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অধ্যাত্মভাবনা ও শিল্পবোধ তার জীবিকা সংগ্রহের আর্থ সামাজিক উৎসের সঙ্গে নিজের অজান্তেই যে নিবিড় ভাবে অন্বিত হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পসৃষ্টি i³Kiex নাটক তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩৬৪]

অবশ্য উপর্যুক্ত বিরোধগুলো i³Kiex নাটকের কিছু তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা মাত্র। নির্মম শ্রমশোষণ ও অত্যাচারে অর্ধমৃত শ্রমিকদের উপস্থিতি, কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ, শ্রমিকদের প্রতি নন্দিনীর অকৃত্রিম সহানুভূতি, ধর্মীয় ভণ্ডামীর স্বরূপ উন্মোচন এবং সর্বোপরি শ্রমিকের সংগঠিত বিদ্রোহ চিত্রিত হওয়ায় এ নাটককে গণচেতনা-মূলক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

---

৩৬১ "His plays have plenty of kings; but they are usually abdicating or wanting to abdicate, or in the end learn to abdicate – that is the true kings...." Edward Thompson, ibid, p. 212.

৩৬২ 'রায়তের কথা', কালান্ড়র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৭

৩৬৩ পূর্বোক্ত, পৃ, ৪২৭

৩৬৪ প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব', অনুষ্টুপ, চতুর্বিংশ বর্ষ, ২য় (বসন্ড়) সংখ্যা, ১৯৯০, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এটি বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁর প্রথাগত রসবাদী ভক্ত সমালোচকদের এর প্রচ্ছন্ন বক্তব্য খুঁজতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

> রক্তকরবী সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। ... সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায়িত্ব কবির নয়।[৩৬৫]

শিল্প-সাহিত্যে শ্রেণি-সংঘাতের প্রতিফলন থাকলে শিল্প-রসের ব্যাঘাত ঘটে – এ আদর্শপন্থী সমালোচকের অস্তিত্ব সে সময়ের মতো এখনও আছে। তাঁদের কাছে এ নাটকের আবেদন 'প্রপাগান্ডামূলক' বা সীমাবদ্ধ বলেই মনে হতে পারে। যেমন একজন রবীন্দ্রজীবনীকার নিজেই বলেছেন, "রক্তকরবী শ্রেণী-সংঘাত, শোষিত ও শোষকের দ্বন্দ্ব-কেন্দ্রিক বলিয়া ইহারও আবেদন বিশ্বজনীন হইতে পারে নাই।।"[৩৬৬] সম্ভবত এর ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কেও ইংল্যান্ডে অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে 'প্রপাগান্ডা'ও যুক্ত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তারও বিরোধিতা করেছিলেন।[৩৬৭] বস্তুত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন অধ্যাত্মবাদী দর্শনের রূপকার হিসেবে বিশ্বজনীন হওয়ার চেয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অংশ তথা নিপীড়িত শ্রমজীবীর মতাদর্শিক সংগ্রামের অংশীদার হয়ে ওঠা অনেক শ্রেয়। এবং একইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে শ্রেণি-সংগ্রাম ভিত্তিক বহু রচনাই শিল্পসফল হয়েছে; বাংলা সাহিত্যেও তার প্রমাণ মেলে। i³Kiex-ও রাজা শেষদিকে শ্রমিক শ্রেণিতে ভিড়ে গেলেও সে যে পরাজিত হয়েছে, তার শোষণ-ব্যবস্থা যে বিধ্বস্ত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ আড়াল করেন নি। অনিবার্য বাস্তবতা উদ্ভূত শিল্পবোধের কারণেই সেটা সম্ভব হয় নি বলে মনে হয়। ফলে শ্রমিক কিংবা শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শে ও সংগ্রামে রক্তকরবী নাটকের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েই গেছে।

i‡_i iwk : i³Kiex রচনার কয়েক মাসের মধ্যে (ডিসেম্বর, ১৯২৩) কবি i_hvÎv নামে একটি ক্ষুদ্র রূপক-নাটক রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) পত্রিকায়; এবং পরের মাসে এর ইংরেজি অনুবাদ *The Car of Time* নামে The Visva-Bharati Quarterly (January, 1924) তে প্রকাশিত হয়। এর প্রায় নয় বছর পরে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেই পুরনো নাটিকার কিছু পরিবর্তন করে (প্রধানত কাব্যরূপ প্রদান) নাম দেন i‡_i iwk (১৯৩২)। সে সঙ্গে Kwei 'xÿv নামে অপর একটি সংলাপ ধর্মী রচনা Kv‡ji hvÎv নামের গ্রন্থে সন্নিবিশিষ্ট করে তা শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয় রূপের মধ্যে i_hvÎv

---

৩৬৫ রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১৯

৩৬৬ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

৩৬৭ "I can assure my readers that I never meant to use this book as propaganda,..." রক্তকরবী (পরিশিষ্ট অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যনাটিকার সঙ্গে গ্রাম্য কিছু মহিলা ও সন্ন্যাসী চরিত্র সংযোজন ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। এ নাটক সম্বন্ধে কবি বলেন:

> রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মানুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।[৩৬৮]

বক্তব্যটি i‡_i i\k নাটকের কাহিনীতে এসেছে এভাবে: রথযাত্রার উৎসব শুরু হয়েছে। পাশের রাস্তায় নর-নারীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে রথ দেখার আশায়। কিন্তু রথের দেখা নেই। কারণ রথ টানবে যারা তারা শত চেষ্টায়ও রথ একচুল নাড়াতে পারছে না। পথের ওপর বিশাল দড়ি স্থির হয়ে পড়ে আছে অজগর সাপের মত। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না। এমন দিনে এই অলক্ষুণে কাণ্ড দেখে সবাই অমঙ্গল আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। সন্ন্যাসী নানা রকম সর্বনাশের ইঙ্গিত দেয়। ভীত নারীরা এসে দড়ির ওপর ঢালতে থাকে ঘি, দুধ আর গঙ্গাজল। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে উপবাস করে তারা শুরু করলো দড়িদেবতার পূজার আয়োজন। সে সঙ্গে চলছে রাস্তা ঠাকুর আর গর্ত প্রভুর পূজা। শেষ পর্যন্ত নর্মদা তীরে ছাপ্পান্ন বছরের উপবাসী বাবাজিকে আনা হলো। কিন্তু তিনি হাত দেয়ামাত্র আরও বসে গেল রথের চাকা। নিরুপায় রাজা তাঁর সৈন্যদলসহ টানলেন সেই রথের রশি। রথ একটুও না নড়ায় সৈন্যরা হলো বিস্মিত ও লজ্জিত। ধনপতি এসে তার দলবল নিয়ে জোর চেষ্টা চালালো। কিন্তু রশি হয়ে গেল আরও আড়ষ্ট, আর তাদের হাত হয়ে পড়ল যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মানে মানে সরে পড়ল তারা।

এমন সময় সংবাদ এলো শূদ্রপাড়ায় ভীষণ গোল বেঁধেছে। তারা নাকি জানতে পেরেছে যে, এবার রথ টানার ভার পড়েছে তাদের ওপর। দলে দলে ছুটে আসতে লাগল তারা। সৈনিক, পুরোহিতরা প্রথমে তাদেরকে রশি ধরতে দিতে চায় না। তারা কেউ চোখ রাঙায় কেউ অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু মন্ত্রীর নির্দেশে শূদ্ররা ‘জয় জয় মহাকালের জয়’, বলে রশিতে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকার শব্দে আর্তনাদ করে উঠল আকাশ। আর ধূলো উড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো রথ। তবে এবার রথ কিন্তু প্রথাগত পথে চলল না। কাঁচাপথ ধরে রথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটতে লাগল ধনপতির

---

[৩৬৮] গ্রন্থপরিচয় অংশ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৫০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভাণ্ডারের দিকে, সৈনিকের অস্ত্রশালার দিকে। শঙ্কিত ও সচকিত হয়ে ধনপতি ও সৈনিক যার যার স্থান সামলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এ সময় কবি সেখানে এসে পড়লে সবাই এর কারণ জিজ্ঞাসা করে তাঁকে। সত্যদ্রষ্টা কবি বললেন, পুরোহিত, রাজা বা সৈনিকরা ছিল উঁচু মাথাওয়ালা। তাদের দৃষ্টি সবসময় ছিল রথের চূড়ার দিকে নিবদ্ধ। রথ টানছে যে দড়ি, তার দিকে ওরা ফিরেও তাকায় নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্পর্কের বন্ধন তাকেই ওরা এতদিন অস্বীকার করেছে। তাই রশির এই অভিনব আচরণ। শূদ্ররা তাদের আত্মশক্তির যোগ্যতায় আজ রথ টানার অধিকার পেয়েছে। তবে শক্তি ও সংযমের ভারসাম্য না রাখলে আসবে আবার উল্টোরথের পালা।

উল্লিখিত কাহিনীর সঙ্গে কবির বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এখানে নাটকীয় সংঘাত খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। চরিত্রগুলো থেকে গেছে অবিকশিত ও কেবল প্রতিনিধিত্বমূলক। তা ছাড়া কাহিনীর সুস্পষ্ট পরিণতিও এখানে অনুপস্থিত।[৩৬৯] তা সত্ত্বেও, এর ভাববস্তুতে যে প্রগতিমুখী সমাজমানসের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে ও ভারতবর্ষে রাজনৈতিকভাবে প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণির যে ব্যাপক উত্থান লক্ষ করা গিয়েছিল তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে এ নাটকে। বিশেষত i_hvÎv হিসেবে প্রায় নয় বছর পড়ে থাকার পর যখন নাটকটি একই বিষয় ও বক্তব্য নিয়ে কবি আবার i‡_i iwk নামে লিখলেন তখন বোঝা যায় যে, এর বক্তব্যের সঙ্গে কবির উপলব্ধি নিবিড়ভাবে যুক্ত। কবির মতে প্রথম যুগে পুরোহিতের মন্ত্রেই চলত রথ। অর্থাৎ ধারণা করা যায় তারাই ছিল সামাজের প্রভু বা চালক। কিন্তু সে দিন আর নেই। দ্বিতীয় নাগরিক তাই বলছে:

সেদিন নেই রে
যেদিন পুরুতের মন্তর পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।[৩৭০]

সমাজের উপর পুরোহিতের খবরদারি গেছে ঘুচে। তাই মন্ত্রে আর রথ চলছে না। কারণ, "কালের পথ হয়েছে দুর্গম।"[৩৭১] এ দুর্গম অবস্থাকে নিজেদের বশে আনল ক্ষত্রিয়রা। সমাজকে চালিয়েছিল

---

[৩৬৯] "নাটকীয় লক্ষণ ইহাতে সামান্যই আছে; পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টা হয় নাই কিংবা নাটকীয় পরিণামকেও স্পষ্ট করিয়া তোলা হয নাই। সূক্ষ্ম একটি কাহিনীর সূত্রকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মূলগত ভাবটিকে কবিগুর— বিশেণ্ঢষণ করিয়া গিয়াছেন। সেই মূলগত ভাবের গুর—ত্বেই নাটকটির গৌরব।" প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
"বিরোধ–সংঘাত বা সুনির্দিষ্ট নাটকীয় পরিণাম ইহাতে নাই। পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে একটা ঘটনা বিবৃত হইয়াছে মাত্র এবং ইহার অন্ড়রালে কবি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন একটি তত্ত্বের।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

[৩৭০] রথের রশি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২শ খ—, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

[৩৭১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

তারা দোর্দণ্ড প্রতাপে। আর তারা যতই যুদ্ধ করেছে, তীর ছুঁড়েছে, অসি চালিয়েছে; ততই মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয়েছে বিছিন্ন। ফলে তাদেরকে দিয়েও আর রথ চালানো সম্ভব নয়। পরে এল ধনপতি বা পুঁজিপতিরা, পুরো পৃথিবীকে তারা করল পুঁজির বশ। পুরোহিত, সৈনিক সবাইকে নিজেদের অনুগত করল তারা। তাদের বাণিজ্যের হাত ছড়িয়ে পড়ল হাট থেকে হাটে, ঘাট থেকে ঘাটে, দেশ থেকে দেশান্তরে। বিজ্ঞানবলে তাদের মুঠোয় এলো স্থল জল ও আকাশের সীমা। কিন্তু ধনপতিরা মানুষে মানুষে ভেদ করল আরো বেশি, সম্পর্কের রশি বলতে রইল না কিছু। তাই তাদের হাতেও রথ চলল না। এল শূদ্রের দল তথা চিরকালের বঞ্চিত, নির্যাতিত, শোষিত শ্রেণির দল। ওরা হাত লাগাতেই রথ চলল ছুটে। কারণ শ্রমজীবী শ্রেণি বা প্রলেতারিয়েতই পৃথিবীতে সৃষ্টি করবে সম-অধিকারের দিন, আনবে সাম্য। উঁচু নিচুর ভেদাভেদ তখন আর থাকবে না, থাকবে না অন্যায় অত্যাচার পীড়ন। রাজা পুরোহিত ধনপতি শূদ্র সবাই দাঁড়াবে একই শ্রেণিতে; একসাথে টানবে সভ্যতার মহারথ।

নাটকের উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে মনে হয় i³Kiex রচনার সময় কবি যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বা শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক দর্শন ব্যবহার করেছিলেন i‡_i iwk নাটকে তা-ই অনুসৃত হয়েছে। i³Kiex-র শ্রমিক অভ্যুত্থান এখানে পরিণত হয়েছে সভ্যতার (বা রথের) চালক হিসেবে শ্রমজীবী শ্রেণির নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতিতে। উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালে i³Kiex রচনার পরপরই মে-জুন মাসে 'সংহতি' (জৈষ্ঠ্য, ১৩৩০) পত্রিকায় প্রকাশিত একই নামের প্রবন্ধে কবি বলেন যে, তিনি বর্তমান পৃথিবীর শ্রমজীবী শ্রেণির ঐক্যের মধ্যে দেখছেন বিপুল শক্তির উত্থান। জীবনীকারের ভাষায় শোনা যাক, তাঁর বক্তব্য:

> য়ুরোপে কর্মজীবীদের যে দল গড়ে উঠেছে, আশা করা যায়, সেই দল একদিন নেশনের বেড়াকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে, কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটায় টান দিতে হচ্ছে সেই দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপরেই বিস্তৃত, টান দিচ্ছে সকল দেশের মানুষ। এই দড়িটার ঐক্যে তারা এক, একে অবলম্বন করেই তাদের ঐক্য দৃঢ় হবে। যদি এই ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ হয় তা হলে পৃথিবীতে একদিন একটি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে।[৩৭২]

উল্লিখিত 'রথযাত্রা'ই যে পরবর্তী সময় নাটিকা i_hvÎv-য় পরিণত হয়েছে, তা অনুমান করা কষ্টকর নয়। অবশ্য মহাজন ও মজুর কিংবা ধনপতি ও কর্মজীবীর মধ্যে যে সংঘর্ষ আসন্ন – এ ধারণা তিনি বেশ আগেই ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯১২ সালে 'সবুজপত্রে' (পৌষ, ১৩২১) প্রকাশিত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন:

---

[৩৭২] উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, রবিজীবনী, ৯ম খ=, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

> ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে – কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটি চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।[৩৭৩]

আবার ১৯২১ সালে আমেরিকা ভ্রমণের সময় কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দিনেন্দ্রনাথকে তেলকূপের একটি 'পিকচার পোস্টকার্ড' পাঠিয়ে লিখেছিলেন:

> ছবিটা ভাল করে দেখ– কেরোসিন তেলের অন্ধকূপ– এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠ্‌চে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরের এই দশা– এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্য্যের আলো এদের মানসচক্ষে পৌঁছায় না। বলিরাজা পাতাল পুরীর রাজা – তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবতার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে যারা এত কাল ছোট হয়ে ছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে– বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গ-প্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুল্‌চে– কিন্তু দৈত্য ভায়ার পাপের ধন আর টিক্‌বেনা।[৩৭৪]

তা ছাড়া এ নাটক প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর আগে (১৯৩০ সালে) কবি বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘুরে এসেছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন শূদ্রদের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নিদর্শন। তাই শূদ্র তথা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ঘোষণা করার জন্য তার মনে দ্বিধা ছিল না। এ কারণে i‡_i i¾k নাটকে রূপকের আড়াল খুব একটা নেই। সমালোচক সুকুমার সেন তাই স্পষ্ট করেই মত প্রকাশ করেছেন, "'রথযাত্রা'–'রথের রশি' রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুরাপুরি পোলিটিকাল নাট্যরচনা।"[৩৭৫] মনে হয়, যে কথাটি কবি i³Kie¨-তে স্পষ্ট তুলে ধরতে পারেন নি, তাই যেন এখানে উপস্থাপন করলেন তিনি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে রথযাত্রার প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পর্যায়সমূহের মিল না থাকলেও পুঁজিবাদ এবং প্রলেতারীয় শ্রেণির আবির্ভাবে পুঁজিবাদের ধ্বংসের তত্ত্ব বেশ দক্ষতার সঙ্গে এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। এমন কি বাণিজ্যিক পুঁজি যে এক সময় সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে তা-ও অল্প আয়াসেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন:

> দ্বিতীয় ধনিক। ... আজকাল চলছে যা-কিছু
>
> সব ধনপতির হাতেই চলছে।

---

[৩৭৩] 'লড়াইয়ের মূল', কালান্ড়র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

[৩৭৪] উদ্ধৃত; পিকচার পোস্ট কার্ডের মুদ্রিত রূপ থেকে। বহুরূপী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

[৩৭৫] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সৈনিক। সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার

চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক। তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে?

প্রথম সৈনিক। চুপ দুর্বিনীত!

দ্বিতীয় সৈনিক। চুপ করব আমরা বটে।

আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক। মনে আছে, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক। ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম

ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর – এক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।[৩৭৬]

পূর্বোক্ত, 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে এ কথা তিনি অনেক আগেই উল্লেখ করেছিলেন। যেমন, "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।"[৩৭৭] আর শূদ্রদের প্রতীক দ্বারা তিনি মূলত সমস্ত প্রলেতারিয়েতকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন:

(শূদ্র) দলপতি। আমরাইতো জোগাই অন্ন তাই তোমরা বাঁচ –

আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লাজরক্ষা।[৩৭৮]

তবে এ শ্রেণির উত্থান যে সহজে কেউ মেনে নিতে চায় না, তারও উদাহরণ আছে এ নাটকে। সৈনিকের সংলাপে পাওয়া যায়– "সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা–

তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।

আজ ধরেছে উল্টো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।"[৩৭৯]

তাই শূদ্রদের হাতে রথ চললেও তাদের আক্রমণ করে হত্যা করার অনুমতি চাইতেও তাদের কুণ্ঠা নেই –

"ঠাকুর তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ চলা।"

---

[৩৭৬] রথের রশি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
[৩৭৭] 'লড়াইয়ের মূল', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
[৩৭৮] রথের রশি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
[৩৭৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

> "... ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে, ঢালব ওদের রক্ত।"[৩৮০]

এসব সংলাপে বোঝা যায়, বর্তমান যুগ শূদ্রদের হলেও সে অধিকার আদায়ের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। রক্তাক্ত ও হিংস্র শ্রেণি-সংগ্রাম অনিবার্য; রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য নাট্যকাহিনীতে সেই চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব নাট্যক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় নি। তা ছাড়া যে ভাবে পুরোহিত থেকে সৈনিক রাজাদের ক্ষমতা দখল এবং তাদের কাছ থেকে ধনপতি বা বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ দেখানো হয়েছে তাতে কিছুটা সরলীকরণের আভাস পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুত ইতিহাসের এই ক্রমবিবর্তন একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় নি। এ জন্যে প্রত্যেক অগ্রগামী শক্তিকেই অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ লড়াই হয়েছে কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে। মার্কস- এঙ্গেলসের ভাষায়, "প্রতিবার এ সংগ্রাম তথা লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণিগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।[৩৮১] বিভিন্ন পর্যায়ের এ সব সংগ্রামের প্রতিফলন এ ক্ষুদ্র নাটকে উপস্থাপিত হয় নি। আবার শূদ্রের হাতে বর্তমান যুগ চালানোর ক্ষমতা দিলেও তাদের ওপর নিরঙ্কুশ আস্থার বিষয়টি থেকেছে দোদুল্যমান। শূদ্রদের বুদ্ধির প্রতি তাই পুরোহিত সংশয় প্রকাশ করে বলে:

> তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান–
>
> ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি সেই সংশয়কে স্থির বিশ্বাসে সমর্থন দিয়ে বলে:

> পারবে না হয়তো।
>
> একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই
>
> দেখো কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে–
>
> জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
>
> তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা–
>
> হলধরের মাতালামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।[৩৮২]

---

[৩৮০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
[৩৮১] মার্কস–এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
[৩৮২] রথের রশি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

চিরকালের অবহেলিত, শোষিত ও নিপীড়িত প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে কোনো শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারে না– এ প্রত্যয় ‘কবি’ চরিত্রের নেই। তার মনে হয়েছে, ক্ষমতা পেয়ে ওরাও এক ধরনের শোষকে পরিণত হবে; সমাজে আবার দেখা দেবে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ, সম্পর্কের ফাটল। তাই কবি বলছে:

> তারপরে কোন্- এক যুগে কোন্ -একদিন
>
> আসবে উল্টোরথের পালা।
>
> তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।[৩৮৩]

উল্লিখিত সংলাপ থেকে ধারণা করা যায় যে, শোষিতের প্রতি, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির বা নাট্যকারের সহানুভূতি থাকলেও তাঁদের দর্শনের প্রতি, রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভ্রমণের সময় লেখা চিঠিতে (রাশিয়ার চিঠি) প্রচুর প্রশংসা থাকলেও কবি তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। কালীমোহন ঘোষ-এর কাছে পাঠানো তেমনি একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

> ... মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিক মত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ... এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না।[৩৮৪]

বস্তুত মার্কসবাদী রাজনীতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যে বরাবর নেতিবাচক ছিল, তা নন্দগোপাল সেনগুপ্ত Kv‡Qi gvbl iex›‘bv_ গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। উক্ত লেখকের মতে:

> মার্কসবাদ ও রুশ প্রসঙ্গে পড়াশুনা তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) একটু সীমাবদ্ধ ছিল। লেনিন ও ট্রটস্কির রচনা অল্পস্বল্প পড়তে দেখেছি। ... মনে হয়েছে মার্ক্সীয় দর্শনের বস্তুমুখিতা ধনসাম্যের ভিত্তিতে নূতন বিশ্ব-বিধান গড়ার জন্য মার্ক্সপন্থীদের বৈপ্লবিক মনোভাবে বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক সমানাধিকারাত্মক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে সুস্পষ্ট একটা নেতিভাব ছিল। এসব প্রসঙ্গের আলোচনা এলে তাই তিনি সাধারণত একটু উত্তেজিত হতেন।[৩৮৫]

---

[৩৮৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
[৩৮৪] রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৩২৭–২৮
[৩৮৫] উদ্ধৃত; আবু জাফর, অন্বিষ্ট জীবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা করা যায় যে, উক্ত মনোভাবের কারণে i‡_i i¯wk নাটকে শূদ্রদের তথা শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতি কবি এবং নাট্যকার পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন নি।

অবশ্য রথের রশি নাটকের মূল ভাববস্তুর ব্যঞ্জনা, কবির উপরি-উক্ত দোদুল্যমান অবস্থাকে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। শ্রমজীবী শ্রেণির হাতেই যে বর্তমান সভ্যতার সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শ্রেণির কর্তৃত্বের যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজ গঠিত হতে পারে– এ আকাঙ্ক্ষা নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে প্রবলভাবে। তবে স্বল্প পরিসরের কারণে এ বক্তব্য যথেষ্ট শিল্প সাফল্য যে লাভ করে নি তা অস্বীকার করা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে মাও-সে তুঙ-এর একটি বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, “শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন তাতে শিল্পগত গুণাবলীর অভাব থাকলে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে।”[৩৮৬] i‡_i i¯wk নাটকের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারই ঘটেছে। মনে হয় তৎকালীন বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ধারার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি নতুন যুগের নতুন বিষয় উপস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নশ্রেণির মানুষের জয়গানমূলক এ নাটক তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বক্তব্যের চিরকালীনতা সম্পর্কে সংশয়ের কারণে হয়তো নাটকের শিল্পসৌকর্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পূর্ণ-মাত্রায় প্রসারিত হয় নি। কেবল নতুন যুগের কাণ্ডারীদের সাময়িকভাবে স্বাগত জানাবার তাগিদই এখানে বেশি সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। কবির শেষ সংলাপে সে ইঙ্গিত যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> আজকের মতো বলো সবাই মিলে–
>
> যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
>
> যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।[৩৮৭]

উল্লিখিত সংলাপে ‘আজকের মতো’, ‘একবার দাঁড়াক’ শব্দ প্রয়োগে বক্তব্যের সাময়িকতা সহজেই লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও ভারত ও তৎকালীন বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে প্রলেতারীয় শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামে i‡_i i¯wk নাটকের অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রবিজীবনীকারের মতে, রবীন্দ্রনাথও তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুভব করে নাটকটি *The car of Time* (1924) নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যা The Visva -Bharati Quarterly- তে প্রকাশিত হয়।[৩৮৮]

---

[৩৮৬] মাও সে-তুঙ, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, পিকিং, ১৯৭৭, পৃ. ১০০
[৩৮৭] রথের রশি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
[৩৮৮] প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

cÂg Aa¨vq

iex› ‘bvU‡K ivRbxwZ : ZZxq ce

wPiKgvi mfv : i‡_i iwk নাটকের আদি রূপ ‘রথযাত্রা’ রচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক – সাংকেতিক নাটক রচনার পালা প্রায় শেষ হয়ে যায়। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,

> ‘রক্তকরবী’ রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাংকেতিক নাটক রচনার যুগের অবসান হয়। যদিও তিনি ইহার পরও আরও দুই একখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে পূর্ববর্তী ভাবধারাই অনুবর্তন করিয়াছেন, নূতন মৌলিক কোন ভাব অবলম্বন করিয়া আর কোন রূপক নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।[১]

বস্তুত রূপক-সাংকেতিক শুধু নয়, এ পর্বের নাট্যধারা সমাপ্তির সঙ্গে তাঁর নাট্যপ্রতিভার চূড়ান্ত পর্বও সমাপ্ত হয়। বর্তমান পর্বে তাঁর রচিত নাটকের শিল্প সৌন্দর্য – দু’একটি ব্যতিক্রম ছাড়া – অনেকখানি ম্লান; প্রতিভার দীপ্তি নির্বাপিত প্রায়। এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় wPiKgvi mfv (১৯২৬) রচনায়।

wPiKgvi mfv রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপান ভ্রমণ করে এসেছিলেন। এর মধ্যে চীনে তাঁর ভ্রমণাভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল কিছুটা বিব্রতকর। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে চীনা কর্তৃপক্ষ তাঁকে চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাবার পর থেকে সেখানকার মার্কসবাদী মহলে তাঁকে নিয়ে বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়েছিল।[২] পরবর্তী বছর এপ্রিলে চীনে গিয়ে বিভিন্ন ভাষণে তিনি বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শগত বিরোধিতা, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার জয়গান ও প্রাচীন চীনা সভ্যতার প্রশংসাসূচক বক্তব্য প্রদান শুরু করলে সে বিরূপতা তুঙ্গে ওঠে। কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে প্রবন্ধ প্রকাশের পাশাপাশি কবির ভাষণস্থানে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমেও চালানো হয় সে কার্যক্রম।[৩] এমন কি কোন কোন সমাবেশে তাঁকে শুনতে হয়েছিঠল, “পরাধীন দেশের দাস, ফিরে যাও,” “আমাদের দর্শন চাই না, আমরা চাই বস্তুতান্ত্রিকতা” ইত্যাদি শ্লোগান।[৪]

---

[১] আশুতোষ ভট্টচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, কলকাতা ২০০৩ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ, ২১৯

[২] কুম্যনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক একটি পত্রিকায় (২৭ অক্টোবর, ১৯২৩) লেখেন, “Why do we welcome Tagore! Having added to the Chaotic thought of lao Tzu and Chaung-zu, the chaotic thought of Buddhism, we have suffered anough, and are more than grateful to the Indians for their gifts.. Now there is no need to add Tagore to all this” উদ্ধৃত; নিত্যপ্রিয় ঘোষ, ডাকঘরের হরকরা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৭৮.

[৩] প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৯ম খন্ড, কলকাতা ২০১০ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ১০৩

[৪] উদ্ধৃত; নিত্যপ্রিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

এসব বিরোধিতা, প্রচারকৃত লিফলেটের বক্তব্য[৫] জানার পর রবীন্দ্রনাথ পিকিঙে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করে সে মাসের শেষদিকে তিনি যাত্রা করেন জাপানের উদ্দেশ্যে। জাপানে কয়েকটি বক্তৃতা ও সম্বর্ধনা সভায় অংশ গ্রহণ করে জুলাই মাসের মাঝামাঝি কবি কলকাতায় ফিরে আসেন।

জুন মাসে জাপান ভ্রমণের সময় কবি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু ভ্রমণের আমন্ত্রণ পান। ১৯২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পেরুর সরকার কবিকে সে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণের সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়ার নিশ্চয়তাও প্রদান করেছিলেন। সে আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ কবি ২১ সেপ্টেম্বর জাহাজে ওঠেন মাদ্রাজ থেকে। সেখান থেকে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে ওঠেন 'হারুনা-মারু' জাহাজে। ১২ অক্টোবর কবি ফ্রান্সের মার্সেলিস বন্দরে পৌঁছে 'আন্ডেস' নামের আরেকটি জাহাজে চড়েন। কিন্তু এ জাহাজে থাকতেই কবির শরীর খারাপ হতে থাকে। এর এক পর্যায়ে ৬ নভেম্বর জাহাজ আর্জেন্টিনার বুয়েন্‌স্‌ আইরেস-এ পৌঁছলে কবিকে দেওয়া হয় বিপুল সংবর্ধনা। উল্লেখ্য স্প্যানিশ ভাষাভাষি আর্জেন্টিনায় কবির বহু রচনা অনুদিত হওয়ায় কবি সেখানে আগে থেকেই বেশ পরিচিত ছিলেন। সেখানকার ডাক্তাররা কবিকে পরীক্ষা করে জানান যে, তাঁর হৃদযন্ত্র খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে আন্দেস পর্বত অতিক্রম করে ট্রেনে পেরু যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তাঁকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিরুপদ্রব বিশ্রামও নিতে হবে। এ অবস্থায় কবির এক আর্জেন্টিনার ভক্ত ও লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁর গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়িতে কবিকে থাকার অনুরোধ জানান। সে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ওকাম্পো তাঁর বাড়ির দাসদাসীদের এনে নিয়োজিত করে দেন কবির সেবায়। বাড়িটি ছিল বুয়েন্‌স্‌ আইরেস থেকে বিশ মাইল দূরে সান ইসিদ্রো নামক শহরতলীর নদীতীরের এক বাগানবাড়ি। মিরালরিও নামে এ বাড়িতে কবি বেশ তৃপ্তি অনুভব করেন এবং সেইসঙ্গে ভিক্টোরিয়ার সাথে গড়ে ওঠে একান্ত ব্যক্তিগত প্রণয়ের সম্পর্ক।[৬] বোধ করি এর

---

[৫] লিফলেট-এর কয়েকটি বক্তব্য নিম্নরূপ: ক) প্রাচীন চীনের সভ্যতার কাছে আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, আর পেয়ে কাজ নেই। এই সভ্যতা মানুষকে শোষণ করে রাজাদের বড়ো করেছে, মেয়েদের পদানত করেছে, পুরুষকে দিয়েছে সব অধিকার, তোষণ করেছে অভিজাত সামন্তদের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সভ্যতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাই আমরা তাঁর বিরোধিতা করি। খ) রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন আত্মিক সভ্যতা তার ভয়াবহ রূপ আমরা প্রাচীন চীনে দেখেছি– অকারণ যুদ্ধ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, মিথ্যাচার, বঞ্চনা, লালসা, নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তি, লুব্ধ ধনীর রক্তপান, ... পা বিকৃত করে মেয়েদের সুন্দরী বানাবার চেষ্টা। এই প্রাচীনের দিকে ফিরতে বলছেন রবীন্দ্রনাথ। গ) ... রবীন্দ্রনাথ বলছেন ব্রাহ্মর কথা–আত্মার মুক্তির কথা। এই ঘৃণ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি। আর যাঁরা বরীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি।" উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১০

[৬] এ সম্পর্কের সূত্রপাত ওকাম্পো ঘটালেও কবিও হয়তো বিভিন্ন কারণে তাতে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। নিম্নোক্ত চিঠিতে তার কিছু আভাস মেলে, "... Last night when I offered you my thanks for what is ordinarily termed as hospitality I hoped that you could feel me that what I said was much less than what I had meant.

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবেই কবির কাব্য-প্রেরণা বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় ১২ নভেম্বর, ১৯২৪ থেকে ০২ জানুয়ারি ১৯২৫ পর্যন্ত এ বাড়িতে তিনি রচনা করেন বিশটি কবিতা। এর আগে দক্ষিণ আমেরিকার পথে জাহাজে মাত্র তিনটি কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। এসব ও পরবর্তী সময় রচিত কিছু কবিতা সংযুক্ত করে ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় ciex (১৯২৫) কাব্য। কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেন তাঁর সেই ভক্ত প্রণয়িনীকেই, যাঁকে তিনি বিজয়া সম্বোধন করতেন।[৭] বইটি ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠাবার সময় তিনি লিখেছিলেন, "... My readers who will understand those poems will never know who my vijaya is with whom they are associated".[৮] অবশ্য সেই বিজয়া বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোও বাংলা না জানার কারণে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এর সব কবিতা আস্বাদন করতে পারেন নি।[৯]

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর কবি ইউরোপের উদ্দেশে আর্জেন্টিনা ত্যাগ করেন ৩ জানুয়ারী। ১৯ জানুয়ারি সকালে তিনি পৌঁছেন ইতালি জেনোয়া বন্দরে। ইতঃপূর্বে ইতালির সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার গবেষক ড. ফর্মিকির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ইতালি ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ইতালিতে তখন চলছিল ফ্যাসিস্ট বেনিতো মুসোলিনির জঙ্গি শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। ড. ফর্মিকি ছিলেন মূলত ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির সমর্থক। জেনোয়া থেকে মিলানে যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ ফর্মিকির কাছে ইতালির রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বভাবতই তিনি মুসোলিনির প্রশংসা শুনেছিলেন। কিন্তু কবির অভিজ্ঞতা সেখানে পুরোপুরি ইতিবাচক ছিল না। মিলান স্টেশনে ও একটি থিয়েটার হলে তিনি অভাবিত সম্বর্ধনা পেলেও ২২ জানুয়ারী 'The Voice of Humanity' শিরোনামে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁকে ফ্যাসিস্ট সমর্থকদের কড়া সমালোচনা ও রূঢ় আচরণের সম্মুখীন হতে হয়।[১০] এ অবস্থায় স্বাস্থ্যের অজুহাতে তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে দেন[১১] এবং ভেনিস ও ব্রিন্দিসি

It will be difficult for you fully to realise what an immense burden of loneliness I carry about me. The burden that has specially been impored upon my life by my sudden and extraordinary fame. My market price has risen high and my personal value has been obscured. This value I seek to realise with and aching desire whicl constantly persues me. This can be had only from a woman's love and I have been hoping for a long time that I do deserve it.
I feel today this precious gift has come to me from you and that you are able to prize me for what I am and not for what I contain." উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৯ম খণ্ড, কলকাতা ২০১০, পৃ. ১৬৭

[৭] উৎসর্গ/বিজয়ার করকমলে"। পূরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

[৮] উদ্ধৃত; ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ, কলকাতা ১৯৯৮ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ১১৫

[৯] "But it is quite imposible for me to go on looking at the book and not being able to know what is inside those pages. ... The book you sent me is my greatest treasure, but I am mad to know what is inside it." ভিক্টোরিয়ার চিঠি থেকে উদ্ধৃত; শঙ্খ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯.

[১০] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শহর ঘুরে ৪ ফেব্রুয়ারি রওনা হন ভারতাভিমুখে। ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি বোম্বাই বন্দরে পৌঁছেন এবং সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে এলাহাবাদ হয়ে আসেন কলকাতায়।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করার বেশ আগে গান্ধির একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও কোন আন্দোলনের মধ্যে তা রূপায়িত হয় নি। বরং এ সুযোগে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গান্ধিকেও গ্রেপ্তার করে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিয়ে দেয়। তবে এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং গান্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে কংগ্রেসের অন্যতম নেতা মোতিলাল নেহেরু ও বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ, বিঠলভাই প্যাটেলসহ কয়েকজন কংগ্রেসের অধীনেই 'স্বরাজ্য দল' নামে একটি উপদল গঠন করেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৯২২) । বাংলাদেশের প্রায় সব কংগ্রেস নেতাই যোগ দেন এ দলে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিল নির্বাচনে তাঁরা বিজয়ী হয়ে কাউন্সিলের বাজেটসহ সব সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করার চেষ্টা চালাবেন। এ পরিকল্পনায় ১৯২৩ সালে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে এ দল বাংলা কাউন্সিলে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অধিকাংশ আসন দখল করতে সমর্থ হয়। এ সুবাদে তাঁরা বাংলায় বিনা বিচারে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধে আটক বহু রাজবন্দীর মুক্তি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। কেন্দ্রীয় আইন সভাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ গুলোতে স্বরাজ্য দল একই নীতি অনুসরণ করে ইংরেজদের শাসনকাজে সৃষ্টি করতে থাকেতন নানাবিধ অসুবিধা। কিন্তু এ সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য ইংরেজ গভর্নর নিজের ক্ষমতাবলে ১৯২৪ সালের অক্টোবরে একটি সামরিক অর্ডিন্যান্স জারি করেন।[১২] এ আইনের বলে কেবল সন্দেহের বশে ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, বাড়ি তল্লাশী ও জেলে নেওয়ার অধিকার পেল পুলিশ। জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ আইনে সুভাসচন্দ্র বসুসহ বহু যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রবীন্দ্রনাথ এ সংবাদ পেয়ে আর্জেন্টিনা থেকে দিনেন্দ্রনাথকে একটি কবিতাপত্রে লেখেন:

> ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
>
> কুলিশপানি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
>
> শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
>
> কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।[১৩]

---

[১১] "... দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে পা দিয়ে বক্তৃতা বন্ধ করেছিলেন যতটা না স্বাস্থ্যের কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি বন্ধুবান্ধবের সুপরামর্শে। তখনো – অসংগঠিত ফ্যাসিস্ট চ্যাংড়ারা তাঁকে নিগৃহীত করত।" অবন্ড়ীকুমার সান্যাল, প্রসঙ্গঃ রম্যাঁ রলাঁ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫

[১২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খ, কলকাতা ১৯৮৩, পৃ. ২৫৭

[১৩] চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খ, (সুলভ সংস্করণ), কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সে সঙ্গে ভবিষ্যদবাণী করেন:

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,

জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।

দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,

ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,

মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।[১৪]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হওয়ার আগে (১ মার্চ, ১৯২৪) কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে (ভুলক্রমে অন্য ইংরেজ নিহত হয়েছিল) বাঙালি যুবক গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হলে সে সময় তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। তেমনি কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে (২৭ জুন, ১৯২৪) স্বয়ং গান্ধীও গোপীনাথের কাজের নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। উল্লেখ্য এর চার মাস আগে একটি অস্ত্রোপচারের কারণে মেয়াদ ফুরোবার আগে গান্ধিকে মুক্তি দেওয়ার হয়েছিল। সে বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৪০ তম বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং স্বরাজ্য দলের কর্মসূচির প্রশংসা করেন। সে সঙ্গে কেবল চরকা কাটা ও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যাবলির সঙ্গে মেনে নেন স্বরাজ্যদলের নেতা ও কর্মীদের সহাবস্থান। যদিও পূর্ববর্তী আহমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি উক্ত দলের কর্মীদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে মেয়েলি কান্নার নাটকও করেছিলেন।[১৫] এ দিকে কংগ্রেসের গণ- আন্দোলন থেকে পিছু হঠার পর স্বরাজ্য দলেও সরকারের প্রতি সহযোগিতার নীতি লক্ষিত হতে দেখা যায়। ১৯২৫-এর মে মাসে ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের ভাষণে সে আপোসের ইঙ্গিত হয়ে ওঠে স্পষ্ট। কিন্তু এর পরের মাসে চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু (১৬ জুন) ঘটলে চতুর ইংরেজ কংগ্রেস কিংবা

---

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ.

[১৫] "Teass flowed from his eyes. Men around him began to sob. His immediate followers began to weep. Moulana Mahomed Ali took his handkerchief to his eyes. The ladies burst out sobing audibly. Gandhi in tears! ... Mahomed Ali rose and with eyes full of tears took off his cap and knelt down before Gandhi and asked him to foregive him and foregive others. ..." Indian Annual Register, 1924, Vol. 1 থেকে উদ্ধৃত; প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫.

Dhaka University Institutional Repository

স্বরাজ্য দলের সঙ্গে কোন আপোসমূলক আলোচনা চালাতে অস্বীকার করে।[১৬] আর এর মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের অবসান ঘটে।

এ সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখেন সেখানে রীতিমতো ৯০টি চরকায় সুতো কাটা চলছে পুরোদমে। তাঁকে সে সুতার তৈরী একটি উত্তরীয়ও উপহার দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য, তিনি এ সবের সমর্থন না করলেও কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন। এর কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় মঞ্চস্থ (জুলাই, ১৯২৫) হয় তাঁর প্রহসনধর্মী নাটক wPiKgvi mfv (১৯২৬)। এটি মূলত ১৯০৮ সালে প্রকাশিত cRvcwZi wbeÜ (১৯০৮) নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ। তবে তারও আগে 'ভারতী' পত্রিকায় (১৯০০) উপন্যাসটি wPiKgvi mfv নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত এ প্রহসনের কাহিনী নিম্নরূপ:

চন্দ্রমাধববাবু বৃদ্ধ, আত্মভোলা ও ক্ষীণদৃষ্টিশক্তির অধিকারী হলেও প্রবল দেশহিতৈষী মানুষ। নিবিষ্টভাবে দেশসেবার জন্য তিনি যুবকদের আহ্বান জানান চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করার। সে অনুযায়ী অক্ষয়, শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ প্রমুখ যুবকদের নিয়ে তিনি গঠন করে চিরকুমার সভা। তবে এদের মধ্যে অক্ষয় সম্প্রতি বিয়ে করে তার সভ্যপদ হারিয়েছে। আবার অন্য সভ্যদেরও বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার মতো মনের জোর খুব একটা নেই। যেমন পূর্ণ এ সভার সদস্যই হয়েছে মূলত চন্দ্রমাধববাবুর বাসায় পালিতা ভাগ্নী নির্মলার আকর্ষণে। এমন কি এক পর্যায়ে নির্মলাও একই কারণে সভার সদস্যপদ গ্রহণ করে। অনেকটা বিনা আপত্তিতেই নির্মলা এ সভার সদস্যপদ পেয়ে যায়। ওদিকে অক্ষয়কুমারের বিধা শাশুড়ী জগত্তারিনীর মোট চার কন্যা। বড় মেয়ে পুরবালার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অক্ষয়কুমারের। দ্বিতীয় শৈলবালা বিয়ের একমাস পরে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। তৃতীয় মেয়ে নৃপবালা ও চতুর্থ নীরবালা লেখাপড়া শেখার কারণে দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছে। সম্প্রতি জগত্তারিনী শেষোক্ত মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য হয়ে উঠেছেন উদ্বিগ্ন। মূলত এ উদ্দেশ্যে তিনি ভাবী জামাতার সন্ধানে কাশী যাত্রা করেন। জগত্তারিনীর খুড়ো শ্বশুর রসিক দাদা বয়সে বৃদ্ধ ও চিরকুমার। তিনি দীর্ঘকাল ধরে এ পরিবারের আশ্রিত এবং সবার সঙ্গে সুখে দুঃখে জড়িত। দাদা সম্পর্কের এবং স্বভাবেও রসিক হওয়ায় তাঁর সঙ্গে চার কন্যা ও জামাতার সরস রসিকতা লেগেই থাকে। এবার অক্ষয়, রসিক ও শৈলবালা পরামর্শ করে যে, চিরকুমার সভার সভ্য শ্রীশ ও বিপিনকে ভুলিয়ে নৃপবালা ও নীরবালার সঙ্গে বিয়ে দেবে। পরামর্শ অনুযায়ী অক্ষয় চন্দ্রমাধববাবুর বাড়ি গিয়ে জানায় যে, তার এক ধনী বন্ধুর পুত্র ও বৃদ্ধ দাদা রসিক সভার সভ্য হতে ইচ্ছুক। সে সঙ্গে আলো বাতাসযুক্ত একটি সভাস্থলও যোগাড় হবে বলে জানায়। প্রকৃতপক্ষে বিধবা শৈলবালার চুল ছোট

[১৬] রমেশচন্দ্র মুজমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০–৬৭

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ায় তাকে নবীন যুবক হিসেবে এবং অক্ষয়ের শ্বশুরবাড়িই স্থির করা হয় নতুন সভাস্থল হিসেবে। অক্ষয়, রসিকদাদা ও শৈলবালার উদ্দেশ্য হলো কোনরকমে শ্রীশ ও বিপিনের সঙ্গে নৃপ ও নীরবালার সাক্ষাৎ ঘটানো।

নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থলে শ্রীশ ও বিপিন কিছু আগেই চলে এলে সেখানে থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া নৃপ ও নীরবালাকে তারা দেখে ফেলে। নৃপ ও নীর পালিয়ে গেলেও সে ঘরে পড়েছিল তাদের একটি রুমাল ও গানের খাতা। শ্রীশ নৃপবালার রুমাল এবং বিপিন নীরবালার গানের খাতা বেশ উৎসাহ নিয়ে প্রকাশ্যে আত্মসাৎ করে। শুধু তাই নয়, এর সূত্র ধরেই তারা ওই দু'জনের প্রেমে পড়ে যায় এবং তাদের সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠে ভীষণভাবে। বলা বহুল্য, পুরুষবেশধারী শৈল ও রসিক দাদা এ ব্যাপারে শ্রীশ ও বিপিনকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করে না। এ অবস্থায় এক দিন রসিক দাদা শ্রীশ ও বিপিনকে জানায় যে, নৃপ ও নীরবালার মা তাদেরকে দুটি কুৎসতি বরের হাতে সমর্পণ করার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সামনের শুক্রবারেই তারা কনে দেখতে আসছে। রসিক অনুরোধ করেন– শ্রীশ ও বিপিনই যেন ওইদিন সেখানে উপস্থিত হয়; প্রকৃত বর দুটিকে রসিক অন্য ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। রসিক কেবল এবারের জন্য নৃপ ও নীরকে উদ্ধার করে দেওয়ার অনুরোধ করলেও শ্রীশ ও বিপিন নিজেদের গরজে তাদের বিয়ে করতেই সম্মত হয়ে যায়। ওদিকে নৃপ ও নীরও এদের বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন সময় অজানা পত্রের কথা বলে তারা দুজনেই বিয়ে করতে অস্বীকার করে। অবশ্য যথাসময়ে পাত্র হিসেবে শ্রীশ ও বিপিন সেখানে উপস্থিত হলে তাদের সম্মতি মেলে সহজেই। কনের মা জগত্তারিনীও আন্দচিত্তে আশীর্বাদ করে শ্রীশ ও বিপিনকে। আবার ইতোমধ্যে অপর সভ্য পূর্ণ বাবুও চন্দ্রমাধবের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে নির্মলাকে বিয়ে করার জন্য। চন্দ্রমাধবও তাতে সম্মত হয়েছেন এবং ভাবছিলেন চিরকুমার সভা থেকে কৌমার্যব্রতই উঠিয়ে দেবেন। এবার শ্রীশ ও বিপিনের বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি জেনে সে ব্রত তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকে না।

সমালোচকদের মতে, এ নাটকের 'শিল্পরূপ দুর্বল, ঘটনা সমাবেশ শিথিল।'[১৭] সংলাপবহুল উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দেওয়া হলেও উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য নাটকীয়তায় বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রমথনাথ বিশীর মতে,

> ... ইহাকে অভিনয়যোগ্যতা দিতে গিয়াও কবি সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হন নাই। উপন্যাসের ঘটনার মৌলিক মন্থরতা, ঔপন্যাসিক সংলাপের দীর্ঘায়িত আতিশয্য নাটকের অনিবার্য গতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।[১৮]

[১৭] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের শিথিলতা, অবান্তর ঘটনা ও দীর্ঘ সংলাপের বাহুল্য ইত্যাদি এ প্রহসনের শিল্পমান ক্ষুণ্ন করেছে। তা ছাড়া নাট্যদ্বন্দ্বের ভিত্তি হিসেবে কল্পিত চিরকুমার সভার সভ্যদের চিরকৌমার্য ব্রত রক্ষার কোনরকম দৃঢ়তা লক্ষ করা যায় নি। ফলে প্রতিপক্ষ তথা অক্ষয়, রসিক ও শৈলবালার সামান্য প্রয়াসেই তারা সেই ব্রত বিসর্জন দিয়ে বসেছে। মেয়েদের ব্যবহৃত একটি রুমাল ও গানের খাতাই তাদের চিরকৌমার্যব্রত ভাঙার জন্য যথেষ্ট। রসিক দাদার একটি মন্তব্যে এই কুমারদের বৈশিষ্ট্য বেশ ধরা পড়েছে; যেমন–

> ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যে রকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তাপস্য ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।[১৯]

এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উদ্ধার করা যাক:

> ... এই চিরকুমার-সভার সভ্যেরা কেহই তাহাদের আদর্শকে প্রাণমন দিয়া গ্রহণ করে নাই। শ্রীশ বিপিন যেন একটা সাময়িক খেয়ালের বশে চিরকুমার সভার সভ্য হইয়াছে: কখন কৌমার্য ভাঙিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে, সেই সুবর্ণসুযোগের অপেক্ষায়ই যেন বসিয়া আছে। পূর্ণের সভ্য হওয়া তো কেবল নির্মলার জন্য।[২০]

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ নাটকের বিশেষ কোন বক্তব্য নেই। সে দিক থেকে কংগ্রেসের চরকা কাটা ও গঠনমূলক কর্মের আড়ালে যে আসলে আন্দোলন বিরতি চলছিল, এ নাটকের মঞ্চায়ন যেন সে অবস্থার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাণিজ্যিক থিয়েটারে wPiKgvi mfvর সাফল্যের পর পর কবি আরো কয়েকটি নাটক তাঁর পূর্বের রচনা থেকে তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। এ সবের মধ্যে Mnc‡ek (১৯২৫), †kva‡eva (১৯২৬) অন্যতম। ১৯২৫ সালের অক্টোবরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত Mnc‡ek নাটকটি রচিত হয় প্রায় এগার বছর পূর্বের 'শেষের রাত্রি' (সবুজপত্র, ১৩২১) গল্প অবলম্বনে। এর কাহিনীতে আছে: ব্যবসায়ী যুবক যতীন গুরুতর অসুস্থ হয়ে সারাদিন শুয়ে থাকে বিছানায়। স্ত্রী মণিকে সে মনে প্রাণে ভালোবাসে এবং তার সেবা পাওয়ার জন্যও রীতিমত উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু মণি অসুস্থ স্বামীর ঘরেই ঢুকতে চায় না। একদিকে ওষুধের গন্ধে তার অস্বস্তি, অপরদিকে রোগীর কক্ষও তার কাছে ভীতিজনক মনে হয়। যতীনের বিধবা মাসী ও বোন হিমিই যতীনের যাবতীয় সেবা-সুশ্রূষায় নিয়োজিত। সম্প্রতি যতীন পাটের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার এ

---

[১৮] প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, কলকাতা, ১৯৮৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৮৩
[১৯] রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৬ পৃ. ১৬১
[২০] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় সে নিজের বাড়ি বন্ধক রেখে স্ত্রীর জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছে মণিসৌধ নামে। বাড়ির বিভিন্ন উপাদানেও পাওয়া যায় স্ত্রীর প্রতি তার আবেগময় ভালোবাসার প্রকাশ। তাকে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়েছে তারই আইন ব্যবসায়ী বন্ধু ও মাসীর দেবরপুত্র অখিল। আর মাসী তাঁর গহনা বিক্রি করে সে সুদ পরিশোধ করে চলেছেন।

এতসব করেও যতীন তার স্ত্রীর ভালোবাসা কিংবা সেবা কোনটাই পায় না। মণি সারাদিন ব্যস্ত থাকে গৃহপালিত পশু পাখির পরিচর্যায়। এমন কি চিড়িয়াখানায় বেড়ানো কিংবা থিয়েটার দেখাও তার বাদ যায় না। হিমি ও মাসী যতীনের প্রতি স্ত্রীর অবহেলা ও তাচ্ছিল্য নানারকম মিথ্যা ও ছলনায় ভোলাবার চেষ্টা করে। সে সব ছলনায় ও কিছুটা মনের ঔদার্যে যতীন নিজেও ভুলে থাকতে চায় মণির সান্নিধ্যহীনতা। যতীনের রোগ ক্রমে তীব্র হয়ে উঠলে ডাক্তার শেষ কথা জানিয়ে রোগীকে মানসিক আনন্দ ও স্বস্তিতে রাখার পরামর্শ দেয়। হিমি ও মাসী সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যতীনকে সে অনুযায়ী রাখার। কিন্তু এরই মধ্যে ছোট বোনের অন্নপ্রাসন উপলক্ষ্যে মণি যতীনের অনুমতি না নিয়ে চলে যায় বাপের বাড়ি। এর তিন দিন পর পরিচারক শম্ভু এক ফাঁকে সে কথা যতীনকে জানিয়ে দিলে তার প্রতি স্ত্রীর অবহেলার কঠিন সত্য শেষ পর্যন্ত যতীন বুঝতে পারে। এর কিছুক্ষণ পরেই সে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। অবশ্য শেষ মুহূর্তে চেতনা হারাবার আগে তার পায়ে এসে পড়ে স্ত্রী মণি। ডাক্তারের লেখা চিঠি পেয়ে তার পিতাই মণিকে এখানে নিয়ে এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, অসুস্থ যতীন কর্তৃক স্ত্রীর ভালোবাসা ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুমুখেও তার অপ্রাপ্তিজনিত মনোবেদনা এ নাটকের মূল বিষয়। লক্ষণীয় এর সঙ্গে নাট্য শিরোনাম গৃহপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যার যোগ নেই বললে চলে। কারণ যতীন তার নতুন তৈরি গৃহে প্রবেশ করার সুযোগই পায় নি এবং সে বাড়িও আর তার নামে ছিল না। আবার মণির সাহচর্য না পাওয়ার ফলে যতীনের চিত্ত বিক্ষোভ মাসী ও হিমির কর্মতৎপরতায় এবং স্বয়ং যতীনের উদারতায় দানা বাঁধতে পারে নি। ফলে নাটকে কোন প্রত্যক্ষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা গভীর ও সুনির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায় না। তা কেবল যতীনের মনের অন্তর্তলের বিষয় হিসেবে থেকে গেছে। তেমনি নাটকের শেষে মণিকে যেভাবে যতীনের চরণাশ্রিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, তা কেবল তার পিতার কারণে ঘটায় – হয়ে উঠেছে আকস্মিক ও আরোপিত। এ সব কারণে নাটকটি আকাঙ্ক্ষিত শিল্প-সফলতা অর্জনে সমর্থ হয় নি। প্রসঙ্গত মঞ্চেও এ নাটক সাধারণ দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে নি। সে কারণে এর সঙ্গে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ekxKiY নামে আরো একটি নাটক জুড়ে দিতে হয়েছিল।[২১]

[২১] রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, নাট্য বিষয়ের সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষের সমস্যার যোগ নেই। স্ত্রীর সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বাড়ি নির্মাণ করেও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি সমাজের বিশেষ একটি স্তরের মানুষের একান্ত দাম্পত্য সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ শ্রেণির মধ্যে মানবিকতার চেয়ে অর্থ-বিত্তের আকাঙ্ক্ষা যে প্রবল তা-ও উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটকে। যেমন ঋণশোধে ব্যর্থ মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের বাড়ি দখলের জন্য তারই বন্ধু ও আত্মীয়ের উৎকণ্ঠায় ধনবাদী সমাজের প্রধান বিকার যেন উপস্থিত। এটি নিঃসন্দেহে কবির সামাজিক চিন্তারই একপ্রকার বহিঃপ্রকাশ।

নারী পরিস্থিতি বিচারে এ নাটকে কবির একটি বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তা হলো যতীন তার স্ত্রীকে যে আদর্শে কল্পনা করেছে তাতে রয়েছে এ অঞ্চলের সনাতন সেবাপরায়ণা নারী প্রকৃতির রূপ। যতীনের জীবদ্দশায় সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি না হলেও শেষ পর্যন্ত মণিকে তার চরণেই সমর্পিত হতে হয়েছে। বিষয়টিকে নাট্যকারের সনাতন পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বলে অভিহিত করা চলে।

†kva‡eva: Mnc‡ek (১৯২৫) প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে কবি রচনা করেন †kva‡eva নাটক। এটিও পূর্বের মতো ‘কর্ম্মফল’ নামের অপর একটি গল্পের নাট্যরূপ। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় বার্ষিক ‘বসুমতী’ (আশ্বিন, ১৩৩২) পত্রিকায় এবং ১৯২৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয় এর গ্রন্থরূপ।[২২]

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আরেকটি আত্মীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়; তিনি তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮ জানুয়ারি (১৯২৬) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর দিন রবীন্দ্রনাথ নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে লখনৌতে ছিলেন। সংবাদ শুনে সেখানকার কার্যসূচি অসমাপ্ত রেখে তিনি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। এর কিছুদিন পর (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি ঢাকাসহ ত্রিপুরা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শেষে ১ মার্চ কলকাতায় ফিরে আসেন।

রাজনীতিতে এ সময় আন্দোলন বিরতি চলছিল। এ অবস্থায় স্বয়ং গান্ধীও ৩ জানুয়ারি থেকে এক বৎসরের জন্য আন্দোলন থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। ফলশ্রুতিতে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের পরিবর্তে কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিচলিত কবি এ সম্পর্কে একটি চিঠিতে (৬ এপ্রিল, ১৯২৬) লেখেন:

[২২] প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল কিনারা পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোন জিনিষের সমাধান হয় না। রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেব, কে দেবে?[২৩]

ও দিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে বাংলা ও উত্তর ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। বোমা তৈরি ও অস্ত্র কেনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডাকাতিসহ তারা মনোযোগ দেয় সরকারি কর্মকর্তা ও গুপ্তচর হত্যায়। পূর্বোক্ত গোপীনাথ সাহা (মূল নাম গোপীমোহন সাহা) কর্তৃক চার্লস টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা ছিল তারই অন্তর্ভুক্ত। এর ধারাবাহিকতায় ১৯২৫-এর ১০ নভেম্বর কলকাতার দক্ষিনেশ্বর ও শোভাবাজারে বিপ্লবীদের ঘাঁটি ঘেরাও করে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়। এদের কয়েকজনকে রাখা হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বম্ব-ওয়ার্ডে। এর পাশের ওয়ার্ডে ছিলেন বিনাবিচারে আটক বেশ কিছু রাজবন্দী। পুলিশের 'রায় বাহাদুর' খেতাবপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা ভূপেন চট্টোপাধ্যায় এসব রাজবন্দীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে বিপ্লবীদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাঁদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করতেন। এ কারণে বোমা ওয়ার্ডের আসামী অনন্তহরি চক্রবর্তী ও প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী জেলের ভেতরেই (২৮ মে, ১৯২৬) হত্যা করেন ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে।[২৪] এর পরের মাসে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক †kva‡eva।

†kva‡eva-এর কাহিনীতে আছে: মন্মথ রায়ের যুবকপুত্র সতীশ ইংরেজ-সংস্কৃতি অনুকরণে অভ্যস্ত লাহিড়ী পরিবারের কন্যা নলিনীর অনুরক্ত। সামর্থ্য না থাকলেও সে ওই পরিবারের মতো সাহেবিয়ানা রপ্ত করার অক্ষম চেষ্টা চালায়। এ নিয়ে সে প্রায় সৃষ্টি করে বিব্রতকর পরিস্থিতি। অথচ তার বাবা তাকে সাধারণ বাঙালি হিসেবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত পরিবারের মেয়ে নলিনীও আকর্ষণ বোধ করে সতীশের সহজ সরল রূপটির প্রতি। সে আসলে তার বাবা মার পছন্দের পাত্র বিলেতফেরত ব্যারিস্টার বরুণ নন্দীকেও সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দেয় তার অপছন্দের কথা। এ দিকে হঠাৎ করে মন্মথ রায়ের মৃত্যু হয়। পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় মৃত্যুর পূর্বে করে যাওয়া উইলে তিনি সতীশকে বঞ্চিত করেন তাঁর সম্পত্তি থেকে। এ অবস্থায় সতীশ আশ্রয় নেয় তার মাসীর বাড়িতে। নিঃসন্তান এই মাসী একসময় সতীশকে সাহেবিয়ানা অনুকরণের খরচ যোগাতেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তাঁদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ায় ধীরে ধীরে সতীশকে অপছন্দ করতে শুরু করেন মাসী। এমন কি শ্লেষ ও কটূক্তির মাধ্যমে সে-কথা সতীশকে বুঝিয়ে দিতেও পিছ পা হন নি। মাসীর অপমানে সতীশের আত্মসম্মান জাগে এবং সে মাসীর ঋণশোধের

২৩ উদ্ধৃত; প্রশান্ড়কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯
২৪ সুধাংশু দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপণ্ঢবীদের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা করে। কিন্তু ছোট চাকরিতে তা দ্রুত করা যাবে না ভেবে সে অফিসের তহবিল তছরুপ করে শোধ করে তার ঋণ। এর পর আত্মগ্লানিবশত সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটি পিস্তল নিয়ে বাগানে ঢোকে। বাগানে হঠাৎ মাসীর পুত্র হরেনকে দেখে তাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয় সতীশ। কিন্তু একই সঙ্গে সে মাসীকে ডেকে হরেনকে বাঁচাবার আহ্বান জানায়। চিৎকার শুনে মাসী দৌড়ে বাগানে এসে উদ্ধার করে হরেনকে। এমন সময় সতীশের অফিস কর্মকর্তা পুলিশ নিয়ে সে বাড়িতে এলে সতীশের তহবিল তছরুপের বিষয়টিও উন্মোচিত হয়ে যায়। ইতঃপূর্বে সতীশ সমস্ত ঘটনা চিঠিতে জানিয়ে রেখেছিল নলিনীকে। এ অবস্থায় নলিনী তার সমস্ত গহনা নিয়ে এসে সে সবের বিনিময়ে সতীশকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

নাটকের কাহিনী নির্মাণ ও চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সাফল্য প্রশ্নাতীত নয়। সতীশের ব্যক্তিত্বহীনতা মা ও মাসী কর্তৃক সতীশকে প্রশ্রয় দান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাসীর নিম্নরুচির আচরণ, তহবিল তছরুপ করে ঋণশোধ, পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার পরিকল্পনা এবং অকস্মাৎ বালক হরেনকে হত্যা প্রচেষ্টা ইত্যাদি ঘটনার যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এমন কি কৃত্রিম রোমাঞ্চ সৃষ্টির চেষ্টাও তাতে দুর্লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া হত্যা করতে উদ্যত হয়ে আবার মাসীকে ডেকে হরেনকে রক্ষা করার আহ্বান সতীশ চরিত্রকে অনেকখানি ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। ইতঃপূর্বে সে নলিনীর মনোভাব বুঝতে পারে নি, এবং সে কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী বরুণ নন্দীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নলিনীকে দামি নেকলেস কিনে দিয়েছে পিতার সিন্দুকের সোনার গড়গড়া চুরি করে। এ সবই তাকে ব্যক্তিত্ব হিসেবে করে তুলেছে দুর্বল। পক্ষান্তরে নলিনীর চরিত্র সৃষ্টি যথেষ্ট দৃঢ়তাপূর্ণ সার্থক ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সতীশসৃষ্ট কয়েকটি বিব্রতকর পরিস্থিতি সে তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সামলে নিতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি পিতা মাতার পছন্দের পাত্রকেও সে প্রত্যাখ্যান করেছে কোনরকম অশোভন আচরণ ছাড়াই।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাটকে কিছু ইতিবাচক বিষয় লক্ষযোগ্য। যেমন ইংরেজ-সংস্কৃতি নকল করার অন্তঃসারশূণ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধা। আর এটি বেশ সপ্রতিভ কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নলিনী চরিত্রের সংলাপে। পিতার সঙ্গে নলিনীর কথোপকথনো তা লক্ষ করা যেতে পারে:

লাহিড়ী। ... সেদিন চা-পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিল যে তার মচমচ শব্দে দেয়ালেল ইঁটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক এক সময় ভারি অক্‌ওঅর্ড্ হয়। তা ছাড়া ও ট্রাউজার্‌গুলো–থাক্‌গে, ... কিন্তু যেদিন বরুণরা, সেদিন বরঞ্চ ওকে–

Dhaka University Institutional Repository

নলিনী। ভয় কী বাবা, সেদিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধূতি পরে আসতে বলব, আর দিল্লির জুতো– সে মচ্‌মচ্‌ করবে না।

লাহিড়ী। ধূতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।[25]

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলে শাসকের কাছাকাছি হয়ে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক ভারতবাসী আচরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদে ইংরেজদের অনুকরণে উৎসাহী ছিল। এ আগ্রহের পেছনে বস্তুগত লাভের আশা থাকলেও এর দ্বারা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবোধ বিসর্জন দেওয়ার পাশাপাশি প্রকাশ পেত ব্রিটিশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব। তাই সচেতন ব্যক্তির কাছে এ অনুকরণ ঘৃণ্য বলেই বিবেচিত ছিল। শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধতায় পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল জাতীয়তাবোধের বিষয়টিও। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ছিল বরাবরই ইংরেজ-সংস্কৃতি অনুকরণের বিরোধী। কবি নিজেও প্রথম জীবনে এ বিষয়ে কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করে এ ধরনের বিরুদ্ধতা তুলে ধরেছিলেন। †kva‡eva নাটকেও এ চেতনা সঞ্চারের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক ভাবধারাই প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য শিল্পগুণের দিক থেকে দুর্বল নাটকের বক্তব্য উদ্দেশ্য পূরণে সফল হতে পারে কি না তাও ভেবে দেখার বিষয়।

bUxi cRv : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছেন মার্চ (১৯২৬) মাসের শেষ সপ্তাহে। এর কিছুদিন পর সেখানে তাঁর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়। মেয়েরা করছিল তাঁর K_v I Kwwnbx কাব্যের 'পূজারিনী' কবিতার মূকাভিনয়ের আয়োজন। এবার কবি নিজেই তার নাট্যরূপ দিতে উঠে পড়ে লাগলেন; কিন্তু শর্ত হলো – ৮ মে তার মঞ্চায়ন হবে এবং কেবল মেয়েরাই হবে এর অভিনয় শিল্পী। ফলে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে কয়েকদিনের মধ্যে লিখলেন বৌদ্ধ আখ্যানভিত্তিক নাটক bUxi cRv (১৯২৬)।[26] এর কাহিনীতে দেখা যায়: মহারাজ বিম্বিসার এবং রানি লোকেশ্বরী বৌদ্ধ ধর্মে অনুরক্ত। রাজউদ্যানের যে স্থানে বুদ্ধ ধ্যানস্থ হতেন রাজা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধের আসন। কিন্তু রাজপুত্র অজাতশত্রু সিংহাসনলোভী হয়ে উঠলে রাজা বিম্বিসার রাজ্যপাট ত্যাগ করে ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর অপর রাজপুত্র চিত্রও ভিক্ষু হয়ে গৃহত্যাগ করলে রানির মণে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কেই জাগে বিরূপ ভাব। রাজপ্রাসাদের অন্যান্য নারীর মনেও অনুরূপ ভাব জাগে। এমন কি নিম্নস্তরের মানুষের ধর্ম বলে বৌদ্ধ ধর্মকে বিদ্রূপও করতে থাকে

[25] শোধবোধ, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ.-২১০

[26] প্রমথ চৌধুরীকে ২৭ এপ্রিলে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন "... তাগিদে পড়ে লিখতে শুরু করেছিলেম, কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্ড্রীণ তাগিদে তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মত নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।" উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩১৭ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ। কেবল রাজবাড়ির নর্তকী শ্রীমতীর মনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আস্থা থাকে অবিচল। অবশ্য রানির মনে বিরূপ ভাবের পাশাপাশি প্রথম জীবনের পূজা অর্চনার রেশ থেকে যাওয়ায় উভয় ভাবের দ্বন্দ্বও বেশ পরিলক্ষিত হয়। এমন এক সময় সংবাদ পাওয়া যায়, ভিক্ষু বিম্বিসার রাজপ্রাসাদে আসবেন ভিক্ষা সংগ্রহে। ক্ষুব্ধ অজাতশত্রু এই বলে ঘোষণা দেয় যে, ভিক্ষুদের পূজা ও ভিক্ষা প্রদান বন্ধ এবং দণ্ডণীয়। তা সত্বেও রাজনর্তকী শ্রীমতী ভিক্ষুকে পূজা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রহরীরা তাকে সাবধান করলেও সে থাকে সংকল্পে অটল। এমন সময় রাজার নির্দেশ আসে যেখানে শ্রীমতী পূজা দেবে সেখানেই তাকে নাচতে হবে। ওদিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে বিম্বিসারের আগমণ উপলক্ষ্যে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। অজাতশত্রু ও দেবদত্তের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যপন্থী জনতা বুদ্ধের পূজা ও অনুশাসন উৎখাতে সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়। তাদের উপদ্রবে ধর্মানুসারী জনগণ ও শ্রমণেরা শঙ্কিত হলেও তাদের শক্তিও কম নয়। উভয় দলের সংঘাত হয়ে পড়ে অনিবার্য। বাইরের উত্তেজনা রাজপ্রাসাদেও ছড়িয়ে পড়ে। শোনা গেল দেবদত্তের শিষ্যরা হত্যা করেছে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণাকে। শ্রীমতীর মতো পরিচারিকাদের মধ্যেও রয়েছে বুদ্ধের অনুসারী। তা ছাড়া রানি লোকেশ্বরী প্রকাশ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হলেও অন্তরে যথার্থ বৌদ্ধভাবাপন্ন ও উপাসিকা। ইতোমধ্যে সংবাদ আসে পূজা নিবেদন করতে আসার সময় রাজা বিম্বিসারও নিহত হয়েছেন। এ অবস্থায় শ্রীমতী প্রস্তুত হতে থাকে নাচের জন্য। অনেকে তাকে ভর্ৎসনাসহ ও কাজে বিরত থাকতে বলে। লোকেশ্বরী তাকে বিষ এনে দিয়ে বলেন যে, বরং এখন আত্মঘাতী হওয়াই উত্তম। কিন্তু শ্রীমতী কারো কথা না শুনে শুরু করে নাচ। তবে নাচ শুরু হলে দেখা যায় নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে শ্রীমতী বুদ্ধের প্রতি পূজাই নিবেদন করছে। সে তার তার বহুমূল্য অলংকার খুলে ফেলে দিতে থাকে আবর্জনার মতো। এমন কি শেষদিকে তার নর্তকীর পোষাকের ভেতর থেকে প্রকাশ পায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর গেরুয়া বসন। এক পর্যায়ে শ্রীমতী বুদ্ধের স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করলে রক্ষিণীর অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়। এমন সময় বাইরে শোণা যায় বুদ্ধ পূজার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে রাজা অজাতশত্রু নিজেই অশোককাননে পূজা দিতে আসছে। রানি লোকেশ্বরী এবার মৃত শ্রীমতীর মাথা কোলে নিয়ে উচ্চারণ করতে থাকে –“বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি, ধর্মং সরনং গচ্ছামি...”। রাজকন্যা রত্নাবলীসহ অন্যরাও তার সঙ্গে এসে ত্রিশরণ গ্রহণ করে। এ ভাবে শেষ পর্যন্ত নটীর বুদ্ধপূজা হয়ে ওঠে সার্থক।

এ ভাবে bUxi cRv নাটকে বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। একইসঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু বৌদ্ধ শ্লোক বা সূত্র। যেমন দ্বিতীয় অঙ্কে রাজকন্যারা বিভিন্ন পূজা-উপকরণ নিয়ে স্তূপমূলে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনাসহ আহার্য, পুষ্প, প্রদীপ ও সুগন্ধ পূজার বন্দনা সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে যথাযথভাবে। অবশ্য একইসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তিও চোখে পড়ে। যেমন বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহা পরিনির্বাণ বৈশাখী

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণিমা তিথিতে বলে দিনটিকে বৌদ্ধরা বুদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে উদ্‌যাপন করে। কিন্তু এ নাটকে বুদ্ধের জন্মোৎসব পালনের দিন হিসেবে ধরা হয়েছে বসন্ত পূর্ণিমা। আবার এক জায়গায় বলা হয়েছে, "আজ বসন্ত পূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। আশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।"[২৭] এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সাধারণ একজীবনের অবস্থা নয়, বরং বুদ্ধ হয়ে ওঠার পথে বুদ্ধের পূর্ব জন্মসমূহের রূপই হলো বোধিসত্ত্বাবস্থা। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের ক্ষেত্রেও এ অভিধা প্রয়োগ করা হতো।[২৮] তবে নাটকের ঘটনা সংস্থাপনে উক্ত বৌদ্ধ আদর্শ ও বাণী নাট্যকার এমন কৌশলে প্রয়োগ করেছেন যে, তা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, এমনকি রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে চমৎকারভাবে সহায়তা করেছে। যেমন রানি লোকেশ্বরী ও রক্ষিণীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় স্পষ্ট। যে রক্ষিণী রাজার আদেশে শ্রীমতীকে হত্যা করেছে তার হৃদয়ে আছে বুদ্ধ অনুসারীর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা; কারণ বুদ্ধের প্রতি সেও সমানভাবে নিবেদিত। তাই শ্রীমতীকে আঘাত করতে হবে জেনে সে বহু আগেই তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়। যেমন :

রক্ষিণী। পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা?

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। কোরো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো ক্ষমতু! বুদ্ধো ক্ষমতু![২৯]

সে অনুযায়ী শ্রীমতীর মৃত্যুর পর অন্যান্য রক্ষিণীরা এসে গ্রহণ করে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা। অপরদিকে রাজকন্যা রত্নাবলীর সঙ্গে শ্রীমতীর বিরোধের মধ্যে এন্টাগোনিস্ট প্রোটাগনিস্ট দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট, যা নাটকের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় উপাদান। আবার ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদের বাইরে বৌদ্ধ ও বিরোধী শক্তির মধ্যে যে প্রবল সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে তাও রূপকায়িত হয়েছে উক্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে। রত্নাবলীর হিংস্র ও নিষ্ঠুর আচরণের পাশাপাশি ভিক্ষু উৎপলপর্ণা ও বিম্বিসারের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে

---

[২৭] নটীর পূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, (সুলভ সংস্করণ), কলকাতা, ১৪১৭ পৃ. ২৩১

[২৮] The Seeker's Glossary of Buddhism, New York, 1998, pp. 68-69

[২৯] নটীর পূজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ-বিরোধী শক্তির নিষ্ঠুরতাও সমান্তরাল আবহ সৃষ্টি করেছে। উক্ত বিষয়সমূহ এ নাটকে স্বল্পসংখ্যক নারী চরিত্র, সংলাপ ও ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে এমন পরিচিতি ও সংযমের রূপায়িত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্য নাটকে তা দুর্লভ। তাই একজন সমালোচক bUxi cRv সম্পর্কে লিখেছেন:

> নাটক হিসেবে এই ক্ষুদ্র নাটকটি সার্থক রচনা। একটি ঐতিহাসিক ধর্মবিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টিতে, ঘটনার দ্রুতগতিতে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্বের সম্মিলিত রূপাভিব্যক্তিতে, আবেগময়, পরিমিত ব্যঞ্জনামুখর ভাষণে, বাস্তব জীবনচেতনার মায়াসৃষ্টিতে এই নাটকটি সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।[৩০]

এ ছাড়া বৌদ্ধ আদর্শ হিসেবে অহিংস মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এ নাটক সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনন্য অদ্বিতীয় বলে মনে হয়। লক্ষণীয় যে, রক্ষিণী রোদিনী দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃত্যু-সংবাদ শুনে সবাইকে অস্ত্র হাতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার আহ্বান জানায়।

শ্রীমতীকে সে বলে:

> রোদিনী। রক্তপাত তবে শুরু হল। তাই যদি হলই তা হলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইবে না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।
>
> শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।
>
> পাটলী। তা হলে এই নাও (তরবারি দান)
>
> শ্রীমতী। (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না না! প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক, প্রভুর জয় হোক।[৩১]

এখানে স্পষ্ট যে, রোদিনীর আহ্বান বাস্তবায়িত হলে তা হয়ে উঠত রাজা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র তথা রাজদ্রোহ। সে সঙ্গে এতে প্রতিষ্ঠিত হতো হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার রক্তপাতের বিরুদ্ধে সমান নিষ্ঠুরতার মতবাদ। তাতে জয় হতো প্রমত্ত রিপুর, মারের, পরাজয় ঘটতো বুদ্ধ শিষ্য শ্রীমতীর, অহিংসা ও ক্ষমার। কিন্তু নাটকে তা ঘটে নি; ঘটেছে বুদ্ধের শিক্ষার জয়, বৌদ্ধ আদর্শের জয়।

bUxi cRv-য় সমকালীন রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তবে এখানে যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতির জয়গান করা হয়েছে তাতে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাযুজ্য লক্ষণীয়। যেমন

---

[৩০] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩
[৩১] নটীর পূজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন নিপীড়নের সামনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও অহিংস নীতি বজায় রাখলে তাতে গণজাগরণ তৈরি এবং স্বৈরাচারীরও যে মানস পরিবর্তন সম্ভব, তা-ই যেন এ নাটকে দেখানোর প্রয়াস আছে। নাটক রচনাকালে কলকাতায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাজনীতিতে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের আবহ যে কবিকে উক্ত নাটক লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে, তা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

প্রসঙ্গত bUxi cRv নাটকের উপস্থাপনা সে সময় কলকাতায় বেশ আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। শান্তিনিকেতনে নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন (৮ মে, ১৯২৬)-এর আট মাস পর একই দল কলকাতায় জোড়াসাঁকোতেও পরপর চারবার মঞ্চস্থ করে এ নাটক। সে সঙ্গে নাটকে 'ভিক্ষু উপালি' নামে একটি পুরুষ চরিত্র সংযোজিত হয় যার অভিনয়ে কবি নিজেও অংশ গ্রহণ করেন।[৩২] তৎকালীন প্রায় সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ নাটকের উচ্চ প্রশংসামূলক প্রতিবেদন। বিশেষ করে 'শ্রীমতী'-র ভূমিকা অভিনয়ে গৌরী বসু-র নৃত্য সব দর্শককে মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়।[৩৩] আরো উল্লেখ্য যে, শ্রীমতী চরিত্রের শেষ নৃত্যের মাধ্যমেই প্রথম শিক্ষিত বাঙালি সমাজে নৃত্য বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসেবে। ইতঃপূর্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ শেখাবার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা হয়েছিল গোপনে; এমনকি শান্তি-নিকেতনেও তা প্রকাশ্যে (বিশেষত ছাত্রীদের) অনুশীলন করা হতো না।[৩৪] এ সাফল্যের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাটকের নৃত্যরূপের পাশাপাশি মৌলিক নৃত্যনাট্যও রচনা করেছিলেন।

১৯২৬ সালের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরেই (১২ মে) কবি সদলবলে চললেন ইটালি সফরে। এর আগের বছর সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর সফর অসমাপ্ত ছিল। সে সময় ফ্যাসিবাদের সমর্থকরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও এবার যে তিনি খোদ স্বৈরাচারী মুসোলিনির আমন্ত্রণেই যাচ্ছেন, তা তিনি তখনো বুঝতে পারেন নি। জাহাজে ওঠার পর সেটি তাঁরা কেবল ধারণা করতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার জানাচ্ছেন:

> রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য ইতালীর জাহাজ Aquileja-য় ছয়টি দ্য-লুক্স ক্যাবিনের ব্যবস্থা হইল। বোম্বাইতে জাহাজে উঠিয়া তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই তাঁহারা ইতালীয় সরকারের অতিথিরূপে চালিয়াছেন, কারণ জাহাজের অধস্তন ভৃত্য হইতে কাপ্তেন পর্যন্ত সকলেই ইহাদিগকে যেরূপ সমাদর করিতে লাগিলেন, তাহা কখনো সাধারণ যাত্রীর প্রাপ্য নহে।[৩৫]

---

[৩২] শান্ড়িদেব ঘোষ, গুর‌ুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২৩
[৩৩] র‌ুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮–১৪
[৩৪] শান্ড়িদের ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
[৩৫] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

আর ইটালির নেপল্‌স পৌঁছার (৩০ মে) পরপরই যখন সরাসরি মুসোলিনির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ চলে এলো রোমে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে থাকার, তখন আর সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বৈরাচারী মুসোলিনি সম্পর্কে তখন বিশেষ কিছু জানতেন না। উল্লেখ্য, মুসোলিনির পাঠানো ইটালি সম্পর্কে এক বিশাল বইয়ের ভাণ্ডার ও জুইসেপ্পে তুচ্চি নামক একজন পণ্ডিতকে বিশ্ব-ভারতীর জন্য পেয়ে অবধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসোলিনির প্রতি বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন।[৩৬] অথচ প্রচণ্ড স্বৈরাচারী মুসোলিনি তখন সারা পৃথিবীতে কুখ্যাত, ঘৃণিত। কারণ ১৯২৩ সাল থেকে ইটালির ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর সারাদেশে তিনি গুণ্ডামি ও নৃশংসতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। এক সমালোচকের ভাষায় :

> ১৯২৬ সালের মধ্যে মুসোলিনি প্রায় সকল বিরোধী নেতাদের হয় হত্যা করেছিলেন নয়তো জেলে পাঠিয়েছিলেন, কিংবা দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। বিরোধী নেতারা এবং অগণিত রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী সুইটজারল্যাণ্ড, ভিয়েনা, ফ্রান্সে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন; পারীতে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ইতালীয়রা মুসোলিনির ইতালির হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী জগতের সামনে উদ্‌ঘাটন করছিলেন।[৩৭]

এই মুসোলিনির খপ্পরে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই ফ্যাসিবাদের সমর্থক ও প্রশংসাকারী হিসেবে প্রচারিত হলেন। তিনি কিংবা দলের কেউ ইটালি ভাষা না জানার কারণে দোভাষী ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ভিজিটিং অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি তাঁকে যা বোঝান তার বাইরে কিছু বুঝতেন না; পত্র-পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যের ভুল উপস্থাপনা সম্পর্কেও পান নি কোন তথ্য। এমন কি এ সফরের সময় বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বেনেদিত্তো ক্রোচে গোপনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হন। রোমে মুসোলিনির সঙ্গে কবির দেখা হলে তিনি মুসোলিনির চেহারার তুলনা দেন শিল্পী মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সৃষ্ট ভাস্কর্যের সঙ্গে। তিনি বলেন:

> His Excellancy Mussolini seems modelled body and soul by the chirel of a Michael Angelo, whose every action showed intelligence and force. I see a great future for your country, a future as great as her part

---

৩৬ এ প্রসঙ্গে সে বার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সফর সঙ্গিণী নির্মলকুমারী (রাণী) মহলানবিশ পরে স্পষ্টই বলেছেন (১) ফর্মিকি আর তুচ্চি ছিলেন মুসোলিনির গুপ্তচর, (২১ মুসোলিনি ফার্মকি আর তুচ্চিকে শান্ড়্নিকেতনে পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষে ফ্যাসিজিম প্রচারের জন্য, (৩) শান্ড়্নিকেতনে গ্রন্থ উপহার, ইটালিতে রবীন্দ্রনাথকে এই আমন্ত্রণ, সবই মুসোলিনীর অনুকুলে প্রচারের জন্য, ... (৫) ... রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থপ্রাপ্তিতে এবং দুই প িতকে শান্ড়্নিকেতনে পেয়ে এত মুগ্ধ যে বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদের (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্ড়চন্দ্র মহলানবিশ০ সন্দেহ দেখে বিরক্ত।" উদ্ধৃত, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, ডাকঘরের হরকরা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৯৮-৯৯

৩৭ অবন্ড়ীকুমার সান্যাল, প্রসঙ্গ: রম্যাঁ রলাঁ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

> after she rises glorious and beneficent to herself and also to others from the courage that shook the whole world.[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের এ সব মন্তব্য এবং তাঁর ইটালি ভ্রমণ সারা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এতে তাঁর ভক্ত ও ইউরোপের অনেক বন্ধু পড়লেন বিব্রত অবস্থায়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন ফরাসী লেখক-শিল্পী ও 'চিন্তার স্বাধীনতা' আন্দোলনের নেতা রম্যাঁ রলাঁ। ১৯১৯ সাল থেকে রলাঁ-রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বের সূচনা। রলাঁ এসময় (১৯২৬) অবস্থান করছিলেন সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভ শহরে। রবীন্দ্রনাথ ইটালি সফর শেষ করে রলাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য (২২ জুন) সুইজারল্যান্ড আসেন এবং ৪ জুলাই পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় রম্যাঁ রলাঁ কয়েকজন প্রবাসী ইটালীয়বাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে, মুসোলিনি কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তির বিষয় জানিয়ে এন্ডরুজকে যে পত্র লেখেন, সেটি তিনি ইংল্যান্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। তাঁর সেই দোভাষী ফর্মিকির কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে তিনি লেখেন:

> আমি নিশ্চিন্ত যে, ফ্যাসিবাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার পক্ষে এক ধরনের নৈতিক আত্মহত্যা। কিন্তু ঠিক এইটিই সর্বত্র ইয়োরোপ ও অন্য মহাদেশগুলোয় – সমস্ত মতের মানুষেরা বিশ্বাস করছে। প্রতিবাদ না করে জনরব চলতে দেওয়াটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।[৩৯]

এ ধরনের কয়েকটি চিঠি ইয়োরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় আগস্টের শেষ দিকে সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনার ঢেউ থেমে যায়; তাঁর সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে কবি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, ইত্যাদি ঘুরে ১৯২৬-এর ডিসেম্বরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতে তখন পূর্বোক্ত 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' আইনে চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। বহু যুবক বিনা বিচারে বন্দি কিংবা ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় 'ফরওয়ার্ড' কাগজে প্রকাশিত হলো 'খোলা চিঠি' নামে কবির এক সাক্ষাৎকার (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭)। এখানে কবি ব্রিটিশ পুলিশের অন্যায় আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ জাতির মহত্তর স্বভাবের কাছে আবেদন করাই একমাত্র পথ বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন:

---

[৩৮] Visva-Bharati Quarterly (October, 1926) থেকে উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩

[৩৯] উদ্ধৃত, অবন্ডী কুমার সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা শাসকজাতির নিকট হইতে আত্মীয়-উচিত সহানুভূতি দাবি করিতে পারি না; অপরদিকে আমরা যখন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত হই, তখন আমাদের ক্লীবতা হাস্যকর হইয়া উঠে। আমাদের একমাত্র দাবি মানবতার দাবি; তাহা যদি অগ্রাহ্য হয়, তবে তাহা তাহাদিগকেই গোপনে আঘাত করিবে।[৪০]

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এ সময় কবি-লেখকদের রচনার ওপরও ব্রিটিশের দমন অভিযান চলছিল সমানভাবে। এ প্রক্রিয়ায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সন্ত্রাসবাদী চরিত্র ও তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী গোপন কার্যক্রমকেন্দ্রিক উপন্যাস c‡_i ‘\`vex (১৯২৭) ব্রিটিশ প্রশাসন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মর্মাহত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতা চাইলে তিনি উল্টো শরৎচন্দ্রকে তিরস্কার করে একটি চিঠিতে লেখেন:

> লেখকরা উত্তেজক গ্রন্থ লিখিবেন অথচ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশাও করিবেন যে, ইংরেজ সরকার তাহাদের শাস্তি দিবে না, এরূপ মনোভাব স্বাস্থ্যকর নয়। ... ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করিবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করিব, সেটাতে পৌরুষ নাই।...[৪১]

সেই সঙ্গে ইংরেজ সরকার প্রসঙ্গে বলেন:

> পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরেজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরেজ গর্ভনমেন্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গর্ভনমেন্টকে যা' তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।[৪২]

উদ্ধৃতি দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দমননীতির সমালোচনা করলেও তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, মোহ ও আস্থার বিষয়ও যে প্রবল, তা স্পষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের c‡_i ‘\`vex উপন্যাসে উক্ত বিষয়গুলো তো নেই-ই বরং তাতে তীব্র ইংরেজ-বিরোধিতার পাশাপাশি তাদের বিতাড়িত করতে সশস্ত্র সংগ্রামের বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে। একজন সমালোচকের ভাষায়:

> শরৎচন্দ্র ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কোনো মোহই ‘পথের দাবী’তে দেখাননি। তিক্ত ইংরেজ বিদ্বেষ এতে প্রচারিত। সব্যসাচীর [সন্ত্রাসবাদী চরিত্র] পন্থার নাম তিনি

---

[৪০] উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬
[৪১] উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭
[৪২] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

> দিয়েছেন 'বিপ্লব'। অবশ্য সব্যসাচীর তথাকথিত বিপ্লব যে তার শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্ষমতা দখলে তাদের শ্রেণী যে সুবিধা পাবে সে কথা এ গ্রন্থে অস্পষ্ট থাকেনি।[৪৩]

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ-বিরোধী কোন ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

এ সময় রবীন্দ্রনাথ 'রায়তের কথা' (১৯১৭) নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যাতে তাঁর কিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি সবুজপত্রে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর একই শিরোনামের প্রবন্ধ পাঠের প্রতিক্রিয়া হিসেবে লিখিত।[৪৪] এর কিছু সময় পরে (১৯২৭) রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং পরে চীন, জাপান হয়ে কানাডা ও আমেরিকা ঘুরে আসেন (১৯২৯)। দেশে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যে পুরনো নাটক ivRv I ivYx কে গদ্যভাষায় প্রায় নতুন করে লিখলেন ZcZx (১৯২৯) নাম দিয়ে। অবশ্য শিরোনাম, ভাষা ও কাহিনীতে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও নাটকের বক্তব্যে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এ সময় ড. শচীন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে *The Political Thought of Rabindronath Tagore* নামক গ্রন্থ রচনা করলে কবি সে সম্পর্কে রচনা করেন, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' শীর্ষক প্রবন্ধ।[৪৫] এর কিছুদিন পর কবি আবার ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন (মার্চ ১৯৩০)। এ ভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য লন্ডনের অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়া হলেও, অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সেখানে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। তাই দেখা যায় লন্ডনে যাওয়ার আগেই ২ মে থেকে প্যারিসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সহায়তায় শুরু হয়ে যায় তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী। এ প্রক্রিয়া চলে জার্মানি, ডেনমার্ক ও মস্কোতেও। কবি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় থাকার সময় রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ পান। এর আগে দু'বার রাশিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ এলেও অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারেন নি। এবার (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) দলবলসহ কবি পৌঁছলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে। উল্লেখ্য, সে সময় ব্রিটিশ সরকারের বিদ্বেষভাবের কারণে সাধারণ মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও রাশিয়া সম্পর্কে ছিল কিছুটা বিরূপ ধারণা। কিন্তু রাশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এবং সে সম্পর্কে জেনে তাঁর অনুভূতি অনেক ক্ষেত্রে মুগ্ধতার পর্যায়ে পৌঁছে। রাশিয়া অবস্থানকালে ভারতে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে রয়েছে সে মুগ্ধতার পরিচয়। বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের মর্মবাণী, লিগ অব নেশন্স-এ সোভিয়েতের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব ও শান্তিনীতি, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থা, জনশিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে রাশিয়ার

---

[৪৩] নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা ১৯৮৩, পৃ. ১২১

[৪৪] গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৫০১

[৪৫] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ ও সফলতার বেশ প্রশংসা করেন তিনি। অবশ্য সে সঙ্গে তিনি সেখানে শ্রমজীবী শ্রেণির একনায়কত্ব ও বলপ্রয়োগের নীতি সমর্থন করতে পারেন নি।[৪৬] কালী মোহন ঘোষের কাছে লেখা (১৩ নং পত্রের) এক জায়গায় তিনি এ সম্পর্কে জনিয়েছেন:

> মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিক মত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাস্টিদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।[৪৭]

রাশিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ২৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন:

> But I find here certain contradiction to the great mission which you have undertaken, Certain attitudes of mind are being cultivated which are contrary to your ideal.
>
> I must ask you: Are you doing your ideal a service by arousing in the ninds of those under your training, anger, class hatred and revengefulness against those not sharing your ideal, against those whom you consider to be your enemies?[৪৮]

তবে এসব দ্বিমত সত্ত্বেও রাশিয়ার চিঠিতে প্রশংসার ভাগ এত বেশি ছিল যে, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৪৯]

কিছু দিন পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া থেকে জার্মানি হয়ে আমেরিকা পৌঁছেন। এখানে এসে তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে বেশ দ্রুততার সঙ্গে স্থগিত করা হয় তাঁর কয়েকটি পূর্ব নির্ধারিত বক্তৃতা। এ প্রসঙ্গে জীবনীকারের মত হলো তিনি যতটা অসুস্থ ছিলেন তার চেয়েও বেশি প্রচার চালানো হয়েছিল। কারণ আমেরিকানদের ভয় ছিল, পাছে কবি ভারতে গান্ধীবাদ সমর্থন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের প্রশংসা করে ফেলেন।[৫০] এ কারণে এ সময় প্রায় দু'মাস কবি আমেরিকায় অবস্থান

---

[৪৬] "রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার 'প্রলেটারিয়েট ডিক্টেটরশিপ,' অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নীতি – এগুলি সমর্থন করেন নাই। তাছাড়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই।" নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, কলকাতা-১৯৮৮ (প্রথম দে'জ সংস্করণ) পৃ. ৯৫

[৪৭] রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৩২৭–২৮

[৪৮] উদ্ধৃত; নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৯৫

[৪৯] "'রাশিয়ার চিঠি' প্রথমে 'প্রবাসী' তে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সহস্র বাঙালি সে গুলি পড়িয়াছিল; তার পর পুস্তকাকারে বাহির হইলে বহুলোক পড়ে। ... কিন্তু মর্ডাণ রিভিউ পত্রিকায় একটি মাত্র চিঠির ইংরেজি তর্জমা বাহির হওয়া মাত্র সম্পদকের উপর সরকারী হুকুম আসিল আর যেন অনুবাদ ছাপানো না হয়।" প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

[৫০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

করলেও বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রায় হয় নি বলা চলে। অগত্যা আমেরিকা ত্যাগ করে তিনি ইংল্যান্ড হয়ে ফিরে আসেন ভারতে। দেশে ফিরে (৩১ জানুয়ারি, ১৯৩১) কবি প্রধানভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন গান রচনায়। সে সব নিয়ে রচিত হয় bexb (১৯৩১) নামের একটি গীতিনাট্য, যা শান্তিনিকেতন ও পরে কলকাতায়ও প্রদর্শিত হয়। এসময় কবি নৃত্য বিষয়েও শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের নিয়ে শুরু করেন নানা রকম নিরীক্ষা। উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটে kvc‡gvPb (১৯৩২) নৃত্যনাট্যে।[৫১] যে বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে ivRv (১৯১০) নাটক রচিত তারই সূত্রে গড়ে উঠেছে kvc‡gvPb-এর কাহিনী।[৫২] এর কিছুদিন পর পূর্বলিখিত i_hvÎv (প্রবাসী, ১৯২৩) নাটিকাও কাব্যছন্দে i‡_i iwk (১৯৩২) নামে পুনরায় প্রকাশ করেন যা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়)। এ সময় কবিকে কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনায়ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায়। সে গুলি হলো হিন্দু মুসলমান সমস্যা, হিজলী বন্দী-শালায় বিপ্লবীদের নির্যাতন ও হত্যা, গান্ধির অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে কবি নিজেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং রচনা করেন PÐvjKv (১৯৩৩) নাটক।

PÐvjKv : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৯ সালে) ইউরোপ যাওয়ার সময় থেকে ভারতে সংঘটিত হয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। যেমন ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের বিপুল জনতা এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে তা নির্মমভাবে দমনের চেষ্টা করে ব্রিটিশ সরকার। পুলিশের লাঠি ও গুলিতে সারাদেশে ১২০ জন নিহত হয়, আহত হয় বহুশত। গান্ধী নিজে বেছে নেন লবণ তৈরি করার মাধ্যমে লবণ আইন ভঙ্গের কর্মসূচি। দেশের বিভিন্ন স্থানের জনতা বিদেশি বস্ত্র বয়কট, মাদক দ্রব্য বর্জন, সরকারি বনাঞ্চলের গাছ কাটা ইত্যাদির মাধ্যমে আইন ভঙ্গ করতে শুরু করে। কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত বেছে নেন প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পাঠ করে 'সিডিশন আইন' ভাঙার আন্দোলন। এমন কি গান্ধী সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ভারতীয় মহিলাদেরও এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দিয়ে কেবল দিল্লিতেই কারাবরণ করেন ষোল শত মহিলা।[৫৩] এভাবে সারা ভারতে নব্বই হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে এবং ১৯৩৩-এর মে মাসে গান্ধীকেও গ্রেপ্তার করা হলে এ আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু ১৯২২ সালের মতো এবারও গান্ধী হরিজনদের উন্নতিকল্পে তাঁর নিজের ও সাথীদের চিত্তশুদ্ধির জন্য ২১ দিন অনশনের ঘোষণা দেন। শুধু তাই নয়, এ উপলক্ষ্যে দেড় মাস

[৫১] প্রতিমা দেবী, নৃত্য, কলকাতা ১৪০০, পৃ. ২১
[৫২] গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩
[৫৩] সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯০ (২য় সংস্করণ), পৃ. ২৮১–৮৩

Dhaka University Institutional Repository

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখারও অনুরোধ জানান কংগ্রেস সভাপতিকে। তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হলে স্বাভাবিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে।[৫৪]

এদিকে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীরা সরকারি পুলিশ কর্মকর্তা বা গুপ্তচর হত্যা চালাতে থাকে। তারা ১৯২৯ সালে বরিশালে দারোগা যতীশচন্দ্র রায় ১৯৩০ সালে চাঁদপুরে রেল পুলিশের ইন্সপেক্টর তারিনী মুখোপাধ্যায়সহ কয়েকজনকে হত্যা করলে বেশ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ১৯৩০ সালের ২১ আগস্ট ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে 'ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান' 'মিঃ নোম্যান এবং ৮ ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে পুলিশের কারা বিভাগের প্রধান (Inspector General of Prisons) N G Simpson কে হত্যা করা হলে পরিস্থিতি ওঠে চরমে। লক্ষণীয় যে, এ সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে তরুণ যুবকদের পাশাপাশি তরুণীরাও শরীক হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ রকম অষ্টম শ্রেণির দু'জন ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী প্রকাশ্য দিবালোকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট C G B Stevens-কে।[৫৫]

ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের এই পর্বে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময় ঘটনা ছিল ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠ ও চট্টগ্রাম দখল কার্যক্রম। এর আগে বিপ্লবীদলের মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ পুলিশের কর্মকর্তা ও গুপ্তচর হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য ছিল – ব্রিটিশদের হঠিয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম দখলের মাধ্যমে একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করা।[৫৬] এ উদ্দেশ্যে 'মাস্টারদা' সূর্যসেন-এর নেতৃত্বে ৬৩ জন বিপ্লবী বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে একযোগে চট্টগ্রামের পুলিশ হেড কোয়াটার অস্ত্রাগার, রেলওয়ে পুলিশের অস্ত্রাগার ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করেন। আক্রমণ সফল হওয়ার পর সব দল পুলিশ হেড কোয়াটারে সমবেত হলে সেখানে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ওড়ানো হয় স্বাধীন ভারতের পতাকা। সে সঙ্গে সূর্যসেনকে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রধান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সামরিক কায়দায় অভিনন্দনও জানানো হয়।[৫৭] এ দলের একজন নারী সদস্য, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারও পরবর্তী সময় একাধিক সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে বিশেষ করে লাহোরে ১৯২৮ সালের দিকে – ভগৎ সিং ও শুকদেবের নেতৃত্বে – সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ সংযুক্ত হতে দেখা যায়। তাঁরা এ পাটির নাম 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' (HSRA) এবং ১৯২৯ এপ্রিল ভগৎ সিং ও

---

[৫৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯৯–৪১

[৫৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

[৫৬] এ দলের একজন সামরিক নেতা গনেশ ঘোষ পরে একটি লেখায় জানিয়েছেন, "... তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের একটি নির্ভুল পথ ও পন্থার উদাহরণ দেশের জনগণের সম্মুখে স্থাপন করা। মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেই জাতির বৃহত্তম অংশকে জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব এবং সে পথে জাতীয় মুক্তি সুনিশ্চিত হয়"। গনেশ ঘোষ, বিপণ্চবী সূর্য সেন, কলকাতা, ১৯৯৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ৮৩

[৫৭] পূর্ণেন্দু দস্তিদার, স্বাধীনতা সংগ্রামের চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ১৩৯৭, পৃ. ১৩৬–১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা ছুঁড়ে প্রচারপত্র বিলি করেন।[৫৮] সে প্রচারপত্রে লেখা ছিল:

> বিপ্লব মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্বাধীনতা সকলের অনপনেয় অধিকার। সমাজের প্রকৃত ধারক হলো শ্রমিক ... বিপ্লবের এই বেদিতে আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের যৌবণের অর্ঘ্য, কারণ এইরকম এক অসাধারণ লক্ষ্যের কাছে কোনো ত্যাগই যথেষ্ট মহান নয়। আমরা তৃপ্ত। বিপ্লবের আবির্ভাবের জন্যে আমরা প্রতীক্ষারত। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।[৫৯]

এ ঘটনার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া যতীন দাস কারাগারে ৬৪ দিন অনশন ধর্মঘট করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে HSRA-এর বীর ও শহীদরা সে সময় লাভ করেছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়তা। সে কারণে শহীদ যতীন দাসের মরদেহ লাহোর থেকে কলকাতায় এলে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার মিছিল দু'মাইল দীর্ঘ হয়েছিল।[৬০] উল্লেখ্য এ বিপ্লবীদলের উত্থান এবং তাদের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন গান্ধি তাঁর 'Yong India' পত্রিকায়। এ পত্রিকায় তিনি বিপ্লবীদের তাঁদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানালে তাঁরা 'The Philosophy of Bomb' শিরোনামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হয়েছিল:

> বিপ্লবীরা বিশ্বাস করেন যে, ভারতের মুক্তি কেবলমাত্র বিপ্লবের দ্বারাই সম্ভব। বিপ্লব শুধুমাত্র বিদেশী সরকার ও তার সাকরেদদের সঙ্গে ভারতীয়দের সশস্ত্র সংগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে; বিপ্লবীরা পুঁজিবাদ ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটাবেন; দেশী ও বিদেশী শোষণ থেকে কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষকে মুক্ত করে বিপ্লব সমৃদ্ধি আনবে এবং তার ফলে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।[৬১]

এই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারেও ১৯৩০-এর এপ্রিলে ঘটে কৃষক-জনতার বিশাল অভ্যুত্থান। এখানে 'বাদশা খান' নামে পরিচিত আবদুল গফ্‌ফার খানের নেতৃত্বে 'লাল কোর্তা' বাহিনী ব্রিটিশ সৈন্যের সাঁজোয়া গাড়ির মুখোমুখি তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে বেসরকারি হিসেবে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০ জন। প্রসঙ্গত এ অভ্যুত্থানে ভারতের সাম্প্রদায়িক সহনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। তা হলো – এ সময় হিন্দু সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তোলা গাড়োয়াল

---

[৫৮] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কলকাতা ১৯৯৫ পৃ. ২৭১-৭২

[৫৯] উদ্ধৃত; সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

[৬০] সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

[৬১] সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

রাইফেল্‌স বাহিনী মুসলমান আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেন। পরে সামরিক বিচারের সময় তাঁরা বলেন:

> আমাদের নিরস্ত্র ভাইদের আমরা গুলি করে মারব না, কারণ ভারতের সৈন্যদের কাজ বাইরের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে আপনারা আমাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দিতে পারেন।[৬২]

এ ঘটনায় মোট দশ দিন পেশোয়ার শহর ছিল আন্দোলনকারীদের দখলে। এর দুই সপ্তাহ পরে মহারাষ্ট্রের শিল্পশহর শোলাপুরেও শিল্প শ্রমিকদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। এতে শ্রমিকরা একযোগে পুলিশ চৌকি, আদালত, পৌরসভা কার্যালয় আক্রমণ করে এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের ঘেরাও করে রাখে একটি রেল স্টেশনে। ব্রিটিশ সরকার এক সপ্তাহ পর সামরিক আইন জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়।

উল্লিখিত সশস্ত্র আন্দোলনগুলো দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশরা অবলম্বন করে বীভৎস উৎপীড়ন পদ্ধতি। যেমন চট্টগ্রামের ৫২টি গ্রামকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে, ঘরে ঘরে চালানো হয় লুঠতরাজ ও অত্যাচার। এরই এক পর্যায়ে (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) মেদিনীপুরের হিজলী জেলে বন্দি বিপ্লবীদের ওপর কারারক্ষীরা নৃশংস হামলা চালায়। তাদের গুলি ও বেয়নেটে দুই জন বিপ্লবী নিহত হয় এবং আহত হয় বহু বন্দি। এ ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় আয়োজিত সভায় সত্তর বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যোগদান করেছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার এ বিষয়ে বলেন:

> ... কলকাতার প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও এ বছরগুলিতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে দূরেই সরে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর বৈরীতাও ছিল সুজ্ঞাত।[৬৩]

অবশ্য এ বক্তৃতায় ও পরে লিখিত 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধে তিনি সরকার ও দেশবাসীকে শান্ত থাকারই অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। যেমন তিনি লেখেন:

> পরিশেষে আমি বিশেষভাবে গবর্মেন্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনই শান্ত হোক। ... এ রকম উভয় পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক– এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা

[৬২] উদ্ধৃত; সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২
[৬৩] সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

> বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।[৬৪]

তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক নেতা গান্ধী চট্টগ্রামের সূর্য সেন, দিল্লির ভগৎ সিং এমন কি গাড়োয়ালি সৈন্যদের সত্যিকার অহিংস ও 'আদেশ অমান্য' কার্যক্রমকে মোটেই সমর্থন করেন নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণ পরবর্তী ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার পরোক্ষভাবে সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন, "তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভাইসরয় চট্টগ্রামের গণ্ডগোলের জবাব দিয়েছেন।"[৬৫] তেমনি গাড়োয়ালি সৈন্যদের সেই মহৎ সিদ্ধান্ত ও কাজের নিন্দা করে লন্ডনে এক সাংবাদিককে তিনি বলেন:

> যে সৈন্য গুলি চালনার আদেশ অমান্য করে সে তো শপথ ভঙ্গ করে। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সময় সে এই শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং সে অবাধ্যতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী।[৬৬]

বস্তুত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও দ্বিতীয় দফা আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যেই গান্ধি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী লিগ গঠন (সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) করেন এবং শুরু করেন অনশনসহ অন্যান্য কর্মসূচি। যেমন, ১৯৩৩-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩৪ এর আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি ১২,৫০০ মাইল হরিজন পরিক্রমা করেন। আর এ ভাবে ১৯৩৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হলো আইন অমান্য আন্দোলন।[৬৭]

লক্ষণীয় যে, গান্ধি সূচিত উক্ত অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন PÛvjKv নাটক। উল্লেখ্য, এর আগের বছর (১৯৩২) এর ২৭ সেপ্টেম্বর গান্ধীর জন্মদিন পালনের জন্য পুণায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথও দেশবাসীকে অস্পৃশ্যতা বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন:

> I appeal to our countrymen that this must never pause till the wils of disparity and discord are completely rooted out from the soil of India. Let us today take upon ourselves, all men and women of India, this great task which lies before us ad dore meet the chalange which it has sent from one end of our country to the other.[৬৮]

---

৬৪ কালান্ড়র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬

৬৫ উদ্ধৃত; সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি, কলকাতা, ২০০১ পৃ.

৬৬ উদ্ধৃত; সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৪৩–৪৪

৬৭ সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৪

৬৮ উদ্ধৃত; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১-৯২

Dhaka University Institutional Repository

পুণা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি বিশ্বভারতী থেকে সমাজ সংস্কারমূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তাতে উল্লিখিত ছিল:

> ১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই জল-চল করিয়া লইতে হইবে।
>
> ২। সাধারণ মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।
>
> ৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।
>
> ৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিবে না।[৬৯]

উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের বেশ কয়েকটির নাটকীয় প্রয়োগ PÛWj Kv-র কাহিনীতে লক্ষ করা যায়। এর কাহিনীটি নেওয়া হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি আখ্যান 'শার্দূল কর্ণাবদান' থেকে।[৭০] আবশ্য শার্দূল কর্ণাবদান' আখ্যানের পুরো অংশ এখানে ব্যবহৃত হয় নি। এর প্রথম অংশ এবং তার মধ্যে আধুনিক মানব চেতনার সংমিশ্রণে এ নাটক অনেকাংশে হয়ে উঠেছে কবির নতুন সৃস্টি। উক্ত কাহিনীতে আছে শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর শিষ্য আনন্দ এক চণ্ডাল কন্যার কাছ থেকে জল পান করতে চান। চণ্ডালিনী তার নিচু জাতের কথা উল্লেখ করলে আনন্দ তাকে বলেন সকল মানুষের সমান মর্যাদার কথা। এ কথা শুনে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি নিঃসঙ্কোচে ভিক্ষু আনন্দকে জল দান করে। মানব মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দের প্রতি প্রকৃতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি তাঁর সৌম্য কান্তি ও অশ্রুতপূর্ব বাণীতে হয়ে পড়ে মোহাবিষ্ট। তার মধ্যে জাগে অদম্য প্রেমস্পৃহা। প্রকৃতি এ কথা তার মাকেও জানায়। প্রকৃতির মা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী। এ সুবাদে প্রকৃতি তার মাকে অনুরোধ করে মন্ত্রবলে আনন্দকে এনে দেওয়ার জন্য। মা তাকে বলে যে, আনন্দ বুদ্ধের শিষ্য বলে মন্ত্রজাল ছিন্ন করার ক্ষমতা রাখেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রজাল কোনভাবে ছিন্ন হয়ে গেলে প্রকৃতির মায়ের জীবন হয়ে উঠবে বিপন্ন। তবু প্রকৃতির পীড়াপীড়িতে তার মা শুরু করে মন্ত্র পাঠ। আনন্দ মানসিকভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও মন্ত্রের প্রভাব ছিন্ন করতে ব্যর্থ হন। এ দিকে একটি মায়াদর্পণে আনন্দের মানস-পরিবর্তন ও তাঁর ওপর মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে থাকে প্রকৃতি। মন্ত্রের চূড়ান্ত অভিঘাতে রিপুদমনে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত আনন্দ এসে উপস্থিত হন প্রকৃতির অঙিনায়। প্রকৃতি দেখে পরাজিত আনন্দের মধ্যে সেই সৌম্য কান্তি ও উন্নত দর্শনের কিছুই

[৬৯] উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৩
[৭০] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৭

Dhaka University Institutional Repository

অবশিষ্ট নেই। সে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার মা আনন্দকে তাঁর সু-উচ্চ মহিমান্বিত স্থান থেকে নামিয়ে এনেছে ধুলোয় অবমানিতের অবস্থানে। এ অবমাননা প্রকৃতির বুকে বাজে গভীর হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে মন্ত্রের উপাদানগুলো নষ্ট করে দিলে আনন্দ হয়ে ওঠেন তাঁর পূর্ব অবস্থানে স্থিত ও আত্মস্থ। কিন্তু এর ফলে তখনই প্রকৃতির মায়েরও মৃত্যু ঘটে। আর আনন্দ স্ব-মহিমায় বুদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে ফিরে যান তাঁর আবাসস্থলে।

অবদানের গল্পে জাতপাতের অসারতা প্রতিপাদনের যে চেষ্টা পরিলক্ষিত তা-ই রবীন্দ্রনাথ এ নাটিকায় গ্রহণ করেছেন। তবে সে বক্তব্য কবির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পকৌশলে হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে মানবিক ও নাটকীয়। যেমন নাটকে প্রকৃতি নিজেকে চণ্ডালকন্যা হিসেবে পরিচয় দিয়ে আনন্দকে তার কুয়োর জল অশুচি বলে উল্লেখ করে। কিন্তু আনন্দ বলে "যে মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থ জল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।"[৭১] এ সংলাপের সহজ সরল ভাষ্যে ও যুক্তির ঋদ্ধতায় ভেঙে পড়ে প্রকৃতির জাত-বিজাতের পূর্ব ধারণা ও সংস্কার। একই সঙ্গে ধুয়ে মুছে যায় তার আজন্ম অনুসৃত গ্লানিবোধ ও অশুচিতা। প্রকৃতির মা এ সব কথা শুনে তাকে তার জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে বলে, "কেবল এক গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।"[৭২] সত্যিই যেন প্রকৃতির নতুন জন্ম হয়েছে যুক্তির শৃঙ্খলায় ও আত্মসম্মানবোধের মাটিতে। এ প্রসঙ্গে মায়ের সঙ্গে প্রকৃতির কথোপকথন লক্ষ করা যেতে পারে:

মা। মিছে রাগ করিস কেন, বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের– পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।[৭৩]

এমন কি ধর্ম সম্পর্কে তার স্পষ্ট মত, "যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে।"[৭৪] প্রকৃতির এই নবোদ্ভূত মানবিক ও প্রাতিস্বিক চেতনা তার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করেছে তা থেকেই জন্ম নিয়েছে আনন্দের প্রতি তার আকর্ষণ। এ দিক থেকে অবদান কাহিনীর সঙ্গে নাট্যকাহিনীর প্রভেদ ঘটেছে। অবদানে এ আকর্ষণ সৃষ্টির ভিত্তি ছিল একান্ত দেহজ ও স্থূল। তা ছাড়া প্রকৃতি মায়ের মন্ত্রের প্রভাব এবং এর বিরুদ্ধে আনন্দের চারিত্রিক শুচিতা রক্ষার যে সংগ্রাম মায়াদর্পণে প্রকৃতির সংলাপের মাধ্যমে

---

[৭১] চণ্ডালিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১৩৬
[৭২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
[৭৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
[৭৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলিত হয়েছে, সে উৎকন্ঠা নাটকের শিল্পগুণ সৃষ্টিতে করেছে ব্যাপক সহায়তা। সবশেষে অভিচার মন্ত্রের কাছে পরাস্ত হয়ে ম্লান ও অবনমিত মহিমায় আনন্দ এসে উপস্থিত হয় প্রকৃতির বাড়িতে। কিন্তু উন্নত মহিমা ও শান্ত সমাহিত চরিত্রের যে আনন্দ প্রকৃতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আশ্রয় হয়েছিল তার কিছুই অবশিষ্ট নেই পরাজিত আনন্দের মধ্যে। এর জন্য নিজেকেই দায়ী ভেবে প্রকৃতি পাপবোধ ও গ্লানিতে সংকুচিত হয়ে পড়ে। সে অপরাধ বোধ থেকেই প্রকৃতি তার মায়ের পূজার উপকরণ নষ্ট করে দেয় এব তার ফলে মৃত্যু ঘটে প্রকৃতি মায়ের। কিন্তু বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ ফিরে পায় তার বিশুদ্ধ ও উন্নত চারিত্রিক মহিমা। এর ফলে প্রকৃতি চরিত্রের স্থূল বাসনার যেমন যৌক্তিক সমাপ্তি ঘটে, তেমনি জাতক কাহিনীর অবাস্তবতার আবহ থেকেও মুক্ত হয় নাটক। অবশ্য তা সত্ত্বেও মাত্র দুটি চরিত্রের কথোপকথন এবং দুটি দৃশ্যে নাটকের মতো জটিল ও দ্বন্দ্বমুখর শিল্প সৃষ্টি বেশ কঠিন। বিশেষত i³Kiex (১৯২৩) নাটকের পর রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটক রচনার প্রেরণায় তেমন একটা জোর ছিল না, বরং তৈরী হয়েছিল অপর এক আঙ্গিক নৃত্যনাট্য সৃষ্টির জোয়ার। সে কারণে কয়েক বছর পর ১৯৩৮ সালে PÐwjKv-র একটি নৃত্যনাট্যরূপও নির্মাণ করেন কবি। তাতে মূল কাহিনীর সঙ্গে কিছু নতুন দৃশ্য যুক্ত হয় এবং গদ্য সংলাপগুলো পরিবর্তিত হয় গানে। তুলনামূলকভাবে নৃত্যনাট্য হিসেবেই PÐwjKv বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

রাজনৈতিক বিবেচনায় চণ্ডালিকা নাট্যের উপজীব্য হলো সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার অযৌক্তিকতা। বর্ণপ্রথার শিকার সে সমাজের নিম্নস্তরের এক নারীর মনে মানবিকতার উন্নত আদর্শের প্রভাবে প্রেমভাবের জাগরণ এবং পরিনামে মহত্তর চেতনায় স্থিত হয়ে প্রেম ও কামভাবের পরিত্যাগ এ নাটকের মূল বক্তব্য। অবশ্য এ পরিণতি আপাতদৃষ্টিতে সমাজসত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয় নি। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির নিজস্ব গণ্ডীতেই এর উন্মেষ ও সমাপ্তি; এবং আনন্দও সমাজ-সংসার ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাই মনে হতে পারে বর্ণপ্রথার অযৌক্তিক সংস্কার থেকে সমাজের উৎক্রমণ চেষ্টা নাটকের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হয়তো ছিল না এবং উন্নত মানবিকতার এ চেতনা এসেছে কেবল বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য দর্শন থেকে। এ মনোভাব থেকেই সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক মানবতাবাদের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতির মুখে কল্পিত সংলাপ দিয়ে তা দেখাতে চেয়েছেন। যেমন:

> আমার পূর্ব জন্ম বলে কিছু ছিলো, সে-জন্মে আমি অনেক পাপ করেছিলাম – এ সব তোমাদের বানানো কথা, আমি তাতে ভুলবার পাত্রী নই। আমি বেশ বুঝতে পারছি ঐ আষাঢ়ে কৈফিয়ৎ তৈরী করে তোমরা তোমাদের ইহজন্মের ঘোরতর অন্যায় অবিচারকে

Dhaka University Institutional Repository

> ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছো। আমি তার কিছুই মানি না। যে-ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যা।[৭৫]

বস্তুত এর দৃষ্টিভঙ্গি নাট্যকাহিনী ও চরিত্রের সংলাপে না থাকলেও, এটিই যে নাট্যকারের মনে অনুপ্রেরণা হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল তা স্পষ্ট। যেমন মূল কাহিনীতে চণ্ডালিকা ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণ করে সমস্ত রিপু ও প্রবৃত্তি দমনের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিল। পক্ষান্তরে এ নাটকে তা অভিষিক্ত হয়েছে একান্ত মানবিক চেতনায়। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভাব শেষ পর্যন্ত ধর্মবোধ অতিক্রম করে মানবিকতা বোধে সমর্পিত হয়েছে। এ বিবেচনায় সমাজ সংগঠনের সঙ্গে PÐwjKvi সরাসরি সংঘাত না হলেও এ চেতনার মূল্য কম নয়। বিশেষত ভারতের বর্ণপ্রথা ছিল শ্রেণি শোষণের এক মারাত্মক হাতিয়ার। উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা নিম্নশ্রেণির মানুষকে এই গণ্ডীতে বেঁধে বিভিন্নমুখী শোষণের পথ করে রেখেছিল। সে প্রেক্ষাপটে সব শ্রেণির মানুষকে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার এ নাটক দীর্ঘ শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক ধরণের শৈল্পিক প্রতিবাদ। যদিও পূর্বোল্লিখিত সমালোচক নাটকের শিল্পিত রসপরিণামকে বেশি মূল্য দিতে গিয়ে বক্তব্যের দিকটিকে কিছুটা উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, "PÐwjKv' ডাইড্যাক্টিক্ নাটক নয়। নীতিশিক্ষা তার রসরূপের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্রাঙ্গ।"[৭৬] কিন্তু আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি যে, গান্ধী সূচিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচীর সমর্থনে কবি নিজেও শান্তিনিকেতনে অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এবং সে অনুপ্রেরণাতেই এ নাটকের বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, PÐwjKvi নৃত্যনাট্যরূপ মঞ্চস্থ হওয়ার পর ১৯৩৮ সালের ১৯ মার্চ 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল অনুরূপ মন্তব্য। তাতে লেখা হয়েছিল, æThe theme was particularly suitable to the present time, as it dealt with the Harijan question... ।"[৭৭] সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যও এ মত সমর্থন করে লিখেছেন," রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে রচিত PÐwjKv ও তার পর 'PÐwjKv bZ¨bv‡U¨'র মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন বা ছুঁৎমার্গ পরিহার আন্দোলনের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।"[৭৮] PÐwjKv নাটকের অপর বিবেচ্য বিষয় হলো রিপুর কঠিন সংযমের মাধ্যমে উন্নত চারিত্রিক মহিমা প্রকাশের তত্ত্ব। নাটকের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, রিপু দমনে ব্যর্থ আনন্দের মধ্যে দৈহিক কান্তি ও চারিত্রিক মহিমার অভাব ঘটেছে। যা আহত করেছে রিপু তাড়িত চণ্ডালকন্যাকেও। শারীরবৃত্তিক নিয়মে রিপুর আবির্ভাব এবং তার যৌক্তিক প্রশমন ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক দিক থেকে হানিকর হওয়ার কথা নয়। বরং এর অবদমনই জন্ম দিতে পারে বিভিন্ন বিকৃতির। বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের ক্ষেত্রে এই দমন শীল (আচরণ) পালনের বিষয় হলেও

---

[৭৫] আবু সায়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১১৯

[৭৬] আবু সায়ীদ আইয়ুব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

[৭৭] উদ্ধৃত; র"দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৮

[৭৮] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খ-, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৩৩

প্রকৃতির পক্ষে এটি স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। তাই আনন্দকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রকৃতির সক্রিয়তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিশেষ করে এই সক্রিয়তার সঙ্গে যখন তার মায়ের মৃত্যুও জড়িত।

Zv‡mi †`k : PÐvwjKv মঞ্চায়নের কয়েকদিন আগে (আগস্ট, ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন Zv‡mi †`k নাটক এবং এটি PÐvwjKvর সঙ্গে পরপর তিনদিন ধরে মঞ্চস্থ হয় (১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী পরিকল্পিত গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র নৃত্যরূপ-এর সূত্রে রচিত হয় Zv‡mi †`k (১৯৩৩)।[৭৯]

নাটকের কাহিনীতে বলা হয়েছে, এক রাজপুত্র রাজকীয় ভোগ বিলাস ও নিয়ম নীতির বেড়াজাল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাণিজ্য করতে বের হয়। সঙ্গে নেয় বন্ধু সদাগর পুত্রকেও। কিন্তু মাঝপথে নৌকাডুবি হলে তারা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ওঠে একটা দ্বীপে। সেখানে তারা দেখল দ্বীপের মানুষগুলো তাসের মতো, বুকে পিঠে চৌকো। কারো নাম ছক্কা শর্মন, কারো পঞ্জা বর্মণ, কেউ তিরি ঘোষ, কেউ দুরি দাস। পুতুলের মতো নির্দিষ্ট তাদের চালচলন। চলনের চেয়ে চালটাই তাদের প্রধান। সেখানে প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও, নেই কারও মুখে হাসি। তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে রাজপুত্র ও সদাগর পুত্র হেসে ওঠে শব্দ করে। এতে সে দেশের নিয়মের ঘটে যায় ব্যাঘাত। তাস ছক্কা বলে, "একী ব্যাপার! হাসি!" সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জা এসে বলে, "লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!" কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল – এই দুই বিদেশির প্রভাবে তাসবংশীয়দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ইস্কাবনের নহলা গাছের তলায় বসে থাকে চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ শোনার আশায়। ওদিকে ইস্কাবনী, টেক্কানী কিংবা চিঁড়েতনীর মনও করছে টলমল। তাসের দেশের নিয়ম ভেঙে তাদের ইচ্ছ হল মানবীর মতো সাজতে। তারা দল বেঁধে যায় বকুল তলায়, নদীর ধারে; এর আগে যা ছিল অকল্পনীয়। এসব দেখে সে দেশের রাজা রাজপুত্রকে বলে, "শোনো বিদেশী। ... তোমরা তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ – জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ – এসব কেন?" রাজপুত্র বলে, "এ আমাদের ইচ্ছে"। রাজা অবাক হয়, "ইচ্ছে! কী সর্বনাশ!" কিন্তু রাজা অন্য সবার মতামত জানতে চাইলে ছক্কা-পাঞ্জা একসঙ্গে জানায় যে, তারা রাজপুত্রের কাছে ইচ্ছেমন্ত্র নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ ইচ্ছেমন্ত্র অন্য সবার মতো রানির মনেও এনেছে চাঞ্চল্য। সবাই মিলে এবার সে দেশের নিয়ম, শাস্ত্র অস্বীকার করে বলে ওঠে, "জয় ইচ্ছের জয়।" রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে রানির নির্বাসন ঘোষণা করলে সব প্রজাও যেতে চায় নির্বাসনে। এ ভাবে তাসের দেশের সবাই মানুষের মতো আচরণ শুরু করলে রাজাও শেষ পর্যন্ত মানুষ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে।

---

[৭৯] শান্ড়িদেব ঘোষ, গুর–দেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ৬৬-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

Zv‡mi †'k নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ আছে বলে কেউ কেউ এটিকে নৃত্যনাট্য হিসেবে বিবেচনা করেন। বিশেষ করে এটি কবির অন্যান্য নৃত্যনাট্যের সমসাময়িক এবং এর উপস্থাপনাও একইসঙ্গে ঘটায় অনুরূপ ধারণা হয়েছে বলে মনে হয়। আবার সমসাময়িক কালের আলোচকদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে বলেছিলেন Burlesque বা কৌতুকনাট্য।[৮০] বস্তুত Zv‡mi †'k নাটকের উপস্থাপনায় নৃত্যের প্রয়োগ এবং কাহিনী ও সংলাপে যথেষ্ট কৌতুকের উপাদান থাকলেও এর রূপকত্বই সবচে প্রবল। তাই সমালোচকেরা এটিকে রূপক-নাটক হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।[৮১]

এ নাটকের মাধ্যমে কবি যে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা হলো যৌবনের প্রাণাবেগে সকল জড়তা ও স্থিরতার অবসান ঘটে, মুক্তি আসে বদ্ধ প্রাণের। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র নাট্য ধারায় এ বক্তব্য নতুন নয়, APjvqZb ও dvj¸bx নাটকেও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছিল।[৮২] অবশ্য Zv‡mi †'k-এ নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংগঠনের তীব্রতা না থাকায় এটি APjvqZb-এর মতো যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক নয়। APjZvqb নাটকের মহাপঞ্চক চরিত্রে পুরাতন সংস্কার রক্ষায় যে দৃঢ়তা পরিলক্ষিত, Zv‡mi †'k নাটকে সে রকম কোনো শক্তিশালী বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। তাসদ্বীপের অধিবাসীরা যেন রাজপুত্র ও সদাগর পুত্রের আহ্বানের জন্যই অপেক্ষা করছিল এবং সে আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে ঘটতে থাকে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এ সব কারণে বক্তব্য ও শিল্পসংগঠনের দিক থেকে Zv‡mi †'k নাটকে রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভার মৌলিকতা ও দীপ্তি প্রায় অনুপস্থিত। তাই সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্য মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না:

> এ নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয়ে কোনও বৈচিত্র নাই, নিতান্ত পরিমিত রচনাক্ষেত্রে ইহার ভাবটি প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া ইহার রচনায়ও কোন উচ্চ শিল্পগুণ প্রকাশ পায় নাই। ... নৃত্যনাট্য রচনার বাহিরের তাগিদ হইতেই এই নাকটখানি রচিত হইয়াছিল,

---

[৮০] ক) আনন্দ বাজার পত্রিকায় (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩) বলা হয় "...'তাসের দেশ' বাহ্যতঃ কৌতুক নাট্য..."। (খ) 'নবশক্তি'-র মতে (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩), ... 'তাসের দেশ' burlesque শ্রেণীর রচনা।..." গ) 'The advance' (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)-এর মতে "House of cards which is the other play to be staged is a sort of burlesque in which some serious ideas are dramatised in the form of a comedy..."। উদ্ধৃত; র ন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

[৮১] ক) "এই তাসের দেশ যে আমাদেরই সনাতনপন্থী দেশ তাহা না বলিয়া দিলেও কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।" চার ন্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রশ্মি, ২য় খ ন্, কলকাতা, (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ২২৩–২৪ খ) "তাসের দেশ কিম্ভূতরসাশ্রিত তত্ত্বনাট্য," প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৭৭ গ) "কাঠামোটি রূপকথার হইলেও ইহার অন্ড়র্নিহিত ভাবের আবেদন সকল কালের; রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে সেই ভাব ব্যঙ্গ রসমিশ্রিত হইয়া আমাদের চিত্তকে এক অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়..."। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ৩৪৭ ঘ) "রূপক নাট্যরচনার যুগ অতিক্রম করিয়াও রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুই একখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তাদের মধ্যে 'তাসের দেশ'ই কতকটা তাঁহার পূর্ববর্তী রূপক নাট্যগুলির সমধর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খ ন্, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১৯

[৮২] 'তাসের দেশ' ও 'অচলায়তনে'র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।' আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

> সেইজন্য ইহার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার নূতনতর কোন বিস্ময়কর দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় না।[৮৩]

এই ধরনের দুর্বল শিল্পগুণের নাটকে প্রকাশিত রাজনৈতিক বক্তব্য ও যে দর্শক শ্রোতার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না, তা আমরা প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় লক্ষ করেছি। অবশ্য, Zv‡mi †'k নাটকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রকাশও নেই বললে চলে। বরং সংস্কারের জড়তা থেকে, প্রথার দাসত্ব থেকে কিংবা পুরাতনের অনুবর্তন থেকে মুক্তির যে বাণী এ নাটকে রূপকের আবরণে প্রকাশ পেয়েছে তাতে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়। যেমন সমালোচকদের মতানুযায়ী নাটকের তাসদ্বীপ যদি ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে রাজপুত্র ও সদাগর পুত্রের আগমন ঘটেছে কোন দেশ থেকে? এদিক থেকে মনে হয়, পূর্বতন APjvqZb নাটকে যেমন এ দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ (স্থবিরক), অন্ত্যজ সমাজ (দর্ভক) এবং পশ্চিম থেকে আগত মুসলিম ও ইংরেজ(শোণপাংশু)দের নিয়ে নতুন আয়তন গড়ে তোলার আহ্বান লক্ষ করা গিয়েছিল, তেমিন এ নাটকেও আছে পশ্চিমদেশ তথা ইংরেজ-সূচিত আদর্শ গ্রহণ করার ইঙ্গিত। নাটক রচনাকলের ব্রিটিশ-ভারত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এ সমীকরণ অস্বাভাবিক নয়। পার্থক্য কেবল, নাটকের রাজপুত্র তাসদ্বীপে এসেছে সদাগরপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে; আর ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজত্ব স্থাপিত হয়েছে সদাগর তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসার সূত্রে। এ বিবেচনায় বলা চলে, কবির সজ্ঞানে কিংবা অজান্তে উক্ত নাটকে পশ্চিমী সভ্যতার সুবাদে ইংরেজ শাসনের প্রশস্তিমূলক ভাব প্রকাশ পেয়ে গেছে।

Zv‡mi †'k-এর পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৩৯) কবি উৎসর্গ করেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি বাঙালি নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে। উল্লেখ্য, এ সময় সুভাসচন্দ্র কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে কবি সন্দর্শনে এসেছিলেন।[৮৪]

evkix : একই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর evkix (ডিসেম্বর, ১৯৩৩) নামে একটি সামাজিক নাটকও রচনা করেছিলেন। এর কাহিনীতে আছে: বাঁশরী সরকার বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা একই সঙ্গে চৌকস ও সুন্দরী মেয়ে। শম্ভুগড় রাজ্যের রাজকুমার সোমশঙ্করের সঙ্গে বাঁশরীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সবার ধারণা, তাদের মধ্যে পরিণয় সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। বাঁশরীর বান্ধবী সুষমা সেন আরও সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। তার শিক্ষক পুরন্দর এক রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। সে একদিকে সন্ন্যাসী হলেও ইউরোপে কাটিয়েছে বেশ কিছুদিন। কখনো সে গল্ফ খেলা শেখায় হিমুকে, কখনো ইংরেজ ডাক্তারকে পড়ায় যোগ বাশিষ্ঠ; কখনো তাকে দেখা যায় নবাবের সঙ্গে মোগলাই পোশাকে। ছাত্রী সুষমা তাকে যেমন ভক্তি করে, তেমনি ভালোবাসে। কিন্তু পুরন্দরের রয়েছে এক অদ্ভুত দীক্ষামন্ত্র

---

[৮৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

[৮৪] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খ, কলকাতা, ১৪১১ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৬৭-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ এবং নিরাসক্ত আত্মনিবেদন। সুষমার মনের কথা জেনেও সে তাকে নির্দেশ দেয় সোমশঙ্করকে বিয়ে করার। অপর দিকে সোমশঙ্করের পিতার ওপর প্রভাব খাটিয়ে সে সুষমাকে সোমশঙ্করের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ফলে সোমশঙ্করের আকাঙ্ক্ষা যেমন পূর্ণ হলো না, তেমনি সুষমার ভালোবাসাও হলো ব্যর্থ। এ দিকে বাঁশরীর জীবনও ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হলো। এ অবস্থায় বাঁশরী এক বাস্তববাদী নবীন সাহিত্যিককে নিয়ে আসে সঙ্গী হিসেবে। কিন্তু তাকে কথায় কথায় তার বাস্তবতাবোধের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। বাঁশরী একা শুধু নয়, সুষমা-সোমশঙ্করের এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানে আগত অর্চনা, লীলা প্রমুখও তাতে অংশ নেয়। আবার এরই এক পর্যায়ে ক্ষিতীশ বাঁশরীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বাঁশরী তা গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে। এমনকি এ সংবাদ সে একটি চিঠি পাঠিয়ে সোমশঙ্করকে জানাবার ব্যবস্থাও করে। কিন্তু সে চিঠি পাওয়ার আগে সোমশঙ্কর বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসে বাঁশরীকে জানায় যে, সুষমাকে বিয়ে করলেও সে কেবল বাঁশরীকে ভালোবাসে। এ কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশরী ক্ষিতীশকে পরিত্যাগ করে এবং সোমশঙ্করের সে নিরাসক্ত নির্বিকার ভালোবাসাই তার বঞ্চিত জীবনের সান্ত্বনা হিসেবে গ্রহণ করে।

এ নাটকের সঙ্গে চার বছর আগে রচিত †k‡li KweZv (১৯২৯) উপন্যাসের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। সে দিক থেকে প্রেম ও বিয়ে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ মনোভঙ্গির বাহন হিসেবে নাটকটি বিবেচ্য। এবং তা হলো, সংসারসীমায় প্রেম হয় সঙ্কুচিত, অপর দিকে শাশ্বত প্রেমের মুক্তি ঘটে দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে নিষ্কাম ভালোবাসায়। অবশ্য †k‡li KweZv-য় অমিত ও লাবণ্যের মধ্যে এ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে চাইলেও তাদের মধ্যেকার সামাজিক, শ্রেণিগত ও সাংস্কৃতিক স্তরগত বাধা যে ছিল প্রায় অনতিক্রম্য, সে বাস্তবতা বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য।। অমিত বাসা বদল করে হোটেলে উঠে গেলে লাবণ্য বুঝতে পারে, "... এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসেনি যে, অমিতের যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে।"[৮৫] কিন্তু evkix-তে সোমশঙ্কর ও বাঁশরীর মধ্যে যে প্রতিবন্ধক ছিল না; ছিল এক অবাস্তব চরিত্র পুরন্দরের অবাস্তব তত্ত্বের প্রভাব। পুরন্দর সুষমাকে বলে :

> বৎসে যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি, যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে।[৮৬]

বস্তুত পুরন্দর কথিত নির্বিশেষ প্রেম কিংবা নিষ্কাম আত্মনিবেদনভাব অনেকটা জৈবিক নিয়ম বিরোধী বলে এ নাটকের বক্তব্য শেষ পর্যন্ত অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন:

---

[৮৫] শেষের কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৩৪৪
[৮৬] বাঁশরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

> ... ব্যক্তিগত দাম্পত্য-প্রেমকে প্রবৃত্তিপঙ্কিল মনে করা প্রেমহীন বিবাহের আদর্শ খাড়া করা নিতান্তই কাল্পনিক ও অবান্তর। বিবাহবন্ধনের মধ্যে আসিলেই প্রেমের জাতিচ্যুতি ঘটিল আর বাহিরে থাকিলেই তাহার কৌলীন্য বজায় রহিল – ইহা যুক্তিহীন ও অর্থহীন।[৮৭]

পুরন্দরের তত্ত্ব শুধু নয়, চরিত্রসৃষ্টি হিসেবেও সে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এমন কি তার নামও সত্যিকার নয়। তা ছাড়া, তাকে অসাধারণ করে তোলার জন্য যে সব চমক কেবল বাঁশরী, তারক কিংবা শচীনের সংলাপে পাওয়া যায় সেগুলোর বাস্তবতাও প্রশ্নসাপেক্ষ।[৮৮] চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে একমাত্র বাঁশরী ভিন্ন অন্যান্য চরিত্র রক্ত মাংসের সত্তা হয়ে উঠতে পারে নি। অজিত কুমার ঘোষের মতে,

> নাটকে কথার প্রয়োজন চরিত্রসৃষ্টির জন্য, কিন্তু এই নাটকে কথার কারুকার্যের দিকে কবি যত দৃষ্টি দিয়াছেন, চরিত্রের সজীবতার দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই। সেজন্য বাক্যের বোমায় চরিত্রের সম্ভাবনা উড়িয়া গিয়াছে।[৮৯]

এ ধরনের কাল্পনিক ভাবসর্বস্ব চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা সংঘটন যেমন কঠিন, নাট্যদ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনও তেমনি দুরূহ। নিষ্কাম প্রেম ও নিরাসক্ত বিবাহ-বন্ধনের বিরুদ্ধে বাঁশরীর সংগ্রামে নাটকে যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সোমশঙ্করের স্বীকারোক্তির পর বাঁশরী নিজেই তা বিনষ্ট করেছে কাল্পনিক ভাবাবেগের কারণে।

সুতরাং অবাস্তব ভাব ও অস্পষ্ট চরিত্রের নাটক e/k i/তে তাই রাজনীতি বা সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। পুরন্দর, সোমশঙ্কর, বাঁশরী, সুষমা প্রত্যেকেই সমাজের উচু স্তরের বাসিন্দা। তাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সমস্যার যোগ না থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার সে সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও করা হয়েছে ভাববাদী অবাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে। এ দিকে বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলে কথিত ক্ষিতীশকে এ নাটকে যে ভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে শেষ পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, তাতে নাট্যকারের মনে তৎকালীন বাস্তববাদী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ-ভাবের পরিচয় মেলে।[৯০] ধারণা করা যায়, নাট্যকার এ নাটকে বাস্তববাদী সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে যেমন বিদ্রূপ করিয়েছেন, তেমনি 'রায়তের কথা' (১৯২৬) প্রবন্ধে তৎকালীন 'কল্লোল', 'কালি কলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি পত্রিকার নবীন লেখকগোষ্ঠীর বাস্তবধর্মী ও

---

[৮৭] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫

[৮৮] "... পুরন্দর চরিত্রের চমক এত বেশি, এত বেশি রহস্যময় যে এই ধরনের বস্তু-ঘনিষ্ঠ সামাজিক নাটকে এতটা চমক এতটা রহস্য বস্তুপ্রত্যয়কে শিথিল করিয়া দেয়।" নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

[৮৯] অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০

[৯০] বাঁশরীর ব্যঙ্গের মাধ্যমে কবি যে তর͡ণ সাহিত্যিক ও তাহাদের সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, একথা বলা যায় না।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিমুখী সাহিত্য প্রচেষ্টাকে নিজেই বলেছিলেন, 'হিস্‌টিরিয়া', 'নকল নৈপুণ্যের নাট্য' 'চিত্তহীনতা' ইত্যাদি।[৯১] পরের বছর 'সাহিত্য নবত্ব' (১৯২৭) প্রবন্ধে ক্ষিতীশের মতো 'অপটু লেখকদের' সম্পর্কে আবার বললেন:

> বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে, ... আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে – অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে, 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্রের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।[৯২]

বাঁশরীও ক্ষিতীশকে অনেকটা সেভাবেই আক্রমণ করে। যেমন ক্ষিতীশের চাদরে কালির দাগ দেখে সে বলে, "ব্যস্ত হও কেন। ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিস্ট, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ।"[৯৩] আবার সুষমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলে, "ক্ষিতিশবাবু ন্যাচারল হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে"।[৯৪] অর্চনা ও লীলার কণ্ঠে সে বিদ্রূপ নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে, "(জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।"[৯৫] মনে হয়, বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের ওপর তাঁর রুষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল এটিও যে, এ সময় তিনি সাহিত্যে বাস্তব বলতে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত সত্যকে বুঝতে চাননি, অন্তর দ্বারা উপলব্ধ সত্যই ছিল তাঁর কাছে বাস্তব। তাই ১৯৩৭ সালে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন mwn‡Z¨i c‡_ গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে তিনি এ বিষয়ে লিখেছিলেন:

> ইংরেজিতে যাকে বলে real সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম'।[৯৬]

একইসঙ্গে ১৯৩৬ সালে রচিত 'আমি' কবিতায়ও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশিত হতে দেখা যায়; যেমন–

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,

---

[৯১] "আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে, মজাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনই বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকলনৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।" রায়তের কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

[৯২] 'সাহিত্যে নবত্ব', সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩২শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১

[৯৩] বাঁশরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

[৯৪] বাঁশরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

[৯৫] বাঁশরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

[৯৬] উৎসর্গপত্র, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

আমি চোখ মেললুম আকাশে,

জ্বলে উঠল আলো

পুবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',

সুন্দর হল সে।[৯৭]

এ সব বিবেচনায় বলা চলে, বাঁশরী নাটকের বিষয়, বক্তব্যে ও চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের ভাববাদ-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়ে গেছে, যা পরোক্ষভাবে হলেও শেষ পর্যন্ত প্রগতি-বিরোধী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়।

†hvMv‡hvM : পরবর্তী নাটক †hvMv‡hvM (অভিনয়: ডিসেম্বর, ১৯৩৬) তাঁর একই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ। তৎকালীন নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ি-র অনুরোধে কবি এ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে তা অভিনীত হয় নবনাট্যমন্দির নামে বাণিজ্যিক থিয়েটারে। নাটকটি স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসের কাহিনী অনুযায়ী হলেও এর সমাপ্তি নিয়ে নির্দেশক ও প্রযোজক শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে কবি একমত হতে পারেন নি। দর্শক আনুকূল্য পাওয়ার জন্য প্রযোজক চেয়েছিলেন শেষ দৃশ্যে কুমুদিনী মধুসূদনের ঘরে প্রবেশ করবে।[৯৮] নাট্যরূপে দেখা যায় মধুসূদনই কুমুদিনীকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিপ্রদাসের বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং কুমদিনীকে 'মহারাণী' সম্বোধন করে তাকে নিজের ঘরে ফেরার আহ্বান জানায়। দাদা বিপ্রদাস কুমুদিনীর মত জানতে চাইলে সে বলে, 'হাঁ যাব দাদা। বন্দিনী হয়ে নয়, আপন সম্মান নিয়ে যাব – যাব সেইখানে যেখানে যাবার আসবার দরজা সমান খোলা রয়েছে।[৯৯] কুমুদিনীর শেষ সংলাপটিও লক্ষ করার মতো; যেমন, "... মনের মধ্যে বেড়ি খসেছে, তাই যাচ্ছি, নইলে যেতেম না। দাদা, আশীর্বাদ করে বলো, আমাকে কেউ বন্দী করতে পারবে না, বন্দীশালার মধ্যেও নয়"।[১০০]

---

[৯৭] শ্যামলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৬৫

[৯৮] এ প্রসঙ্গে তারাকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত, 'অন্তরালের শিশিরকুমার' গ্রন্থে শিশিরকুমার ভাদুড়ির জবানিতে পাওয়া যায়, "আমি তখন বললুম, তাকে একবার মধুসূদনের ঘরে যেতে তো হবে। শুনে কবি খুব ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তা তো যাবে। যাবে কি থাকবার জন্য। যাবে ফিরে আসার জন্য।"
"আমি বললুম। ঐ মধুসূদনের ঘরে তার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করবে কুমু। দৃশ্য শেষ হবে।... সমগ্র দর্শক সমাজ খুশি হবে। আমি দক্ষিণাটা ভালো পাবো। শুনে কবি অতলগম্ভীর হলেন। বললেন, তুমি তো খুব দুষ্টু লোক হে। তারপর বললেন, যা খুশি করো গে। তোমার যোগাযোগ লোকে কদিন মনে রাখবে? আমার যোগাযোগ বরাবর থাকবে।" উদ্ধৃত; রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৯৬৪

[৯৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৬

[১০০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৬

Dhaka University Institutional Repository

এ অবস্থায় বিপ্রদাস মধুসূদনের কাছে জিজ্ঞেস করে, কুমুদিনীকে এরপরও সে নিয়ে যেতে পারবে কি না। উত্তরে মধুসূদন জানায়, “পারব। আমি মহারানীকেই খুঁজেছিলুম, পেয়েছি মহারাণীকে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমি জেলখানার দারোগা নই।”[১০১] এমনকি এরপর মধুসূদন বিপ্রদাসকে প্রণাম করে তার আশীর্বাদও প্রার্থনা করে।

নাটকের এ সমাপ্তি নাট্যকার ও প্রযোজক উভয়ের সন্তুষ্টি বিধান করলেও মধুসূদন চরিত্রের পক্ষে উক্ত পরিবর্তন যথেষ্ট বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। এর জন্য তাকে পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা হয় নি বলে তা আকস্মিক ঠেকে। তা ছাড়া নাটকে দুটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক রুচিগত পার্থক্যের কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলেও তা ঘটেছে কেবল চরিত্রের মনোগত উপলব্ধিতে। দৃশ্যত কোনো গুরুতর ঘটনা এখানে নেই বলে নাটকীয়তা দানা বাঁধে না।[১০২] কারণ নাটক সৃষ্টি হয় মানুষের ব্যক্ত অংশ নিয়ে এবং তা প্রকাশ পায় চরিত্রের ক্রিয়া বা সংলাপের মাধ্যমে।[১০৩] কিন্তু এ নাটকে পাত্র পাত্রীর আচার আচরণ, সংলাপ প্রভৃতি বাহ্যিক ক্রিয়ার ঘাটতি সহজেই চোখে পড়ে। ফলে নাটকটির অভিনয় সে সময়ও খুব একটা জনপ্রিয়তা পায় নি। এর কারণ যে অভিনয় নৈপুণ্য কিংবা প্রযোজকের দক্ষতার ঘাটতি নয়, তা কবির একটি মন্তব্য থেকে পরিস্ফুট। সেখানে তিনি লিখেছিলেন:

> নবনাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। ... এমন সুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না– তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতার মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে তবে সেজন্যে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়িকে দোষ দেওয়া যায় না।[১০৪]

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, প্রায় সমশ্রেণির দুই পরিবারের (বুর্জোয়া ভাবাপন্ন সামন্ত বিপ্রদাস এবং সামন্ত ভাবাপন্ন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া মধুসূদন) মনোময় ও অন্তর্জাগতিক সংকটের নাটক †hvM‡hvM-এ রাজনৈতিক বক্তব্য প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। এ ছাড়া নাটকে কুমুদিনী চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্ফূরণ দেখানো হয়েছে তা মধুসূদনের সংসারে আসার পর কতটুকু বিকশিত হবে কিংবা আদৌ বজায় থাকবে কি-না– সে নিশ্চয়তা নাটকে নেই। এখানে স্মর্তব্য যে, মধুসূদনের বাড়ি

---

[১০১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৭

[১০২] ‘যোগাযোগ’ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি নাট্যরূপ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যেমন, ‘যোগাযোগ’র বস্তুজাগতিক ঘটনাংশ অকিঞ্চিৎকর, বড় রকম কিছু সেখানে সংঘটিত হয়নি। সদ্য ধনিক ব্যবসায়ী মধুসূদন ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ড়সমাজের কুমুদিনী– উভয়ের দাম্পত্যজীবনের অসংগতি, স্বামীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় কুমুদিনীর দাদার বাসায় যাওয়া, অবশেষে সন্ড়ানসম্ভবা কুমুর প্রত্যাবর্তন এই হলো সমস্ড় যোগাযোগ উপন্যাসের ঘটনাংশ। সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৩৯৪ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩১৯

[১০৩] “নাটকের কারবার মানুষের ব্যক্ত অংশ নিয়ে এবং তা ক্রিয়ায় বা কথার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, ফলে ক্রিয়াকলাপের বাহ্যিক প্রকাশের রূপায়ণই হচ্ছে শিল্প হিসেবে নাটকের চৌহদ্দি, পাত্র-পাত্রীর আচার আচরণ সংলাপ প্রভৃতি বিবিধ বহিঃস্থ ক্রিয়া নাট্যকারের নাটকীয়তা সৃষ্টির সহায় হয়।” কার্তিক লাহিড়ী, বাস্ড়বতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৮

[১০৪] রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

থেকে চলে আসার পর দাদা বিপ্রদাসের সঙ্গে কয়েকটি সংলাপে কুমুদিনীর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধের আভাস লক্ষ করা গিয়েছিল। যেমন,

কুমুদিনী। ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

বিপ্রদাস। ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনি আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?

কুমুদিনী। দাদা, সেই দিন তুমিও আমাকে স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।

বিপ্রদাস। আচ্ছা – আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।

কমুদিনী। তুমি বিশ্বাস করছ না, মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন বাঁধন কাটব, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।[১০৫]

কুমুদিনীর উল্লিখিত সংলাপের সঙ্গে ইবসেনের *A Doll's House* (1879) নাটকের ব্যক্তিসত্তায় জাগরিত নোরা চরিত্রের কিছু সংলাপের সাদৃশ্য আছে। যেমনঃ

হেলমার। কিন্তু তোমার বাড়ি ... তোমার স্বামী আর ছেলে মেয়েদের ছেড়ে যাবে ... লোকে তোমাকে কী বলবে সে কথা ভাবছো না তুমি।

নোরা। সেসব কথা ভাবছি না। আমি শুধু জানি যে এটাই আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

... ...

হেলমার। অন্য কিছু ভাবার আগে তোমাকে ভাবতে হবে তুমি স্ত্রী, আর তুমি মা।

নোরা। ও সব কথায় আর আমার আস্থা নেই। আমি বিশ্বাস করি যে সকলের আগে আমি একজন মানুষ। ঠিক তুমি যেমন। অন্তত, একজন মানুষ হওয়ার চেষ্টা আমার করা উচিত, তাই আমি করবো। ...[১০৬]

তবে বর্তমান নাটকে নোরার সংলাপের মতো কুমুদিনীর বক্তব্যে তার নবচৈতন্যের বোধজাত বিশ্লেষণ লক্ষ করা যায় না। একইভাবে পাওয়া যায় না মধুসূদনের ইতিবাচক পরিবর্তনের বাস্তব কারণ। তাই নাটকের উল্লিখিত সমাপ্তি অনেকটা আরোপিত বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

---

[১০৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৪

[১০৬] ইবসেন নাট্য সম্ভার (অনুবাদঃ সুনীলকুমার ঘোষ), ৪র্থ খন্ড, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৮৪–৮৫

Dhaka University Institutional Repository

†hvMv‡hvM-এর নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে (পৌষ, ১৩৮৫) iex›`ªex ÿv পঞ্চম সংকলনে।[১০৭]

gy³ i Dcvq : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী নাটক gy³ i Dcvq (১৯৩৮) মাসিক 'অলকা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বেরোয় কবির মৃত্যুর সাত বছর পর।[১০৮] চার দৃশ্যে সমাপ্ত এ নাটক তাঁর একই নামের একটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ।

এর কাহিনীতে আছে : লোভী সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দের জনৈক ভক্ত ফকির ও একই গ্রামের উড়নচণ্ডী স্বভাবের যুবক মাখনলালের কৌতুকজনক সংসার যাপনের বর্ণনা। ফকির গুরুভক্তিতে সংসার সম্পর্কে ভীষণভাবে উদাসীন। এক পর্যায়ে স্ত্রীর স্বর্ণালংকারও সে গুরুকে দান করে আসে। তার স্ত্রী হৈমবতীর এক এম এ পাশ বোন পুষ্পমালা এ সব শুনে ভণ্ড অচ্যুতানন্দের মুখোশ খুলে দিলে সে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে যায়। গুরুকে হারিয়ে সংসার বিরাগী ফকির এবার আস্তানা গাড়ে পাশের পাড়ায়। এদিকে ঐ পাড়ার মাখনলাল তার দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর গ্রামছাড়া। তার দাদা ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে মাখনলাল ভেবে ঘরে নিয়ে গেলে সেখানে ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ফকির। এ অবস্থা থেকে ফকিরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে হৈমবতী। আবার মাখনলালের চেহারার বিবরণ জেনে পুষ্পমালা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় হনুমানের চরিত্রে সিনেমায় অভিনয়ের জন্য অভিনেতা চাই বলে। সে বিজ্ঞাপন দেখে মাখনলাল হাজির হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

নাটকে পুষ্পমালার সঙ্গে ফকিরের কথোপকথনে ভণ্ড গুরু ও শিষ্যের সাধন প্রক্রিয়ার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বেশ কৌতুককর। কিন্তু মাখনলালকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুষ্পমালার কৌশলটি অবিশ্বাস্য ও অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত। ফলে নাটকের সমাপ্তি মিলনান্তক হলেও তা অনেকখানি নিস্প্রভ।

রাজনীতির দৃষ্টিকোণে এ নাটক অনেকাংশে প্রগতিমুখী। কারণ, ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের সারল্যকে পুঁজি করে বর্তমানেও অনেক প্রবঞ্চক নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর। গুরু-সন্ন্যাসী, পীর ফকির ইত্যাদি ছদ্মবেশে এরা এখনো সক্রিয়। এদের প্রতারণা ও ভণ্ডামী এ কৌতুকনাটিকার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করে নাট্যকার তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ সব ভণ্ড তপস্বীর মুখোশ উন্মোচন যে পরোক্ষভাবে প্রগতিশীল রাজনীতির সহায়ক তা অস্বীকার করা চলে না।

k¨vgv : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী নাটক (গীতি-নৃত্যনাট্য) k¨vgv-র বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে তাঁর পূর্বের রচনা 'পরিশোধ' (১৮৯৯) কবিতা থেকে। এ কবিতার মূল উৎস মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু' অবদানের অন্তর্গত শ্যামাজাতক। তবে কবি এর গল্পাংশ সংগ্রহ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

[১০৭] রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩১শ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ৪১২
[১০৮] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৪১১, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোক্ত গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (1882) থেকে।[১০৯] সে গল্পাংশ নিম্নরূপ:

তক্ষশীলার অশ্ববণিক বজ্রসেন বারাণসিতে যাওয়ার সময় চোরের হাতে সর্বস্ব খোয়ায় এবং আহত হয়। এ অবস্থায় তাকেই চোর সাব্যস্ত করে ধরে নিয়ে যায় নগরীর প্রহরী। পথিমধ্যে তার সুপুরুষোচিত সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয় নগরের শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনা শ্যামা। তার রূপমুগ্ধ এক প্রেমিককে শ্যামা বহু অর্থের বিনিময়ে জল্লাদের হাতে সঁপে দিয়ে বজ্রসেনকে মুক্ত করে। কিন্তু বজ্রসেন প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে নিজেকে গণ্য করতে থাকে নরঘাতী ও অপরাধী হিসেবে। একদিন উভয়ে প্রমোদভ্রমণে গেলে বজ্রসেন শ্যামাকে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করায় এবং শ্বাসরোধ করার জন্য ডুবিয়ে রাখে পানিতে। এক পর্যাযে শ্যামার মৃত্যু হয়েছে ভেবে সেখান থেকে পালিয়ে যায় বজ্রসেন। এদিকে আশে পাশে অবস্থানকারী শ্যামার মা ডুবন্ত শ্যামাকে দ্রুত উদ্ধার করে এবং বহু কষ্টে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর শ্যামা পুনরায় তক্ষশীলা নগরে যায় বজ্রসেনের খোঁজে। সেখানে এক ভিক্ষুণীর মাধ্যমে সে বজ্রসেনকে তার ভালোবাসার আলিঙ্গনে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। অতীতে বুদ্ধ ছিলেন সেই বজ্রসেন আর বুদ্ধের স্ত্রী যশোধরা ছিল শ্যামা।[১১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের k¨vgv রচনায় বজ্রসেন হয়েছেন সুবর্ণবণিক এবং শ্যামা রাজনটী। আর শ্যামার একনিষ্ঠ প্রেমিক উত্তীয় এসেছে প্রেমের চরম মূল্য হিসেবে বজ্রসেনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে। কিন্তু সব চরিত্র তাদের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের তীব্রতা, প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ববোধ, প্রেমিক সত্তা এবং সামাজিক কল্যাণচেতনার প্রভাবে নাটকটিকে করে তুলেছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের আকর। নাটকের প্রথম পর্যায়ে বজ্রসেনকে দেখা যায় বাণিজ্যের ফাঁকে মনের মানুষ খোঁজার জন্যও তৎপর। সে সুবর্ণদ্বীপ থেকে তার ভাবী প্রণয়িনীর জন্য এনেছে ইন্দ্রমণির হার। কিন্তু রাজ্যের কোটাল তাকে চুরির মিথ্যা অপরাধে শূলে চড়াতে নিয়ে যায়। এ দিকে সুন্দরী রাজনটী শ্যামার বহু রূপমুগ্ধ ভক্ত থাকলেও নিজেকে সঁপে দেওয়ার মতো মানুষের সন্ধান সে পায় নি। এ অবস্থায় বন্দী বজ্রসেনকে দেখে মুগ্ধ শ্যামা কোটালের কাছে দু'দিন সময় প্রার্থনা করে। এর মধ্যে শ্যামা তার কিশোর প্রেমিক উত্তীয়কে রাজী করায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বজ্রসেনকে বাঁচানোর জন্য। এ লক্ষ্যে শ্যামা উত্তীয়কে প্রদান করে একটি রাজ-অঙ্গুরী। উত্তীয় সে অঙ্গুরী কোটালকে দেখিয়ে চুরির অপবাদ নিজের কাঁধে নেয় এবং কোটালের হাতে মৃত্যুবরণ করে। পরিবর্তে বজ্রসেন ছাড়া পেলে শ্যামা তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় রাজপুরী থেকে।

---

[১০৯] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

[১১০] Story of Syama and Vajrasena, উদ্ধৃত; রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে শ্যামা ও বজ্রসেন-এর মিলন হলেও পাপের অনুশোচনা ও গ্লানিতে শ্যামা হয়ে পড়ে মোহ্যমান। আবার বজ্রসেন-এর উপর্যুপরি প্রশ্নের উত্তরে শ্যামা একসময় প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দিলে বজ্রসেন-এর অন্তরও পাপবোধে জর্জরিত হয়ে ওঠে। শ্যামাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেঃ

কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
... ...
এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা
মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত।
কলঙ্কিনী ধিক নিশ্বাস মোর
তোর কাছে ঋণী।[১১১]

সে সঙ্গে শ্যামাকে প্রচণ্ড আঘাতে ফেলে দিয়ে চলে যায় বজ্রসেন। কিন্তু পথে প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বজ্রসেন-এর মনেও অন্তর্দহনের সূত্রপাত ঘটে। এবার সে শ্যামাকে মৃত ভেবেও পরম মমতায় তাকে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর শ্যামা পুনরায় বজ্রসেন-এর কাছে গেলে এবারও তাকে নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দেয় বজ্রসেন। এবার শ্যামা বজ্রসেনকে শেষবারের মতো প্রণাম করে চলে যায় অজানার উদ্দেশে। এদিকে শ্যামাকে বিতাড়িত করলেও তাকে বজ্রসেন বিস্মৃত হতে পারে না। শ্যামার জন্য বজ্রসেন-এর প্রাণে জাগে করুণা; অন্তরে সঞ্চারিত হয় নতুন সন্তাপ। তারই করুণ আর্তি ঝরে পড়ে তার শেষ গানে :

ক্ষমিতে পারিলাম না যে,
ক্ষমো হে মম দীনতা,-
পাপীজনশরণ প্রভু।
... ...
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,

[১১১] রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু

পাপেরে ডেকে এনেছি।

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে

চরণে তব বিনতা।

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না

আমার ক্ষমাহীনতা, ...[১১২]

সাধারণভাবে এ কাহিনীতে যা লক্ষণীয় তা হলো মানুষের শ্রেয়োচেতনা সঙ্গে প্রেমচেতনার বিরোধ। এ বিরোধ উক্ত নাটকে এমন অমীমাংসেয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, পাঠক শ্রোতার মনে এর অনুরণন- অনুচিন্তন চলতে থাকে নিরন্তর। নাটকে সঙ্কটের সূত্রপাত হয় শ্যামা বজ্রসেনকে দেখার পর থেকে। আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সন্ধান পেলেও শ্যামার হাতে সময় ছিল কেবল দুই দিন। যেখানে অপরাধের প্রমাণের অপেক্ষা না করেই বিদেশী বণিককে শূলে চড়াবার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, সেখানে সুনীতির বাঁধন যে খুব একটা কড়া নয় তা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায় রাজনটীর পক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধানে কিশোর প্রেমিক উত্তীয়কে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য এ নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিয়েও শ্যামা নির্দ্বন্দ্ব ছিল না। শেষ মুহূর্তে বধ্যভূমিতে ছুটে গিয়ে সে কোটালকে থামাতে চেয়েছে। কিন্তু কোটাল তার কোনো কথা না শুনে তাকে সরিয়ে দিয়েছে ‘চুপ কর, দূরে যাও, দূরে যাও নারী’ বলে। আবার এর মধ্যেই রাজপুরী ছেড়ে শ্যামাকে পালাতে হয়েছে বজ্রসেনসহ। তাদের মিলন ও অভিসার হয়েছে পলাতক অবস্থায়। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, বজ্রসেনও তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সীকে খুঁজে পেয়েছে শ্যামার মধ্যে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এটাও উপলব্ধিযোগ্য যে, তাদের সে মিলনে উভয়ের মানসিক অবস্থানের দূরত্ব ছিল যোজনপ্রায়। শ্যামা যেখানে নিষ্পাপ প্রেমিকের হত্যাজনিত কারণে পাপবোধের গ্লানতে সঙ্কুচিত, বজ্রসেন সেখানে প্রিয় মিলনের মধুর আবেগে ভাসমান। কিন্তু মূল ঘটনা জানার পর-পর সামাজিক সুনীতিতে আস্থাশীল বজ্রসেন মুহূর্তে মানবহত্যার অপরাধবোধে শ্যামার সঙ্গে সমীকৃত হয়। একই সঙ্গে নাট্যকাহিনী উত্থিত হয় উৎকণ্ঠার সর্বোচ্চ স্তরে। কিন্তু তাও কয়েকটি ক্ষণের জন্য মাত্র। শ্যামার প্রতি ঘৃণা এবং শ্যামার পাপে রক্ষা পাওয়ায় নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কারবশত বজ্রসেন নিজেই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রচণ্ড আঘাতে শ্যামাকে ভূলুণ্ঠিত করে বজ্রসেন যেন পাপঋণ থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা চালায়। ভাগ্যিস শ্যামার মৃত্যু হয় নি। হলে বজ্রসেনও ওথোলোর মতো নর হত্যার পাপে জড়াতো।

---

[১১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সে আঘাতের পরে নাটক প্রবেশ করে পরবর্তী স্তরে যেখানে বজ্রসেন তার প্রেমিক সত্তা ও শ্রেয়োচেতনার অন্তর্দহনে উদ্‌ভ্রান্ত। তারই দোলাচলে এক দুর্বল মুহূর্তে সে শোকার্ত হৃদয়ে (যেহেতু শ্যামা তার কাছে মৃত) শ্যামাকে আহ্বান করে। কিন্তু জীবিত শ্যামাকে দেখে তার নৈতিক সত্তার প্রাবল্য দেখা দেয় এবং পুনরায় বিতাড়িত করে দেয় তাকে। অথচ পাপবোধে জর্জরিত, প্রিয় বিরহে তাপিত ও লাঞ্ছিত শ্যামার প্রতি বজ্রসেন-এর করুণাধারার প্রবাহ শেষ হয় না। নৈতিক সত্তা ও বিরহী সত্তার তীব্র দংশনে বজ্রসেন-এর অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে।

এ ভাবে চারটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে রচিত k¨vgv নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ মানবমনের সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতির বিভিন্নমাত্রিক বিস্তার ঘটিয়ে দর্শক ও পাঠকের মনে শিল্পের অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করেছেন। বস্তুত, k¨vgv কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ববস্তুসৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার অসামান্য স্বাক্ষর, যা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও সদর্থক বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

gvjÂ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ নাটক gvjÂ (১৯৬৮) একই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ। এটি কবির মৃত্যুর সাতাশ বছর পর iex›' wRÁvmv দ্বিতীয় খণ্ডে এবং পরে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১১৩]

gvjÂ নাটকের কাহিনীতে আছেঃ আদিত্যের এক দূর সম্পর্কের বোন সরলা মা-বাবাকে হারিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের (আদিত্যের মেসো) বাড়িতে এসে ওঠে। জ্যাঠামশাইয়ের প্রিয় বাগানের পরিচর্যা করে সরলার সময় অতিবাহিত হয়। এক সময় তার সঙ্গে এসে যোগ দেয় আদিত্য। উভয়ে মিলে বাগানের উন্নতিতে নিয়োজিত হয়ে নিজেদের অজান্তে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলে। অবশ্য কেউ-ই কোনোভাবে তা প্রকাশ করতে পারে না। এক সময় আদিত্যের বিয়ে হয় নীরজার সঙ্গে। কিন্তু সরলা কাউকে বিয়ে না করে একা থাকারই সিদ্ধান্ত নেয়। ওদিকে দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে আদিত্য-নীরজার ঘরে কোন সন্তান আসে নি।

ইতোমধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নীরজা হয়ে পড়ে শয্যাশায়ী। এ অবস্থায় তার মনে উদয় হয় সরলা সম্পর্কে ঈর্ষা। প্রথম পর্যায়ে আদিত্য ও সরলার আচরণে সে রকম ইঙ্গিত না থাকলেও নীরজার ঈর্ষা তাদের সুপ্ত ভালোবাসাকে প্রকাশ্যে আসার সুযোগ ঘটিয়ে দেয়। এ যেন এতদিন তাদের নানা কর্তব্যের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। স্মৃতি রোমন্থনেই তারা বুঝতে পারে, তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। আর এ অবস্থায় প্রেমের প্রকাশে সরলা মানসদ্বন্দ্বে ভুগলেও আদিত্য তাতে নিঃসঙ্কোচ। নীরজা সমস্ত কিছুর জন্য সরলাকে দোষী সাব্যস্ত করে। সরলার বন্ধু ও এক সময়ের প্রেমপ্রার্থী রমেন নীরজাকে অনুরোধ জানায় সরলাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। নীরজা

[১১৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মালঞ্চ (সূচনাংশ), কলকাতা, ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

বারবার চেষ্টা করেও সরলাকে ক্ষমা করতে পারে না। এ দিকে নীরজার অসুখের মাত্রা বেড়ে গেলে ডাক্তার শেষ সময়ের কথা জানিয়ে দেয়। অন্তিম সময়ে সরলাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিলে সরলা প্রণাম করতে আসে নীরজাকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নীরজা পা সরিয়ে নেয় এবং আশ্চর্য উপায়ে দাঁড়িয়ে সরলাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলে, "পালা, পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত"।[১১৪] এটুকু বলেই মেঝের উপর পড়ে নীরজার মৃত্যু ঘটে।

উক্ত কাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য রমেন ও সরলার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কিছু পরিচয়ও উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটকে। কাহিনীতে উপন্যাসের প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষণীয়। সে সঙ্গে নাটকের ঘটনাসমূহ প্রধানত সংলাপাশ্রয়ী হওয়ায় তা অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণহীন। নীরজার ঈর্ষার প্রভাবে আদিত্য সরলার মানসিক পরিবর্তনজাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেপথ্যেই সংঘটিত হয়ে যায়। আদিত্য সরলার সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর এবং ডাক্তার নীরজার ব্যাপারে শেষ কথা জানিয়ে দিলে সরলার কিছুদিন নেপথ্যে থাকার প্রয়োজন পড়ে। আর এ সময়েই গভর্নরের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সরলার কারাবাস এবং নীরজার ঠিক অন্তিম সময় মেয়াদ ফুরোবার আগেই অনির্দেশ্য কারণে তার মুক্তি পাওয়া অস্বাভাবিক ঠেকে। শেষ মুহূর্তে নীরজার অদ্ভুত আচরণও স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া কষ্টকর।

চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে সরলা ও নীরজার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়, আদিত্য ও রমেনের মধ্যে তা অনুপস্থিত। রমেন যেন আদিত্য ও সরলার মানসিক পরিবর্তনকে বাঙ্ময় করার জন্যই পরিকল্পিত হয়েছে। আর নীরজার প্রতি দায়িত্ব পালনে কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরলার প্রতি অবদমিত প্রেমের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশের ক্ষেত্রে আদিত্যকে মনে হয় অনেকাংশে যান্ত্রিক।

এ নাটকেও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির প্রতিফলন নেই বললে চলে। কিন্তু রমেন ও সরলার অপরাধের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনার দাবি রাখে। উপন্যাস (রচনা: ১৯৩৪) কিংবা নাটকটি রচনার সময় এ দেশে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদের ধারা ছিল বেশ সক্রিয়।[১১৫] তারই প্রেক্ষাপটে রমেন ও সরলাকে জেলে প্রবেশ করানো হয়েছে। তাতে মনে হয়– রমেন যেন অনেকটা নিশ্চিত হয়েই সরলাকে সঙ্গে নিয়ে করতে গেছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি। যাওয়ার আগে রমেন-সরলার সংলাপ থেকে জানা যায় যে, আদিত্যের কাছ থেকে সরলা তার ভালোবাসার স্বীকৃতি পেলেই রমেন সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সরলা নিরাশ্রয় হয়ে পড়লে সে দেশ উদ্ধারের চেয়ে সরলা উদ্ধারেই আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী তা স্পষ্টভাবেই বোঝানো হয়েছে। রমেনের সংলাপে আছে :

---

[১১৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
[১১৫] মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১২০-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

রমেন

... তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে?...

সরলা

কি করবে তুমি?

রমেন

তোমার অশুভ গ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন কি কালাপানির পার পর্যন্ত।[১১৬]

যেন ব্যাপারটা এ রকম যে, রমেনের মতো সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিকদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক কোন মহৎ কর্তব্য ছিল না বলেই তারা ঐ পথে গিয়েছিল। এবং ঐ পথে দেশপ্রেমের চেয়ে চমক-ই যেন বেশি।

শুধু তাই নয়, এক পর্যায়ে তিনি আন্দোলনকারীদের আখ্যায়িত করেছেন 'দুর্জন' হিসেবে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রমেনের সঙ্গে সরলাও নিশান হাতে যাওয়ার প্রস্তাব করে বলে :

সরলা

আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।

রমেন

হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।[১১৭]

বলা বাহুল্য, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি কবির বরাবরের মতো নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গিই এ মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। স্মর্তব্য, এরপরের বছরই কবি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস P¨i Aa¨vq রচনা করেন যেখানে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা বেশ স্পষ্ট।[১১৮] এ কারণে ব্রিটিশ সরকার সে উপন্যাসের কপি জেলখানায় বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে বিলি করেছিল তাঁদের মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য।[১১৯]

---

[১১৬] মালঞ্চ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

[১১৭] মালঞ্চ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

[১১৮] ক) এ বিষয়ে সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার বলেন, ..."মূলগতভাবে অসত্য প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে তিনি 'চার অধ্যায়'-এর কাহিনী বুনন করেন; সেই কাহিনী বিপণ্ডবীদের ভাবমূর্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে কালিমালিপ্ত করেছে সত্য, কিন্তু রূপস্রষ্টা হিসেবে তাঁর আত্মমর্যাদা তাতে বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি।" রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৭

খ) নাজমা জেসমিন চৌধুরী লেখেন, "... তিনি প্রথম থেকেই চরমপন্থার ঘোরতর বিরোধী। কারণ তাঁর মতে এ পন্থা বৈধ নয়, ভদ্র নয়, প্রকাশ্যও নয়। এ বই প্রকাশের সময় সন্ত্রাস যুগ চলছে সন্ত্রাসবাদীরা জনসংযোগে

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এর পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্রিটিশের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিরও পরোক্ষ সমালোচনা আছে g\/jÂ নাটকেই। যেমন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরলা জেলে যাওয়ার উপায় খোঁজ করলে রমেন বলে: জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে, কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিকতে দিল না।[১২০]

কবি ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন না করলেও তাদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। এ সময় বাংলার গভর্নর 'উৎপীড়ন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে পরিচিত জন এন্ডারসন সন্ত্রাসবাদ দমনে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[১২১] অত্যন্ত পরোক্ষভাবে হলেও তার প্রতিফলন g\/jÂ নাটকে লক্ষ করা যায়। এতে আবারও প্রমাণিত হয় যে, লেখকের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেও দেশের তৎকালীন রাজনীতি প্রভাব ফেলেছে তাঁর রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস P\/i Aa¨vq-এরও একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ নাট্যরূপ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত হলেও তা কখনো প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না।[১২২]

অবিশ্বাসী। কিন্তু জনসাধারণ সন্ত্রাসবাদীদের দেখেছে শ্রদ্ধার চোখে।..." বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৫

[১১৯] "পুনশ্চ স্মরণীয় যে, এটি রচিত হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন এন্ডারসনের নেতৃত্বাধীন বাংলার প্রাদেশিক প্রশাসন বিপণ্ঢবীদের চরিত্র হননের জন্য সাধ্যমত সব রকমের প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিল; তজ্জন্য প্রচারধর্মী সাহিত্যের আশ্রয়ও গ্রহণ করা হয়েছিল।... 'চার অধ্যায়কে সরকার তেমনিভাবে ব্যবহার করেছেন; শত শত কপি বিভিন্ন বন্দীনিবাসে আটক রাজবন্দীদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে রবীন্দ্র-দর্পণে তাদের আকৃতি কি রূপ ধারণ করেছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য।" অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

[১২০] মালঞ্চ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

[১২১] সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৯০

[১২২] অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

Iô Aa¨vq

Dcmsnvi

প্রাচীন কাল থেকে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে নাটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারিত হয়ে আসছে। অধুনিক যুগে সে প্রবণতা হয়ে ওঠে আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা ও চিনে নির্দিষ্ট, রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারমূলক যে নাট্যধারা গড়ে উঠেছিল বাংলা নাটকেও সে ধারার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে বাংলা নাটক ছিল মোটামুটিভাবে সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজ-সংস্কার চেতনা প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয়ে অচিরেই তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধ-চেতনায় স্থিত হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের KjxbKjmeŸ¯^, দীনবন্ধু মিত্রের bxj 'cY ও maevi GKv'kx, মীর মশাররফ হোসেনের Rgx'vi 'cY, মাইকেল মধুসূদন দত্তের eo mwj‡Ki Nv‡o †ivGবং G‡KB wK e‡j mf¨Zv? উমেশচন্দ্র মিত্রের kir m‡iwRbx, গিরিশচন্দ্র ঘোষের wmivR‡Ïš¦jv ও gxiKvwmg প্রভৃতি নাটক সে বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। রবীন্দ্রনাটকেও প্রথম থেকে উক্ত ধারার রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে এবং আরো তীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপিত হলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। স্মর্তব্য, রাশিয়া ও চিনসহ ইউরোপে রাজনৈতিক নাটকের বিকাশ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ঘটেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের নাটকে তেমনটি ঘটে নি বললে চলে। অবশ্য ১৮৯০ সালে রচিত wemRb থেকে প্রায় সচেতনভাবে তাঁর নাটকে প্রকাশিত হতে থাকে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের মনোভাব। পরবর্তী পর্যায়ে বা রূপক-সাংকেতিক ধারায় সে মনোভাব সচেতন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশেষত g³avi, i³Kiex ও i‡_i iwk-তে তার প্রতিফলন অনেকখানি স্পষ্ট। তবে শেষ পর্বের বিশেষত মৌলিক নাটকে সেটি আর তেমনভাবে পাওয়া যায় নি। অবশ্য এ নাটকগুলো শিল্পগুণের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলেও প্রতীয়মান হয়েছে। সে দিক থেকে বলা চলে, দ্বিতীয় পর্বের তথা রূপক-সাংকেতিক ধারার নাটকগুলোতেই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য প্রতিভার নানামাত্রিক স্ফূরণ। তাঁর শিল্পদৃষ্টি, নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্ব এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনা অনেকখানি প্রকাশিত হয়েছে এ পর্বের নাটকেই। এ সব নাটকে তাঁর মতাদর্শিক বক্তব্যসমূহ প্রকাশ পেয়েছে কখনো সচেতনভাবে, কখনো ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে। যেমন, cKwZi cwZ‡kva, kvi‡'vrme, cvqwðË ও APjvqZb নাটকে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে অনেকটা পরিমাণে অসচেতনভাবে। আবার g³avi, i³Kiex ও i‡_i iwk-তে রাজনীতি এসেছে তাঁর ইচ্ছানুসারেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তরুণ বয়স থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক রাজনীতির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিনিও অংশ গ্রহণ করতেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় প্রতিটি বার্ষিক সম্মেলনে। এ সময় তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাতও ঘটে, যা তাঁর সৃষ্টিকর্মে বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। কংগ্রেস সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রভাবে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে এ সময় তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেখানে পাওয়া যায় তাঁর সে সময়ের রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্টনৈতিক মত' (১৯৩৩) প্রবন্ধে বলেছেন:

> বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেই জন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। ... অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি – জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।[১]

বস্তুত, তাঁর সৃষ্টিতে রাজনৈতিক বক্তব্যের মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা মৌল প্রবণতা বহুলাংশে ক্রিয়াশীল ছিল। সে বিষয় অনুধাবনের লক্ষ্যে এবং তাঁর নাট্য রচনায় প্রতিফলিত রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর প্রবন্ধগুলোর দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এতে দেখা যায়, তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনায় আলোড়িত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেখানে ব্রিটিশ শাসক, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্পর্ক এবং ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, 'দয়ালু মাংশাসী', 'জুতা ব্যবস্থা' (১৮৮১), 'টাউনহলের তামাশা' (১৮৮৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান। কিন্তু ১৮৮৯ সালে জমিদারির দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার তীব্রতা হ্রাস পায়। বরং ১৮৯০ সালে লেখা 'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত হয়েছে ইংরেজ প্রশস্তি; যেমন, ইংরেজ সরকারের 'নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস' করা 'কৃতঘ্নতা' ইংরেজের অন্তরে 'দীপ্ত মনুষ্যত্বের মহিমা' বিরাজিত, 'ইংরেজ মহৎ' ইত্যাদি।[২] এর একটি অংশে তিনি বলেন:

---

[১] কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৪৩৭

[২] 'মন্ত্রি অভিষেক', রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ১৬৩-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

> ... আমরা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ গর্বমেন্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে, তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র। অতএব সকলেই বলিবেন ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কাজ।[৩]

এখানে স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বাস্তবতার মূল বিষয়টি উল্টো করে দেখেছেন। জনৈক সমালোচকের মতে, "ইংরেজদের ভারতশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন।"[৪] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ ছিল না বলে এর পর ১৮৯৩ সালে লেখা 'ইংরাজ ও ভারতবাসী', 'রাজনীতির দ্বিধা', 'রাজা ও প্রজা' সহ কয়েকটি প্রবন্ধের কোনটিতে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় জনগণকে নগ্নভাবে শোষণের উল্লেখ নেই।[৫] বরং লক্ষ করা যায় যে, ইংরেজদের বিবেচনার প্রতি তাঁর আস্থা আছে, তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং ইংরেজরা প্রশংসার যোগ্য। ইংরেজের ব্যাপারে তাঁর এ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি ইংরেজের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবর্তে চেয়েছেন এ দেশের মানুষের আত্মিক স্বাধীনতা। এ লক্ষ্যে 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪), 'সফলতার সদুপায়' (১৯০৪) ও 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (১৯০৫) প্রবন্ধে তিনি সে কালের সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন ঐক্যবদ্ধভাবে পল্লীসমাজ গড়ে তোলা। যেমন, 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> ...স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে – কেহ তাহা কাড়ে নাই কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথ ঘাটের উন্নতি সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি – যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই, ...।[৬]

বলা বাহুল্য, তাঁর এ আহ্বান ও দৃষ্টিভঙ্গির কড়া সমালোচনা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে। সে কালের বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

---

[৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

[৪] 'রাজনীতির রবীন্দ্রনাথ', সৈয়দ আবুল কালাম, নতুন দিগন্ড় (সম্পা. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা. পৃ. ৮৬

[৫] "It is nowhere mentioned that the Indian people were being nakadly exploited by the Brithish." Hitendira Mitra, Tagore without Illusions, Calculta, 1983, p. 177

[৬] আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খন্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৫৬৪

Dhaka University Institutional Repository

> সর্ব প্রথম ও সর্বাগ্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন লক্ষ্য হিসেবে স্থির না করে জাতির সামাজিক সংস্কার, শিল্প-সম্প্রসারণ ও নৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে অতি উচ্চ মাত্রার অজ্ঞতা ও অন্তঃসারশূন্যতা।[৭]

রবীন্দ্রনাথের এ দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন অত্যাচারী ও আক্রমনাত্মক ব্রিটিশ শাসন-শোষনের প্রেক্ষাপটে 'নিরাপদ' বলে অভিহিত করে বর্তমানের এক সমালোচক লিখেছেন, "It is a safe way to cultivate patriotic feeling without having any danger of being a victim of anger of the British rulars."[৮]

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করলে রবীন্দ্রনাথ কিছু সময়ের জন্য বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন সক্রিয়ভাবে। কিন্তু এ আন্দোলন ক্রমে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে মোড় নিলে দ্রুত তিনি তা পরিত্যাগ করেন। যতদূর জানা যায় এ সময় জনসভায় প্রদত্ত একটি ভাষণ কেন্দ্র করে তৎকালীন ভারত সচিত ম্যাকফারসন (Macpherson) কবিকে সতর্ক বার্তা পাঠালে কবি উক্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৯] যদিও উক্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত কবিতা ও গানে আন্দোলনকারীরা খুঁজে পাচ্ছিলেন দেশের জন্য আত্মদানের উদ্দীপনা। শুধু তাই নয়, এর পর থেকে তাঁর প্রবন্ধে ফুটে উঠতে থাকে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সমন্বয়বাদী চিন্তার ছাপ। 'সমস্যা' (১৯০৮) প্রবন্ধে তিনি এ সম্পর্কে লেখেন:

> ... যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন-একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে– এমন-কি, ইংরেজ-রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।[১০]

---

৭ "... to attempt social reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost political freedom is the very height of ignorance and futility." quoted; Hitendra Mitra, ibid, p. 192

৮ `Hetendra Mitra, ibid, p. 190

৯ "He addressed a public meeting around 1906 or 1907 in calcutta which was considered to be a seditous one by the British Government and the Chief Secretary Macpherson" sent him a letter of warning for delivering such seditious speech ibid, p. 118-19

১০ 'রাজা ও প্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৪৮০

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৯০৮) প্রবন্ধে বিষয়টি স্পষ্ট করে তিনি বলেন যে, ইংরেজ পশ্চিমী সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে, 'বিধাতার ইচ্ছায়' এ দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্নমুখী জ্ঞানের আদান প্রদান চালাতে হবে এবং এ ভাবেই সত্যিকার মিলন হবে পূর্ব ও পশ্চিমের। এর আগে 'অসময়ে ইংরেজকে দূর' করার অধিকার আমাদের নেই।[১১] স্মর্তব্য, APjvqZb নাটকে তাঁর এই পূর্ব-পশ্চিম মিলনতত্ত্বের শিল্পরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য শেষ জীবনে, আশি বছর বয়সে তাঁর এ উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটেছিল, যা বিবৃত হয়েছে 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে ।

এটা সহজবোধ্য যে, ইংরেজকে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে তাদের সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভূত হয় না। সে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিষয়টিও চলে যায় বিবেচনার বাইরে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের উক্ত বক্তব্য ও নিষ্ক্রিয়তা সে কালের স্বাধীনতাকামী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতবাসীর কাছেও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় ভীরুতা, আপোসকামিতা, এমন-কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলমান আন্দোলনের বিরোধিতাও। এর ফলে তিনি অহিংস, হিংস্র কিংবা সশস্ত্র– কোনো উপায়ে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের বিষয়টি কখনো সমর্থন করেন নি। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা হামলাকে তিনি সুনজরে দেখেন নি, সমর্থন করেন নি কংগ্রেস কিংবা গান্ধির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সহিংস পরিণতি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, সম্মিলিত সাধারণ জনতা সব সময় অহিংস থাকতে পারবে না। এক পক্ষের নিষ্ঠুরতা অপর পক্ষের অহিংস থাকার অন্তরায় এবং সহিংসতা অবশ্যম্ভাবী। আর সেখানেই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি। কারণ ব্রিটিশ তাঁর কাছে শুধু শাসক নয়, সরকার নয়; 'ব্রিটিশ রাজ'-ও। তাঁর মতে, "ইংরেজিতে যাকে স্টেট বলে আমাদের দেশের আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তির আকারে ছিল।"[১২] আর 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, রাজা হলো রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যে মঙ্গলের ও দেবতার শক্তিস্বরূপ।[১৩] তাই তাঁর নাটকের রাজাও সব সময় ধার্মিক ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, কখনো কখনো দেবতাতুল্য; যেমন kvi‡'vrme ও WvKNi- এর রাজা। এ রকম রাজার সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক থাকে সব সময় মধুর ও পবিত্র। যেন সেখানে থাকে না শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। মূলত এটাই ছিল তাঁর পূর্বাপর দৃষ্টিভঙ্গি; এক ধরনের রাষ্ট্রদর্শন। তাই তাঁর নাটকের প্রজারা কোন অবস্থাতেই রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না। এমন-কি রাজা কখনো নিপীড়ক বা অত্যাচারী হয়ে উঠলেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা

[১১] 'সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খন্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ২৬৪
[১২] 'স্বাদেশী সমাজ' রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬
[১৩] 'রাজভক্তি', রাজা ও প্রজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

Dhaka University Institutional Repository

যাবে না; যেমন, cvqwðË নাটকে। তেমনি ivRv ও g³avi নাটকে স্পষ্টত রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নি। i³Kiex নাটকে শ্রমিক শোষণের নির্মম চিত্র ফুটিয়ে তোলা হলেও সেখানে রাজাকে দেখানো হয়েছে শ্রমিকদের সহযোগী হিসেবে। তাই উক্ত নাটকে শ্রমিক বিদ্রোহের লক্ষ্য হয়েছে রাজা নয়, সর্দাররা।

আবার নাটকের উক্ত পরিণতি এখানে ব্যবহৃত সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ রাজনীতির ধারায় আছে – শ্রমিক কৃষক তথা মেহনতী শ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের শোষণহীন সুষ্ঠু মানবিক সমাজ। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্য থাকবে না বলে সামন্ত রাজা কিংবা কোন পুঁজিপতিরও স্থান নেই। কিন্তু কবি শ্রমিক-কৃষক বা নিম্নশ্রেণির নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন না বলে i³Kiex-র শ্রমিকরা রাজার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে। একইভাবে i‡_i iwk নাটকেও শূদ্র শ্রেণির নিরঙ্কুশ জয় ঘোষণায় আছে দ্বিধা ও দোদুল্যমানতার পরিচয়। অথচ বাস্তব প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে ১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা একের পর এক ধর্মঘট (প্রায় ২০০টি), রাজপথে সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধসহ পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল ব্যাপক সংগ্রামে। উল্লেখ্য, ১৯০৮ সালে বোম্বাই নগরীর রাজপথে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে লেনিন অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘনিয়ে এসেছে।[১৪] আর ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে রীতিমতো বৈপ্লবিক কাল হিসেবে।[১৫] উল্লিখিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় ছিল– শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, উৎখাতের লক্ষ্যে সাধারণ জনগণের সংগ্রাম। কিন্তু তৎকালীন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার রাজনৈতিক দল কংগ্রেস- এর সমর্থক এবং একইসঙ্গে সামন্তপ্রথায় জীবিকা সংস্থান-নির্ভর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে উল্লিখিত রাজনীতি সমর্থন করা ছিল বেশ কঠিন। তা ছাড়া তত্ত্বগত ভাবেও উল্লিখিত রাজনৈতিক দর্শন তিনি ধারণ করতেন না বলেই i³Kiex-র পরিণতি সমাজ-বিকাশের বস্তুগত বিশ্লেষণ অনুযায়ী হয়ে ওঠে নি। এ ভাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মূল্যায়ন এবং তত্ত্বগত উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেণি-পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যেমন, জমিদার হওয়ার সুবাদেই তাঁকে সবসময় কল্পনা করতে হয়েছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় কৃষকের, যাঁদের সঙ্গে রাজা বা জমিদারের থাকবে এক

[১৪] সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপণ্ঢবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খ–, কলকাতা, ১৯৯৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃ. ১১ (ভূমিকাংশ)

[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২ (ভূমিকাংশ)

Dhaka University Institutional Repository

সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক। এ কারণে কৃষকের ‘কর-বন্ধ আন্দোলন’ কিংবা শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ জনতার ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন কোনোটিকেই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বরং তাঁর এই আন্দোলন-বিমুখতা ও বিরোধিতা তাঁকে এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। সে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ব্রিটিশ প্রশাসন পরিকল্পনা নিয়েছিল তাঁকে দিয়ে Pvi Aa¨vq (১৯৩৪) উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করানোর। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার প্রদত্ত তৎকালীন একটি সরকারি প্রতিবেদনের অংশ-বিশেষ নিম্নরূপঃ

> Arrangements have already been made for the staging of plays to oppose the evils of terrorism and civil disobedience.
>
> Dr Rabindranath Tagore has also recently been persuaded through the Assistant Director of Public Instruction /Bengal to dramatise one of his books Char Adhaya which delivers a powerful attack on the cult of terrorism.[১৬]

তবে লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মধ্যে যে গণমুখী চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তা পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন আপোসরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি। তারই প্রভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গেলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ বা অংশ গ্রহণ থেকে তিনি একেবারে বিরত ছিলেন না। কংগ্রেসের একাধিক প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন, এক পর্যায়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করেছেন ‘স্যার’ উপাধি। তাঁর পক্ষে এটি ছিল একটি বড় ধরণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পদক্ষেপ। ১৯৩১ সালে হিজলি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতায় লক্ষ লোকের সমাবেশে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তিনি। কখনো তিনি জাতীয় আন্দোলনের কৌশল প্রশ্নে বিতর্ক করেছেন তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা গান্ধির সঙ্গে, কখনো শামিল হয়েছেন আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে। তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে; অহিংসবাদী হয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশেষত ফ্র্যান্সের পতনের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তারবার্তা’ পাঠিয়েছেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। নিজের রাজনৈতিক মত সম্পর্কে খোলাখুলি লিখেছেন ivRv I cRv, Kvjvšĺi গ্রন্থের এবং ‘সভ্যতার সংকট’সহ অন্যান্য প্রবন্ধে ও iwkqvi wPwVতে। এসব লেখায় তিনি সম্পূর্ণ মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে তিনি বাস্তবসম্মত মতামত প্রকাশ করেন যা ছিল সে সময় বেশ

[১৬] অরবিন্দু পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কোলকাতা, ১৯৮৮ পৃ. ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহসিকতার পরিচায়ক। শেষ জীবনে বৃটিশের কাছে পেশ করেছেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী। কৃষক সমাজের উন্নতির জন্য স্বল্প সুদের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে বিভিন্ন গণকল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এভাবে দেখা যায়, বাল্যকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও কর্মকাণ্ডের মধ্যেই অবস্থান করেছেন; এবং উক্ত দ্বিবিধ চেতনা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধের মতো তার নাট্যসাহিত্যেও 'বাঁধাধরা' 'সুস্পষ্ট' বা একপেশে রাজনৈতিক মতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

অবশ্য দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই পাওয়া যায় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকাশ। এমন-কি আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব না থাকলেও তা সমকালে প্রচলিত শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক আদর্শের অনুরূপ বলে ধরে নিতে হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পন্ন রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে রয়েছে তিনটি ধারা। যেমন,

এক, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শ্রেণি-ঐতিহ্যভিত্তিক;

দুই. উদার মানবিকতাবাদী;

তিন. সমাজ প্রগতিমূলক রাজনীতি।

প্রথম পর্যায়ভুক্ত নাটকগুলো হলো যথাক্রমে cKwZi cwZ‡kva, ivRv I ivYx, wPÎv½'v, †Mvovq Mj', gwjbx, ˆeK‡Éi LvZv, kvi‡'vrme, cvqwðË, ivRv, dvêbx, Mnc‡ek, wPiKgvi mfv, evkix, †hvMv‡hvM I gvjÂ।

দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে evj¥xwK cwZfv, wemRb, †Mvovq Mj', WvKNi, APjvqZb, bUxi cRv, PÐwjKv, Zv‡mi ‡'k, †kva‡eva I gw³i Dcvq।

তৃতীয় ধারার মধ্যে আছে APjvqZb I PÐwjKv।

উপরি-উক্ত নাটকগুলোর কয়েকটিতে একইসঙ্গে একাধিক ভাবের মিশ্রণও চোখে পড়ে। যেমন †Mvovq Mj' নাটকের মূল বিষয়ে রাজনীতি না থাকলেও উকিল নিমাই চরিত্রের মাধ্যমে ধনবাদী সমাজের অর্থসর্বস্বতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টভাবে। তেমনি উদার মানবিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নাটক PÐwjKv ও agms¯'vigjK নাটক APjvqZb-এ নিম্নশেণির মানুষকে যে মর্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতির জয়গানই প্রাধান্য পায়। বিশেষ করে APjvqZb নাটকে নিম্নশ্রেণির সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আছে রক্তাক্ত বিপ্লবের উপাদান।

রবীন্দ্রনাথের সচেতন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক মূলক নাটকেও ঘটেছে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। যেমন, g³aviv নাটকে উত্তরকূট রাজার সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশের ছায়াপাত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্রিটিশের শাসন শোষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মাধ্যমে এ নাটকে তাঁর শ্রেণি-উদ্ভূত আপোসকামী ও পলায়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়ে গেছে। i³Kiex নাটকের সমাপ্তি অংশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সামান্য বিচ্যুতি থাকলেও এ নাটকের মূল বিষয় ও কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে সমাজ-প্রগতিমূলক বক্তব্য। আবার শিল্পগত দুর্বলতাসহ i‡_i iwk নাটকে শেষ পর্যন্ত সমাজ-প্রগতিমূলক রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে।

এ অবস্থায় বলা চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন ধারার বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য, এটি ঘটেছে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ত সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিতে অবস্থান করেও তাঁর মধ্যে শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দ্বিকতার ফলে। কারণ সমাজের সচেতন সত্তা হিসেবে তিনি সমাজ-অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করেছেন অনেকখানি এবং তাঁর একাধিক নাটকে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশও করেছেন। আবার কয়েকটি নাটকে তা প্রতিফলিত হয়েছে যেন নিজেরই অজান্তে। এ ভাবে তাঁর চিন্তায় যতটুকু গণমুখী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রকাশমাত্রই অনেকাংশে তাঁরই শ্রেণিশাসিত রাজনীতির সঙ্গে যেন বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সব নাটকে কেবল ভাববাদ নির্ভর শ্রেণিবৈষম্যমূলক রাজনীতির প্রকাশ থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু বেশ কয়েকটি নাটকে এর বিপরীতধর্মী সমাজ-প্রগতিমূলক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল কলা-কৈবল্যবাদী, ভাববাদী এবং রস ও সৌন্দর্যের পূজারী নন, একই সঙ্গে বহুলাংশে তিনি সমাজ-সচেতন, মানবতাবাদী ও গণদরদী। এখানেই নাট্যকার হিসেবে, শিল্পী হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে তাঁর উচ্চতা। এ প্রসঙ্গে সুশোভন সরকারের ‘রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি’ শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> মিউনিসিপ্যাল গেজেটে ভ্যানগার্ডের লেখা প্রবন্ধে পড়লাম এক বামপন্থী স্প্যানিশ যোদ্ধা প্রশ্ন করেছেন, টেগোর কি সেই জাতীয় লোক যাঁরা সাক্ষাৎভাবে নূতন সমাজ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে না পারলেও আগামীকালকে বুঝবার ও অভিনন্দন করবার মতন মনের জোর ও স্বাধীনতা রাখেন? নাৎসি অভ্যুত্থানের পর রলাঁ যেমন লিখেছিলেন – ‘Working men, here are our hands. We are yours.

Dhaka University Institutional Repository

> Humanity is in danger'– জানি না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কোনও কথা বলা সম্ভব ছিল কি না। কিন্তু অশেষ সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও চিরজীবন যিনি নূতন নূতন পথে এগিয়ে চলবার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথেও সহায়ক হিসাবে ভাববার যথেষ্ট হেতু আছে।[১৭]

বস্তুত রমা রলঁ্যার মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতি কোনো বক্তৃতা বা প্রবন্ধে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে ও 'ঐকতান' কবিতায় তাঁর শ্রেণি 'অবস্থানজনিত' কারণে আত্মসমালোচনার যে সুর লক্ষ করা যায়, i³Kiex ও i‡_i iwk নাটকে শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতি যে সমর্থন পাওয়া যায় এবং iwkqvi wPwVতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াসের যে প্রশংসা তিনি করেছেন, তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সরাসরি নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে না পারলেও ভবিষ্যতকে বুঝবার ও অভিনন্দন জানাবার মতো মনের জোর তাঁর অবশ্যই ছিল।

---

[১৭] সুশোভন সরকার, 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি', শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ, সম্পা. বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

mnvqK MšcÄx :

K. evsjv

১. অজয় চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. চীনের আকাশে জাগে লাল তারা, কলকাতা, ২০০৪

২. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫

৩. অজিত কুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা, কলকাতা ১৩৯৫

৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রানী চন্দ, ঘরোয়া, কলকাতা, ১৪১৭

৫. অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৬. অবন্তী কুমার সান্যাল, প্রসঙ্গ : রম্যাঁ রলাঁ, কলকাতা, ১৯৯১

৭. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্র-মানস, কলকাতা, ১৯৬৯

৮. অরবিন্দ পোদ্দার, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার, কলকাতা, ১৯৮৫

৯. অরবিন্দ পোদ্দার, মানুষের পার্থিব সম্পদ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৯৫

১০. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কলকাতা ১৯৮৮

১১. অনিল আচার্য ও সব্যসাচী দেব (সম্পা.) অনুষ্টুপ প্রবন্ধ সংকলন, বিষয় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯১

১২. অরুণ মিত্র (সম্পা. ও অনু.), রম্যাঁ রলাঁ : বিপ্লবের নাট্যরূপায়ণ (১ম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৯২

১৩. শ্রীঅশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৬৪

১৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২

১৫. আনিসুজ্জামান, সম্পা. রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা, ১৯৮৩

১৬. আবু জাফর, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫

১৭. আবু জাফর, সাহিত্যে সমাজ ভাবনা, ঢাকা, ১৯৯৫

১৮. আবু জাফর, অন্বিষ্ট জীবন, ঢাকা ১৯৯৯

১৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, কলকাতা, ১৯৭৭

২০. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সম্পা. সীমার মাঝে অসীম, ঢাকা, ১৯৮৬

২১. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), মীর মশাররফ হোসেনের নাট্য সমগ্র, ঢাকা, ১৯৯৯

২২. আবুল হাসনাত, সম্পা, নানা রবীন্দ্রনাথের মালা, ঢাকা, ১৯৮১

২৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১, ২য় খণ্ড ২০০৩

২৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩৯৯

২৫. উৎপল দত্ত, শেক্স্পীয়ারের সমাজ চেতনা, কলকাতা, ১৩৯৫ (তৃতীয় সংস্করণ)

২৬. উৎপল দত্ত, জপেন দা জপেন যা, কলকাতা, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

২৭. উৎপল দত্ত, গিরিশ মানস, কলকাতা, ১৯৮৩

২৮. উৎপল দত্ত, আশার ছলনে ভুলি, কলকাতা, ১৯৯৩

২৯. উৎপল দত্ত,আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, কলকাতা, ২০০৯

৩০. এ. আর. দেশাই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কলকাতা, ১৯৮৭

৩১. এ. ফ. ইমাম আলি, সমাজতত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৯৩

৩২. এ্যারিস্টোফেনিস, ভেক (অনু. কবীর চৌধুরী), ঢাকা, ১৯৮৬

৩৩. কবীর চৌধুরী, ফরাসী নাটকের কথা, ঢাকা, ১৯৯০

৩৪. কাজী আবদুল ওদুদ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৩৭৬

৩৫. কার্তিক লাহিড়ী, বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৪০৫

৩৬. কুন্তল মুখোপাধ্যায়, থিয়েটার ও রাজনীতি, কলকাতা, ২০০২

৩৭. কুমার রায়, নাট্যভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৮৭

৩৮. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯০

৩৯. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি (অনু. রনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), কলকাতা, ১৯৮২

৪০. গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, ঢাকা, ১৯৮৪

৪১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ২০০৬

৪২. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০২

৪৩. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২

৪৪. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৬

৪৫. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ২০০২

৪৬. আলী আনোয়ার, আধুনিক ইউরোপীয় নাটক, ঢাকা, ১৯৮৫

৪৭. ইসমাইল মোহাম্মদ, নাট্যকলার ক্রমবিকাশ,ঢাকা, ১৯৮৭

৪৮. ইসমাইল মোহাম্মদ (অনু.) হপ্তম্যানের তিনটি নাটক, ঢাকা, ১৯৭০

৪৯. ইজরাইল এপস্টাইন (অনু. মাহফুজ উল্লাহ), আফিম যুদ্ধ থেকে মুক্তি, পেইচিং, ১৯৮৫

৫০. ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০১

৫১. কবীর চৌধুরী, প্রসঙ্গ নাটক, ঢাকা, ১৯৮১

৫২. কবীর চৌধুরী (অনু.) ভেক, এ্যারিস্টোফেনিস, ঢাকা, ১৯৮৬

৫৩. কাবেরী বসু (ভাষান্তর), 'মায়ারহোল্ড', এলেনদিয়া প্রোফের, স্যাস (নাট্যপত্র), সম্পা. সত্য ভাদুড়ী, কলকাতা, ২০০৮

৫৪. কার্ল মার্কস ও ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, মস্কো, ১৯৭১

৫৬. কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো, ১৯৭১

৫৭. কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, মস্কো, ১৯৭২

৫৮. কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো, ১৯৭২

৫৯. গনেশ ঘোষ, বিপ্লবী সূর্য সেন, কলকাতা, ১৯৯৫ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

৬০. গীতা চট্টোপাধ্যায়, বাংলা স্বদেশী গান, দিল্লী, ১৯৮৩

৬১. গীতা সেনগুপ্ত, বিশ্ব রঙ্গালয় ও নাটক, কলকাতা, ১৯৭৫

৬২. গোপাল হালদার (সম্পা.) রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৮

৬৩. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, কলকাতা, ১৯৮৪

৬৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি-রশ্মি, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬০ (চতুর্থ মুদ্রণ)

৬৫. চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, কলকাতা, ১৩৯২

৬৬. জামিল আহমেদ, হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, ঢাকা, ১৯৯৫

৬৭. জিয়া হায়দার, নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮১

৬৮. জিয়া হায়দার, নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার, ঢাকা, ১৯৯৫

৬৯. জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫

৭০. জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০

৭১. জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪

৭২. জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৬

৭৩. জিয়া হায়দার, থিয়েটারের কথা, ৫ম খণ্ড, ঢাকা, ২০০৭

৭৪. জিয়া হায়দার, বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা, ঢাকা, ১৯৯১

৭৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, সম্পা. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০০২

৭৬. টেরি ঈগলটন, মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা (অনু. নিরঞ্জন গোস্বামী), কলকাতা, ১৩৯৮

৭৭. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯৪

৭৮. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কলকাতা, ১৯৯১

৭৯. দুলাল ভৌমিক, সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৪

৮০. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (সম্পা. রথীন্দ্রনাথ রায়), প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৮

৮১. ধনঞ্জয় দাশ, সম্পা. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৯

৮২. ধনঞ্জয় দাশ, সম্পা. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. ধনঞ্জয় দাশ, সম্পা. বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চিন্তার প্রভাব, কলকাতা, ১৯৯৩

৮৪. ধর্মপাল মহাথের, সদ্ধর্ম রত্নমালা, কলকাতা, ২০০২

৮৫. নন্দিনী সেন, 'জাতীয় জাগরণ ও আন্তর্জাতিক চেতনা', অসমাপ্ত বিপ্লব, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা (সম্পা. নরহরি কবিরাজ), কলকাতা, ২০০৭

৮৬. নরহরি কবিরাজ (সম্পা.) অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, কলকাতা, ২০০৭

৮৭. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৩

৮৮. নারায়ণ চৌধুরী, রবীন্দ্র-চর্চা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

৮৯. নাসিম আখতার হোসাইন ও সরদার আবদুস সাত্তার (অনু.), মার্টিন কেম্পচেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জার্মানী, ঢাকা, ১৯৯৮

৯০. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ২০১২

৯১. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, ডাকঘরের হরকরা, কলকাতা, ১৯৮৫

৯২. নির্মল কুমার সেন, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯০

৯৩. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ১৪১০

৯৪. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৩

৯৫. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৮

৯৬. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১

৯৭. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১

৯৮. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৪

৯৯. নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯৯৯

১০০. পিনাকেশ সরকার (সম্পা.) হারানো দিনের নাটক, কলকাতা, ১৯৯১

১০১. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৩৯৭

১০২. প্রতিমা দেবী, নৃত্য, কলকাতা, ১৪০০

১০৩. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, কলকাতা, ১৭৭৯

১০৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, কলকাতা, ১৪০১ (৪র্থ মুদ্রণ)

১০৫. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৪১৫

১০৬. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৪১৬ (পঞ্চম সংস্করণ)

১০৭. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৪১৭

১০৮. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৪১১ (পুনর্মুদ্রণ)

১০৯. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository

১১০. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ প্রবাহ, কলকাতা, ১৯৮৮

১১১. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

১১২. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

১১৩. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৪

১১৪. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৪১৭ (পঞ্চম মুদ্রণ)

১১৫. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

১১৬. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

১১৭. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৯

১১৮. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৮ম খণ্ড, কলকাতা,২০০৯

১১৯. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, ৯ম খণ্ড, কলকাতা, ২০১০

১২০. প্লেখানভ, জি. ভি. শিল্প ও সমাজ, অনু. আফজালুল বাসার, ঢাকা, ১৯৮৬

১২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্যসমগ্র), কলকাতা, ২০০৪

১২২. বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৬

১২৩. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯০

১২৪. বদরুদ্দীন উমর, ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, কলকাতা, ১৯৯৮

১২৫. বিনয় ঘোষ, নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, কলকাতা, ১৯৮১

১২৬. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ২০০৭

১২৭. বিনয় ঘোষ, নবজাগৃতি, কলকাতা, ১৯৯৩

১২৮. বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ২০০০

১২৯. বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, কলকাতা, ২০০২

১৩০. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৯৮৯

১৩১. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, ২০০৬

১৩২. বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ, কলকাতা, ২০০০

১৩৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৪০৫

১৩৪. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঢাকা, ১৯৮৩

১৩৫. মলিনা রায় (অনু.) রবীন্দ্রনাথ এন্ডরুজ পত্রাবলী, কলকাতা, ১৯৬৭

১৩৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন দীনবন্ধু রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৭৮

১৩৭. মাও সে-তুঙ, চার প্রবন্ধ, পিকিঙ, ১৯৭৭

১৩৮. মালেকা বেগম, নারীমুক্তি আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১৩৯. মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কলকাতা, ১৯৭৬

১৪০. মুজফ্ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা, ১৯৯৬

১৪১. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, কলকাতা, ১৯৯৮

১৪২. মুনীর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪

১৪৩. মোবাশ্বের আলী, বিশ্বসাহিত্য, ঢাকা ১৯৮৩

১৪৪. মোবাশ্বের আলী, গ্রীক ট্র্যাজেডি, ঢাকা, ১৯৯৩

১৪৫. রজনী পাম দত্ত, আজিকার ভারত, কলকাতা, ১৯৮৩

১৪৬. রথীন চক্রবর্তী, (অনু.) রম্যাঁ রলাঁর পিপল্স থিয়েটার, কলকাতা, ১৯৮৩

১৪৭. রথীন চক্রবর্তী (সম্পা.) নাট্যচিন্তা (যুদ্ধ ও থিয়েটার), বর্ষ ২৫, কলকাতা

১৪৮. রথীন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি ও নাট্যকার, কলকাতা, ১৪০০

১৪৯. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি, কলকাতা, ২০১০

১৫০. রবীন্দ্রগুপ্ত, সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৩

১৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মালঞ্চ, কলকাতা, ১৯৭৯

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৪০৬

১৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৪০৬

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ১৪০৯

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯০

১৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১

১৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২

১৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২

১৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮০, ১৩৯৪

১৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮০, ১৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১

১৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২, ১৪০৭

১৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২

১৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২

১৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯২

১৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩

১৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪

১৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪

১৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৮শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪

১৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৯শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪

১৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩০শ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪

১৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩১শ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৭

১৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ-১, কলকাতা, ১৩৯৩

১৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ-২, কলকাতা, ১৩৯৩

১৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা ৬ষ্ঠ সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, ১৩৭০

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীত চিন্তা, কলকাতা, ১৩৯৯

১৮৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৬

১৯০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৮২

১৯১. রাজশেখর বসু, মহাভারত (সারানুবাদ), কলকাতা, ১৩৯৪

১৯২. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট : প্রয়োগের নন্দনতত্ত্ব, কলকাতা, ২০০৩

১৯৩. রাহমান চৌধুরী, রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক, ঢাকা, ২০০৭

১৯৪. রেবতী বর্মণ, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬

১৯৫. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ (সমকালীন প্রতিক্রিয়া), কলকাতা, ১৯৯৫

১৯৬. লেনিন, ভ. ই. ধর্ম প্রসঙ্গে, কলকাতা, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, কলকাতা ১৯৯২

১৯৮. শান্তনু কায়সার, তৃতীয় মীর, ঢাকা, ১৯৯৪

১৯৯. শান্তিদেব ঘোষ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, কলকাতা, ১৪১৪

২০০. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৯৩

২০১. শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ (সম্পা.), বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা, কলকাতা, ১৯৯৮

২০২. শিশির কর, ব্রিটিশ আমলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, কলকাতা, ২০০৯

২০৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১

২০৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৯

২০৫. শোভনলাল দত্তগুপ্ত, মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, কলকাতা, ১৯৯০

২০৬. শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য সন্দর্শন, ঢাকা, ১৯৮২

২০৭. শঙ্খ ঘোষ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক, কলকাতা, ১৯৮৫

২০৮. শঙ্খ ঘোষ, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯৮

২০৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, ১৯৭১

২১০. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার, কলকাতা, ১৯৮২

২১১. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্র রচনা-সংকলন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, শিল্পচিন্তা, কলকাতা, ১৯৯৬

২১২. সরোজ আচার্য, সরোজ আচার্য রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭

২১৩. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, কলকাতা, ১৯৯৪

২১৪. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, ২০০৬

২১৫. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ঢাকা, ১৯৭৩

২১৬. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯০

২১৭. সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা, ঢাকা, ১৯৮৫

২১৮. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯৫

২১৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৭৫

২২০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রেণী সময় সাহিত্য, ঢাকা, ১৯

২২১. সুকান্ত পাল, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮

২২২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (চতুর্থ সংস্করণ), কলকাতা, ১৩৬৯

২২৩. সুকুমারী ভট্টাচার্য (অনু.), মৃচ্ছকটিক, নতুন দিল্লী, ১৯৮৫

২২৪. সুকোমল সেন, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০–২০০০), কলকাতা, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

২২৫. সুধাংশু দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৯০

২২৬. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৯৫

২২৭. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা গানের চার দিগন্ত, কলকাতা, ১৯৯২

২২৮. সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি, রাজনীতি, কলকাতা, ২০০১

২২৯. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), কলকাতা, ১৯৮৭

২৩০. সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. মার্কবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৮৪

২৩১. সুপ্রকাশ রায়, গান্ধীবাদের স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯০

২৩২. সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

২৩৩. সুনীল কুমার ঘোষ (অনু.), ইবসেন নাট্যসম্ভার, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৩

২৩৪. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানের শব্দ পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯১

২৩৫. সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৩৯৪ (পুনর্মূদ্রণ)

২৩৬. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, লেনিনবাদীদের চোখে গান্ধীবাদ, কলকাতা, ১৯৯১

২৩৭. স্বপন বসু, গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, কলকাতা, ১৯৮৭

২৩৮. স্ট্যালিন, জোশেফ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, কলকাতা ১৯৯৭

২৩৯. হায়দার আকবর খান রনো, রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে, ঢাকা, ২০১১

২৪০. হীরেন ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তব্তা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা ১৯৮৭

২৪১. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও বৃটিশ ভারত), কলকাতা, ১৯৮৬

২৪২. হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলকাতা, ২০০৭

L. Bs‡iwR

1. ALLARDYCE NICOLL, The theory of drama, Delhi, 1999
2. A Centenary Volume, Rabindranath Tagore. 1961-1961, Fourth Printing, New Delhi, 1992
3. Aronson, Alex. Rabindranath Through Western Eyes, Calcutta, 1985
4. Bottomore, Tom. A Dictionary of Marxist Thought, New York, 1985
5. Brustain Robert (edtd.), STRINDBERG, SELECTED PLAYS AND PROSE, New York, 1964
6. Dutt, R. Palme, India Today, Calcutta, 1986
7. Guhathakurta, P. The Bengali Drama : Its Origin and Devolopment, London, 1930
8. J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, Penguin Books, 1982
9. Keith. A, B, The sanskrit Drama, Oxford. 1982

Dhaka University Institutional Repository

10. Kripalani, Krishna, Rabindranath Tagore : A Biography, Calcutta, 1980
11. Lenin, On Literature and Art, Moskow, 1987
12. Marx : Engels, Selected Works, Moscow, 1970
13. Marx : Engels, Selected Correspondence (1846-1895), London, 1943
14. Mitra, Hitendra, Tagore Without Illusions, Calcutta, 1983
15. Peter Thomson and Glendyr Sacks (ed.), The Cambridge Companion to Brecht, Cambirdge University, 1994
16. Sisir Kumar Das, ed. The English Writings of Rabindranath Tagore, New Delhi, 1996
17. Solomon Maynard, Marxism and Art, Detroit, 1979
18. Thompson, Edward, Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist, 2nd edn. London, 1948
19. Wellek, Rene and Warren, Austin, Theory of Literature, London, 1963
20. Bloomstury English Dictionary (New edn.)
21. Dictionary of Philosophy, Moscow, 1984
22. SHAKESPEAR, The Essential Guide to the Life and Works of the Bard, Encyclopaedia Britannica
23. THE SEEKER'S GLOSSARY OF BUDDHISM, 2nd Edition, Taipai, 1998

M. ceÜ I cwÎKv :

১. অভীক কুমার দে, 'মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, কলকাতা, ১৪০৫
২. উৎপল দত্ত, 'পিসকাটর : রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক', এপিক থিয়েটার (সম্পা. উৎপল দত্ত), কলকাতা, ১৯৯৩
৩. কাবেরী বসু (অনু.), এলেনদিয়া প্রোফের, 'মায়ারহোল্ড', স্যাস (নাট্যপত্র), সম্পা, সত্য ভাদুড়ী, রজত জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৮
৪. পবিত্র সরকার, 'ডাকঘর : নাস্তিকের নিবিড় পাঠ', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, কলকাতা, ১৪০২
৫. প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব', অনুষ্টুপ (সম্পা. অনিল আচার্য), চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯০
৬. বিষ্ণু বসু, 'পোলিটিক্যাল থিয়েটার কেমন হবে', গ্রুপ থিয়েটার (সম্পা. রমন মহেশ্বরী), ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা কলকাতা, ১৯৮০
৭. ভবতোষ দত্ত, 'রবীন্দ্রনাটকের পূর্বসূত্র; বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, কলকাতা, ১৯৭৬
৮. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার'; নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ৩, কলকাতা ১৯৯৩

৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'মেকওলে, বিদ্যাসাগর ও বিবেকান্দ', মুক্তকণ্ঠ সাময়িকী, ১৯ জুন, ঢাকা ১৯৯৮

১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের নাটক : মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধনের সত্য', কালিকলম (সম্পা. আবুল হাসনাত), ঢাকা, ২০১২

১১. সুধী প্রধান, 'রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, কলকাতা, ১৪০৩

১২. সৈয়দ আবুল কালাম, 'রাজনীতির রবীন্দ্রনাথ,' নতুন দিগন্ত (সম্পা. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), অক্টোবর- ডিসেম্বর, ঢাকা, ২০০৬

১৩. স্বরোচিষ সরকার, 'অস্পৃশ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ', সীমার মাঝে অসীম, সম্পা. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ঢাকা, ১৯৮৬

১৪. হাসিবুর রহমান (অনু.), অগাস্ট বেবেল, 'নারী এবং সমাজতন্ত্র', সংস্কৃতি, (সম্পা. বদরুদ্দীন উমর), বিশেষ নারী সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ঢাকা, ১৯৯৭

১৫. হীরেন ভট্টাচার্য, 'নাটক ও নাট্য আন্দোলনের সামাজিক দায়িত্ব', মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, সম্পা. শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৪

১৬. এপিক থিয়েটার (সম্পা. উৎপল দত্ত), সংখ্যা : ৯-১২, কলকাতা, ১৯৯২

১৭. এপিক থিয়েটার (সম্পা. উৎপল দত্ত), নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৩

১৮. গ্রুপ থিয়েটার (সম্পা. রমন মহেশ্বরী), শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৫

১৯. নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৩, (সম্পা. নৃপেন্দ্র সাহা, রথীন চক্রবর্তী), তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি, কলকাতা ১৯৯৩

২০. নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, পথনাটক সংখ্যা (সম্পা. নৃপেন্দ্র সাহা, চন্দন সেন), কলকাতা, ২০০৪

২১. পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্র সংখ্যা, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৪, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২২. বহুরূপী ১০৪ (সম্পা. কুমার রায়), বিশেষ রক্তকরবী প্রযোজনা ১০২ সংখ্যার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৫

২৩. The Visvabharati Quarterly, Volume 40, No. 1, 1974-75

২৪. Hiren Kumar Sanyal, 'The Plays of Rabindranath Tagore', A Centenary Volume : Rabindrnath Tagore, 1861 – 1961, New Delhi, 1992

২৫. Humayun Kabir, 'Social and Political Ideas of Tagore.' Ibid.

Dhaka University Institutional Repository